সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অষ্টমবর্ষ—প্রথম খণ্ড।

সূচীপত্র।

অষ্টম বর্ষ—প্রথম খণ্ড।

—:*:—

Slave-Mentality বা শূদ্র-আত্মা।

——:*:——

প্যাট্রিয়টিজম্ একটা সুরা বিশেষ—ও উদরস্থ হ'লেই চোখ একটু না একটু বিস্ফারিত হবেই এবং প্রাণে একটু না একটু রঙ্ ধরবেই। কিন্তু ঐ একটুকু নেশা না হলেও আবার মানুষের চলে না। যাঁরা দেশের ও দশের কাজ করতে নেমেছেন, তাঁদের সবাইকে যদি একেবারে বোধিসত্বের মতো গম্ভীর হ'য়ে কর্ত্তব্যের কণ্ঠে 'সংবদদ্ধং' 'সংগচ্ছধ্বং' বল্তে হয়, এবং সৃষ্টির চারিদিকে কোথাও যেন এতটুকু অকেজো নিঃশ্বাস না পড়ে তাই সন্তর্পনে দেখতে হয়, তবে তাই দেখতেই তাঁদের সময় কেটে যাবে—আর কাজের কিছুই হবে না। কাজে একটু রস চাই বই কি—জীবনে একটু ফুর্ত্তি চাই বই কি! নইলে মানুষ বাঁচে না—ত্রিশ বছরে সে বুড়ো হয়, বত্রিশ বছরে তার চুল পাকে দাঁত পড়ে, আর চল্লিশ বছরে তার জীবনের বোঝা একেবারে আশ্চর্য্য রকম হাল্কা হ'য়ে যায়। আসলে জীবনে একটা নেশা চাই-ই, তা সে খেলারই হোক্ বা পড়ারই হোক্, প্রেমেরই হোক্ বা জ্ঞানেরই হোক্, কর্ম্মেরই হোক্ বা ধর্ম্মেরই হোক্। ভৌতিক সুরা যেমন প্রাণের Stimulant—মানস-সুরা তেমনি আত্মার Stimulant বা আত্মিক সুরা মনের Stimulant;—যেদিক থেকেই ধরা যাক্ না কেন, ওর ফল একই। ঐ Stimulant মানুষের জীবনকে সতেজ রাখে ও

মনকে সহজে বুড়ো হ'তে দেয় না। সুতরাং মানুষের পরমায়ুও বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ঐ প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ যখন পলিটিক্যাল প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ হয়, তখন তা হ'য়ে ওঠে একেবারে ত্বরিতানন্দ। ওর ফলে মনের পাতায় সত্য মিথ্যার মাঝখানের রেখাটা এমনি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় যে, তখন দেখা যায় প্যাট্রিয়ট্ সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে একটা নৃত্য সুরু করেছেন যেটা নটরাজের প্রলয়নৃত্যের মতোই হ'য়ে উঠেছে—অর্থাৎ তাতে ভাঙ্গাটা যেমন এগিয়ে যায়, গড়াটা তেমনি পিছিয়ে পড়ে। কেননা ভাঙ্গাটা চোখ বুঁজেও করা চলে, কিন্তু গড়াটা জ্ঞান না হ'লে চলে না। জ্ঞান অবশ্য সত্য মিথ্যার জ্ঞান। কেননা মিথ্যা মানুষকে মৃত্যুই দান করতে পারে—সত্যই তাকে প্রাণ দেয়, তাকে সৃষ্টি করবার শক্তি দেয়।

(২)

উপরের ঐ ভূমিকার তাৎপর্য্য কি ?—বল্‌ছি।

কিছুদিন থেকে দেশের পলিটিক্সের হাওয়ায় একটা কথা উড়ছে, কথাটা হচ্ছে Slave-mentality. ইংরেজের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছথেকে আমরা নাকি কোন লাভই লাভ করি নি—যা লাভ করেছি সেটা হচ্ছে নিছক ও নির্জ্জলা Slave-mentality. অবশ্য বিদ্যালয় যদি বিদ্যাদানের পরিবর্ত্তে কেবলই Slave-mentality দান করে, তবে তার সংশ্রব যত শীঘ্র ছাড়া যায় ততই মঙ্গল,—বিশেষত আমাদের উদ্দেশ্য যখন হচ্ছে স্বরাজ-লাভ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার কায়দাকানুন একেবারে উঁচু দরের না হলেও

সেটা যে বাঙালী জাতির কোন ভালই করে নাই, কেবল তাদের Slave-mentality-ই গড়ে তুলেছে, তা যে অবিসংবাদিতরূপে কোথাও প্রমাণিত হয়েছে, এটা কানেও শুনি নি চোখেও পড়ি নি। তবুও যে অবিসংবাদিতরূপে ওটা সবার কাছে গ্রাহ্য হয়েছে, তার মূলে আছে আমাদের পলিটিক্যাল প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্। এতে একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে, আমাদের স্বদেশ-প্রেম আজও স্বরাট্ হয় নি। আজও সেটাকে পরের দোষের ঠেকো দিয়ে উঁচু করে' রাখতে হয়। নিজ হাতে অমৃত আহরণ করবার ইচ্ছা আমাদের তখনই জাগে, যখন বুঝি পরে আমাদের বিষ দিচ্ছে। আজও আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নিজের বাঁচবার ইচ্ছার জোরে প্রারব্ধ হয় না, পরের দেওয়া মৃত্যুর ভয়ে হয়। আজকে যে আমরা স্বরাজ চাচ্ছি, সেটা স্বরাজের আনন্দেই নয়—সেটা চাচ্ছি ইংরেজ শাসনে ব্যথিত হ'য়ে। স্বরাজের স্বপ্নের চাইতে জালিয়ানালাবাগের বিভীষিকা আমাদের চোখে বেশী স্পষ্ট। নিজের পায়ে দাঁড়াবার, নিজের হাতে নিজের বিদ্যামন্দির গড়ে' তুলবার সত্য ও সহজ শক্তি আমাদের নেই বলেই, পরের দেওয়া বিদ্যাকে নিন্দা করে' আমরা আমাদের ঐ পথে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করছি। আজ তাই এ-কথা আমরা যত মনে করে' রাখি ততই মঙ্গল যে, মানুষের ঐ অবস্থা, সৃষ্টি করবার সত্য ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামক নয়। কবির কাব্য বা কর্ম্মীর কর্ম্ম এ-দুয়ের পিছনে একই সত্য রয়েছে। কবি কাব্য লিখতে বসেন, অ-কবি অ-কাব্য লিখছেন বলে' নয়—কর্ম্মীর কর্ম্ম-প্রচেষ্টাও তখনই জয়যুক্ত হবে, যখন তা হবে স্বরাট ও স্বাধীন। পরমুখাপেক্ষিতা আছে দু'রকমের। এক পরের মুখ চেয়ে আশা করা, আর এক পরের মুখ চেয়ে নিরাশ হওয়া।

শেষেরটী ঐ আগেরটীরই ছোট । আমাদের মুখ থেকে আজ যে কথা ফুট্‌ছে ও আমাদের যে অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ পাচ্ছে, সে হচ্ছে অভিমানে—তার জন্ম হয়েছে পরের মুখ চেয়ে নিরাশ হওয়ায়। মানুষের অন্তরে যতক্ষণ ব্রহ্মা না জেগেছেন, ততক্ষণ সে বাইরের কারণকেই তার সৃষ্টির motor-power রূপে ব্যবহার করতে চায়। তার ফল মানুষের অকৃতার্থতা ও অনুষ্ঠানের অকৃতকার্য্যতা।

(৩)

কিন্তু যাক্ সে কথা। আলোচ্য বিষয়টা হচ্ছে এই যে, ইংরেজের ইউনিভারসিটি আমাদের কেবল Slave-mentality দান করেছে। এই Slave-mentality ইংরেজিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়—দাস্য-ভাব নয়, শূদ্র-আত্মা। এখন এই শূদ্র-আত্মা কি ইংরেজের ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনোর ফলই ?—কি জানি ! কে জানে ! হয় ত তাই, হয় ত নয়। কিন্তু যে কথাটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে সেটা হচ্ছে এই যে, ইংরেজ ইউনিভারসিটি বসিয়ে ভারতবাসীকে Slave করে নি, ভারতবর্ষকে Slave করে' তারপর ইউনিভারসিটি বসিয়েছে। অবশ্য ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় করা সম্বন্ধে দুটো উল্টো মত আছে, হয়ে একটা হচ্ছে যে ; তা, করেছে ইংরেজের তরবারীর জোরে, আর এক হচ্ছে, ভারতবাসীর অন্তরে ইংরেজের প্রতি আত্যন্তিক মহিমায়। কিন্তু ঐ দুই থিওরির যে-কোন-একটার মধ্যে ঐতিহাসিক সব সত্যটুকু নেই। সে সত্য হচ্ছে এই যে, ইংরেজ ভারত জয় করেছে তরবারীর জোরে ঠিকই, কিন্তু সে তরবারী খেলেছিল ভারতবাসী কালা আদমিদেরই সহস্র সহস্র হাতে। তাতেই

দেখা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার আগেও দেশে শূদ্র-আত্মার অভাব ছিল না। কেননা শূদ্র-আত্মার ধর্ম্মই হচ্ছে পরের হাতে পরের ইচ্ছায় পরের প্রয়োজন জুগিয়ে চলা। ইংরেজের ভারত অধিকার করাটাই প্রমাণ যে ভারতবাসী তাই করেছে, আর এটা সবাই জানেন যে, তখন ভারতে ইংরেজের ইউনিভারসিটির একটা থাম পর্য্যন্তও গড়া হয় নি। আসলে ইংরেজ ভারত অধিকার করবার পূর্ব্বে Slave-mentality বলে' কথাটা দেশে না থাকলেও, ও পদার্থটার অভাব দেশে একান্তভাবে ছিল না।

(৪)

সুতরাং এখন যে প্রশ্নটা ওঠে সেটি হচ্ছে এই যে, শূদ্র-আত্মার লক্ষণ কি?—এক কথায় সে লক্ষণ হচ্ছে, আত্মা হ'তে নব নব সৃষ্টি করবার শক্তি ও সাহস নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাওয়া। যখন দেখব যে মানুষের অন্তরে বৃহৎ চিন্তা, বৃহৎ জ্ঞান, বৃহৎ স্বপ্ন, বৃহতের আকর্ষণ অতি অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—বৃহৎ জীবনের বৃহৎ আনন্দের অঙ্কুর শুকিয়ে গিয়েছে, সেখানেই বুঝব মানুষ শূদ্র হ'য়ে উঠেছে। যেখানে চলতে ভয় নিঃশ্বাস নিতে ভয়, আনন্দ করতে ভয়, সেখানেই বুঝব শূদ্রের আবির্ভাব হয়েছে। যেখানে জীবনের চাইতে মৃত্যুকে, স্বর্গের চাইতে নরককে, বিশ্বের চাইতে গৃহকোণকে বড় করে' তোলা হয়েছে সেখানেই জানব শূদ্র-আত্মার শঙ্কা আকুল বিশেষ কার্য্য-বিবরণী আপনাকে চরিতার্থ করে' করে' চলেছে। আর বাঙালী হিন্দুর ও অবস্থা ১৮৫৮ সাল থেকে, অর্থাৎ যে সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপিত হয় সেই সাল থেকে জন্মলাভ করে নি, তার আগে হ'তেই ওর পরিচয় প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়।

সিরাজদ্দৌলাকে মস্‌নদ থেকে নামাবার পর Press Act, Arms Act-বিহীন তখনকার বাঙলার কোটী কোটী হিন্দুমুসলমানের সামনে ধীরে ধীরে দেশটা যে ইংরেজের হাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল এটা অবশ্য সমাজের ব্রহ্মণ্যজ্ঞান, ক্ষত্রিয়বীর্য্য, বা বৈশ্য বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। সমাজ-অন্তরে শূদ্র-আত্মা সহজ হ'য়ে উঠেছিল বলে' দেশে মুষ্টিমেয় বিদেশী সেদিন আপনাদের এমন করে' প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করেছিল। দেশ শূদ্র হ'য়ে উঠেছিল, তাই বৈশ্য এমন করে' তাকে করতলগত করতে পেরেছিল।

কিন্তু সে যাহোক্—রাজনীতির দিকটার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্। কেননা হিন্দু বাঙলার স্বাধীনতার কথা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অতীতের কথা হ'য়ে উঠেছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছিল, এটা উপকথাই হোক্ আর ইতিহাসই হোক্, এ-কথা সত্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাংলার রাজনীতি বাঙালীর সমাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেছিল। কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুআগে হতেই বাংলার রাজনীতি ছিল নবাগত মুসলমানদের হাতে, আর বাংলার সমাজনীতি ছিল বাঙালী হিন্দুদের হাতে।

সুতরাং ইংরেজ এদেশে আসবার সময়টাতে বাঙালী হিন্দুর মন নামক পদার্থটির কেমন চেহারা ছিল, সেটা তখনকার মুসলমানের রাজনীতিতে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, খুঁজতে হবে তখনকার বাঙালী হিন্দুর সমাজনীতিতে। হিন্দু বাংলার মনের ছাপ মিলবে একমাত্র হিন্দু বাঙালীর সমাজের পিছনে। রাজনীতি যেখানে মুসলমানের

হাতে, সেখানে সে রাজনীতির পিছনে নিশ্চয়ই হিন্দুর মন মিলবে না। বলা বাহুল্য মনের খোঁজ নেওয়ার অর্থ আত্মারই সংবাদ নেওয়া। কেননা মন আত্মাকেই প্রকাশ করে, আর কিছুকে নয়।

মোটামুটি হিসেবে পলাশীর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দুর মনের ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে, সে মন হ'য়ে গেছে শূদ্রের মন।

তাই দেখতে পাই যে, সে মনে নব নব স্পন্দনের কোন অনুভূতি নেই নব নব সৃষ্টির কোন বেদনা নেই, মানুষের চিরন্তন পথচলার কোন আনন্দ নেই। সাহিত্য বল, আর্ট্ বল, ধর্ম্ম বল, দর্শন বল, বাঙালীর মনে সমস্তই একটা দাঁড়ি টেনে বসে আছে। আর দেখতে পাই শূদ্র আত্মার সবার চাইতে বড় নিদর্শন,—জীবন মনের নিদারুণ ভীতি। নূতন পথে চলা, নূতন কিছু বলা, নূতন কিছু ভাবা,—যাতে ব্রাহ্মণের আনন্দ, ক্ষত্রিয়ের উল্লাস, বৈশ্যের সুখ—তার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা। বাঙালী মনের প্রচণ্ড দাসত্বের নিদর্শন পাই এযুগে তাদের প্রাণপণে গতানুগতিকের পথে চলার বিশেষ বিবরণে, তাদের জীবনে শাস্ত্রীয় শ্লোকের বিরাট অট্টহাস্যে ও মেয়েলী ছড়ার মৃদু কৌতুক-হাসিতে।

সত্য কথা এই যে, মানুষের বড় দাসত্ব মনের দাসত্ব। বলা বাহুল্য মজুর ও মানবের দাসত্বে বড় বিশেষ প্রভেদ নেই। আমরা সবাই জানি বাঙালী হিন্দুর—এমন কি সমস্ত ভারতের হিন্দুর—এই দাসত্ব কত জমাট বেঁধে উঠেছিল; অতীতের জ্ঞান, অতীতের ধর্ম্ম, অতীতের কর্ম্ম আমাদের চারিদিকে তার মোহ ও ভয় দিয়ে আমাদের অমানুষ করে' তুলেছিল; আর আমরা পদে পদে শিখেছিলেম ভয় চাইতে

পরম সুখ ও পরম মঙ্গল আর কিছু নয়, আর কিছুতে নেই। এর চাইতে শূদ্রত্বের আর কি বড় নিদর্শন হ'তে পারে? সারা জগত যখন সাত সাগর ডিঙিয়ে আমাদের দু'য়োরে এসে ঘা দিচ্ছিল, তখন আমরা প্রাণপণে মন্ত্র উচ্চারণ করেছি—হে অতীত! আমাদের সকল বৃহৎ হ'তে রক্ষা কর, সকল নূতন হ'তে দূরে রাখ, সকল সাহসে বঞ্চিত রাখ। হে অতীত! তোমার মাঝে আমার মৃত্যু হোক, তাও আমার প্রেয় কোন নূতন প্রেয়কে অভিনন্দিত করবার দায় থেকে আমাকে রক্ষা করে' করে' চল। এ মন্ত্রে ত ব্রাহ্মণের দৃষ্টি নেই, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য নেই, বৈশ্যের স্বপ্ন নেই—এ যে শূদ্র মনের শূদ্র আত্মার চিরন্তনের মর্ম্মোচ্ছাস। আর ঐ মনোভাব হিন্দুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর জন্মলাভ করে' নি—তার আগেই বর্ত্তমান হ'য়ে ছিল। আজও আমরা জানি, নূতন পথে এক একটী পদক্ষেপ করবার সময় হিন্দুর অন্তর থেকে কি এক ভীতিপূর্ণ গভীর আর্ত্তনাদ ওঠে। ঐ আর্ত্তনাদ একমাত্র শূদ্রেরই স্বধর্ম্ম।

পলিটিক্সে সুবিধা হবে মনে করে' আজ আমরা যত বড় করেই ভাবি না কেন যে, ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের খালি দাসমনোভাবই জাগিয়ে তুলেছে—একথা আমরা মনে মনে জানি যে, ইংরেজি শিক্ষা ইংরেজের সাহিত্য আমাদের ঐ গতানুগতিক মনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে একটা প্রচণ্ড আঘাত করেছে, সে আঘাত মুগুরের আঘাত নয়—সে আঘাত জীবনের আঘাত। সে আঘাতের প্রথম ও প্রধান মঙ্গল হচ্ছে এই যে, আমাদের গতানুগতিক মন একটা প্রচণ্ড দোলা খেয়েছে। এই দোলা খাওয়া আমরা অমঙ্গল মনে করি নে। প্রমাণ, আজ অনেকের মধ্যেই গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ছেড়ে দেবার কথা

উঠলেও, কারো মুখেই ইংরিজি ভাষা বা সাহিত্য বয়কট করার কথা শোনা যায় না। একথা ত চোখ বুঁজেও সত্য বলে' বোঝা যায় যে, পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের যে স্থান আমাদের মনোজগতে ছিল, আজ আর তা নেই ; এবং আজ যে স্থান আছে, পঞ্চাশ বছর পরে আবার সে স্থান থাকবে না। কিন্তু এক মনের নেভা প্রদীপ, আর এক মনের জ্বালা প্রদীপে যে ধরিয়ে নেওয়া যায়, এ সত্য পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শ আমাদের মনকে সারা বিশ্বের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে, সাত সাগরের কলধ্বনিতে আমাদের প্রাণের বৃহত্তর ধর্ম্মের কথা শুনিয়েছে—যে মন সংকীর্ণ ছিল, যে প্রাণ সঙ্কুচিত ছিল, সেই মন প্রাণকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গতিশীল করেছে। আমার একথা যে কত সত্যি, তা টোলে-পড়া একটি পণ্ডিত ও কলেজ-ছাড়া একটি ছেলের তুলনা করলেই, তাদের দু'জনের মনের চেহারার পরিচয় নিলেই প্রমাণিত হবে। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ করিয়ে দেবার সাহায্য করেছে, একথা বল্‌লে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ করা হবে না।

টোলে-পড়া পণ্ডিতের কথা শুনে কারও কারও মনে পড়ে' যেতে পারে যে, ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি শিখে আমরা জাত ও জাতীয়তা দু'ইই হারিয়েছি,—কেননা আজ আমরা টিকী ও টীকা, এ দুটোর পূজোই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু যে কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি সেটা হচ্ছে এই যে, মনের প্রাণের সংকীর্ণতা, সঙ্কুচিত অবস্থা, কোন জাতিরই জাতীয়তা হতে পারে না,—কেননা তা কোন মানুষেরই পরম ধর্ম্ম নয়। এই

কথাটা মনে রাখা সর্ব্বদা দরকার যে, যে-বিচার যে-অনুষ্ঠান সমাজের পক্ষে এককালে সত্য ও সহজ ও উপযোগী ছিল, সে বিচার সে অনুষ্ঠান আর এককালে সত্য সহজ ও উপযোগী নাও থাকতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যের চলবার বেগ এইটুকু বোঝবার মতো সাহস আমাদের মনে চারিয়ে দিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালীর মনকে একদিকে শাস্ত্রীয় শ্লোক, অন্যদিকে মেয়েলী ছড়া, এই দুই স্তূপের ভিতর থেকে টেনে বের করেছে। এই টেনে বের করবার কাজ আজও শেষ হয় নি।

এইখানে কেউ কেউ বলবেন যে, আমাদের মনকে অতীতের ভগ্ন রাজপ্রাসাদের স্তূপ থেকে টেনে তোলা হোক্, কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কিছুই হয় নি। ও স্তূপ থেকে আমরা উঠেছি কেবল পরের মনের রূপ ধরবার জন্যে। আমরা আগে বেদ আওড়াতেম, আজ না-হয় বাইবেল আওড়াই ;— সুতরাং আমাদের যে শূদ্র-মন সেই শূদ্র-মনই রয়ে গেছে। কথাটা কতকটা সত্য, কিন্তু পুরোপুরি সত্যি নয়। আজ আমাদের জাতীয় মন একটা গতির মাঝদিয়ে চলেছে—সাহিত্য আর্ট বিজ্ঞান পলিটিক্স সর্ব্ব বিষয়েই তাই দেশে একটা মুভ্মেণ্ট চলছে। এই সব মূভমেণ্ট যদি পরের অনুসরণে না বলে' পরের অনুকরণেই ধরে' নি, তবুও এই সব মুভমেণ্ট মনের যে গতিশীলতার ফল, সেই গতিলাভই একটা মস্ত লাভ ; কেননা গতি যেখানে আছে, সেখানে মিথ্যা ও অমঙ্গল আজ না হোক্ কাল, কাল না হোক্ পরশু ভেসে যাবেই যাবে। সুতরাং ওটা সমাজের দিক থেকে একটা মস্ত সম্পদ। আশা করি এবিষয়ে দু'মত হবার সম্ভাবনা নেই। কেননা এটা প্রত্যক্ষ সত্য।

কিন্তু ও-অপবাদ যদি পুরোপুরি সত্যি নাও হয়, তবুও তাতে আমাদের লাভের ঘরে শূন্য পড়ে না। আমাদের অতীতের প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করাই একটা মস্ত কাজ। তা করতে গিয়ে যদি কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলার কাজ হয়ে থাকে—যদি আমরা সংস্কৃত পাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে ইংরেজি "নেট্"এ গিয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকি, তবুও তাতে আমরা লাভের ঘরে ফাঁকি পড়ি নি। কেননা অতীত ও পূর্ব্ব-পুরুষের আদেশ আমাদের যেমন করে চেপে ধরেছিল, বর্ত্তমান ও অপর পুরুষের উপদেশ আমাদের নিশ্চয়ই তেমন করে' চেপে ধরতে পারবে না। যে গতির কথা পূর্ব্বে বলেছি, সেই গতিই আমাদের বাইবেল বর্জ্জন করবার সম্ভাবনাকে অবিরাম জাগিয়ে রাখবে। আর বাইবেলের চাপ ঠেলে বের হওয়া, বেদের চাপ ঠেলে বের হওয়ার চাইতে বহু পরিমাণে সহজ হবে। কেননা বাইবেলের পিছনে আমাদের স্বজাতীয় ঋষিও নেই বা বিজাতীয় অহঙ্কারও নেই। সুতরাং পদে পদে সেখানে আমাদের আত্মগৌরবের মায়া-মরীচিকার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে না। সুতরাং বেদের ধমক থেকে যদি আমরা বাইবেলের চমকে গিয়ে পড়েই থাকি, তবে সেটা frying-pan থেকে fire-এ পড়া হয় নি—সেটা হয়েছে fire থেকে frying pan-এ ওঠা। সুতরাং ও-একটা লাভই।

কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন,—ইংরেজ যদি দেশে না আস্‌ত, ইংরেজি যদি আমরা না শিখতেম, তবে কি আমাদের জাতটা মহাপ্রলয়ের তারিখ পর্য্যন্ত গতানুগতিকের দাসত্ব করেই কাটিয়ে দিত?—এর উত্তরে আমরা বিনীত ভাবে শুধু এইটুকু নিবেদন করব যে, আমাদের বিচার-তর্ক যা ঘটেছে তাই নিয়ে,—যা ঘটতে

পারত, বা ঘটতে পারা উচিত ছিল, তা নিয়ে নয়। যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি ভবিষ্যৎ বাণীও শুনতে হয়, তবে অবশ্য উত্তরপক্ষের মেড়া বলে চুপ মেরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই!

তবে একথা স্পষ্ট সত্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে পরিমাণ লাভ আশা করা যেতে পারত, সে পরিমাণ লাভ আমরা পাই নি। যে শক্তি আমরা সেখানে খরচ করি, তার অনুপাতে ফল আমরা পাই নে। এবং তার কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির ও নানা মানুষের নানা মত থাকতে পারে এবং আছে। সে কারণগুলো যে কারণই হোক্ না কেন, তা শুধু এই-ই প্রমাণ করে যে, ঐ কারণ-গুলো না থাকলে আজ আমরা যে লাভ পাচ্ছি তার চাইতে ঢের বেশী ও বড় লাভ আমরা লাভ করতেম।

অবশ্য এই অল্প লাভে আমরা তুষ্ট নই। স্বল্পে সন্তুষ্ট ত হয় একমাত্র শূদ্র-মন। সুতরাং আজ আমরা আমাদের বিদ্যা-মন্দির নিজ হাতে গড়ে' তুলতে চাই। কিন্তু পলিটিক্যাল হট্টগোলে তা করা চলবে না কিছুতেই। তা করতে হ'লে চাই সমাজমনের একটা গভীর সত্য ও একটা গভীর সত্ত্বা,— যে সত্য আমাদের পথ দেখাবে, ও যে সত্ত্বা আমাদের শক্তি দেবে। বলা বাহুল্য প্রথম থেকে যদি আমরা সত্য দেখতে অস্বীকার করি, তবে শেষ পর্য্যন্ত আমরা অন্ধকারই সৃজন করে করে চলব। পলিটিক্স প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, বড় জোর প্রতিমা গড়তে পারে। প্রাণহীন প্রতিমা দান করতে পারে, না বর না অভয়। সাময়িক পলিটিক্সের বলদ জুড়ে বিদ্যা-রথ চালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে এই কারণে যে, পলিটিক্সটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মানবের কর্ম্ম, কিন্তু বাণীর মন্দির গড়াটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ মনের ধর্ম্ম।

(৫)

আমি এ প্রবন্ধের পূর্ব্বে একজায়গায় বলেছি যে Slave-mentality ইংরেজিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়, দাস্য-ভাব নয়, শূদ্র-আত্মা। পাটনা "সবুজ-সঙ্ঘে" শ্রীযুক্ত রঙিন হালদার মহাশয় দাস্য-ভাবের গুণগান করেছেন, এবং তা গেল চৈত্রের "সবুজ পত্রে" ছাপা হয়েছে। শূদ্র-আত্মা ও দাস্য-ভাব এক-সঙ্গে জড়িয়ে নেবার আশঙ্কা এ দেশে আছে। কেননা এ দুটো জিনিষ দেখতে একরকমই লাগে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলবার চেষ্টা করলে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না।

দাস্য-ভাব কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আর কতগুলো কথাও মনে পড়ে যায়—যেমন সখ্য-ভাব, বাৎসল্য-ভাব, মধুর-ভাব ইত্যাদি। কথা-গুলো সবই বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাধনার ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের। বৈষ্ণব সাধনা ভক্তি-মূলক। এই ভক্তিই রূপান্তরিত ও রসান্তরিত হ'য়ে কখনও প্রেমে কখনও স্নেহে পরিণতি লাভ করে। বলা বাহুল্য ওর প্রতিটীরই মূল লক্ষ্য ও শেষ ফল আনন্দানুভূতি। সব সাধনারই মূল লক্ষ্য ঐ—অর্থাৎ হয় দুঃখ-নাশ নয় আনন্দ-লাভ। তবে বৈষ্ণব-সাধনার একটা প্রধান গুণ এই যে, তা বিশেষ করে' মানবীয়; বৈষ্ণব-সাধনা মানুষের অন্তরকে জয় করতেও বলে না, ক্ষয় করতেও বলে না,—বলে তাকে দিব্য-মূর্ত্তি দান করতে। মানুষের পিতৃত্ব মাতৃত্ব সখাত্ব সখীত্ব প্রণয়িনীত্ব দাসত্ব ইত্যাদি চিরন্তনের যে ধর্ম্ম আছে, তাকে পরিহার করে' নয়—তাকে আশ্রয় করেই, তার ভিতর দিয়েই বৈষ্ণব

চরম ও পরম আনন্দের উৎসে পেঁ ছিতে চায়। সুতরাং তার সাধনা, দ্বৈতের সাধনা। সুতরাং তার জন্যে চাই একজন উপলক্ষ্য। বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণকেই সেই উপলক্ষ্য-পদে স্থাপিত করেছে। কেননা তার মতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই পরম-পুরুষের সাকার অবয়ব—সুঠাম, সুন্দর ও শাশ্বত।

সুতরাং দাঁড়াল এই যে, ঐ সখ্য বাৎসল্য মধুর দাস্য ইত্যাদি ভাবের পিছনে আছে সাধকের অনুভূত একটা নিবিড় প্রেম—যেটাকে বলা যেতে পারে দিব্য প্রেম। কেননা এই প্রেম যে-কেউকে ও যা-কিছুকে স্পর্শ করে, সবকেই স্বর্লোকের মূর্ত্তি প্রদান করে। দিব্য প্রেম এই দাস্য-ভাবের পিছনে আছে বলে', ও শূদ্র-আত্মার পিছনে নেই বলে', দাস্য-ভাবের দাসত্বে ও শূদ্র-আত্মার দাসত্বে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। কেবল তাই নয়,—শূদ্র যতদিন শূদ্র, ততদিন ঐ দাস্য-ভাব তার পক্ষে সত্যও হতে পারে না, সহজও হ'তে পারে না—সত্য ও সহজ হ'তে পারে কেবল দাস-ভাব। মানুষের নিম্নগা প্রকৃতিকে টেনে তুলে দিব্যলোকে স্থাপিত করবার জন্যে যে শক্তি ও সামর্থ্য দরকার, তা শূদ্রের আয়ত্তে কখনও আসতে পারে না। কেননা শূদ্রের ধর্ম্ম হচ্ছে স্বপ্নের ধর্ম্ম—মর্ত্ত্যের ও অপশক্তের। অবশ্য শূদ্র-আত্মার স্বধর্ম্ম উদ্‌যাপনের মধ্যেও একটা সার্থকতা ও আনন্দ আছে। কিন্তু দাস্য-ভাবের দাসত্বে ও শূদ্র-আত্মার দাসত্বে যে কি প্রভেদ, তা যে জানে সেই-ই জানে। ওর একটা হচ্ছে স্বর্লোকের আলোকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান, আর একটা হচ্ছে ভূলোকের আত্মীয়তায় অক্ষম ও কুন্ঠিত। সুতরাং ওর একটার সঙ্গে আর একটার যে মিল, তা কেবল অক্ষরে—অর্থে নয়। এটা আমাদের যত বেশী খেয়াল থাকে ততই মঙ্গল!

কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনার দিক থেকে এই দাস্য-ভাবের যে মূল্য ও যে অর্থই থাক্ না কেন, এই এক দাস্য-ভাব নিয়ে সমাজ চলে না। দাস্য-ভাবের মূল্য ও মহত্ত্ব ততক্ষণই সিদ্ধ ও সার্থক হ'য়ে থাক্‌বে, যতক্ষণ সারা জগত তার সেবা গ্রহণ করবার উপযুক্ত। সেবা-গ্রহণেরও যে অধিকারী-ভেদ আছে, তা ত আমরা হিন্দুরা সবাই জানি ও মানি। অনধিকারীকে দান করলে যে গ্রহীতার অমঙ্গল ও দাতার অধঃপতন, এটা হাতে কলমে প্রমাণ করা যায়। আজকের পৃথিবী যে সেই সেবা-গ্রহণ করবার অধিকারী নয়, তা আমরা চর্ম্ম-চোখেই দেখতে পাই। আজও সমাজের নানা প্রয়োজনের দরকার রয়ে গেছে। সুতরাং আজ সমাজে নানা লোকের, নানা ভাবের, নানা ধর্ম্মের প্রয়োজন। সুতরাং কেবল এক দাস্য-ভাবকে ধর্ম্ম করে' তুললে, সমাজের মানে আজ ব্যর্থ হবেই হবে। যদি এমন সময় কোন দিন আসে যে, সারা পৃথিবী পরমপুরুষত্ব লাভ করে শান্তং শিবং সুন্দরং হ'য়ে উঠেছে, তবে সেইদিন, কেবলমাত্র সেই দিন সমস্ত সমাজকে সমস্ত জাতিকে দাস্য-ভাবের সাধনা করবার উপদেশ দেওয়া চলতে পারবে। আজ কেবল দাস্য-ভাব নিয়ে কোন সমাজের বিশ্ব-মানবের সেবা করা চলবে না, কেননা তাহলে সে সমাজকে তলিয়ে যেতে হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দেশের শিক্ষা

—:০:—

দেশের শিক্ষা নিয়ে দেশের লোকের মনে একটা ঝড় উঠেছে। এই ঝড়ের চোটে এত উদ্দাম মতামত ও কল্পনার ধূলো ঘরে বাইরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে যে পণ্ডিতরাও চোখে ঝাপ্সা দেখচেন। কাজেই ঝড় না একটু পড়ে' আসা পর্য্যন্ত এত অদ্ভুত আর এত বিচিত্র কথা আমাদের শুনতে হবে, যে মোটেই অসহিষ্ণু হলে চলবে না।

যে শিক্ষার স্রোত আজ পঞ্চাশ বছর ধরে এই ভারতভূমি দিয়ে বইচে, তা যে যুগপৎ সঙ্কীর্ণ ও পঙ্কিল, তাতে করে আমাদেব যে তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হচ্চে না—স্বাস্থ্যও উন্নত হচ্চে না, এই হচ্চে আমাদের অধিকাংশ লোকের মত এবং বলা বাহুল্য সম্পূর্ণ একমত না হলেও—মোটের মাথায় তাঁদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ নেই। শিক্ষার মাত্রা ও উপাদান এ দুটোকেই যে একটু বদ্লানো দরকার তা তাঁরাও বলচেন, আমিও বলি। কিন্তু কেন আমরা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উপর হঠাৎ এতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলুম? কি করে আমরা আবিষ্কার করলুম যে আমাদের বিদ্যালয় আমাদের মনকে ফাঁসি দিচ্চে? এ সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণই আমাদের বেশীর ভাগ লোকের সম্বল। একদল সেন্সাস্ রিপোর্ট হাতে নিয়ে শিক্ষার ওজনটা এঁচে নিচ্চেন আর একদল আর্থিক অবস্থার কষ্টিপাথরে কষে শিক্ষার মূল্য বের করেচেন। অবশ্য সিদ্ধান্ত দুদলেরই সত্য কিন্তু বিচার প্রণালীটা

ঠিক—যুক্তিসম্মত নয়। যাদের বর্ণজ্ঞান আছে তারাই যে শিক্ষিত আর যারাই নিরক্ষর তারাই যে অশিক্ষিত এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম জ্ঞানরাজ্যে নেই। তবে যে হেতু আমাদের দেশে শিক্ষা জিনিষটা সম্পূর্ণ পুঁথিগত সুতরাং সেন্‌শাসের এ উক্তিকে অনুমোদন করতেই হবে যে শতকরা ৯২ জন পুরুষ ও ৯৯ জন স্ত্রীলোক একেবারেই অশিক্ষিত। তারপর দেশের দারিদ্র্য দুরবস্থার সঙ্গে শিক্ষার যে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত আছে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত নই আমাদের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান জীবিকাদৈন্যের জন্য শিক্ষাই যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী এমন কথা তিনিই নির্ভয়ে বলবেন যিনি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর আর কতকগুলি কারণের প্রতি অন্ধ। কিন্তু এ সত্বেও আমি বলতে বাধ্য যে রীতিমত সুশিক্ষার প্রসার দেশ কে অর্থশালী করে না তুললেও তার অভাব দেশকে নিঃস্ব করবেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য যাই হোক্ তার একটা ধ্রুব পরিণাম হচ্চে মানুষকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তৈরী করা। সুতরাং শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় একথা অসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে "জ্ঞানের ভাণ্ডার ধনের ভাণ্ডার না হলেও যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়ে ও ভবানী।"

যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে আমাদের শিক্ষার অভাব অভ্রান্তভাবে বোঝা যায়—সে হচ্চে অন্য সভ্য দেশের সঙ্গে তুলনা। ইউরোপের একজন কৃষক রমণীর ও যে মোটামুটি সর্ব্ববিষয়ী জ্ঞান আছে তা আমাদের অনেক শিক্ষাভিমানী ভদ্র-সন্তানের ও নেই। যাঁরাই ঘরের গণ্ডীর বাইরে একপা বাড়িয়েচেন—তাঁরাই হলপ করে বলে থাকেন যে সে দেশের শিক্ষার fact-এর জ্ঞান যত হোক্ না হোক্

principle-এর জ্ঞান বেশী হয়, ফলে সে দেশের অল্প শিক্ষিতেরাও যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় দেন তা এদেশের তথা কথিত উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যেও বিরল। তবে একথা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত যে শিক্ষার একটা বড় রকম বনেদী সংস্কার এ দেশের পক্ষে দরকার হয়ে উঠেচে। কিন্তু কি রকম বনেদী সংস্কার দরকার সে সম্বন্ধে যার যে রকম বনেদী সংস্কার তিনি সেই রকম মত জাহির করচেন। একদল পণ্ডিত শিক্ষার নিস্ফলতা দেখে এতই হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েচেন যে তাঁরা অসঙ্কোচে এবং মুক্তকণ্ঠে একথা প্রকাশ করচেন যে শিক্ষায় এখন আমাদের আর প্রয়োজনই নেই। তাঁদের মতে স্বরাজ্য লাভই এখন আমাদের একমাত্র কাম্য এবং তদুপযোগী কর্ম্মই একমাত্র কর্ত্তব্য। স্বরাজ্য লাভ যে কাম্য তা কে অস্বীকার করবে কি তাই যে আমাদের একমাত্র কাম্য বা সেই কল্পতরু থেকেই যে আমরা শিক্ষার সমস্ত সুফল বিনা প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হবো, এ বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস শিক্ষার সুফল এক শিক্ষাই দিতে পারে, যদি, সে শিক্ষা সুশিক্ষা হয়। স্বরাজ্য মূলক স্বাধীনতা কেবল শিক্ষার গাছের উপর থেকে খানিকটা আওতা সরিয়ে দিয়ে তাকে ফলবান্ হতে সাহায্য করে। দেশের সমস্ত লোক যদি পুঁথিপত্র বন্ধ করে স্বরাজ্যের প্রতীক্ষায় উত্তর-কালের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে, তা'হলে দেশের স্বরাজ্য ও যে শীঘ্র হস্তগত হবে, এমন কোন নজির নেই ; উপরন্তু মনের স্বরাজ্য থেকেও আমরা অনেকটা বেদখল হয়ে পড়্বো। শিক্ষা জিনিষটা স্বাধীনতার পরিপন্থী ও নয়, তার অপেক্ষাও রাখে না। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলচেন "দেশের স্বরাজ্য পরের কাছ

থেকে হাত পেতে পাওয়া যায় কিনা জানিনা কিন্তু একথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারি, যে মনের স্বরাজ্য নিজ হাতে গড়ে তুল্‌তে হয়।" তা ছাড়া স্বরাজ্যের লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে যদি আমরা শিক্ষার রাজবেশ খুলে ফেলে দিই তাহলে কি ব্যক্তিগত কি জাতীয় মুক্তি কেউই এনে আমাদের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবেন না। আমি জানিনা সে স্বাধীনতার মূল্য কি যাতে মনুষ্যত্বের না বিকাশ হয় এবং মনুষ্যত্বই যে সমস্ত সম্পদের একমাত্র বাহন তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার কর্বেন না। স্বাধীনতা তাদেরই ভোগ্য এবং তারাই বজায় রাখতে পারে যারা চরিত্রে মনে সুশিক্ষিত।"

আর একদল পণ্ডিতের মতে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্চে সুচারুরূপে জীবিকানির্ব্বাহ সুতরাং যে বিদ্যা অর্থকরী নয় তার চর্চ্চা একেবারেই নিরর্থক। তাঁদের মতে Technical school এবং Scientific college-ই আমাদের সমস্ত জাতকে ঋদ্ধির পথে নিয়ে যাবে—কাব্য, ইতিহাস শিল্প, দর্শনে মনঃশক্তির অপচয় করা মানে অপমৃত্যুকে বরণ করা। জীবন সংগ্রামে দাঁড়াতে হলে সেই সরস্বতীকে আমাদের পুষ্প চন্দন দিতে হবে যিনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্নাত্মা—কারণ অপসরস্বতীর প্রসাদ উপবাস। এ সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে দেশের মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু নয়—আত্মার মৃত্যু আরো ভয়ঙ্কর, আরো শোচনীয়। আত্মাকে উপোষী রেখে শুধু দেহের পরিপোষণ কর্‌লে—দেহরক্ষা হতে পারে আত্ম-রক্ষা হয় না। যে culture সভ্যতার একটা উচ্চাঙ্গ তাকে ছেঁটে ফেল্লে আমরা যে মানুষের আকার নিয়েও মানুষ থাকবো না তা নিশ্চিত। utility-র ক্ষুদ্র তুলাদণ্ডে জ্ঞানের সার্থকতা মাপা যায়

না। তা ছাড়া এটাও নাকি একটা পরীক্ষিত সত্য যে খালি Technical এবং Scientific শিক্ষার চাবিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খোলে না। একটা সোজা উদাহরণ দিলেই এ সত্যটা স্পষ্ট করে বোঝানো যাবে। আইন একটা অর্থকরী বিদ্যা। কিন্তু কেবল আইনের জ্ঞানে অর্থোপার্জ্জন হয় না। যে বিদ্যায় মানুষের তর্ক শক্তিকে উদ্বোধিত করে, যে বিদ্যায় মানুষের মনস্তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, যে বিদ্যায় মানুষকে নির্ভীক ও চরিত্রবান করে, কৃতী আইনজ্ঞের সে সব বিদ্যাও দরকার। অবশ্য এমন দু'একজন কৃতী আইনজ্ঞ আছেন, যাঁরা কি চরিত্র কি মনস্তত্ত্ব কিছুরই ধার ধারেন না, কিন্তু তাঁদের অর্থোপার্জ্জন অনেকটা লটারিতে টাকা পাওয়ার মত ভাগ্যসাপেক্ষ। দেশের আর্থিক উন্নতি জুয়োখেলা নয়।

তবে একথা ঠিক যে কেবল General education মানুষকে জ্ঞানী করলেও কর্ম্মী করে না। General education-এর প্রশস্ত ভিত্তির উপর বিশেষ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। আমাদের দেশের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে General education-এর দিকে যাতে করে আমরা বিশেষ বিজ্ঞানকে—অবজ্ঞা না করলেও অনেকটা উপেক্ষা করি। এই উপেক্ষাই যে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ তা অস্বীকার করবার জো নেই। আমাদের বেশী ঝোঁক দিতে হবে এখন বিশেষ বিজ্ঞানের দিকে—এবং তার মধ্যেও বিশেষ করে জড় বিজ্ঞানের দিকে, কেননা জড়ই হচ্চে জগতের আদিতত্ত্ব। এবং জীবনের ক্ষেত্রেও জড়ের কাঁধে ভর দিয়ে আত্মাকে দাঁড়াতে হয়। জড়-

বিজ্ঞানের কৃপাতেই আমাদের অসাড়, পঙ্গু, অকর্ম্মণ্যদেহের জড়ত্ব যদি ঘুচে যায়।

তৃতীয় আর এক দলের পণ্ডিত আছেন যাঁরা সেই শিক্ষা ফিরে আনবার জন্য আমাদের উপদেশ দেন, যা বিদেশী শিক্ষার আমদানীর পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিরাজমান ছিল। এক কথায় তাঁরা বলেন যে স্কুল কলেজ থেকে জ্ঞানের চাষ উঠিয়ে দিয়ে—টোলের মধ্যেই তার আবাদ করা হোক্, কেননা সে আবাদে সোনা ফল্‌তে বাধ্য। জানিনা টোলের আবাদে কোন যুগে সোণা ফলেছিল কিনা কিন্তু এ যুগে যে তা ফল্‌বেনা তা নিশ্চিত। আমাদের জীবনের চাকা যতই আস্তে ঘুরুক্, টোলের যুগ থেকে অনেক এগিয়ে এসেচে; আর যে হেতু জাতীয়-জীবন থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই জন্য টোলের শিক্ষায় ফিরে যেতে হলে জাতীয় জীবনকেও একশো বছর পিছিয়ে যেতে হবে। সনাতন প্রথাকে চিরন্তন করবার চেষ্টাই গতিশীলতার প্রতিকূল, কাজেই উন্নতির অন্তরায়। নব্য ন্যায় আর মুগ্ধবোধের কঙ্কালের—উপর যদি আমাদের নব সাহিত্যের প্রতিমাকে গড়ে তুল্‌তে হয় তা হলে আর যাই হোক্—তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে না। তা ছাড়া "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরিয়সী" এই বীজ মন্ত্রের উপরও আমরা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছি। ওহেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যত মন্দিরই আমরা গড়িনা কেন তার অচলায়তন ভূমিসাৎ হতে বাধ্য।

সকল দেশেই শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যুগে যুগে Experiment চলে এবং তার ফলে যুগে যুগেই শিক্ষাপদ্ধতি বদলায়—কিন্তু আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যদি অতীত কি বর্ত্তমানের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে

তা হলে বুঝতে হবে, আমরা জাতকে জাত মরে গেছি। আমাদের ideal, সমস্যা, আশা, ভরসা সবই যখন বদলাচ্চে তখন সাবেকী শিক্ষাতে ও আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না, হালি শিক্ষাতেও নয়। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকেও যদি আমরা আলাদিনের বাড়ীর মত হুবহু তুলে এনে আমাদের দেশে বসাতে যাই তাহলেও ভিতের বাঁধন নেই বলে তা দুদিনেই ঘাড়মোড় ভেঙ্গে পড়ে যাবে। আমরা চাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে—একটা নূতন শিক্ষাপদ্ধতি একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে—আমরা চাই এমন একটা সৃষ্টি যা বিদেশী জ্ঞানকে দেশের উপযোগী করে, অতীতের জ্ঞানকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। কাজেই নমুনা আমরা পাঁচটার জায়গায় দশটা দেখতে পারি কিন্তু নকল একটার ও করতে পারি না।

(৩)

আমি আগেই বলেছি দেশের লোককে যথার্থ সুশিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে—প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির একটা বড় রকম সংস্কার আবশ্যক, কতখানি সংস্কার আবশ্যক তা জানতে হলে জীর্ণস্থান গুলোকে আগে লক্ষ্য করা চাই। প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত অল্প যে তাতে এই বিরাট জনসংঘের মুষ্টিমেয়েরও স্থান সঙ্কুলান হয় না। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কল্পে গভর্ণমেণ্টের চিরকারিতাকে আমরা যতই দোষ দিই না কেন, আমরাই তার প্রয়োজনীয়তা এখন ও ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করিনি এবং তা করিনি বলেই আমরা চাষার ছেলেদের

লেখাপড়া শেখাতে এতটা বেশী নারাজ। একটা নূতন পাঠশালা কি একটা নূতন নাইটস্কুল স্থাপিত হয়েচে শুনলেই আমরা আশঙ্কার সঙ্গে পরস্পরের মুখ চেয়ে বলি "এইবারই সেরেচে। তখনিই চাকর মজুর পাওয়া যায় না, তার উপর যদি ছোটলোকেরাও লেখাপড়া শেখে তা হলে মান সম্ভ্রম বাঁচানো দায় হবে।" অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে ঐ তথাকথিত ছোটলোকেরা চিরকাল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যেই বসে থাকুক আর আমরা যদৃচ্ছাক্রমে তাদের উপর অত্যাচার করি জুলুম চালাই। আমরা চাই তারা আমাদের পা জড়িয়ে কেঁদে হুজুর হুজুর করবে, আর আমরা তাদের লাথিমেরে খাটিয়ে নেবো। এই মনোভাব আর দাস মনেভাব যে, একই জিনিষের এ পিঠ ও পিঠ, তা বলাই বাহুল্য কিন্তু এই অনুদার স্বার্থ-পরতায় আমরা যে আমাদেরই জাতীয় স্বার্থকে—বিসর্জ্জন দিচ্চি তা আমরা ভাবি না। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি যত বিস্তৃত হবে উচ্চ-শিক্ষার চূড়াও ততই উন্নত হবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য আমাদের গোড়াতে অনেকখানি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য আমি একথা বলচি না যে, যে ছাঁচে এখন প্রাথমিক শিক্ষা ঢালাই হচ্চে সেই ছাঁচই আমাদের বাহাল রাখতে হবে। সে ছাঁচের প্রথম দোষ হচ্চে স্থান নির্ব্বাচন। বিদ্যালয় বললেই আমরা বুঝি ইঁটের পাঁচিল ঘেরা, টেবিল বেঞ্চি সাজানো একটা রুদ্ধ স্থান যেটাকে পাঠাগার মনে না করে কারাগার মনে করলেও বড় বেশী দোষ হয় না। মুক্ত প্রকৃতির সজল সবৃক্ষ প্রশস্ত শ্যামল অঙ্কই মানবশিশুর মনোগঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান—জীবনের সজীব প্রফুল্লতার মধ্যেই পর্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, কৌতূহল

প্রভৃতি জীবনের ক্রিয়াগুলো আপনা হইতেই এসে পড়ে, জীবনী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে বসে যতই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যাক্ না কেন বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। টেবিলের উপর কমলানেবু রেখে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করলে ছেলেদের মনে, কমলানেবুর জ্ঞান ততটা বিশদ হয় না যতটা হয় কমলানেবুর বাগানে তাদের ছেড়ে দিলে। তারা আকার এবং বর্ণ ছাড়া আরো কিছু জানতে চায়—যা হচ্চে গন্ধ, স্পর্শ, রস। কমলা-নেবুর গাছ থেকে কমলানেবুর বিচ্ছিন্ন জ্ঞানটাও তাদের পক্ষে আদৌ রুচিকর নয়, আর কমলানেবুর রং যে গাঁদাফুলের রংএর মতই এ জ্ঞানটা তারা শিক্ষকের মুখে না শুনে নিজের চোখেই দেখতে চায়। তা ছাড়া যখনই তাদের মনে হয় কমলানেবু তাদের পড়াশুনারই একটা অঙ্গ এবং সেইজন্যেই বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করেচে, যখনই মনে হয় ঐ কমলানেবু সম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদই বেত্রাঘাত না হোক্ রক্তচক্ষু ও ভ্রুকুটী গর্জ্জনের কারণ হতে পারে তখনই কমলানেবুর রং হয়ে যায় ফেকাশে, স্বাদ হয়ে যায় তেতো, বোধ হয় স্পর্শ ও হয়ে যায় নীরেট নীরস কাঠের বলের মত। অনেক প্রাথমিক স্কুলে কিন্তু বস্তু পরিচয়ের এ প্রহসনেরও অভিনয় হয় না। সেখানে কেবল নামের সঙ্গেই কারবার, বানান প্রতিশব্দ নিয়েই মারামারি কণ্ঠস্থ করাতেই শিক্ষার পরিসমাপ্তি। তা ছাড়া যাদের উপর শিশুদের মন গড়ে তোলবার ভার তাঁদের নিজেদের মনই গড়ে ওঠেনি তা প্রাথমিক স্কুলের যে কোন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করলেই বোঝা যায়। শিশুদের মনে শিক্ষার ছাপের আগে শিক্ষকের ছাপ পড়ে, তাদের নির্ভর শিক্ষকের উপর অগাধ, তাই তাদের সামনেই সব চেয়ে বড়

শিক্ষকের আদর্শ ধরা চাই। শিশুর সঙ্গে শিশুর মত মিশে, শিশুর ভাষায়, শিশুর প্রণালীতে, বড় বড় জ্ঞানকে শিশুর গ্রহণযোগ্য করে এগিয়ে দিতে পারেন এমন কৌশল, এমন সহানুভূতি এখন চরিত্র কজন শিক্ষকের আছে? যাঁদের আছে তাদের উচ্চ শিক্ষা বিভাগে না নিযুক্ত করে শিশুশিক্ষা বিভাগেই নিযুক্ত করা উচিত, উচ্চশিক্ষার্থীদের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শিক্ষক হলেও চলতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই গাম্ভীর্য্য হানির ভয়ে কঠোর বিভীষিকার মত, আত্মসম্ভ্রমের উচ্চ মঞ্চের উপর বসে থাকেন—সুতরাং তাঁরা ছেলেদের মনে যে ভাবের উদ্রেক করেন, তা ভক্তিও নয়, প্রেমও নয়, অন্য কিছু এবং সে ভাবটা যে একটা তামসিক-ভাব, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া শিক্ষার বিষয়ের উপর শিশুদের মনে যে প্রেমের সঞ্চার করা দরকার তা কখনই করা হয় না, কেন না শিক্ষকের মনেই সে প্রেমের একান্ত অভাব। এইজন্যে তাঁরা নিজের সুবিধা মত গাড়ীর পিছনেই ঘোঁড়া জুতে দেন, অর্থাৎ সাধারণ সত্য থেকেই বিশেষ-সত্যে অবতরণ করেণ যদিও তার উল্টো গতিটাই হচ্চে মানব মনের স্বাভাবিক গতি।

(৪)

নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব কথা প্রয়োজ্য তার অনেকটা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও খাটে, উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধেও খাটে। কেবল বিদ্যালয়েরই ঈপ্সিত সুফল ফল্‌তে পারে না, যদি না প্রত্যেক বিদ্যার্থীর বিশেষ অভাবগুলি দূর করা হয়। এ দেশের বিদ্যালয়গুলি

এম্‌নি ভাবেই পরিচালিত যে সব ছেলেদের একই ক্ষুরে মাথা মোড়ানো হয়ে থাকে। প্রত্যহ একই পাঠ সকল ছেলেকে দেওয়া হয়—একই ভাবে সকলকে বোঝানো হয়—যেন ক্লাস জিনিষটা কতকগুলি বিশেষ শক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন বালকের সমষ্টি নয়, একটা গড় পড়তা কষা কাল্পনিক বালকের সমষ্টি। এতে করে ছুরি, কাঁচি, খোন্তা, কুড়ুলের মত এক একটী বালক এক একটী বিশেষ সার্থকতা নিয়ে বেরিয়ে আসেই না; এমনকি ফলে কলে-কাটা স্কুলের মত একই মূর্ত্তি একই উপযোগিতা নিয়ে—বেরিয়ে আসাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেননা মানুষের মন আর যাই হোক্ ধাতু নয় এবং যদিও ধাতু হয় ধাতুগত পার্থক্য মনে মনে যথেষ্ট।—Syllabus রূপ বাৎসরিক চক্রে সকল ছেলেকেই—পল্টনের মত একই তালে একই চালে পা ফেলে পরিভ্রমণ করতে হবে যাতে সকলেই এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে—ঘোঁড়দৌড়ের ঘোড়ার মত কেউ এগিয়ে কেউ পেছিয়ে থাকলে চলবেনা। এইজন্য Class promotion ব্যাপার-টাও বৎসরের শেষে হতে বাধ্য—এবং এই ব্যাপারে সব ছাত্রকেই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, এক যারা ক্লাসে উঠ্‌তে পার্‌লে আর এক যারা পার্‌লে না। এই দুই বিভাগের মাঝামাঝি স্তর একটাও নেই কাজেই যে সব বালক কোন একটা কি দুটো বিষয়ে সামান্য অপরিপক্ক বলে নীচের ধাপেই রয়ে গেল—তাদের ও আর আর অক্ষম বালকদের মত সারা বছরটাই বিজ্ঞাত বিষয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে বর্ষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আমার বিবেচনায় ক্লাসপ্রোমোসনরূপ কৃত্রিম জিনিষটাকে যদিও রাখতে

হয় তাকে এম্‌নি ভাবেই রাখা উচিত যাতে মাসে মাসেই প্রোমো-সনের ব্যবস্থা থাকে এবং একই বালক যুগপৎ এক বিষয়ে উচ্চতর ক্লাসে আর এক বিষয়ে নিম্নতর ক্লাসের ছাত্র হতে পারে।

যে পরীক্ষায় বালকদের উচ্চতর ক্লাসে বা উচ্চতর শিক্ষায় উন্নীত করা হয় সে পরীক্ষা প্রণালী ও যে খুব আশাপ্রদ তা নয়। সকলেই জানেন এখানকার পরীক্ষায় বুদ্ধির পরীক্ষা ততটা হয় না যতটা হয় মুখস্থ শক্তির। যার যে পরিমাণে গলাধঃকরণ করবার ও উগ্‌রে দেবার শক্তি আছে, সেই সেই পরিমাণে বিদ্যার জয় পতাকা উড়িয়ে বিদ্যা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মার্কামারা ছেলেদের দেখ্‌লেই মনে হয় তারা এক একটী পেটেণ্ট করা গ্রামোফনের রেকর্ড।

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে পরীক্ষায় পাশ করাই হচ্চে বিদ্যা-জীবনের কৃতিত্বের নিদর্শন এবং সেই পাশের দরেই কি কর্ম্মক্ষেত্রে কি বিবাহক্ষেত্রে আমরা তাদের দর সাব্যস্ত করি, তাই তাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় ঐ পাশের বেড়াকে, কোনক্রমে লাফিয়ে পার হবার জন্যে। জ্ঞানের জমি মাড়াক্ না মাড়াক্, সেখানে তারা খুঁড়িয়েই চলুক্ আর গড়িয়েই চলুক্ তাদের দরকার শুধু মুখস্থ শক্তির প্রাণ-পণ চেষ্টায় ঝাঁপ ডিঙোনো। একদিকে পরীক্ষার প্রণালী তাদের ঐ সাধু উদ্যমকে সুমুখ থেকে উৎসাহিত করে, আর দিকে অধ্যাপনার প্রণালী ও পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাদের এগিয়ে দেয়। এ বিষয়ে শিক্ষক কে অধ্যাপক কে দোষ দেওয়া যায় না, কেননা তাঁদের কেরামৎ ও জীবিকা দুইই নির্ভর করচে ছেলেদের পাশের উপর। ফলে, তাঁরা এসঙ্গে সব ছেলেদের হা করিয়ে নোট গেলাতে থাকেন,

তা সে গুরুপাক জিনিষ তারা জীর্ণ করতে পারুক্ আর নাই পারুক্। এসম্বন্ধে তাঁদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করলে এই উত্তর পাওয়া যায় নোট না দিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরা এত বিভিন্ন বিষয় ও এত স্তূপাকার বই আয়ত্ব করবে কি করে। এ উত্তরের আর কোন জবাব নেই। কিন্তু এ শিক্ষা প্রণালীর ফলে—"ছেলের যে শারীরিক ও মানসিক, মন্দাগ্নিতে" ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে বেরিয়ে আসে তার আর কোন চিকিৎসা নেই। এই শীর্ণদেহ ও জীর্ণমন নিয়ে বালকরা যে জাতির আশা ভরসাকে উদ্ধার করা দূরে থাক্ নিজেরাই সংসার তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে থাক্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? মোট কথা শক্তি আর মুক্তি এ দুইই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বলতে হবে শিক্ষা প্রণালীর অনুর্বর ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্যের বীজ দিন দিন ব্যর্থ হয়ে যাচ্চে।

(৫)

আগেই বলেছি প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তু পরিচয় হয় না, কিন্তু তা বলে কেউ না যেন মনে করেন যে মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষায় সে অভাব পরিপূর্ণ হয়। আমার বিশ্বাস এই শেষোক্ত দুই শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে বস্তুর সংসর্গ আরো কমিয়ে আনে। যে সব বিদ্যা একেবারেই বস্তুতন্ত্র সে সব বিদ্যার আকাশেও আমাদের বিএ বিএস্ সিরা এতটা নিরালম্ব হয়ে ঝুলচেন যে তাঁদের প্রশ্নোত্তরের কোটায় শূন্য না পড়লেও, জ্ঞানের কোটায় মহাশূন্য। একজন বি এস্ সিকে একবার আকাশের দিকে চাইয়ে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম "সপ্তর্ষি মণ্ডল কোনটা ?" তাতে তিনি নিজের মনে অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে কৃত্তিকা

নক্ষত্র দেখিয়ো দিয়েছিলেন, কারণ দিনের বেলায় ছবিতে তারা দেখা ছাড়া রাত্রে আকাশে তারা দেখা বোধ হয় তাঁর সেই প্রথম। আর একজন বিএ পরীক্ষার্থী একবার আমাকে বলেছিলেন "ক্যালা-মাসুরোটাং বলে একরকম লতানে তালগাছ আছে যা কখনো কখনো সাত শ হাত লম্বা হয়। অনুসন্ধানে জানলুম সে ক্যালামাস্ রোটাং বা রতন পাম আর কিছুই নয় আমাদের বেতগাছ অবশ্য এরকম ঠিকে ভুল হওয়া প্রশংসনীয় না হলেও অনিবার্য্য। দুর্বোধ, দুরুচ্চার্য্য নামের তালিকা মুখস্ত করাই যেখানে পাণ্ডিত্যের "মিটার" সেখানে এর চেয়ে বেশীকি প্রত্যাশা করা যায়? তা ছাড়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাতৃভাষা, জ্ঞান ও সত্যের বাহন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তু ও মনের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধান থেকে যাবেই। আমরা যতই বিভাষালব্ধ জ্ঞানকে মনে মনে তরজমা করে নিইনা কেন, তবু সে জ্ঞান আলেয়ার মত দূরে দূরেই সরে বেড়াবে। পরভাষার পলকাটা কাচের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞানের আলো মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তা সে জ্ঞানের স্বরূপ নয়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছটা। তার মধ্য দিয়ে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করাও যা আর কাঁটা চামচে দিয়ে ভাত খাওয়া কি পরদার আড়াল থেকে কথা কওয়া ও ঠিক তাই সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির বনেদী সংস্কার ততদিন কিছুতেই হতে পারে না যত দিন না বাংলা ভাষা আমাদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা হয়। অবশ্য এ প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার যা প্রধান প্রতিবন্ধক সে বিষয়ে আমি যথেষ্টই সজ্ঞান, কিন্তু তা বলে হতাশ হলে চলবে না, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমিও বলি— এবং আমার সঙ্গে সকলেই বোধ হয় বলবেন "বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে এবং সে জন্য বহুশিক্ষিত

লোককে বহুদিন ধরে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করতে হবে।” অবশ্য বিদেশীয় জ্ঞানকে আমাদের চিরদিনই অর্জ্জন করতে হবে, নতুবা আমার মনোরাজ্যে নিতান্ত একঘরে হয়ে পড়বো, বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে এগোতে পার্ব্বো না কিন্তু তার জন্যে ঐ সব জ্ঞানের ভাষাকে Secondary বা গৌণ ভাষা হিসাবে অধ্যয়ন করলেই কাজ চলে যাবে। উদ্দেশ্যকে যদি আমরা বিধেয়ের উপর স্থান দিতে শিখি তা হলে যে সব বিজ্ঞান দর্শনের জ্ঞান, এখন দুচারজন ইংরাজী শিক্ষিতের মাথায় ঘুরচে, দেশের গায়ে বসতে পারচে না, (কেন না ঐ ইংরাজী শিক্ষিতেরা কি ইংরাজীতে কি বাংলা ভাষায় সম্যকরূপে আত্মপ্রকাশে অক্ষম) তাই তখন বাংলার ও বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারকে খালি রাখলে জাতীয় জ্ঞানের কোন অর্থই হয় না।

(৬)

বাংলাভাষায় কাব্য সাহিত্য ছাড়া অন্য সাহিত্য গড়ে তোলবার একটা কোন বিধিবদ্ধ বা ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই এ পর্য্যন্ত হয়নি। কখনো কখনো সাময়িক পত্রিকায় দু একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বের হয়ে থাকে কিন্তু তা এতই আংশিক এতই খাপছাড়া যে তা উল্লেখ যোগ্যই নয়। যে দেশে ১৫৩ খানা মাসিক পত্র আছে এবং প্রতি মাসেই দু পাঁচখানার জন্ম মৃত্যু হয় সে দেশে এমন একখানা মাসিক পত্র নেই যা শুধু বিজ্ঞানের জন্যই উৎসৃষ্ট। আর বই? বাংলা ভাষায় জ্ঞানের বই নেই বল্লেই হয়। যা দু একখানা আছে তা এমন নীরস জটিল ও দুর্ব্বোধ পরিভাষায় পূর্ণ এমন নির্ব্বিচার বিষয়

সন্নিবেশে, ক্রমবিশৃঙ্খলায়, উদাহরণ দৈন্যে পরিমাণের অসামঞ্জস্যে, ও ভাষার সৌন্দর্য্যহীনতায়, শিক্ষার্থীর পক্ষে দন্তস্ফুটের অযোগ্য যে তাদের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান। আমার এ আক্ষেপ যে কতদূর সত্য তা একজন নামজাদা বিজ্ঞান লেখকের দুচার ছত্র রচনা উদ্ধৃত করলেই বুঝতে পারবেন। লেখক প্রাকৃতিক ভূগোল নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকে সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ বোঝাচ্ছেন—

"পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে—তাহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এককালে পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু ইহাদের কিছুই ছিল না, সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া একটী বিশাল তেজোময় মণ্ডলাকার পদার্থ অনন্ত আকাশে আবর্ত্তন করিত, এই তেজোপুঞ্জ মণ্ডলাকার পদার্থ তেজঃ বিকীর্ণ করিয়া যত শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়াছে, ততই উহার ঘূর্ণন বশত সময় সময় স্ফুলিঙ্গাকারে গ্রহগণ বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"—

আর বেশী উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই, যা করা হয়েচে তা হতেই রচনার প্রসাদগুণ সুষমা, শব্দবিন্যাস কৌশল এমন কি ভ্রান্তি-শূন্যতার ও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ এই অমূল্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের একচত্বারিংশৎ সংস্করণ হয়েছিল। যা হতে বোঝা যায় খুব কম হলেও অন্তত একচল্লিশ হাজার শিশুকে স্বাস্থ্যকর জ্ঞানের বড়ি বলে ঐ উৎকট ভাষাবৃত দুর্ব্বোধ বাক্যাবলি গেলানো হয়েচে। ধর্ম্মের নামে ইউরোপে এক সময় যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলতো, স্বাস্থ্যের নামে এদেশে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার কোথাও কোথাও এখনো চলে থাকে, জ্ঞানের নামে এ অত্যাচার তারচেয়ে যে নিষ্ঠুর নয়। আর একখানি বিজ্ঞানের বইথেকে আর একটী নমুনা উদ্ধৃত করবার

লোভ সংবরণ করতে পারচি না, যদিও সুখের বিষয় সেটা বাক্য নয় মাত্র একটা শব্দ, শব্দটী এই—"পতঙ্গবাহিত পরাগসঙ্গমশালী পুষ্প" যে পুস্তকে এই অদ্ভূত শব্দটী পাওয়া গেছে তা আট নয় বছরের ছেলেদের পাঠ্য একখানি বিজ্ঞান পাঠ। গ্রন্থকার ঐ শব্দ দিয়ে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের যে জ্ঞানটী তরুণ-মতি বালকদের মাথায় সরলভাবে ঢুকিয়ে দিতে চান তাকে ইংরেজীতে বলে insect-pollinated flower আর চলতি বাংলায় বলা যায়—"পোকায় যে ফুলের বিয়ে দেয়।" সাধুভাষার দুর্দ্দমনীয় চাপ থেকে সাহিত্যের নিষ্কৃতি যতটা বাঞ্ছনীয় শিশুদের নিষ্কৃতি তার চেয়ে ঢের বেশী বাঞ্ছনীয় কেননা ও সাধুভাষা শুধু ছেলেদের কাছে কেন তাদের অভিভাবকদের কাছেও গ্রাকভাষা। ঐ প্রাণহীন অবাস্তব সংস্কৃত গ্রন্ত ভাষার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ঠিকই বলেচেন—"ও ভাষার ছবিও নেই, জোর ও নেই, ও ভাষা অক্ষরের মধ্যে অক্ষর হয়ে বসে আছে।"

সরকারী বিদ্যালয়ের এ ভয়াবহ শিক্ষাপদ্ধতি থেকে দেশের লোককে মুক্ত করবার জন্যে যে সকল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এ পর্য্যন্ত হয়েচে তাদের সম্বন্ধে এখনও আমাদের ঠিক আলোচনা করবার অধিকার হয় নি, কারণ তাঁদের সংস্কৃতপদ্ধতি এখনো অনেকটা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তবে যতটা বুঝতে পাচ্ছি, যে তা ঐ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটা অসরকারী সংস্করণ। সেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়ানো, সেই রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাস, সেই এদেশের অনুপযোগী দশটা চারিটা ক্লাস, সেই চেয়ার সেই টেবিল, সেই পরীক্ষা, সেই সব, তফাৎ শুধু এই যে, ন্যাশন্যাল স্কুলে চরকা কাটানো হিন্দী পড়ানো হয়, যা সরকারী স্কুলে হয় না। এই ব্যবস্থা বালকদের

পক্ষে তপ্ত কড়াথেকে চূলোর মধ্যে পড়বার মত হয়েচে কি না তা সুধীদের বিবেচ্য। মিথ্যাই, ইউরোপের শিক্ষাশাস্ত্রীরা চীৎকার করে মরচেন যে চোদ্দো বছরের আগে ছেলেদের বিদেশী ভাষায় হাতে খড়ি দেবেনা ঐ বয়সের আগে বিদেশী ভাষা শেখানো আর দাঁত ওঠবার আগে মাতৃস্তন্য ছাড়িয়ে মাংস পোলাও খাওয়ানো একই কথা, মিথ্যাই তারা চীৎকার করে মরচেন, যে নীতিশিক্ষার স্থান বিদ্যালয় হলেও ধর্ম্মশিক্ষার স্থান মঠ; কেননা বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্ম শেখানো যেতে পারে তা হচ্চে সর্ব্বজনীন বিশ্বমানবের ধর্ম্ম।

(৭).

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু এক্ষুদ্র প্রবন্ধের আঁটসাঁট গণ্ডীর মধ্যে তাদের টেনে আনবার অবসর নেই, শুধু একটী কথা আমি বলতে চাই যে সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র, এবং যৌনবিজ্ঞান এই তিনটী অত্যাবশ্যক বিষয় এ পর্য্যন্ত তার পাঠ্যতালিকায় স্থান পায়নি কেন তার কোন সঙ্গত কারণ, আমি খুঁজে পাই না, অথচ এ তিনটী বিষয়ের জ্ঞান না হলে জীবন সুন্দর পবিত্র বা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার বিষয় বাহুল্যে ত কোনই ত্রুটী দেখা যায় না, অথচ এসব বিষয় যে শিক্ষনীয় নয় এই অমূলক, অর্ব্বাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমেও কামশাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল, প্রাচীন গ্রীসেও বিদ্যার্থীদের সঙ্গীতশাস্ত্র অবশ্য শিক্ষনীয় বলে শিখতে হতো। তবে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় আয়ত্ব করবার সোজা পদ্ধতি যতদিন না প্রচলিত হচ্চে অর্থাৎ যতদিন না মাতৃভাষায় বিদ্যার

আদান প্রদানের ব্যবস্থা হচ্চে ততদিন আমার এ প্রস্তাব অরণ্যে রোদন।

তারপর আর একটী কথা বলেই আমি এই ধৈর্য্যহানিকর প্রবন্ধ শেষ করবো। আমরা বিদ্যালয়ের কাছ থেকেই সব শিক্ষার প্রত্যাশা করি, কিন্তু এ রকম প্রত্যাশা অন্যায়। আমরা চাই বিদ্যালয় এবং একমাত্র বিদ্যালয়ই আমাদের যুবকদের সুশিক্ষিত করে কাজের লায়েক করে ছেড়েদেবে এবং কি তার সঙ্গে সঙ্গে কি তারপরে পশ্চাতে আর তাদের কোন শিক্ষার আবশ্যক হবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই অনেক বাপ মা ছেলেকে স্কুলে-ভর্ত্তি করে দিয়েই মনে করেন তাঁদের সব কর্ত্তব্য শেষ হলো। কিন্তু তা নয়। গৃহশিক্ষা আর সমাজশিক্ষাই হচ্চে ছেলেপিলেদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা, এবং সে শিক্ষার অভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কিছুই করতে পারে না, গৃহশিক্ষা যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক না হয় সমাজশিক্ষা যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষার উল্টো টান টানে তা হলে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। বলা বাহুল্য গৃহশিক্ষার মূল হচ্চে নারীশিক্ষা কেন না মাতৃ-কূলের কাছ থেকে সন্তানকুল তাদের জ্ঞানের রসটুকু সবচেয়ে আগে সবচেয়ে আনন্দের সঙ্গে, সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়ে টানতে শেখে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শতকরা—নিরেনব্বই জন রমনী অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয় অনেক স্থলেই কুশিক্ষিত। যদি বিদ্যা-লয়ের শিক্ষা তাঁদের পক্ষে অনুপযোগীই হয় তাহলে অন্ততঃ তাঁদের উপযোগী, তাঁদের হিতকর এমন সব বই তৈরী হওয়া দরকার যা তাঁরা বাজে নাটক নভেল ফেলে, গল্পের মতই আগ্রহের সঙ্গে পড়বেন, গল্পের মতই আনন্দের সঙ্গে ছেলেপিলেদের কাছে পড়ে শোনাবেন।

এ ছাড়া, সাবেকী কথকতার হয় ত এমন সংস্কার করলেও করা যেতে পারে যাতে ঐ লোকমান্য প্রণালী দিয়েই শুধু ধর্ম্মের নয়, ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস সমস্তেরই জ্ঞান নিরক্ষর রমনীদেরও মনের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এরজন্যে মামুলী কথক সম্প্রদায়ের বদলে একদল নবতন্ত্রে দীক্ষিত নবশিক্ষায় শিক্ষিত—নবভাবে উদ্দীপিত কথক সম্প্রদায় গড়তে হবে। শিক্ষার আর একটী বাহনকে ও আমাদের বিশেষ করে সন্মান করা উচিত, যদিও তা বিদেশী ঔষধের মত বিদেশ থেকেই আমদানি। সেটী হচ্চে লাইব্রেরী এবং সে লাইব্রেরী সাধারণের জন্য অবারিত। স্কুল কলেজের বাঁধাধরা পাঠ্য ব্যূহের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কৌতূহলী মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন লাইব্রারী ভিন্ন তার আর স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অবসর নেই। এই মনের হাঁসপাতাল" দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে না প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের কল্যাণ সুদূর পরাহত।

অনেকে আজকাল হাতে কলমে শিক্ষার কথা নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেচেন, কিন্তু তার স্থান ত ঠিক বিদ্যালয় নয়। হয় কৃষিক্ষেত্র না হয় কারখানা, না হয় ঐ রকম একটা কিছু। শিক্ষার সূত্রপাত হয় বিদ্যালয়ে কিন্তু সুশিক্ষিত লোক তাকে পরিসমাপ্ত করেন কর্ম্মজীবনের মধ্যে। বিদ্যালয় শুধু ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ প্রদর্শক তবে একথা ঠিক্ যে হাতে কলমে শিক্ষার পত্তনটা বিদ্যালয়েই করতে হবে। এই জন্যে ব্যায়াম ভূমির মত প্রতি বিদ্যালয়ের সঙ্গেই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র—আদর্শ—শিল্পশালা সংলগ্ন রাখা উচিত। তা ছাড়া শিক্ষকদেরও উচিত ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে অন্তত: সপ্তাহে একদিন

পশুশালা, মিউজিয়াম, কারখানা, প্রভৃতি শিক্ষার জীবন্ত লীলা-ভূমিতে নিয়ে যান—এবং কর্ত্তৃপক্ষদেরও উচিত যাতে ঐ সব স্থান ছাত্রদের জন্য অবারিত হয়। এর জন্য আমাদের শিক্ষিতদের আমাদের ধনীদের—আমাদের কর্ম্মীদের উঠে পড়ে কোমর বেঁধে লাগ্‌তে হবে—তা যদি না করি তাহলে আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্নই দেখব এবং সে স্বপ্ন যখনই ভোরের কুয়াসার মত্‌ মিলিয়ে যাবে তখনই হয় সরকারকে নিন্দা করবো না হয় অদৃষ্টকে গালি পাড়বো—না হয় বিধাতার ঘাড়েই সমস্ত দোষ আর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

রুশীয় কৃষক

——:*:——

আজ রবিবার। আইভানকয়া গ্রামের অধিবাসীরা অপরাহ্নে গ্রামের গির্জ্জার দক্ষিণে একটা খোলা মাঠে সমবেত হয়েছে। গ্রামখানি কৃষকের গ্রাম। বড়লোক নাই, বড়বাড়ী নাই। সাধারণের জন্য টাউনহলও নাই। সকলে মিলে কোন কাজ করতে হলে, এই মাঠেই করতে হয়। আজ "মীরের" একটা বিশেষ অধিবেশন আছে। রুশিয়ার গ্রাম্য সমিতির নাম "মীর" (mir)। গ্রামের সকলেই এসেছে। বালক বালিকারা হাসছে, খেলছে। স্ত্রীলোকেরা গল্প গুজব করছে। পুরুষেরা ছোট ছোট দল বেঁধে এখানে ওখানে বসে ফসলের অবস্থা, সম্প্রতি গ্রামে যে গো-মড়ক হয়ে গিয়েছে তাতে কার কটা গরু মরেছে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করছে। এমন সময় একজন তাদেকে ডাকলে। পুরুষেরা সকলে একত্র হল। কাজ আরম্ভ হল।

মেলনিকয়া। এক বৎসর হল পেট্রফকে "স্তারস্তা" (starosta) নির্ব্বাচিত করা হয়েছে, কিন্তু সে একদিনও "সেলস্কিস্খডের" কোন কাজ করলে না। অনেক আবশ্যকীয় কাজ বাকী পড়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী এই খানেই আছে। তাকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা হোক না? (প্রেট্রফ-পত্নীকে ডাকা হল)।

মেলনিকয়া। প্রেট্রফের খবর কি?

প্রেট্রিফ-পত্নী। খবর আর কি? সে বাঁচে না।

বগোসলাফাস্কি। বাঁচে না কেন? হয়েছে কি? যে শিগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবে।

প্রেট্রিফ-পত্নী। ভগবানের যা ইচ্ছে। আমার ত মনে হয় না যে সে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে। "ফেল্ডশার" (Feldeher) তিনবার এসে দেখে গিয়েছে। ডাক্তারও একবার এসে ছিলেন, বললেন তাকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে।

মেলনিকফ। তা হাঁসপাতালে তাকে পাঠান হয়েছে?

প্রেট্রেফ-পত্নী। কেমন করে পাঠান হবে? অতদূরে কে তাকে নিয়ে যাবে? সে ত খোকা নয় যে আমি তাকে কোলে করে নিয়ে যাব। গোরুর গাড়ী করে পাঠালে সে ত পথেই মরে যাবে। তা ছাড়া কে জানে হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাকে তারা কি করবে? লোকে বলে হাঁসপাতালে গেলে আর সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।

পীটার আলেকসায়েফ। প্রেট্রফ-পত্নীর প্রতি। আচ্ছা বোঝা গিয়েছে। থামো। (গ্রামবাসীদের প্রতি) প্রেট্রফের দ্বারা আর কাজ হবার কোন ভরসা নাই। এখন আর একজনকে "স্তারস্তা" নির্ব্বাচিত করতে হবে। তা না হলে পুলিসের লোক এক দিন এসে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেবে। কাকে "স্তারস্তা" করা যায়? এই কথা হতেই অনেকে একটু সরে দাঁড়াল। কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে অন্য লোকের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, যেন তাদের উপর দৃষ্টি না পড়ে। কেউ ইচ্ছা করে "স্তারস্তা" হতে যায় না।

নিকোলাই আইভানিচ। আলেকসাই আইভানফ (Alexai Ivanof) একবারও "স্তারস্তা" হয় নি।

তাকেই এবার-নির্ব্বাচন করা হোক। আলেকসাই আইভানফ আর ব্যারাখের আপত্তি করতে পারলে না। দাড়ি এবং মাথার চুলের বারআনা আন্দাজ সাদা হায় গেলেও, চেহারাটি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট আছে এবং বিষয়বুদ্ধি-বিশিষ্ট কর্ম্মিষ্ঠ লোক বলেও গ্রামে খ্যাতি আছে। কিন্তু ব্যারাখের আপত্তি না করতে পারলেও তার স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা, মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে হবে, ছেলেটি বিদেশে কাজ করে, বাড়ীতে অন্য কেউ নেই ইত্যাদি অনেক ওজর আপত্তি করলে, কিন্তু সে সকল ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হল না। দৃশ বার জন লোক একসঙ্গে বলে উঠল আলেকসাই আইভানফকেই "স্তারস্তা" করা হোক। বোঝা গেল গ্রামবাসীদের সকলেরই তাই মত। আলেকসাই আইভানফ এইরূপে "সেলস্কি স্তারস্তা" নির্ব্বাচিত হল। প্রস্তাব করা, সমর্থন করা, অনুমোদন করা, নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হলেই "অর্ডার অর্ডার" বলে চিৎকার করা, ভোট নেওয়া প্রভৃতি পার্লামেণ্টারী আচারের বালাই নেই। যা হল তাই-ই সর্ব্ববাদিসন্মত বলে সকলে গ্রহণ করে নিলে। গামের পুরুষই "সেলস্কিস্খডের" সদস্য, সকলেরই নির্ব্বাচনের হাত আছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যাদের স্বামী নেই বা বিদেশে আছে, তাদেরও নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। সভার কাজে তারা যোগও দিয়ে থাকে। সভার কাজের প্রণালী নির্দ্দিস্ট করবার কোন লিখিত নিয়মাবলী নেই। কখনও কখনও এক সঙ্গে দু, তিন জনে কথা বলে। যে ভাষা সভায় সাধু, তাই যে সর্ব্বদা ব্যবহার করা হয় তাও নয়।

অসাধু ভাষার ব্যবহারও নিতান্ত অল্প নয়। এ সকল ক্রুটি সত্ত্বেও যে কাজ হয় তা খাঁটি, তা কোন দোষে দুষ্ট নয়। "মীরের" সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘনীয়। "মীর" মানে আগেই বলা হয়েছে গ্রাম্য সমিতি। "সেলস্কি স্খারস্তা" অর্থে গ্রাম্য সভা আর "সেলস্কি স্খড" মানে গ্রামের মণ্ডল।

মণ্ডল-নির্ব্বাচনের পর গ্রামের জমির বন্দোবস্তের কথা উঠল। রুশিয়ান গ্রামের জমি "মীরের" সম্পত্তি, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়। জমিদার নামক কোন পদার্থ নাই। প্রত্যেক গ্রামের দেয় একটা নির্দ্দিষ্ট রাজকর আছে। "মীর"কে সেই কর আদায় করে দিতে হয়। গ্রাম সম্বন্ধীয় অন্য সকল কাজই "মীর" করে থাকে। কোন কাজে রাজপুরুষের হস্তক্ষেপ নেই। জমির রাজস্ব যেমন "মীর" আদায় করে, জমির বিলি বন্দোবস্তও তেমনি "মীর"ই করে। গ্রামের সমস্ত জমি প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—১ বাস্তু, ২ গো-চর, ৩ আবাদী। বাস্তু জমিতে সকলের বাড়ী। পুরুষানুক্রমে সেই বাড়ীতে সকলে বাস করে। কোন রকমে হস্তান্তর করবার কারো অধিকার নাই। পরিবারের লোক সংখ্যা বাড়লে আবশ্যক অনুসারে বাড়ী করতে নতুন জমি দেওয়া হয়। গো-চর জমি ও আবাদী জমি গুণাগুণ ও পরিমাণ হিসাবে গ্রামই সমস্ত পুরুষকে সমান অংশে ভাল করে দেয় হয়। পুরুষ বলতে সদ্যোজাত শিশু থেকে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত পুরুষজাতীয় সকলকেই বোঝায়। "মীর" সকল পুরুষের তালিকা প্রস্তুত করে এবং সেই তালিকা অনুসারে সকলকে সমান অংশে জমি ভাগ করে দেওয়া হয়। ছোট ছোট ছেলেদের ভাগ তাদের অভিভাবকেরা চাষ আবাদ করে। রুশিয়াতে একান্নবর্ত্তী

পরিবার প্রথা আছে। বাড়ীর কর্ত্তার নাম বলশ্যাক (bolshak) কর্ত্তা পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র প্রভৃতি লইয়া সংসার করেন। পরিবারের সকল জমিই কর্ত্তা একসঙ্গে চাষ আবাদ করান। চাষে যদি পরিবারস্থ সকল পুরুষের পরিশ্রমের আবশ্যক না হয়, তা হলে আবশ্যকের অতিরিক্ত লোকগুলি সহরে চাকরী করতে যায়। এই রকম নানা স্থানের লোক মিলে সহরে একটা বাড়ী ভাড়া করে। সেই বাড়ীতে একসঙ্গে থেকে, একসঙ্গে খেয়ে এরা একসঙ্গে কাজ করে। এই অস্থায়ী সমিতির নাম আর্টেল (artel)। কাজ শেষ হলে খরচপত্র বাদে তাদের উপার্জ্জিত অর্থের যা বাকী থাকে, তা তারা সমান অংশে ভাগ করে নেয়। এই টাকা কেউ সঙ্গে করে বাড়ীতে এনে কর্ত্তাকে দেয়, কেউ সেইখান থেকেই কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দেয়। যারা এই রকম সহরে কাজ করতে যায়, তাদের বধূরা বাড়ীতেই থাকে এবং কৃষির কাজে, ঘর-করণার কাজে সাহায্য করে।

জন্ম মৃত্যু হিসাবে গ্রামের লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হলে সময়ে সময়ে, প্রায়ই পনর বৎসর অন্তর, গ্রামের পুরুষ-তালিকার সংশোধন হয় এবং সংশোধিত তালিকা অনুসারে নতুন করে জমির বিলি বন্দোবস্ত হয়। রুশিয়ার দক্ষিণ প্রদেশের জমি উর্ব্বর। সেখানে কৃষকদের জমি নেবার আগ্রহও খুব বেশী। উত্তর প্রদেশের জমি অনুর্ব্বর, জমি নেবার আগ্রহও লোকের বড় বেশী নয়।

আজ সংশোধিত তালিকা অনুসারে জমির বিলি বন্দোবস্তের দিন। মণ্ডল আইভানকে ডেকে বললেন তুমি কত অংশ জমি নেবে?

আইভান। আমার দুটি ছেলে আর আমি নিজে। আমাকে

তিন অংশই দেন। তবে অনুগ্রহ করে যদি কিছু কম দেন তা হলে বড় ভাল হয়। এখানকার জমির অবস্থা ত জানেন।

বগোলোবফ্। নির্বোধের মত কথা বলো না। তোমার ছেলে ছুটি বড় হয়েছে। তারা তোমাকে সাহায্য করে। আবার তারা বিয়ে করলে ছুটি বউ তোমার সংসারে আসবে। তারাও সাহায্য করবে।

আইভান। বড় ছেলেটি ত মস্কো-এ থাকে ছোটটিও গ্রীষ্মকালে বাড়ী থেকে চলে যায়।

বগোলোবফ। কিন্তু দুজনেই ত তোমাকে টাকা দেয়। তা ছাড়া বিয়ে হলে ত বউ ছুটি বাড়ীতেই থাকবে।

আইভান। ভগবান জানেন কি হবে। তারা বিয়ে করবে কি না তাই বা কেমন করে বলি।

বগোলোবফ। তুমি অনায়াসেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে পার।

আইভান। বন্দোবস্ত ত আমি করতে পারি। কিন্তু কালের গতিটা ত দেখছ। আজ কালকার ছেলেরা কি আর সেকালের মত বাপের কথা শোনে। যদি বা বিয়ে করে ত স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে চায়। আমি তাদের বিয়ের ভরসায় কি কিছু করতে পারি? আমার পক্ষে তিনটা অংশ চালানই গুরুতর ভার।

কার্লিচ। না, না। তোমাকে চারটে অংশ নিতে হবে। তোমার ছেলেরা যদি পৃথক হয়, তোমার কাছ থেকে কিছু জমি নেবে। জান ত ও পাড়ায় ছোট ছোট ছেলে নিয়ে যে কটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আছে, তারা তালিকা অনুসারে অংশ নিতে পারে না।

জনতার মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল "ও (আইভান) বড় মুজিক (mujik) (অর্থাৎ বড় কৃষক) ওর অবস্থা ভাল, ওর উপর পাঁচ জন রাখ, অর্থাৎ ওকে পাঁচ জনের অংশ দাও।

আইভান। দোহাই আপনাদের। আমার উপর পাঁচ জন দেবেন না।

মলল। অচ্ছা তোমাকে চারটে অংশ নিতে হবে (গ্রামবাসী-দের প্রতি) কি বল তোমরা ?

গ্রামাবাসীরা। চারটে, চারটে।

স্থির হয়ে গেল আইভানকে চারটে অংশ নিতে হবে। তারপর ও পাড়ার যে কটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কথা বল হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনকে—মেরিয়া আইভান্নাকে—ডাকা হল। মেরিয়ার স্বামীটি অক্ষম, তিনটি ছেলে আছে। তার মধ্যে একটি কাজকর্ম্ম করতে পারে। তালিকা অনুসারে তার চার অংশ নেওয়া উচিত। তা সে পারে না।

মণ্ডল। মেরিয়া, তোমাকে তিন অংশ নিতে হবে। তালিকা অনুসারে তোমার ভাগে চার অংশ পড়ে।

মেরিয়া। মীরের বিচারে যা হয়।

মণ্ডল। তা হলে তুমি তিন অংশ নিতে রাজী আছ ?

মেরিয়া। রাজী ? কি বল বাবা ? আমার উপর তিন জন ? আমার স্বামী গত গুডফ্রাইডে থেকে শয্যাগত। সকলে বলছে অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তাকে ত মরার মধ্যে ধরলেই হয়। কেবল একটু আধটু রুটি খেতে পারে। কোন কাজই করতে পারে না

নিকোলাই। আর সে যে গেল হাটের দিন কাবাকে (Kabak মদের দোকান) গিয়েছিল?

মেরিয়া। (নিকোলাই-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে) আর তুমি? প্যারিশের (parish) গত উৎসবের দিন তুমি কি করেছিলে? মাতাল হয়ে এসে স্ত্রীকে এমন মার মেরেছিলে যে বেচারী চীৎকার করে পাড়াশুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। ছিঃ—

মণ্ডল। ওসব কথা যেতে দাও। তোমাকে আড়াইটা অংশ নিতেই হবে। তুমি যদি নিজে না চালাতে পার, একটা লোক রেখে নিও।

মেরিয়া। তা কেমন করে হবে? আমি টাকা কোথায় পাব যে লোক রাখব? আমি গরীব।

কিন্তু সে সব কথা আর আর শোনা হল না। তাকে আড়াই অংশ নিতে হল।

এইরূপে গ্রামবাসী সকলের অংশ স্থির হয়ে গেল। তালিকার তুলনায় যে কম বেশী হল, তা অস্থায়ী। ইচ্ছা করলেই যার যা অংশ তা সে পেতে পারে। বলা বাহুল্য এইরূপে জমীর বন্দোবস্ত নিতে কাউকে সেলামী বা কোন রকম আবয়াব দিতে হয় না। জমির অংশ স্থির হয়ে যাবার পর, সেই অংশে কোন জমিখণ্ড পড়বে, তা নিয়ে আর একবার তর্কবিতর্ক, বাগবিতণ্ডা হয়। পূর্ব্বে যে জমিখণ্ডে সার দিয়ে উর্ব্বর করেছে সে সেই জমিখণ্ডই চায় এবং সম্ভব হলে তাকে তাই দেওয়া হয়। কিন্তু কখনও কখনও এমনও হয় যে সে জমি তাকে দিতে পারা যায় না। তখন তাকে অন্য জমি

নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জমিতে কৃষকের স্বত্ব এই পর্য্যন্ত যে সে চাষ আবাদ করে ফসল ভোগ করবে, কোন রকমে হস্তান্তরিত করতে পারবে না ১।

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

---

(১) বৃত্তান্ত গুলি Sir Donald Mackenzio Wallace কৃত Russia হইতে সংকলিত।

আমার খুড়ো

—:❀:—

(Maupassant-র ফরাসী হইতে)

বৃদ্ধ, দীর্ঘ-শ্বেত-শ্মশ্রু এক ভিক্ষুক এসে আমাদের কাছে ভিক্ষে চাইল। বন্ধু জোসেফ চাভরাঁশ তার হাতে গুঁজে দিলেন এক'শ সেণ্ট। আমি বিস্মিত হয়ে গেলেম। তিনি বললেন,—

এই ভিক্ষুক একটি পুরাণো ইতিহাস আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যা এ পর্য্যন্ত আমি ভুলতে পারিনি। তোমার কাছে সেইটেই এখন বল্‌তে চাই।

হাভরতে ছিল আমাদের বাড়ী। অবস্থা কোনকালেই স্বচ্ছল ছিল না। টায় টায় চলে যেত। বাবা আফিসে খেটে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন, তুই পকেট ভরে টাকা মোটেই আনতেন না। আমার তু'টি বোন ছিল।

পয়সার অনাটনে মা বড় কষ্ট পেতেন, আর প্রায়ই তাঁর স্বামীর জন্য প্রচুর পরিমাণে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ সঞ্চয় করে রাখতেন। গাল খাবার সময় ঐ গরীব বেচারার মুখের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হত, আমার। হাতখানা উঠিয়ে তিনি আপনার কপালের উপর বুলিয়ে যেতেন, যেন ঘাম মুছে ফেলছেন। মুখ থেকে একটি কথাও বেরুত না।

তাঁর এই ব্যর্থ চেষ্টার শোক আমার বুকে বিঁধত।

মিতব্যয়িতা তাঁদের চারদিক দিয়েই ছিল। কোন জায়গায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হ'ত না, পাছে উল্টে কাউকে খাওয়াতে হয়। বাজারের সবচেয়ে সস্তা গুদোমপচা যত মাল আমদানী করা হত। আমার ভগ্নীরা আপনাদের পোষাক নিজ হাতে করে তৈয়েরী করতেন, আধ হাত লেশ কিনতে হলে দিনভোর কমিটি করতেন। সাধারণত আমরা খেতেম চর্ব্বির ঝোল, আর একই মাংস হরেক রকমে পাক। হয় ত এ দু'টিই পুষ্টিকর ও মুখরোচক হত; আমি বোধ হয় অন্য জিনিস পেলেই বেশী খুশী হতেম।

আমার বোতাম হারিয়ে গেলে বা প্যাণ্টালুনে একটু খোঁচা লাগলে এক একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত।

প্রতি রবিবারে সমুদ্রের ধারে জেটিতে মহা সমারোহে বেড়াতে যাওয়াটি কিন্তু ছিল। বাবা রাইডিং কোট, লম্বা হ্যাট ও দস্তানা লাগিয়ে নাবিকদের উৎসববেশে বেরুতেন, মায়ের হাত ধরে। বোনেরা অনেক আগেই প্রস্তুত হয়ে যাবার সময়টির প্রতীক্ষা করতেন কিন্তু শেষ মুহুর্ত্তে তাঁরা বাবার রাইডিং কোটে অদৃশ্য একটা দাগ আবিষ্কার করে ফেলতেন; তখন বেনজাইন-সিক্ত একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে সেটা মুছে ফেলবার তাড়া পড়ে যেত।

যতক্ষণ কোটটির উপর কারিগরি হ'ত বাবা খালি সার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার টুপীটিকে সামলাতেন, আর মা নষ্ট হবার ভয়ে দস্তানা খুলে ফেলে, চশমা এঁটে হাত চালিয়ে যেতেন।

বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে পথ চলা হত। বোনেরা যেতেন আগে, হাতে হাত দিয়ে। তাঁদের বিয়ে হয় নি পথে ঘাটে বের হওয়া রীতিমত দরকার ছিল। আমি চলতেম মায়ের বাঁয়ে, বাবা

তার ছিক আগলাতেন। প্রতি রবিবারের এই বেড়ানোর সময়টিতে আমার দরিদ্র পিতামাতার জাঁদরেলি হাবভাব, গম্ভীর মুখ ও সগর্ব্ব চলার কায়দা এখনও আমার দিব্য মনে পড়ে। ধড় সিধে রেখে, ঠ্যাং টান করে গম্ভীর চালে তাঁরা চলতেন—যেন একটু এদিক ওদিক হলেই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

প্রতি রবিবারেই দূর দূরান্তের অজানা দেশ থেকে আগত সব বড় বড় জাহাজকে ঘাটে ভিড়তে দেখে বাবা অভ্যাস মত বলতেন, "দেখ, জুলস যদি ওদের কারও ভিতরে এসে থাকে তাহলে কি অবাকই না আমাদের করে দেবে!"

বাবার সহোদর ভাই, আমার খুড়ো জুলস প্রথমে ছিলেন কুলের অঙ্গার, এখন হয়েছেন আশাবর্ত্তিকা। ছেলেবেলা থেকে ঐ খুড়োর কথা শুনে আসছি, আর এত শুনেছি যে আমার মনে হয় দরজায় তাঁর প্রথম করাঘাতে—তাঁকে চিনে ফেলতেম। আমেরিকা যাত্রার দিন পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা আমি ভাল করেই জানতেম, কারণ ঐ সময়ের কথা উঠলেই বাড়ীর সকলের গলার স্বর খাদে গিয়ে নামত। সকলে বলাবলি করত যে চরিত্রটা তাঁর খারাপ ছিল, অর্থাৎ তিনি কিছু টাকা উড়িয়ে ছিলেন; দরিদ্রের সংসারে এইটেই সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। টাকাওয়ালা লোক আমোদ আহ্লাদে কিছু ব্যয় করলে, সকলে বলে লোকটি বয়ে গেছে। পাড়া প্রতিবাসীরা একটু মুচকি হেসে বলে, লোকটি স্ফূর্ত্তিবাজ হে। আর গরীবের ঘরে যে ছেলের জন্য বাপমাকে মূলধনে হাত দিতে হয় সে হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, বোম্বেটে।

মনে হয় বিচারের এই বিচিত্র পদ্ধতিটা ঠিকই বা হবে; কারণ অপরাধের দর এক হলেও ফলভেদে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়।

এই রকমে নিজের পথে চলতে চলতে আমার খুল্লতাত মহাশয় পৈতৃক সম্পত্তির নিজ অংশটুকু নিঃশেষে হজম করে ফেলে বাবার অংশ টুকুও খোয়াবার যোগাড় করলেন।

তখন তাঁকে ধরে হাবরে থেকে নিউইয়র্কগামী এক সদাগরী জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে সবাই নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

আমেরিকা নেমে খুড়োমশাই কি একটা ব্যবসা ফেঁদে বসলেন, বাড়ীতে লিখে পাঠালেন যে তিনি কিছু কিছু পাচ্ছেন এবং আশা করেন তাঁর ভ্রাতার যে টাকা খেয়েছেন শীঘ্রই সেটা শোধ দিতে সক্ষম হবেন। ঐ চিঠি পেয়ে বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। যে জুলসকে বেচলে একটা কুকুরের গলার শিকলির মূল্যও জুটত না হঠাৎ সে হয়ে দাঁড়াল একজন উঁচু দরের সাধু, হৃদয়বান পুরুষ, ডাবরাঁশ কুলের উপযুক্ত বংশধর।

তারপর এক জাহাজের কাপ্তেন মারফৎ আমরা খবর পেলেম খুড়ো একখানি বড় দোকান খুলেছেন এবং খুব ভারী রকমের ব্যবসা চালাচ্ছেন।

এর দু'বছর পরে দ্বিতীয় পত্র এল, "প্রিয় ফিলিপ, আমার শরীর কেমন আছে না জানতে পেরে তুমি ব্যস্ত হয়ে পড় এজন্য লিখছি যে আমি খুব ভাল আছি। কাজও খুব ভাল চলছে। আগামী সপ্তাহে আমি দক্ষিণ আমেরিকায় একটা দূরের পথে যাত্রা করছি। অনেক বছর হয়ত তোমাকে কোন খবরই দিতে পারবনা। আমার চিঠি না পেলে ব্যস্ত হয়ো না। হাতে টাকা হলেই হাবরে ফিরব। আশা

করতে পারি সে দিন শীঘ্রই আসবে। তখন কত সুখ স্বচ্ছন্দে আমরা থাকতে পারব।"

সেই থেকে ঐ চিঠি খানার কথা গুলো হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের বাড়ীর সবাইকার জপমন্ত্র। যখন তখন সেটা পড়া হত; দুনিয়ার লোককে সেটা দেখানো হত।

এরপর দশবছরের মধ্যে খুড়োর আর কোন খবর বার্ত্তাই পাওয়া গেল না। কিন্তু আমার বাবার আশা যতই দিন যেতে লাগল ততই বেড়ে চলল। মা মাঝে মাঝে বলতেন,—"জুলস এখানে এলেই আমাদের অবস্থা বদলে যাবে। কি মুক্তির নিশ্বাস তখন ফেলতে পারব!"

প্রতি রবিবারেই সমুদ্রের মাঝে বহুদূরে ঘন কাল ধোঁয়ার রাশ সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠতে দেখে, বাবা তাঁর সেই পুরাণো বাঁধা গৎ আওড়াতেন,—"দেখ জুলস যদি ওদের কারও ভিতরে এসে থাকে তাহলে কি অবাকই না আমাদের করে দেবে!"

তখন তাঁদের ভাব দেখে মনে হ'ত এখনই বুঝি খুড়ো জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে রুমাল নেড়ে ডাকবে "কিলিপ"।

খুড়ো এলে কি করা হবে সে সম্বন্ধে হাজার রকম প্ল্যান তাঁদের মাথায় খেলত। সকলেরই ইচ্ছে ছিল যে খুড়োর টাকা দিয়ে পড়াগাঁয়ে ছোট একটি বাড়ী কেনা হয়। আমি জানতেম ইতিমধ্যেই বাবা দু'একজনের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথাও পেড়েছিলেন।

আমার বড় বোনের বয়েশ হয়েছিল আটাশ, অপরটির ছাব্বিশ। তখনও কারও বিয়ে হয় নি; দেশে সকলেই—এই নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করত।

শেষ কালে ছোটটির পাণিপ্রার্থী হয়ে একজন দেখা দিলেন।

তিনি ছিলেন কেরানী সচ্চরিত্র, দরিদ্র।

আমার ধারণা যে খুড়োর ঐ চিঠিখানা একরাত্রে চোখে পড়েছিল বলেই—আমার বোনের পাণিপ্রার্থী যুবকটি অত তাড়াতাড়ি আমাদের আত্মীয় হয়ে যান।

বাপ মা ঐ ভদ্রলোকের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। ঠিক হল যে বিয়ের পরে সবাই মিলে জারসিতে একবার বেড়িয়ে আসা হবে।

যাদের টাকা পয়সা নেই—তাদের সমুদ্র ভ্রমণ করতে হলে জারসির মত জায়গা আর নেই। খুব দূরে যেতে হয় না, ছোট ডাকের জাহাজ চ'ড়ে সমুদ্র একটু পাড়ি দিলেই ইংরেজ অধিকৃত এই "বিদেশ" দেখা যায়। সেখানে প্রতিবাসী একটা ভিন্নজাতকে তাদের ঘরকন্নার মধ্যে দেখবার সুযোগ, দু'ঘণ্টার সমুদ্র যাত্রাতেই একজন ফ্রেঞ্চম্যানের ভাগ্যে ঘটে যায়; অধিকন্তু ব্রিটিশ পতাকা-রক্ষিত এই দ্বীপবাসীদের জঘন্য আচার ব্যবহার (স্পষ্টবাদীদের মতে) স্বচক্ষে দেখবার সুবিধে হয়।

এই জারসি যাত্রা আমাদের জপের মালা হয়ে দাঁড়াল, সর্ব্বক্ষণ এক চিন্তা, এক স্বপ্ন।

অবশেষে সত্যই একদিন আমাদের নিয়ে জাহাজ ছাড়ল; এখনও আমার মনে হচ্ছে সে যেন কালকের কথা। শোঁ শোঁ করে ষ্টীম এসে গ্রাঁভিলের জেটির গায়ে লাগছে; নূতন জহাজে চড়ে ভয় খেয়ে বাবা আমাদের তিনটি মাল ওঠানো দেখছেন; মুরগীর পাল থেকে সবগুলো চ'লে গিয়ে মাত্র একটি থাকলে সেটি যেমন

কারও নজরে পড়ে না, ছোট বোনের বিয়ে হবার পর আমার বড়টিরও ঠিক সেই অবস্থা; মা ব্যস্ত হয়ে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; আর আমাদের নব বিবাহিত দম্পতীযুগল তাঁদের অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে ছিলেন সকলের পেছুতে, সেহেতু আমাকেও বারে বারে ঘাড় ফেরাতে হচ্ছিল তাঁদের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য।

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল। আমরা উঠে পড়াতেই জেটি ছেড়ে দিয়ে, সবুজ মার্ব্বেল পাথরের তৈয়েরী একখানা টেবিলের মত সমতল সমুদ্রের উপর জাহাজখানি গা ভাসিয়ে দিল। লুপ্তপ্রায় তট-রেখার দিকে চেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলেম পরম উল্লসিত ও গর্ব্বিত ভাবে, কারণ এই আমাদের প্রথম সমুদ্র যাত্রা।

বাবা বুকটান করে দাঁড়ালেন, গায়ে সেই পরিচিত রাইডিং কোট। সেদিন সকালে বেনজাইন দিয়ে সেটা সাফ করা হয়েছিল, তার গন্ধ এখন বাতাসের মুখে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে বিশেষ করে রবিবারের বেড়ানোর সময়টির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল দুইটি ভদ্রলোক দু'জন ভদ্রমহিলাকে "অয়েষ্টার" দিচ্ছেন। এক বুড়ো, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা জহাজের মাল্লা, ছুরি দিয়ে শামুকের মুখ কেটে সে গুলো ভদ্রলোক দু'টির হাতে দিলে তাঁরা সেগুলো মহিলাদের নিকট চালান করলেন। মহিলারা একখানা পাতলা রুমালের উপর সেগুলো রেখে,পোষাক না নষ্ট হয় এজন্য মুখ বাড়িয়ে অতি মধুর ভঙ্গীতে সেগুলি গলাধঃকরণ করলেন। শেষে টুক করে জলটুকু খেয়ে খোলাগুলো সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন।

চলতি জাহাজে চড়ে অয়েস্টার খাওয়া এক রকমের নবাবী। এ

ঠিক কথা যে বাবারও দেখাদেখি সখ গেল। তিনি দেখলেন যে এটি বিশিষ্ট ও উচ্চ ষ্টাইলের সৌখীনতার পরিচায়ক। যেখানে মা ও বোনেরা ছিলেন সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমাদের অয়েস্টার খাবার ইচ্ছে আছে"?

মা খরচের কথা ভেবে ইতস্তত করলেন; কিন্তু বোনরা তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মা ভেবে বললেন, "ওগুলো আমার সহ্য হয় না। ছেলেদের কিছু দাও কিন্তু বেশী খেলে অসুখ করবে।" আমার দিকে ফিরে বললেন, "জোসেফকে দিয়ে কাজ নেই। ছোট ছেলেদের ওতে নিশ্চয় অসুখ করে।"

মার অবিচার দেখে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেম, বাবা গম্ভীর চালে তাঁর দুই মেয়ে ও জামাইকে বুড়ো-মাল্লার কাছে নিয়ে চললেন।

মহিলা দু'জন ইতিমধ্যে অন্যত্র গিয়েছিলেন। বাবা বোনদের বোঝাতে লাগলেন কি করে জল না ফেলে অয়েষ্টার খেতে হয়; ভাল করে দেখাবার জন্য তিনি একটা শামুক হাতে নিলেন। মহিলাদের অনুকরণ করতে গিয়ে তখনই সবখানি তরল পদার্থ তাঁর রাইডিং কোটের উপর ঢেলে ফেললেন। মা অনুচ্চ স্বরে বললেন, "অত ছেকমত না দেখালেই ভাল হ'ত।"

হঠাৎ বাবা যেন অস্থির হয়ে পড়লেন। আমার বোনেরা তখনও ঐ শামুক ওয়ালাদের কাছে দাঁড়িয়ে; তিনি একটু দূরে গিয়ে তাদেব দিকে স্থির নেত্রে দেখতে লাগলেন এবং খামকা আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখের চেহারা তখন রক্তশূন্য, চোখ চঞ্চল। তিনি নিম্নস্বরে মাকে বললেন, "ঐ যে লোকটি শামুকের মুখ কাটছে, জুলসের চেহারার সঙ্গে ওর আশ্চর্য্য মিল দেখছি"।

মা বললেন, "কোন জুলস"? বাবা জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "তাইত দেখ—আমার ভাই জুলেস—আমেরিকায় ভাল অবস্থায় সে আছে না জানলে আমি ভাবতেম ঐ লোকটিই জুলস"।

মা চমকে উঠে বললেন, "পাগল হয়েছ! জান যখন জুলেস ও নয়, তখন কেন এমন যা তা বকছ?" বাবা তবুও বললেন, "আচ্ছা এগিয়ে দেখ; নিজের চোখে দেখে ঠিক করাই ভাল"।

মা উঠে ভগ্নীদের কাছে গেলেন। আমি লোকটার দিকে চাইলেম—দেখতে সে বুড়ো, নোংরা, শুকনো কাঠ বিশেষ; এক মনে নিজের কাজ করছিল।

মা ফিরলেন, দেখলেম তিনি কাঁপছেন। দ্রুতস্বরে বললেন,— "আমার মনে হয় এ সেই। কাপ্তেনের কাছে কিছু খবর পাও কি না জেনে এস। দেখ খুব সাবধান, শেষে এই হতভাগাটা আবার আমাদের ঘাড়ে না চাপে"।

বাবা কাপ্তেনের খোঁজে চললেন, আমিও পিছু নিলেম। আমার মনের অবস্থা তখন কেমন যেন হয়ে গিয়েছে।

ঢ্যাঙ্গা, শুকনো, লম্বা গোঁফে শোভায়মান কাপ্তেন সাহেব অতি গম্ভীরভাবে তাঁর ঘরের সুমুখে পায়চারি করছিলেন, দেখে মনে হয় যেন তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে জাহাজ চালিয়ে আসছেন।

বাবা সসম্ভ্রমে তাঁর নিকটস্থ হয়ে, দু'একটি প্রশংসা বাক্যের পর তাঁর সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন,—"জারসির বিশেষত্ব কি? সেখানে কোন কোন ফসল জন্মে? লোকসংখ্যা কত? আচার

ব্যবহার কিরূপ? পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ? মাটির উর্ব্বরতা কিরূপ"? ইত্যাদি।

কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে লোকে ভাবত এরা অন্তত আমেরিকা সম্বন্ধে কথা কইছে।

এর পর "এক্সপ্রেস" অর্থাৎ যে জাহাজ আমাদের নিয়ে চলছিল তার সম্বন্ধে আলাপ হল; তারপর জাহাজের সাজসজ্জা ও শেষে বাবা একটু কেশে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার জাহাজে একটি বুড়ো অয়েষ্টার ওয়ালা আছে যাকে দেখে মনে হয় তার কিছু পূর্ব্ব ইতিহাস আছে। তার সম্বন্ধে অপনি কিছু জানেন কি?"

আলোচ্য বিষয়ের এই অধোগতিতে কাপ্তেন সাহেব চটে গিয়েছিলেন। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন—

"ঐ বুড়ো ফরাসী হতভাগাটাকে গেল বছর আমি আমেরিকায় কুড়িয়ে পাই ও সঙ্গে করে দেশে ফিরিয়ে আনি। হাবরেতে বোধহয় ওর কোন আত্মীয় আছে, কিন্তু তাদের কাছে টাকা ধারে বলে ফিরে যেতে চায় না। ওর নাম জুলস—জুলেস ডামরাঁশ কি ডাবরাঁশ ঐ রকম কিছু হবে। আমেরিকায় একসময়ে ও টাকাওয়ালা লোক ছিল, ওর বর্ত্তমান অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখছেন"।

বাবার মুখের চেহারা পাঁশুটে হয়ে গিছল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে স্খলিতকণ্ঠে তিনি বললেন,

"আহা—হা—বেশ, ঠিক হয়েছে,—আমি মোটেই—আশ্চর্য্য হই নি। আপনাকে বহু ধন্যবাদ কাপ্তেন সাহেব"।

তিনি চলে গেলেন। কাপ্তেন অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

তিনি মার কাছে এলেন। তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত দেখে মা বললেন, "একটু ব'স, ওরা কিছু টের পেয়ে যাবে"।

বেঞ্চের উপর বসে পড়ে অস্থিরভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে বাবা বলে উঠলেন, "এ সেই, ওগো এ সেই"

একটু থেমে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করা হবে এখন ?"

মা তৎক্ষণাত জবাব দিলেন, "মেয়েদেয় সরিয়ে দে'য়া দরকার। জোসেফ সব জানে, সেই ওদের খুঁজতে যাক্। বিশেষ সাবধানে থাকতে হবে যাতে জামাই কিছু না জানতে পারে।"

বাবা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—"কি দুর্ঘটনা !

শুনে মা একমুহূর্ত্তে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, হুঙ্কার দিয়ে বললেন,

"দুর্ঘটনা না হাতী ! মন আমার অষ্ট প্রহরই টিক টিক করেচে ও লক্ষ্মীছাড়ার কিছু হবে না, ও শেষে আমাদের ঘাড়েই ফের চাপবে ! ডাবরাঁশ গুষ্টির চৌদ্দপুরুষে কেউ কখন কিছু করতে পেরেছে ? বচন শুনে বাঁচি নে !"

বাবা কপালের উপর হাতখানা বুলিয়ে গেলেন। স্ত্রীর বকুনির ধাক্কা সামলাবার এইটি তাঁর একমাত্র অস্ত্র।

মা ফের বল্‌লেন, "ওর পাওনাটা জোসেফের হাতে দেও ; সে গিয়ে দিয়ে আসুক। শেষে ভিখিরীটা আমাদের চিনে ফেলুক—না, না তার আর দরকার নেই। জাহাজের সকলে কি মজাই দেখবে এখন ! আমরা ঐ ধারে যাই, দেখ লোকটা যেন কাছে এসে না পড়ে,"

এই বলে তিনি উঠলেন। আমাব হাতে একশ "স্যুর্" এক গোটামুর্দ্রা দিয়ে তাঁরা জাহাজের অন্য দিকে চলে গেলেন।

বোনেরা বিস্মিত হয়ে বাবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললেম সমুদ্রের দুলুনীতে মা কিছু অসুস্থ হয়েছেন।

অয়েষ্টার ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেম, "আপনার কত পাওনা হয়েছে মহাশয় ?" আমার বলতে ইচ্ছা হল—"খুড়ো মহাশয়"।

"দুই ফ্রাঙ্ক"

আমি একশ সেণ্ট—তাঁকে দিলেম, তিনি বাকী পয়সা ফিরিয়ে দিলেন।

আমার চোখ ছিল তাঁর হাত খানার উপর—জাহাজের খালাসীর সেই-রগ-তোলা, কাটা হাত, আর জরাখিন্ন, দুঃখ ক্লিষ্ট সেই মুখের উপর। মনে মনে তখন বলছি—"এই আমার খুড়ো, এই আমার বাপের ভাই।"

আমি দশ সেণ্ট বকশিশ দিলেম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন—"বাবা ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ"—ঠিক একজন ভিখিরীকে ভিক্ষে দিলে সে যেমন করে বলে থাকে। আমার মনে হ'ল তিনি নিশ্চয় এর আগে ভিক্ষে করেছেন।

আমার দানের পরিমাণ দেখে বোনেরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বাকী পয়সা যখন মাকে ফিরিয়ে দিলেম তিনি বললেন, "এত লেগেছে ? ডাকাত নাকি ?"

আমি বললেম "দশ সেণ্ট তাকে জল খেতে দিয়েছি।"

মা লাফিয়ে উঠে, চোখ গরম করে চীৎকার করে উঠলেন, "পাগল হয়েছে এ ছোঁড়া! দশ সেণ্ট দান—ঐ হতভাগাটাকে"—

বাবা জামায়ের দিকে ইসারা করলেন। মা ঐ দেখে হঠাৎ ক্রোধ সম্বরণ করলেন।

তারপর সব চুপ।

আমাদের সুমুখে ধুসর ছায়া, মনে হয় যেন সমুদ্রের জল থেকে ঠেলে উঠছে।

ঐ জারসি।

জেটির কাছে জাহাজ ভিড়লে, আমার খুব ইচ্ছে হল যে আমার খুড়ো জুলেসকে আর একবারটি দেখি, তাঁর কাছে গিয়ে একটা সান্তনা বাক্য, একটু স্নেহমাখা কথা বলি।

কিন্তু সকলের অয়েষ্টার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তিনি অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সম্ভবত জাহাজের খোলের মধ্যে যে অন্ধকার ময়লা খোপটায় এই হতভাগ্য থাকত সেখানেই সকলের চোখ এড়িয়ে নেমে গিয়েছিল।

আমরা ফেরবার পথে "সেঁ্যতমালোয়" অন্য একটা জাহাজে চড়লেম, যাতে করে খুড়োর সাথে আর দেখা না হয়। মা দুর্ভবনায় অস্থির হয়ে কঠেছিলেন।

এর পর আমার বাপের ভাইকে আর কখন চোখে দেখিনি।

এই হচ্ছে আমার ভিখিরীদের মাঝে মাঝে একশ সেণ্ট দেবার ইতিহাস।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

কুজ্যাঁর ভবিষ্যত

——:*:——

(George Duhamel-এর Civilisation হইতে অনুবাদ)

[ধর্ম্ম, রাষ্ট্র বা সমাজ নিয়ে যখন সমস্ত দেশের চিত্ত সত্য সত্যই মথিত হয়ে ওঠে তখন সে মন্থন সাহিত্যে প্রকাশ ত পায়ই, অনেক সময়ে নবযুগ এনে থাকে। রেনেসাঁশ, ফরাসীবিপ্লব প্রভৃতি যে সকল বিরাট ঘটনা ইউরোপে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল তাদের উৎপত্তি ছিল জনসাধারণের চিত্তে। গত মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যে যে কোন নূতন সৃষ্টির আভাষ আমরা এখনও পাই নি, আমার মনে হয় তার কারণ এ যুদ্ধের উৎপত্তি হয়েছিল মন্ত্রীসভার দপ্তর খানায়, এর পিছনে কোন thought movement ছিল না। অবশ্য পরে খবরের কাগজের সাহায্যে দেশের প্রাণে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে তোলা হয়েছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যাই হোক যুদ্ধান্তে ইউরোপের মনে যে বিপুল মন্থন চলছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ মন্থনে কোন বড় সাহিত্য সৃষ্টি হবে কি না তা বিবেচনা করবার সময় এখনও আসে নাই। সে যাই হোক যুদ্ধের পরে যে সব লেখক ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন ফরাসী লেখক Duhamel তার মধ্যে একজন। তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বেই ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সাহিত্যের আসরে আসন লাভ করেছেন। গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে Duhamel এর Civilisation ফ্রান্সের মনকে যেরূপ নাড়া দিয়েছে এক Barbusse এর Le Feu ছাড়া এমন কোন বই-ই লেখা হয় নাই যা সেরূপ দিতে পেরেছে।

Civilisation যুদ্ধের কতগুলো ছবির সমষ্টি। সেগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি ট্র্যাজিক। বীরের মৃত্যু ট্র্যাজেডি নয়—কারণ মৃত্যু তাদের জীবনকে

পূর্ণতা দেয়, মৃত্যু তাদের পক্ষে গৌরবান্বিত পরিণতি। কিন্তু যারা বীর নয় অসাধারণ কিছুও নয়—যারা যুদ্ধে মরবার কথা জীবনে কখন মনেও আনে নাই—তারা যখন অন্যের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অবোধের মত প্রাণ হারায়—তার চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কিছু নাই। তাদের সে অখ্যাত অজ্ঞাত মৃত্যুতে কোনই বিশেষত্ব নাই, বীরত্ব হয় ত আছে—কিন্তু সে সম্বন্ধে তারা নিজেরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা উদাসীন। খবরের কাগজের পাতায়ও তাদের অবহেলা করা হয়—তাদের মত দশহাজার লোক মরলে তবে লেখা হয়—'অমুক আক্রমণে মাত্র দশহাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে।' এই সব লোক কেউ বা ঘড়ির দোকান করে, কেউ বা ক্ষেত চষে জীবন কাটাত—দু'চার টাকা জমিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে তাদের দিন যাচ্ছিল। এর মাঝখানে এল লড়াই। State বলে একটা মানুষের হাতগড়া নিরেট নির্ম্মম দৈত্য প্রত্যহের কাজের মাঝখানথেকে তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে গেল—তারপর তাদের পোষাক পরিয়ে, ড্রিল করিয়ে, গায়ে নম্বরের টিকিট ঝুলিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। সেখানে তাদের কারো বা প্রাণ গেল কেউ বা হাত, পা, চোখ হারিয়ে হাঁসপাতালে ফিরে এল। Duhamel ব্যবসায়ে ডাক্তার ছিলেন—এবং ডাক্তার হয়েই তিনি যুদ্ধে যান—তাই তাঁর লেখায় এই হাঁসপাতালের কথাই আমরা পাই। পাঠকেরা দেখবেন এই সব আহতব্যক্তিরা যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নি, কারণ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে হেঁয়ালী বলে মনে হয়েছে। বলির পশু যেমন বলির পূর্ব্বে নীরব হয়ে যায়—এরাও তেমনি নীরবে মরেছে—যদি বা কেউ তখন কোন কথা বলে থাকে তবে সংবাদপত্রের জয়ঢাকে যে হিংস্র উন্মত্ত বাজনা বেজেছিল—তাতে সে কথা দোশর কানে পৌচয় নি। আজ যুদ্ধের শেষে যাঁরা সেই সব মুক, অখ্যাত লোকদের মুখে ভাষা দিয়েছেন—Duhamel তাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক।]

আমি যখন একটু সময় পেতুম কুজ্যাঁর বিছানায় তার পায়ের দিকটায় গিয়ে বসতুম। সে বল্ল—"ছাখো আমার পা'টা কেটে ফেলায় তোমার বসবার অনেকটা জায়গা হয়েছে। ওরা সেই জন্যেই পা'টা কেটেছে—কেমন হে"?

চল্লিশ বছর বয়েসেও এই লোকটির মুখ ছিল তরুণ ও কোমল। তার মুখে একটা সরল হাসি সব সময়েই লেগে থাকত। "ক্ষৌউরীর দিনে" কামালো হয়ে যাবার পর তার সেই হাসি দেখলে আমাদের মনটাও ভাল থাকত। তার সেই হাসি ছিল ভারি আশ্চর্য্য—খুব মৃদু হাসি—তাতে ছিল খানিকটা বিদ্রুপ—খানিকটা সরলতা, ঠিক ফ্রান্সের হাসির মত। যে ঠোঁটের উপর হাসিটা খেলত সে ঠোঁট ছিল রক্ত-হীনতায় বিবর্ণ এবং তার মুখও ছিল প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে শীর্ণ। এ সমস্ত সত্বেও কুজ্যাঁর চেহারায় একটা প্রীতির ভাব ছিল—যেন পৃথিবীতে সবাইকে সে বিশ্বাস করত। বিশেষতঃ তার নিজের উপর তার অগাধ আস্থা ছিল—তার প্রথম কারণ সে বেঁচে ছিল এবং দ্বিতীয় কারণ—সে ছিল কুজ্যাঁ।

তখনও তার একটা পা বাকী ছিল, তবে সত্যি কথা বলতে কি—সে পা'খানারও মূল্য খুব বেশী ছিল না। একটা টর্পিডো ফেটে তার হাঁটুটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার কেস্ খুবই খারাপ ছিল—সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হলে সবাই ফিস্ ফিস্ করে কথা বলত আর মাথা নাড়ত।

কিন্তু তাতে কি হয়? কুজ্যাঁর পায়ের উপর যে তার খুব নির্ভর ছিল তা নয়। এর আগেই তার অন্য পা'টা সে হারিয়েছিল। একটা পা বেশী কমে তার বিশেষ কিছু এসে যেত এমন মনে হয়

না। আমার মনে হয় কুজ্যাঁ তার বুক, মাথা বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর বেশী নির্ভর করত। পা থাক বা না থাক সে আগেও যেমন ছিল তেমনি রইল। এবং তার উজ্জ্বল সবুজ রঙের চোখে যে স্নিগ্ধ আলোটি জ্বলত সেটি যেন ছিল তার সরল মনের প্রতিমূর্ত্তি মত।

আমি তার বিছানার উপর গিয়ে বসতুম আর কুজ্যাঁ তার জীবনের ইতিহাস আমায় বলে যেত। এই যুদ্ধ হঠাৎ এসে যেখানে তার জীবনসূত্রকে ছিন্ন করে দিয়েছিল সে সেইখান থেকেই আরম্ভ করত, এবং স্বভাবতঃই যুদ্ধের পূর্ব্বে শান্তির সময়ে তার জীবনে যেমন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল যুদ্ধান্তে ভবিষ্যৎ জীবনেরও সে সেইরূপ সুখকল্পনা করে নিত। অশান্তিপূর্ণ রক্তাক্ত অতল গহ্বরটার ওপার থেকে অতীত জীবনের সূত্রটাকে টেনে এনে ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে তার ভালই লাগত। কখনও তার মুখে অতীত বাচক ক্রিয়াপদ শুনি নি—সব সময়ই বর্ত্তমান—আশ্চর্য্য চিরস্থায়ী বর্ত্তমান। সে বলত—"আমার ছিল শিল্পদ্রব্যের ব্যবসা। ব্যবসা জানলে ওতে বেশ লাভ থাকে। আমার কাজ ছিল বেশীর ভাগ এই ঝাড়, বাতিদান নিয়ে। কোহেন কোম্পানি, মার্গুইলে,, স্মিথসান, আর আর বড় বড় হৌসের সঙ্গে আমার কারবার ছিল। আমার কাজের একটা বিশেষ রকম ছিল এই যে—খদ্দেরকে আমি হাতে রাখতুম। সে যে কি চায় তাকে তা' ভাল করে বুঝিয়ে তবে তাকে জিনিস বিক্রী করতুম।

"মনে কর বার্ণাবে সাহেব বা অমনি একটা কেউ তার বৈঠকখানার জন্যে একটা ঝাড় কিনবে বলে আমার কাছে এল। আমি

বল্লুম 'বেশ। আপনি কি চাচ্ছেন আমি বুঝেছি'; অমনি ঝাঁ করে একটা ট্যাক্সি করে বেরোলুম। গেলুম কোহেন কোম্পানীর কাছে বল্লুম—'পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন আমার ঠিক ত'—ধর কোহেন গররাজী। বেশ, এলুম নেমে, আবার ট্যাক্সিতে উঠলুম—স্মিথসানের ওখানে গেলুম......অবশ্য এতে খরচ আছে। শেষকালে যদি বার্ণাবে পিছিয়ে যায়—তা হলে ট্যাক্সিভাড়া অবশ্য আমাকেই দিতে হবে......কিন্তু এতে মজা আছে......এ ব্যবসায় এক রকম করে পুষিয়ে যায়—বুঝেছ; আসল কথা কি জান পছন্দ থাকা চাই"

কুর্জ্যাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে আমি হাসতুম। তার গাল দুটো ফুটো মার্ব্বেলের মত—দেখতে ভাল নয়। জ্বর হয়ে অনেক দিন যারা বিছানায় পড়ে থাকে, অথবা যাদের হজম হয় না তাদের চোখের মত কুর্জ্যাঁর চোখ দুটোও ফোলা ফোলা দেখাত। চল্লিস বছর বয়েসে মনটা যতই তরুণ থাকনা কেন, শরীরটা টর্পিডোর আঘাত থেকে কুড়ি বছর বয়েসে যতটা চটপট সেরে উঠতে পারে চল্লিশে ততটা পারে না। আমি সেই পদশূন্য কুর্জ্যাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম আর সে বলে যেত কেমন করে তার ব্যবসার জন্যে সে একবার কোহেনের দোতলার আফিসে ছুটে উঠত, একবার স্মিথসানের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে আসত, একবার মার্গুইলের ওখানে গিয়ে লাফালাফি করত।

একদিন কুর্জ্যাঁর পা দিয়ে রক্ত পড়ল। লাল ঘামের মত, কফিপাতার উপর ভোরবেলাকার শিশিরের মত বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তার ব্যাণ্ডেজের ভিতর থেকে চুঁইয়ে বের হতে লাগল। চার পাঁচ দিন প্রত্যহ কুর্জ্যাঁর ঘা থেকে রক্ত পড়ল। প্রত্যেক

বার তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া হত। নানা রকম ওষুধ দেওয়া হত—তাতে রক্তও বন্ধ হত। প্রত্যেকবার কুজ্যাঁ একটু বেশী ফ্যাকাশে হয়ে তার বিছানায় ফিরে আসত। তাকে নিয়ে যাবার সময়ে সে আমাকে বল্ল—“দেখেছ হে—কিছুতে শান্তি নেই”

একদিন সকালবেলা অমি কুজ্যাঁর কাছে গিয়ে বসেছি—সে মুখহাত ধুচ্ছে। সে হাঁফিয়ে উঠছিল। তার মুখের সেই ফোলা ফোলা ভাব সত্ত্বেও আমি দেখলুম তার মুখটা বেজায় ঝরে গেছে আর তার কোন আকার নেই। যেন কোন প্রছন্ন রোগ ভিতরে ভিতরে তাকে গ্রাস করে ফেলছিল। সত্যি তার মুখটা দেখলে মনে হত যেন একটা পোকাপড়া পচা ফল।

সে বল্ল—“ভাল খবর এসেছে হে—আমার ছেলেদের খবর,—তাদের একজনের বয়স বার একজনের তেরো। তাদের বেশ হচ্ছে। কেমন—তোমায় বলি নি? আমি ভাবছি এবার ঝাড়ের সঙ্গে ঘড়ি-টড়ির ব্যবসাও জুড়ে দেব। আমি যে সব লোককে জানি তাতে একটা বড় রকমের কিছু করবার ইচ্ছা আছে। উদ্দেশ্য টা সব সময়েই খুব বড় রাখতে হয়—বুঝেছ? উঃ...শীগগির শীগগির আরম্ভ করতে হবে......হয়ে যাবে......কি দরকার জান—এই ষ্টাইলটা জানা চাই.............

আমি হাসবার চেষ্টা করলুম কিন্তু বুকটা কে যেন চেপে ধরল। কুজ্যাঁর মনটা অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। সে এক হাতে তোয়ালে খানা আর এক হাতে সাবানটা ঘোরাতে লাগল। সে তার ভাবী জীবনের গৌরব এমনিভাবে বর্ণনা করতে লাগল যেন সে দেখতে পাচ্ছিল বিছানার চাদরের শাদা জমীর উপর বড় বড় অক্ষরে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লেখা রয়েছে।

বিছানার চাদরের দিকে তাকালুম। হঠাৎ দেখি সেখানে একটা ফোঁটা—একটা লাল ফোঁটা সেটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে বড় হয়ে একটা ভয়ঙ্কর, সুন্দর দাগ পড়ল।

বিড়বিড় করে কুজ্যাঁ বল্ল—"আঃ কি মুস্কিল—আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে—কিছুতেই আর শান্তি নেই"

আমি সাহায্যের জন্য লোকজন ডাকলুম। একটা তেলের কাপড় তার উরুর চারপাশে জড়িয়ে দেওয়া হল।

সে বল্ল—"এইবার বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আর চিন্তার কারণ নেই" কথাটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বল্ল বটে—কিন্তু তার স্বর খুব ক্ষীণ মনে হ'ল—যেন আওয়াজ বেরোল ঠোঁট থেকে।

রক্তপড়া বন্ধ হ'ল। কুজ্যাঁকে পুনরায় অস্ত্র করবার টেবিলে নিয়ে গেল। সেখানে কিছুক্ষণের জন্য সে একটু শান্তি পেয়েছিল। ডাক্তার হাত ধুতে লাগলেন। তারা আস্তে ফিস্ ফিস্ করে কুঁজ্যার কেস্ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। আমার বুকটা দুর দুর করতে লাগল, মুখের মধ্যে জিবটাও শুকিয়ে উঠতে লাগল।

কুজ্যাঁ আমাকে দূর থেকে দেখে চোখ দিয়ে ইসারা করল। আমি তার কাছে গেলুম। সে বল্ল—

"কিছুতেই সোয়াস্তি নেই। তোমাকে যেন কি বলছিলাম? হ্যাঁ ষ্টাইলের কথা। আমার ওস্তাদি কোথায় জান? যত রকম ষ্টাইল আছে সব আমি জানি—পঞ্চদশ লুই বল, নেপোলীয়ানী বল, ওলন্দাজ বল, আধুনিক বল—আর যাই বল। কিন্তু কাজটা শক্ত। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি——"

ডাক্তার আস্তে বল্লেন—"কুজ্যাঁ এইবার ঘুমোও দেখি"

সে আমায় বল্ল—"এঁদের হয়ে গেলে, জেগে উঠে তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবো" তারপর অতিশান্ত ভাবে সে নিশ্বাসের সঙ্গে ইথার টেনে টেনে নিতে লাগল।

* * *

তারপর আজ এক বছর হয়ে গেল। আমাকে যে সব কথা সে বোঝাবে বলেছিল—কিন্তু বোঝাতে পারে নি—কখনও বোঝাতে পারবে না—অনেক সময় সেই সব কথা ভাবি।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

সম্পাদকের নিবেদন

—————:※:—————

সবুজ-পত্র যে এ ক'মাস বন্ধ আছে তার কারণ, প্রথমে মনে করেছিলুম যে ও কাগজ ততদিন আর প্রকাশ করব না যতদিন ওটিকে নিয়মিত চালাবার একটা বন্দোবস্ত না করতে পারি।

গত বৎসর কাগজ খানি যে রকম এলোমেলো ভাবে বেরিয়েছে তার জন্য আমি যেমন লজ্জিত তেমনি দুঃখিত। মাসিক পত্রকে ত্রৈমাসিক করে তোলায় সম্পাদক তাঁর দায়ীত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন না। অথচ কি করে যে সবুজ-পত্রের প্রকাশ একটা অলজ্ঘ নিয়মের অধীন করা যায় তার সন্ধান আমি ইতিপূর্ব্বে পাই নি। যদি পেতুম তাহলে—সরকারের চাকরের মাহিনার মত সবুজ-পত্র প্রতিমাসের পয়লা তারিখে ঠিক বেরত।

কি উপায়ে সবুজ-পত্রের প্রচার বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আমি সে সকল অবলম্বন করতে পারি নি। আমার বিশ্বাস-সে সব উপায় অবলম্বন করা সবুজ-পত্রের পক্ষে বৃথা।

আসল কথা সবুজ-পত্র যে কালের হিসেবে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে সে গ্রাহকের অভাবে নয়—লেখকের অভাবে। এ পত্রের প্রতি পাঠকেরা ততটা অসদয় যতটা লেখকেরা। আর একটা মাসিক পত্র যে একহাতে চালানো যায় না—সে কথা বলাই বাহুল্য। লেখকের সংখ্যা বাড়াবার উপায় আমিও অদ্যাবধি আবিষ্কার করি নি, এবং কি করে যে তা করতে হয়, তার সন্ধান অপর কেউও

আমাকে আজও দেন নি,—এমন কি তাঁরাও নন্ যাঁদের কাছে গ্রাহকের সংখ্যা বাড়বার সর্ব্ববিধ সদুপায় সুবিদিত।

শুনতে পাই যে বাঙলা লেখক সমাজের ধারণা যে সবুজ-পত্র একটি বিশেষ দলের কাগজ এবং সে দল যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনি আত্মম্ভরী—এক কথায় aristocratic। ও ইংরাজি শব্দটি আমি মুখে আনতুম না, যদি কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি মহাশয় সবুজ-পত্রকে উক্ত বিশেষণে ভূষিত না করতেন। এ অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনও জবাব দাখিল করবার প্রয়োজন নেই, কেননা বাগচি মহাশয় সবুজ-পত্রকে অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এ দুই পত্র যে একজাতীয় একথা পূর্ব্বেও শুনেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ইনস্পেক্টর মহোদয় অমৃত-বাজার পত্রিকার পিঠ পিঠ সবুজ-পত্রকেও কোন একটি কলেজ থেকে বহিস্কৃত করে দেবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাগবাজার পত্রিকা যে ভাবে, ভঙ্গিতে, ভাষায়, ও ছাপায় অভিজাত্য কলুষিত, এমন কথা উক্ত ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ও বলেন নি। তবে যখন দেখা যাচ্ছে যে বাঙলা কবির সঙ্গে ইংরাজি অধ্যাপকের মতের মিল আছে, তখন মানতেই হবে যে সবুজ-পত্রের সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকারও মিল আছে। কিন্তু সে ঐক্য হয়ত এত গূঢ় এত মৌলিক যে তা দেখবার শক্তি সহজ চোখে নেই—আছে সুধু কবির শিবনেত্রে আর ইনস্পেক্টরের অশিব-নেত্রে।

সে যাই হোক এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে কোনরূপ বাজারে পত্রিকা হয়ে ওঠবার সামর্থ সবুজ-পত্রের শরীরে নেই। তা হতে চেষ্টা করলে, সবুজ-পত্র কালে অমৃত না হয়ে অকালে মৃত হবে।

গ্রাহকের দিক থেকেই দেখুন—আর লেখকের দিক থেকেই দেখুন সবাই দেখতে পাবেন যে সবুজ-পত্র একটি minorityর কাগজ। কিন্তু এ minority সাম্প্রদায়িক নয়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক্।

যাঁরা আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন্ যে মনের রাজ্যে আমি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। যে দেশে কিম্বা যে সমাজে মানুষের নিজের চোখ দিয়ে দেখবার নিজের মন দিয়ে ধারণা করবার নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করবার হয় প্রবৃত্তি নয় শক্তি নেই—সে সমাজ জড় সমাজ। সুতরাং সমাজকে সজীব ও সতেজ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ব্যক্তি মাত্রকেই নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অধিকার দেওয়া। এ বিশ্ব বহুরূপী – আর সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে বৈচিত্র্যসৃষ্টি। কি জীব-জগতের কি মনোজগতের এই বিপুল বৈচিত্র্যের মূলে আছে আত্মার স্বাধীন স্ফুর্তি। জীবনের ও মনের এই স্বাধীন স্ফুর্তিতে যিনি বাধা দিতে চান, তিনি মুখে যাই বলুন তিনিই হচ্ছেন যথার্থ জড়ভক্ত। একটি ইতালীয় দার্শনিক Croce বলেছেন যে spirit এবং liberty এই দুই শব্দের অর্থ এক। এ কথা আমি সানন্দে শিরোধার্য্য করি। সুতরাং আমি প্রতি ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে দেবার একান্ত পক্ষপাতী। যাকে আমরা ডিমোক্রাসি বলি তার আধ্যাত্মিক ভিত্তি এই ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জীবনের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তির প্রতি অনুকূল বলেই ডিমোক্রাসি গ্রাহ্য।

তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে মনোরাজ্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসকে aristocratic মনোভাবও বলা যায়। কেননা এ মত

জনগণের মত নয়। তার কারণ অধিকাংশলোকের মনের কোনও নিজস্ব নেই—এবং তারা স্বাধীনতাও চায় না। তারা চায় সদলবলে প্রভূর দ্বারা চালিত হতে, সে প্রভূ—মনের প্রভুই হোন আর দেহের প্রভূই হোন।

যে ক্ষেত্রে অমি নিজে স্বাধীনতা চাই—বলা বাহুল্য সে ক্ষেত্রে আমি অপরকেও স্বাধীনতা দিতে চাই—এমন কি তাঁকেও—যাঁর মনের সঙ্গে আমার মনের আদৌ মিল নেই। সবুজ-পত্র সকল প্রকার মতকে বক্ষে স্থান দিতে সদাই প্রস্তুত—অবশ্য সে মতের পিছনে যদি মন নামক পদার্থ থাকে, আর তার প্রকাশ যদি সৌজন্যের সীমা অতিক্রম না করে।

সবুজ-পত্রের পুনঃপ্রকাশের অপর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বর্ত্তমানে যে দেশব্যাপী আন্দোলন চলছে, দেখতে পাই যে বাঙলার প্রায় সকল মাসিক পত্র সে সম্বন্ধে প্রায় সমান নীরব। এ মৌনতা স্বাভাবিক নয়। আমরা কবি হই—দার্শনিক হই—বৈজ্ঞানিক হই—ঐতিহাসিক হই—আমরা পলিটিক্স সম্বন্ধে ত কেউ উদাসীন নই। অধীন জাতিকে স্বাধীন করা যে পলিটিকাল আন্দোলনের উদ্দেশ্য সে পলিটিকস্ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া অধীন জাতির লোকের পক্ষে অসম্ভব। তবে বাঙলার লেখক সম্প্রদায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন না কেন? এর এক কারণ হতে পারে, যে বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁদের মন সাড়া দেয় নি—আর এক কারণ হতে পারে যে তাঁরা নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছেন না। এ দুটির একটিও যে যথার্থ কারণ তা আমি স্বীকার করতে পারিনে, কেননা তাতে আমার বাঙ্গালী পেট্রিয়টিজমে আঘাত লাগে।

স্বরাজ আমরা সবাই চাই আর দেশের জনসাধারণের মনে যে স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে সে বিষয়ে ত কোনই সন্দেহ নেই। তবে যদি সাহিত্যিকরা বলেন যে আমাদের নব-পলিটিক্সের সকল সূত্র তাঁরা গ্রাহ্য করতে পারেন না, তাহলে আমি বলব যে সেই জন্যই ত তাঁদের মুখ খোলা দরকার। যে ব্যাপারের শুধু একটা কাজের দিক আছে কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবের দিক নেই—সে ব্যাপারের মূল্য অতি কম, ফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং আমার অনুরোধ বাংলাসাহিত্যিকরা বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দোলনের আলোচনা করুণ বিচার করুণ। এই জাতীয় জাগরণের দিনে জাতীয় মনটা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা তাঁরা করুণ। এই নব পলিটিক্সকে দার্শনিক দর্শনের দিক দিয়ে বিচার করুণ, বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ঐতিহাসিক ইতিহাসের আলোয় আর কবি কল্পনার সাহায্যে। সবুজ-পত্র সে আলোচনা সাদরে বরণ করে নেবে। আজ কাল বিদ্যার নিন্দা করা একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছে—কিন্তু এ ফ্যাসান চিরদিন থাকবে না। বিদ্যা অবিদ্যার উপর জয়লাভ করবেই। কেননা বিদ্যার অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু অবিদ্যার কোনই গুণ নেই। আর এক কথা। স্বরাজ আমরা সবাই চাই কিন্তু স্বরাজ লাভের সদুপায় সম্বন্ধে আমাদের ভিতর বিস্তর মতভেদ থাকতে পারে এবং আছে। সুতরাং ঐ উপায় সম্বন্ধে যাঁর যা মত, তাঁর তা প্রকাশ করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বর্ত্তমান কংগ্রেসী মত সমর্থন করার অর্থ যেমন পলিটিক্সে যোগ দেওয়া সে মতের প্রতিবাদ করার অর্থও তেমনি পলিটিক্সে যোগ দেওয়া। এবং আমার বিশ্বাস অনুকূল ও প্রতিকূল মতের সংঘর্ষেই একটা

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা

—:•:—

রোগশয্যায় শুয়ে "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" তিনদিন ধরে পড়ে কাল শেষ করলুম। ঐটুকু বই শেষ করতে অতদিন লাগ্‌ল, তার থেকেই বোঝা যায় যে সাধারণতঃ আমাদের পড়বার সময় কত কম। আর ঐ সময়ের মধ্যে যে শেষ করতে পেরেছি, সেও বল্‌তে গেলে রোগের কৃপায়। সুতরাং আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল যে মন্দের মধ্যেও ভাল আছে।

কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন যে নভেল হলে একদিনেই শেষ হত, এবং একটানা পড়বার জন্যে রোগের অবতারণা আবশ্যক হত না। কিন্তু নভেলের প্রতি,—তা' সে যেমনই নভেল হোক্,—বিশেষতঃ আমার এবং সামান্যতঃ শতকরা-একজন-শিক্ষিত বাঙ্গালী মেয়ের যে মনোগত পক্ষপাত আছে, সে দুর্ব্বলতা-দোষ স্বীকার করেও আমি মুক্তকণ্ঠে বলব যে, এ বই একবার ধরলে শেষ করবার ইচ্ছা নভেলের তুলনায় কিছু কম হয় না। অনেকদিন কোন বাঙ্গলা বই পড়ে এত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইনি, এমন মন খুলে অন্যের কাছে প্রশংসা করিনি। যদিও উপন্যাসক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে মুড়িমিছ্‌রির প্রতি সমান লোভ দেখাই বলে আমাদের সর্ব্বভুক্ বদ্‌নাম হয়ে গেছে, কিন্তু নিজের জাতবোনের সপক্ষে এবং সত্যের খাতিরে এটুকু বলতেই হবে যে, আমাদের সাহিত্য-রসাস্বাদনের ক্ষমতা এখনো একেবারে লোপ পায়নি। খারাপকেও ছাড়তে পারিনে বলেই প্রমাণ হয় না যে কোন্‌টা খারাপ কোন্‌টা ভাল, সে সম্বন্ধে আমরা জাত-অন্ধ।

স্বজাতির হয়ে এই অনাহূত কৈফিয়ৎ দানান্তে প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক্। সেটি সংক্ষেপে হচ্ছে এই যে, বইখানি আমার খুব ভাল লেগেছে এবং সেই ভাললাগাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছে হয়েছে, কেন জানিনে;—সম্ভবতঃ দানের বদলে প্রতিদান, এবং দশজনকে ভাল জিনিষের ভাগ দেবার সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায়।

বলছিলুম যে নভেল পড়ার চেয়ে এ বই পড়বার আগ্রহ কোন অংশে ন্যূন নয়; বরং এক হিসেবে ধরতে গেলে ঢের বেশি। কারণ নভেল যতই হাসায় কাঁদায়, যতই মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক সত্যের ছলনা করে, তবু মনের এক কোণে এ জ্ঞানটুকু লুকানো থাকে যে এ কথা সত্য নয়, এ লোক কাল্পনিক, এ ঘটনার উৎপত্তি মস্তিষ্কের কারখানায়। কিন্তু সত্য যখন কল্পনার বহুরূপ ধরে ও নানা রঙ ফলায়, তখনি মন যথার্থ বিচলিত হয়;—তবে এ মণিকাঞ্চন যোগ আমাদের দেশে দুর্লভ। কেননা আমাদের বেশিরভাগ লোকের জীবন বৈচিত্র্যহীন ও একই বাঁধা পথের পথিক। যদি জাতিকুল এবং আর্থিক অবস্থা জানা যায় ত কোন একজন বাঙ্গালীকে না চিনেও বোধহয় তার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লখিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। Mark Twain-এর এক দৈনিকলিপি শুনেছি "Got up, had breakfast, went to bed"—এই তিনটি মহৎ ঘটনার বিবৃতিতেই পর্য্যবসিত হয়েছিল! সেইরূপ আমাদের দেশে অধিকাংশ জীবনই জন্ম মৃত্যু বিবাহরূপ তিন মহা ঘটনার সমষ্টিমাত্র। বাঙ্গালীর জীবনে অর্থকষ্ট ভিন্ন অপর কষ্ট, অন্নচিন্তা ভিন্ন অপর চিন্তা, সাংসারিক সুখ ভিন্ন অপর সুখ, এবং পারিবারিক ঘটনা ভিন্ন অপর ঘটনা যে এমন হিল্লোল তুলতে পারে, সে কথা অপ্রত্যাশিত বলেই এমন

কৌতূহলোদ্দীপক ও আনন্দদায়ক। মাণিকতলার বাগানের খবর হয়ত আমরা কানাঘুষায় শুনতে পেতেও পারতুম, কিন্তু জেলের দরজা খোলা বা আন্দামানের রহস্য উদ্‌ঘাটন কি কোনকালে আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল?—সাধারণ পাঠকপাঠিকার পক্ষে জন্মান্তরগ্রহ ভিন্ন দ্বীপান্তরের গুপ্তকথা আপনাহতে জানবার কোন উপায় নেই। ছবিগুলি সব সময় উল্লাসকর না হলেও, অচেনা এবং অজানার মোহে মনকে যে টেনে নিয়ে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নরকের দ্বারেও উঁকি মেরে দেখ্‌তে ক্ষতি কি, যদি ভিতরে ধরে' নিয়ে যাবার ভয় না থাকে?—বিশেষতঃ এ নরক অনন্ত নয়, তাই ভীষণ হলেও অসহ্য বোধ হয় না। কবি বলেছেন দুঃখের সময় সুখস্মৃতির মত এমন পরমদুঃখময় আর কিছু নেই; সেই হিসেবে এও বলা যেতে পারে যে দুঃখ-অন্তে দুখ-স্মৃতির উদ্বোধনের মধ্যে একপ্রকার সুখ আছে। তা ছাড়া বইটি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী হলে হয়ত অপাঠ্য হত। কিন্তু এর মধ্যে এতরকমের এত ছবি, এত গল্প, এত তথ্য, এত বর্ণনা নদীর মত বহমান, যে তার স্রোতে দুঃখের জঞ্জাল কোথায় ভেসে যায়।

জেলে ত অনেকেই যায়, কিন্তু প্রথমতঃ যাবার কারণের পিছনে সব সময়ে সমস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয় থাকে না; এবং দ্বিতীয়তঃ যে যায় তার ভিতরে সব সময়ে বিশিষ্ট বাঙ্গালী মন থাকে না। এই দুই উপাদানের সমাবেশে বইখানি এমন মনোহর হয়েছে। ১৯০৫ শালের স্বদেশীয়ানার ঢেউয়ের তোড় কমে এলেও এখনো সম্পূর্ণ মরে' যায়নি—কালের অলিগলিতে এখনো তার প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা কেউ সে সম্বন্ধে অল্প কিছু জানি; কেউ

বেশি জানি; কিন্তু সকলেই ভিতরকার সব কথা জানবার জন্য উৎসুক। তাই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার পক্ষে বইটির বিষয়ই যথেষ্ট; তার উপরে লেখকের রচনানৈপুণ্য সোনায় সোহাগা। একটি সামান্য ঘটনায় লিপ্ত থাকবার অব্যবহিত পরে তার বিশদ ও সরস বর্ণনা লেখা কিরূপ শক্ত তা যখন ভেবে দেখা যায়, তখন এতগুলি বিভিন্ন বিচিত্র ঘটনা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল রেখে এতকাল পরে সেগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে, সুললিত ভাষায় ও সংযতভাবে লোকের কাছে যথাযথ প্রকাশ করা যে কত কঠিন কাজ—এবং সেটি অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করা যে কতটা মানসিক শক্তির পরিচায়ক, তা' সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। আর ইতিমধ্যের সেই সময়টি কিছু সুখশয্যায় শুয়ে, বা আরামচৌকীতে বসে', বা লেখাপড়ার চর্চ্চায় বুদ্ধিতে শাণ দিয়ে কাটেনি;—কেটেছে লোটাকম্বল হাতে তীর্থে তীর্থে ঘুরে, বা জেলের নির্জ্জন কুঠ্‌রীর অকথ্য কষ্টের মধ্যে বসে, বা আন্দামানের অপমানের কশাঘাতের জ্বালা সয়ে,—কেটেছে রোষে, ক্ষোভে, নিরাশায়, উৎকণ্ঠায়,—কেটেছে অর্দ্ধাশনে, অনশনে, প্রাণান্ত পরিশ্রমে, অসাধারণ যন্ত্রণায়। ১২।১৪ বৎসর এইরূপ জীবন যাপনের পর পাগল না হয়ে উল্টে যার হাত থেকে এইরকম বই বেরোয়, তার হাতের পিছনে যে মন আছে সে মন আমাদের নমস্য;—আমরা বল্‌তে এই ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব, যারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই, মশা মার্‌তে কামান পাতি; এবং আমরা বল্‌তে আধুনিক বাঙ্গালী, যারা স্বরাজলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই যে মনের স্বরাজ লাভ করাই বাইরে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান ও প্রথম সোপান। এই বই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ও বিশ্বাস

করবার সাহায্য করে যে, এই প্রত্যক্ষ জড়পিণ্ড গণ্ডগোলপূর্ণ বস্তু-জগতের অন্তরালে মন নামক একটি চিৎপদার্থ আছে, যা আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, আশা ছাড়ে না ও লক্ষ্য ভোলে না। "তিমির রাত্রি, অন্ধ যাত্রী, সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!" এ দীপ মানুষের মন ভিন্ন আর কি হতে পারে? যে দীপ সেই মহাপ্রদীপের একটি স্ফুলিঙ্গ, তাই এমন অনির্ব্বাণ-জ্যোতিষ্মান।

এই দীপের হাস্যোজ্জ্বল শিখাটি আমাদের বিশেষরূপে উপভোগ্য মনে হয়েছে। এ হাসি কোথা থেকে আসে? "ঘোর বিপদ মাঝে তুমি কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস?"—কে জানে। শুধু এইটুকু জানি যে সাহিত্যেই বল, জীবনেই বল, এই প্রাণ খুলে হাসবার ও হাসাবার ক্ষমতাটি অমূল্য নিধিবিশেষ। ইহলৌকিক ভাবে দেখতে গেলে, এই কড়িই আমাদের সুস্থিরভাবে ভবনদী পার হবার একমাত্র সম্বল। বাঙ্গালী জাত স্বভাবতঃ পরিহাস-রসিক ও আমোদপ্রিয় বটে, কিন্তু সে রসিকতা প্রায়ই ইতরতার কাছ ঘেঁসে যায়, এবং সে আমোদে সবলতা সরলতার ভাগ কমই থাকে। আত্মীয়স্বজন বাড়ীঘর ছেড়ে এসে, দেশব্রত অঙ্কুরে বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখে, জেলের ঐ লোমহর্ষণ গণ্ডির মধ্যে বাস করে, মকোদ্দমার অনিশ্চিত ফলের বিভীষিকা মাথার উপর ঝুলে থাকা সত্ত্বেও এ কয়টি বঙ্গসন্তান যে কি করে' মনে ঐ অদম্য স্ফূর্ত্তি রাখ্‌ত, কি করে এক পাল ছুটি-পাওয়া ইস্কুলের ছেলের মত দিনরাত কাটাত, তা ভাবলে আমাদের মত সাবধানী, সঙ্কুচিত, সশঙ্ক ব্যক্তির মনে সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদয় হয়! চতুর্থ পক্ষযুক্ত মোটা জেলার-বাবুর ব্যঙ্গচিত্র ও "ন্যাংরার" দলের মস্করাতে জেলের

অধ্যায় এমন ঝল্‌মল্‌ করছে যে, অনেক গৃহপালিত শাবকের বোধহয় সে-সময়কার কয়েদী হতে সাধ যায়,—অবশ্য "লপ্‌সি" প্রভৃতি দু'একটা দুঃস্বপ্ন বাদ দিয়ে! আন্দামান-অধ্যায় অপেক্ষাকৃত নীরস, তবুও অত্যাচারের মাত্রা কমবার পর তরকারী রাঁধবার চেষ্টাচিত্র প্রভৃতি অতি উপাদেয়। সকল অবস্থায় স্ফূর্ত্তির মত, সকল সময়ে লেখকের সংযমও একটি "অ-বাঙ্গালী" গুণ বলে' মনে হয়। কোথায়ও হাহুতাশ, মর্ম্মোচ্ছ্বাস, অবান্তর বাক্যবিলাস বা অহমিকার লেশ নেই; সব বর্ণনাগুলি একটি প্রশান্ত স্মিতহাস্যে মণ্ডিত, গল্প কোথায়ও দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ে না বা ভারি বোধ হয় না,—হাল্কা পায়ে সমতালে গন্তব্য পথে ছুটে চলে। সে পথ কোথায়ও হাস্যকিরণে উজ্জ্বল, কোথায়ও করুণরসে সজল, কিন্তু কখনই ভাবাতিশয্যে ফেনিল বা কটুকাটব্যে পঙ্কিল নয়। এ বইয়ের একটি মহৎ গুণ এই যে তা নিঃসঙ্কোচে আবাল-বৃদ্ধবনিতার হাতে দেওয়া যায়, ও নির্ভয়ে পারিবারিক মজ্‌লিসে চেঁচিয়ে পড়া যায়। অনেক শ্রুতকীর্ত্তি লোকের নিকটতর পরিচয় পাওয়াও লাভের মধ্যে গণ্য; বিশেষতঃ কানাইলালের কঠোর পৌরুষ ও কঠোরতর দণ্ড মন থেকে শীঘ্র মুছে যাবার নয়। এই প্রকৃতির ছেলে যখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করবে,—এমনি নির্ভিক, নির্লিপ্ত, বিনয়ী ও সদাপ্রফুল্ল,—এমনি উচ্চমনা, সুস্থশরীর, একনিষ্ঠ ও শ্রমশীল,—তখনই বুঝ্‌ব যে আমাদের স্বরাজের স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, এখনকার মত সুদূরপরাহত নয়। "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" নব মেঘদূতের ন্যায় আমাদের অধীনতাকাতর চিত্তে স্বাধীনতা-অলকার সুসম্বাদ বহন করে' এনেছে।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

কবি মধুসূদন

(১)

মোরা শুধু শিখেছিনু ভালবাসাবাসি
কুসুমিত উপবনে ; বামা-কণ্ঠ ধরি',
তারি অঞ্চলের মাঝে সুখের প্রত্যাশী,
আলস্যে সোহাগে দিতে জীবনেরে ভরি'
আরো মোরা শিখেছিনু হৃদয়ে সতত
জাগায়ে তুলিতে শুধু করুণ কোমল
সঙ্গীতের সুরধারা ; আপনা-বিহ্বল
ফুটিয়া রহিতে শুধু কুসুমের মত।
তুমি আসি' জ্বালাইলে হোমাগ্নির শিখা,
হে স্বর্গীয় বীর কবি ! হে মধুসূদন !
এ-বঙ্গ-আকাশ-ভালে পরাইলে টীকা
বীরত্বের,—নিনাদিয়া গম্ভীর বচন
বজ্রকণ্ঠে, আলস্য জড়তা করি দূর,
দেখাইলে অন্তরের নব অন্তঃপুর।

(২)

যেথা শুধু ব'য়ে যেত মলয় সমীর,
তুমি সেথা ছুটাইলে ভীম প্রভঞ্জন

কাদম্বিনী-নাদে, যত সোহাগ-স্বপন
নিমেষে ধাঁধিয়া দিল শিখা দামিনীর।
হোক্ আজি নির্ব্বাসিত কুঞ্জ-গেহ হতে
বাঙ্গালার কণ্ঠে যত আধ-আধ ভাষা
প্রণয়ের সোহাগের,—রক্ত-লিখা-স্রোতে
তব বীরগাথা হৃদে নাচাক্ দুরাশা!
"গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী",
তেমনি এ বাঙ্গালার ক্লিষ্ট খিন্ন হিয়া,
বাজায়ে মরণ-বাদ্য, চমকি দামিনী,
ছুটুক দুরাশা পানে ভীম নিনাদিয়া :—
তুমি দেব ঊর্দ্ধ হ'তে নেহারী পুলকে,
গাহ পুনঃ নব গীতি আনন্দ-আলোকে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিদ্রোহী

——:*:——

এসেছি আবার—
স্মৃতির কঙ্কালধরা রুদ্র কাপালিক,
[illegible] পেয়ে নব-সুরা-পাত্র বেদনার।
যাও সামাজিক
কপোত, আনন্দশস্য-সমাকীর্ণ নীড়ে,
কূজিতে প্রেমের সৌধে ভক্তি সনাতন ;
যাবে না সে ভিড়ে,
বজ্রচঞ্চু এই শ্যেন—সর্পের মতন
বিশ্বাস-বিবরে ঢুকি, নিদ্রা-সুখলীন
মুষিকের গায়
ঢালিবেনা নিজ তীব্র গরল মলিন,
ভাগ্যের শোণিত হতে মথিত হিংসায়।
কারে হিংসা করি ?—
জানিনা ; চিন্তার ফণা করিয়া বিস্তার
নিষ্ফল আক্রোশে শুধু খুঁজে খুঁজে মরি।
নাহিক নিস্তার,
বিশ্ব-রচনার মূল শূন্য যদি হয় ;
আমারি বিষেতে শূন্য হয়ে যাবে নীল।

নাহি মোর ভয়,
লোকালয়-জাত কুণ্ঠা, সান্ত্বনা ফেনিল,
শাস্ত্রের পরিখা-বদ্ধ ধারণা দুর্জ্জয় !
আমার নিশান,
চক্ষেতে দুর্ব্বার জ্বালা বিদ্যুদগ্নিময়,
বিকট ভৈরব রবে বাদিত বিষাণ
উন্মাদ অধরে,
তাম্র পলাশের মালা কণ্ঠে, লেলিহান্
সংশয়ের জিহ্বা সম,—মুষ্টিত এ করে
দুর্জ্জেয় বিধান।
নিয়মে, কৌশলে, প্রেমে যা-কিছু বিশ্বাস,
ফুৎকারে উড়িয়া যাক্—পাপিয়ার তান,
মলয় নিঃশ্বাস
মৃদুল বিষাদপূর্ণ, করিবনা দান।
আসি নাই দিতে কলহাস্যের নির্ঝর
প্লাবন-মুখর,
কিম্বা দিতে শরতের শুভ্ররুচিসার
শেফালি সম্ভার—
এসেছি অবজ্ঞা দিতে, আর পরিহাস,
—মিথ্যা হোক্ নাশ !

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক।

ওঁ

দরিদ্র-নারায়ণায় নমঃ

—:*:—

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত 'সবুজ-পত্র' মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

বাংলার সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিকগণকে বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দোলন আলোচনা করবার জন্য আপনি 'সবুজ-পত্রে' আহ্বান করেছেন দেখে আনন্দিত হয়েছি। দলাদলির জন্য বিখ্যাত আমরাও মাতৃপূজার সময় হয় ত একটি শতদলে এবার পূজা করতে পারব।

আপনার নিমন্ত্রণ পত্রে একটা ত্রুটী আমার চোখে পড়েছে। বাংলার হাজার অধিবাসীদের মধ্যে নয় শত নিরনব্বই জন দরিদ্র; একমাত্র এই সম্প্রদায়েই জাতিভেদ নেই; কেননা এর মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, ক্রিশ্চান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং নিরক্ষর কৃষকও আছেন। আপনি কি তাঁদের বাদ দিয়েছেন।

তা নয়; প্রাণের ব্যাকুলতায়, বেঁচে থাক্‌বার চিরন্তন চেষ্টায় দরিদ্র যখন সবুজ-পত্রে আত্ম প্রকাশ করবেন, তখন তিনি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক কিম্বা অন্য যা হয় একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।

দরিদ্রগণ অসাম্প্রদায়িক বলেই জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখ্‌তে পারেন না—এটা politics, ওটা metaphysics, আর একটা sociolgyএ জ্ঞান তাঁদের নেই; কেন না তাঁরা রাত্রিদিনই Reality-ইর মধ্যেই বাস করেন। তাদের তরফ হতে স্বরাজ সম্বন্ধে যদি কিছু আলোচনা করি, আশা করি আপনি সাদরে গ্রহণ করলেও করতে পারেন।

বাংলার প্রায় সকল মাসিক পত্র কেন নীরব জানি না; দরিদ্র-গণ এই জন্য নীরব যে আজ পর্য্যন্ত কেউ তাঁদের মায়ের প্রতিমা দেখবার জন্যে আহ্বান করেন নি; পাঁচ, দশ, পনর, কুড়ি টাকা তাঁরা কোথায় পাবেন? এক মাসের মজুরী; মনুষ্যত্বের বিনিময়ে।

পূর্ব্বে এই আশ্বিনমাসে মহামায়ার পূজায় তাঁদেরও আসন সুনির্দ্দিষ্ট এবং সম্মানের ছিল এখন পৌষমাসের মাতৃপূজায় একমাত্র তাঁদেরই স্থান নেই যাঁরা সংখ্যায় হাজারের মধ্যে নয় শত নিরনব্বই জন এবং শক্তিতে এত বড় ব্যুরোক্রেসী-যন্ত্রটাও কাঁধে করে রাখ্‌তে পারে। এ কেমন মাতৃপূজা? এ কেমন ডিমোক্রেসী? ডিমোক্রেসী তাঁদের কাছে প্রচার করতে যাওয়া বাহুল্য, তাদের সকলেরই দেহ একই রকমের অস্থিচর্ম্মসার।

স্বরাজ শব্দটির অর্থ নিয়ে আজ পনর বৎসর যথেষ্ট বাদানুবাদ চলেছে। শব্দটি একে সংস্কৃত, তাতে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল একজন পার্শির মুখ দিয়ে, যিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান লাভের পথ কখনো অবলম্বন করেন নি; শব্দটি প্রথম আঘাত করল বাঙালীর হৃদয়ে যাঁরা হৃদয়ের আবেগের জন্য প্রসিদ্ধ। শত শত বাঙালী কংগ্রেস

হতে বার হয়ে সমস্ত বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে স্বরাজের ব্যাখ্যা করতে থাকেন; শেষে দাঁড়িয়েছিল স্বরাজ আর কিছুই নয় আমার রাজত্ব। কংগ্রেসে দলাদলি পেকে উঠ্‌লেও পাছে দুখান হয়ে যায় এই আশঙ্কায় বাংলা সংযত হয়ে গেলেন, কিন্তু বোম্বায়ের গৃহবিচ্ছেদে সুরাটে দক্ষ যজ্ঞ হয়ে গেল; তখন বাংলার পোলিটিসানগণ কবির শরণাপন্ন হলেন; কবি একটা বস্তু দেখিয়ে দিলেন; একটা রফা চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে হয়ে গেলে; কিন্তু বাক্য নিয়ে যাঁরা জীবন কাটাতে পারেন তাঁরা প্রয়াগে সমবেত হয়ে স্বরাজের একটা বেড়া-দেওয়া মানে করলেন; আবার দলাদলি আরম্ভ হল; চরমপন্থীগণ কংগ্রেস হতে ছিট্‌কে পড়লেন, এইভাবে কিছুদিন কাট্‌ল। আনি বেশান্ত হোমরুলের ধ্বজা তুলে দেওয়া মাত্রই ভারতবর্ষের নবীন-যুবক-মন জেগে উঠ্‌ল; প্রবীণেরা আপত্তি তুল্‌লেন; নবীনের হৃদয়ের আবেগের সম্মুখে তাঁদের আপত্তি ভেসে গেল; 'হোমরুল' কংগ্রেস থেকে প্রচারিত হল; কিন্তু ইংরাজি শব্দটায় ভারতের মন তেমন খুসি হল না; রাউলেট এ্যাক্‌ট, পাঞ্জাবের ব্যাপারে লোকের মন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল অমনি কংগ্রেস থেকে মহাত্মা গান্ধী আবার প্রচার করলেন স্বরাজ। পনর বৎসর পরে স্বরাজ নবীন যুবকের দিব্যকান্তিতে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু দরিদ্রগণ জিজ্ঞাসা করেন বস্তুটি কি! টাটা কোম্পানীর কারখানায়, দিশী লোহায় দিশী মিস্ত্রীদের হাতে গড়া, দরিদ্রদের চিরদাস করে রাখ্‌বার একটা যন্ত্র নয় ত! বারমিংহামে তৈরী যন্ত্রের ভার বইতে তাঁদের শ্রী, স্বাস্থ্য, সহজ জ্ঞান, আনন্দ, আত্মসংযম

ত গেছে; তার স্থানে এসেছে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, অবিশ্বাস, ইত্যাদি।

স্বরাজ মানে কি যে-যন্ত্রটি ইংরাজ, ভারতবাসী stokerএর সাহায্যে পরিচালনা কচ্চেন সেই যন্ত্রটি, সুধু পরিচালকগণ সকলেই ভারতবাসী হবেন?

তাই যদি হয় তা হলে দরিদ্রদের তাতে কি লাভ! বরং ভয় করবার যথেষ্ট কারণ আছে; কেন না যন্ত্রটি একে বিদেশী; ক্রমশই তার নূতন নূতন ধারাল দাঁত (নূতন নূতন রাজ কর) দরিদ্রদেরই বুকে বিঁধ্‌তে থাক্‌বে। সেটাকে খাড়া রাখ্‌বার মূল্য তাঁদেরই দিতে হবে; এই মূল্যের নাম মনুষ্যত্বের দাবী ত্যাগ করে চিরদাসের মধ্যে গণ্য হওয়া।

এই জন্যই, যন্ত্রের নাম শুন্‌লেই দরিদ্রগণ শিউরে ওঠেন। দরিদ্রগণ চাইছেন যন্ত্র নয় যন্ত্রীকে; ছায়া নয়, সত্যকে। বাংলা নীরব কিন্তু এ নীরবতার কারণ ঔদাসীন্য নয়, আপনারও সেই বিশ্বাস দেখে আমার বিশ্বাস দশগুণ বেড়ে গেছে; এ নীরবতার কারণ বস্তু নির্ণয়ের জন্য মনকে বাইরে ছুটে বেড়াতে না দিয়ে ধরে রাখা; আরও যে অন্য অন্য কারণ নেই তা নয় কিন্তু সেগুলি বল্‌তে গেলে দলাদলির সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে বস্তু নির্ণয়ের ব্যাঘাত ঘট্‌বে এই জন্যও বটে বাংলা নীরব, কিন্তু নিশ্চেষ্ট নয়। যে সকল রুদ্র-ভাব বিচ্ছেদ ঘটায় সে সকল সংযত এমন কি নির্মূল করবার দক্ষতা বাঙালী দেখাচ্ছেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বে ত্যাগের পরিমাণে কথাই বেশি বল্‌তেন এখন যতই ত্যাগ করছেন, ততই নীরব হয়ে পড়চেন। বাংলাই ভারতবর্ষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন, এখন বিদেশীকে আত্মসাৎ

করবার কৌশল বাংলাই ভারতবর্ষকে শেখাবেন। বাংলা নিশ্চেষ্ট নহেন। ভারত-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম এই বাংলাতেই, স্বরাজও প্রতিষ্ঠিত হবে প্রথম বাংলাতে।

বারমিংহামের কলে তৈরী যন্ত্রে মরার চেয়ে, টাটা কোম্পানীর কারখানায় তৈরী কলে মৃত্যু ঘট্‌লে ভাল স্বর্গ হবে এ আশ্বাস দরিদ্রগণকে এ যুগে দেওয়া বৃথা। মধ্যযুগের এ সব ঘুম পাড়ানীর গান আর কি এখন কেউ শুন্‌বেন?

আমার মনে হয় বাংলার মনীষিগণের হাতে এই একটা কাজ রয়েছে; দরিদ্রগণকে বাক্যে নয়, ব্যবহারের দ্বারা, তাঁদের মনুষ্যত্বকে যন্ত্রের অধীনতা হতে স্বাধীন করে দেবার ব্যবস্থায়, দরিদ্রগণকে প্রত্যহ বুঝিয়ে দেওয়া যে স্বরাজ কোন যন্ত্র নয়; কিন্তু একটি উপলব্ধি।

কিন্তু এ কাজ তিনিই করতে পারবেন যিনি অন্তরের সঙ্গে বলতে পারবেন "হে আমার দারিদ্র-দেবতা, আমি এসেছি আজ তোমার সেবা করতে জ্ঞানে জ্ঞানী, প্রেমে প্রেমিক, কর্ম্মে দক্ষ হয়ে"। মূর্খের, স্বার্থপরের, নিষ্কর্ম্মার স্থান স্বরাজে নেই।

দরিদ্রগণ আজ কোথায় এসে পড়েছেন? চির দাসত্বে! তাই প্রভু যে ভাষা লিখ্‌তে বলবেন, যে রকম পরিচ্ছদ পরতে আদেশ করবেন, যখন যেখানে যে ভাবে বসিয়ে কিম্বা দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বেন দরিদ্র দাসকে মাথা নীচু করে তাই করতে হবে; এমন কি চিন্তা করবার স্বাধীনতা যা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার এবং সখ্য, বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবের অনুশীলন যা সৃষ্টিতে একমাত্র মানুষেরই মনে আছে তাও দরিদ্র দাসের নেই;

তাই মনে হয়, দরিদ্রগণ চাইছেন একটা প্রকাণ্ড, এডেন হতে ডিব্রুঘড় ব্যাপী যন্ত্র নয়, যার পরিণামে জগজ্জননীর প্রতিনিধি রমণীও তাঁর নারীত্ব স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়েও তুঃখিত হয়েন না, দরিদ্রগণও তাঁদের মধ্যে করুণাময়ীর প্রকাশ দেখ্‌তে পান না; তাঁরা চাইছেন এমন একটি সত্যবস্তুর সাধনা যার পরিণামে তাঁরা রূপ, যশ, জয় নিজের তুখানা হাতের ব্যবহারে পেতে পারেন। তাঁরা কোনো কালেই অলস, কর্ম্মে বিমুখ নন; কিম্বা মন ঝিমিয়ে পড়ে যে সব আমোদে তার পক্ষপাতীও নন। তাঁদের কাঁধের শক্তির উপরই না ব্যুরোক্রেসী যন্ত্রটা মাথা উঁচু করে রয়েছে। আপনি যা পূর্ব্বে বলেছেন—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি" দরিদ্রগণের ইহাই প্রার্থনা বটে কিন্তু তু একজন অত্যন্ত দরিদ্রদের সত্যনিষ্ঠা দেখে মনে হয়েছে তাঁদের আর একটা প্রার্থনা আছে—

তনয়ে তার' তারিণি।

স্বরাজ আন্দোলনটি কি এখন পোলিটিকাল গণ্ডীর ভিতরেই আছে! আমার সন্দেহ হয়; কেন না সকল দেশের পলিটিক্‌সই

রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্ব্বাঙ্গভূষণা
রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা
রক্তদন্তিকা

দেবীর পূজা অল্প বিস্তর করে থাকে। কিন্তু স্বরাজ লাভ করতে হবে বিন্দুমাত্র রক্তপাত করে নয়; নন্‌ভায়োলেন্‌ট। এই নন্‌ভায়োলেন্‌ট মন্ত্র যে মনীষি প্রচার করেছেন, সেই মহাত্মা গান্ধী যে আরও একটু এগিয়ে শীঘ্রই বলবেন প্রেম, ভক্তি, মানুষকে যন্ত্রের শাসন হতে

উদ্ধার করবার জন্যে চাই মানুষের সহিত সহযোগিতা; ইহা আমরা অনুমান করতে পারি। বাংলার এবং ভারতবর্ষের মনীষিগণ মহাত্মা গান্ধীর নিকট হতে এ দাবী করছেন; আমাদের আশা আছে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন এই আস্তিকতার দিকটা আগামী কংগ্রেসে সুস্পষ্ট করে তুলবেন।

কেন না, তাঁরা জানেন আত্মা তাঁর স্বভাবে নির্গুণ, নির্বিকার হলেও প্রকাশের সময় সগুণ, স-অবয়ব মানুষের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকেন। দরিদ্রের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে আমরা যত নিরীহ ভাবি, ইতিহাসে দেখা যায়, যে তিনি সত্যই তত নিরীহ ন'ন। মনুষ্যত্ব হতে বঞ্চিত করে, বেশি মজুরীর লোভ দেখিয়ে রাম শ্যামের মুখ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু দ্বাদশসূর্য্যের তেজও যে-আত্মার তেজের কাছে কিছুই নয় সেই আত্মার আবির্ভাব বন্ধ করা ত যন্ত্রের মালিকের এলাকার বাহিরে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও আত্মার বাহিরে নন। ঐ আত্মার আবির্ভাবে এই সেদিন য়ুরোপ থেকে মধ্যযুগের শেষ চিহ্ন তিন্ তিনটে জাঁকাল যন্ত্র চুরমার হয়ে গেল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে এখনও আছে মাথা উঁচু করে তার কারণ ইংরাজের সঙ্কল্পে দৃঢ়তা এবং ভারতবাসীর আত্মত্যাগ। যে ভারত আত্মত্যাগের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি যে লোকক্ষয়কর্ত্তা কালরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন না তার স্থিরতা কি? এখন আমাদের স্বার্থ যেন কাল রূপে প্র[illegible] আনন্দরূপে, অমৃত রূপে প্রকাশ [illegible] হবে প্রেমে, সেবায় ভক্তিতে; যন্ত্রের সাহায্যে নয়, যন্ত্রীগণের সহিত সহযোগীতায়।

'সবুজ-পত্রের' এতে ভয় পাবার কিছুই নেই বরং আশা করবার অনেক আছে। যদি সত্যের কাছাকাছি গিয়ে থাকি, তা হলে চিঠিখানি প্রকাশ করে বাধিত করবেন; দরিদ্রদের অভয় দান করবেন। ইতি—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

উড়ো চিঠি

—•••—

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১।

চিনু—

বার বার তুমি আমাকে আঘাত করতে পেরেছ বলেই যে আমি তোমাকে বড় বলে' মান্‌ব তা নয়। গত পাঁচ ছ বছরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আওতায় কোন কোন ইংরেজ আমলাও আমাদের আঘাত করেছে কিন্তু তাই বলেই এ-কথা মান্‌ব না যে ইংরেজ জাতি আমাদের চাইতে বড়। অবশ্য তুমি এ-কথার উত্তরে প্রশ্ন করবে যে তবে কি ব্রিটিশ নেশন আমাদের চাইতে ছোট। যে-নেশনের দু' চার লাখ লোক আমাদের তেত্রিশ কোটী নর নারীকে হাতের মুঠোর মধ্যে দেড় শ' দু' শ' বছর রাখতে পেরেছে তারা যে আমাদের চাইতে ছোট এ-কথা মনে করতে হ'লে যে-রকম আধ্যাত্মিক সাল্‌সা উদরস্থ করা দরকার সে-রকম আধ্যাত্মিক সাল্‌সাকে আমি চিরকাল এড়িয়ে এসেছি। যে আধ্যাত্মিক সাল্‌সা মানুষের কর্ম্ম করবার রোখ বাড়ায় না কেবল কল্পনা করবার ঝোঁক বাড়ায় তেমন আধ্যাত্মিক সালসার প্রতি আমার কোনদিন অনুরাগ ছিলও না আর কোনদিন যে সে-অনুরাগ হবার সম্ভাবনা আছে তা-ও নয়। আত্ম-প্রতারণার আরাম পেতে হ'লে যতখানি অন্ধ সাজা দরকার ততখানি অন্ধ আমি কোন দিনই সাজ্‌তে পারি নি। জীবনের বিচিত্র প্রকাশে যা সার্থক হ'য়ে ওঠে না তার প্রতি আমার প্রাণের টান

কোনদিনই নেই। আমার বিশ্বাস জীবন আছে প্রকাশের জন্য নির্ব্বাণের জন্য নয়। জীবনের এই ধর্ম্মই আমার কাছে সবার চাইতে বড় আধ্যাত্মিকতা। এ-থেকেই বুঝতে পার যে যে-ইংরেজের কর্ম্ম ও চিন্তা সারা জগতে ছড়িয়ে গিয়েছে, যাদের জীবনের প্রকাশ অনিবার্য্য হ'য়ে চারিদিকে ফুটে উঠেছে সে-ইংরেজ আমাদের চাইতে ছোট এ-কথা মনে করবার মতো মনের ভঙ্গী আমার নয়।

তবে আমার শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে ইংরেজ জাত আমাদের চাইতে বড় কিন্তু সেটা তারা ঐ আঘাত করতে পারে বলে' একেবারেই নয়। বরং আমাদের মতো দুর্ব্বলকে তারা যে পরিমাণে আঘাত করেছে ও করবে ঠিক সেই পরিমাণেই তারা ছোট হয়েছে ও হবে। এ-কথাটাকে শুধু দুর্ব্বলের সান্ত্বনা বলে' ধরে' নিও না। ওর পিছনে এমনি একটা অনিবার্য্য সত্য আছে যার হিসেব দু' এক দিনে খুব বড় না হ'তে পারে কিন্তু দু' দশ বছরে বিশ ত্রিশ বছরে তা চোখে পড়বেই।

এ-কথাটা সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য যে তুমি ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে আমাকে আঘাত করেছ কি না তা আমি জানিনে সুতরাং সে-অভিযোগও আমি তোমার বিরুদ্ধে আনতে পারিনে কিন্তু আঘাত যে একটার পর একটা করে' আমি পেয়েছি তাও ঠিক। তুমি ইচ্ছে করে' যে সে-সব আঘাত করনি তাতে যে তার বেদনা কিছু কম তীব্র ও কম নিষ্ঠুর হয়েছে তা নয়। এত কথা যে তোমায় আমি আজ বলছি তার কারণ আজ আমার কোন দুঃখ নেই ক্ষোভ নেই—বরং ও ব্যাপারের লাভের দিকটাই আজ আমার চোখে পড়ছে। যে-দুঃখের বোঝা পাহাড় হয়ে বুকে মেরেছিল

যে-বেদনা অশ্রু-সাগর হ'য়ে দু'চক্ষু অন্ধ করে' তুলেছিল তাও ত গেল। কিন্তু তা রেখে গেল এমন একটা মঙ্গল যা হাজার হাসি গানের ভিতর দিয়ে লক্ষ হ'তে সহস্র যুগেও পারত না। তাই আজ ভাবি যে আঘাত না পেলে—দুঃখের আঘাত না পেলে—মানুষ মানুষ হয় না। দুঃখই মানুষকে আত্মস্থ হ'তে শেখায়—নিজের অন্তরের দিকে ফেরায়। তোমার দেওয়া আঘাতের পর আঘাতে আমাকে সেই দিকেই ফিরিয়েছে। এত বড় একটা মঙ্গল তুমি আমাকে দান করেছ। তাই আজ আমি তোমাকে আমার আন্তরিক নমস্কার জানাচ্ছি।

আজ আমার মনে পড়ছে সে-দিনের কথা যে দিন তুমি নৌসেরাতে আমাদের মাঝে গিয়ে পড়লে। আমরা তিনজন হাবিলদার লেফ্‌টেনাণ্ট্ রায়ের সঙ্গে messing করবার অনুমতি পেয়েছিলুম। লেফ্‌টেনাণ্ট্ রায়ের সঙ্গে আমাদের তিন হাবিলদারেরই কলেজ-অবস্থা থেকে পরিচয়—আমার সঙ্গে তার একটু বেশী ও বিশেষ বন্ধুত্বই ছিল। আমরা একটা ছোট্ট বাড়ী পেয়েছিলুম, সেই বাড়ীতে আমরা চারজনে থাক্‌তুম। তুমি সেইখানে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে না হলেও—যুদ্ধক্ষেত্রের নেপথ্যেত বটে, অসংখ্য গোলাগুলির মাঝে অবিরাম বারুদের গন্ধের মাঝে, সকাল সন্ধ্যে কুচ-কাওয়াজের মাঝে, মানুষকে হত্যা করবার জন্যে তৈরী-হবার সাধনার মাঝে গিয়ে উদয় হয়েছিলে একেবারে ভগবানের সহজ কৃপাশীর্ব্বাদের মতো। আমার কি মনে হয়েছিল জান? মনে হয়েছিল যেন দুরন্ত মরুভূমির লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী শুষ্কবক্ষ বালুকণার হৃদয় বিদীর্ণ করে' হঠাৎ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আকাশে উঠে আপনার নিবিড় সুশীতল ছায়ার মায়া-

অক্ষর দিয়ে যেন চারিদিকে ঘিরে দিলে। সহস্র সহস্র লোক এখানে মর্‌বার জন্যে মারবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কি শৌর্য্য, কি বীর্য্য, কি গৌরব! কিন্তু ওর যেন কিছুই সহজ নয় স্বতঃ নয়। সবার চোখেই যেন কি একটা সঙ্কোচের রেখা অস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে আছে। বাইরের শত ঝন্‌ঝনা শত মূর্চ্ছনা কিছুতেই সেটাকে মুছে ফেল্‌তে পারেনি। সেই সহস্র সহস্র শক্তিমান শোণিতাকাঙ্খীর মাঝে তোমার উদয় যেন একটা তুর্নিবার সহজত্ব নিয়ে—একটা তুর্ব্বার কৃপাপরশ নিয়ে—মূর্ত্তিমান শুভ্রতা ও শুচিতা নিয়ে। যেন লক্ষ লোকের কোষের তরবারী ও কাঁধের বন্দুকের লজ্জা আর সেদিন আত্মগোপন করে থাক্‌তে পারল না। যেন উত্তোলিত রুদ্র খড়্গের কোপের সাম্‌নে বিস্তৃত হল ক্ষুদ্র শিশুর ফুলের মতো কচি অকল্যান-জ্ঞানহীন হাত তুখানি। উত্তোলিত খড়্গ নাম্‌ল বটে কিন্তু সে হিংসায় নয় রোষে নয়—লজ্জায় ও অশ্রুধারায়।

আমি স্বেচ্ছায় যখন সৈনিক হয়েছি তখন যুদ্ধ ব্যাপারটার প্রতি যে আমার আন্তরিক অনুরাগ একটুকুও নেই এ-কথা সত্য করে' বলা চলে না—এবং ঐ কারণেই মানুষ হত্যার প্রতি যে আমার ভীষণ বিরাগ আছে তা বলেও শপথ করা চলে না। কিন্তু সেদিন নৌসেরাতে তোমার আবির্ভাবে যে-সব ভাব আমার মনে প্রাণে উদয় হয়েছিল সে সবও যে একেবারে মিথ্যারই কুহক এ-কথাও ত মান্‌তে পারলুম না। আজকাল পৃথিবীতে জাতি-মণ্ডলীর যে-অবস্থা তাতে সমাজের জন্য অস্ত্রধারণ যত প্রয়োজনীয়ই হোক্ না কেন, মানুষের সবার চাইতে বড় আনন্দলাভ ত অসুরত্বের ভিতর দিয়ে নয়। এই যে জগতব্যাপী লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বুভুক্ষিত

নরনারী—যাদের ধন আছে জন আছে সম্পদ আছে বিভব আছে তবুও যারা বুভুক্ষিত—তাদের এ-ক্ষুধা মিট্‌বে কি কেবল হত্যায় ও হরণে ? নৌসেরাতে সেদিন তোমার আবির্ভাবে দুটী ছবি আমার চোখে পাশাপাশি ফুটে উঠ্‌ল—একটা রুদ্রের তাণ্ডব নর্ত্তনের মতো, যেন আপনার অশান্তিতে আপনি পীড়িত—আর একটা শান্ত সমাহিত আত্মবান সৌন্দর্য্যের মহিমা—যা নিজের মধ্যেই নিজেকে সার্থক করে' তুল্‌ছে। আমার সৈনিক-জীবনকেও ঐ শেষের ছবিটীই আকর্ষণ কর্‌লে। এতকাল আমি রুদ্রের ভ্রূকুটীর সামনেও শির উন্নত করেই চলেছিলুম কিন্তু ঐখানে আমি অন্তর নত না করে' পারলুম না। এ নত-হওয়া ত আমাকে অপমান দিয়ে আবৃত করল না—আমাকে মণ্ডিত কর্‌ল আনন্দের মহিমা দিয়ে।

তাই সেদিন আমি অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা বারুদের গন্ধ ইত্যাদির মাঝে থেকেও এমন একটা জগতের সন্ধান পেলুম ও সত্ত্বা অনুভব কর্‌লুম যে-সত্ত্বা রুদ্রের সত্ত্বার চাইতে কত বড় ও কত বেশী সত্যময় সৌন্দর্য্যময় ও আনন্দময়। আমার মনে হ'ল সারা বিশ্ব যদি ঐ জগতে উঠে যায় ঐ সত্ত্বায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায় তবে সেটা বিশ্ব-মানবের যে কি মহান লাভ সেটা অঙ্ক কসে' দেখান যায় না। তবে সেটা কোনদিনও ঘট্‌বে কি না তা কেবল এক সেই পরম লীলাময়ই জানেন।

তুমি বাঙালীর মেয়ে, নারী-সংস্পর্শ-শূন্য পুরুষের জীবন-যাপন-ইংরেজিতে যাকে বলে Bachelor's life—তা দেখ্‌বার সুযোগ তোমার কোনদিন হয় নি। কেননা ঐ Bachelor বলে' জিনিসটী বাঙালীর সমাজে বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কারণ ওখানে

সবাইকে বিয়ে করতেই হবে—এবং সবাই বিয়ে করেও থাকেন তা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের সামর্থ্য থাক্ আর নাই থাক্। কিন্তু ঐ যে আমরা তিনটী হাবিলদার তোমার স্বামির সঙ্গে নৌসেরাতে এক বাড়ীতে থাকতুম সেখানে আমরা যেভাবে দিন কাটাতুম সেটা ছিল এই রকম একটা ব্যাপার যে-ব্যাপারটা ডন্-কুইকসোটের সঙ্গে পিক্উইকের এবং ঐ দুয়ের সঙ্গে Three musketeersএর Heroকে মেশালে যা দাঁড়ায় তাই। চার মাসের ছুটীতে আমরা ছিলুম military deciplineএর বাইরে—আর তখন আমাদের ছিল "ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর" "রাত কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি"—অবস্থা। খাওয়া ঘুমোনো ব্যাপারগুলো হ'য়ে উঠেছিল এম্নি বেহিসেবী যে তাকে devil's delirium ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বঙ্কিম শান্তির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে হরে মুরারে"—আমাদেরও তখন ছিল ঐ কথা "এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?" কিন্তু তার পিছনে ছিল না ঐ "হরে মুরারে।" জীবনের রাশ এমন করে' নিশ্চিন্ত হয়ে অনিশ্চিতের মাঝে ছেড়ে-দেবার সুযোগ ও প্রবৃত্তি আর কারো কোথাও হয়েছে কি না জানিনে যেমন হয়েছিল আমাদের এবং আমরা সে-সুযোগের একটুও অসম্মান করিনি। এই রকম যখন আমরা চারজন আমাদের জীবনকে উধাও করে' ছেড়ে দিয়ে বসে' ছিলুম তখন তুমি আমাদের সেই অশান্ত উদ্দাম লীলার মাঝে উদিত হ'লে একেবারে মূর্ত্তিমতী শান্তির মতো।

তোমার আবির্ভাবে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলুম যে আমাদের ভিতরে এবং বাইরে কেমন একটা সহজ সংযম ও শিষ্ট শৃঙ্খলা জেগে উঠ্ল—যে-সংযম যে-শৃঙ্খলার জন্যে আমাদের কারো কোন কষ্টও

করতে হয় নি কৃচ্ছ্র তাও করতে হয় নি। সেটা এমনি স্বতঃ হ'য়ে দেখা দিল যে মনে হ'ল আমাদের আগের জীবন ইতিহাসকে ছাড়িয়ে একেবারে প্রত্নতত্ত্বের অধিকারভুক্ত হ'য়ে পড়েছে।

তাই আমার মনে হয় যে পুরুষ হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের এনার্কিষ্ট—এনর্কিজম্ তার গিঁঠে গিঁঠে স্নায়ুতে স্নায়ুতে উদ্দাম চাঞ্চল্য নিয়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে—আর নারী হচ্ছে তার প্রতিষেধক। পুরুষ যেন বর্ত্তমানকে ভোগ করতে চায় তার সর্ব্বস্ব দিয়ে কিন্তু নারীকে যেন ব'য়ে চলতে হচ্ছে অতীতের সমস্যা ও ভবিষ্যতের মীমাংসাকে। পুরুষের জীবনের যা-কিছু স্থায়ী তা সে লাভ করেছে নারীর সংস্পর্শ ও সংসর্গ গুণে। সন্ন্যাসীর অভাব নেই কিন্তু সন্ন্যাসিনী বিরল।

নারীর সংস্পর্শে যেমন পুরুষের মন শিষ্ট ও সভ্য হ'য়ে ওঠে নারীর সংসর্গে পুরুষের কর্ম্মও তেমনি প্রয়োজনের হ'য়ে ওঠে। মানুষের সভ্যতার ঐ দুটোদিক—একদিকে সংযম আর একদিকে প্রয়োজন। ঐ দুটোই পুরুষ পেয়েছে নারীর কাছ থেকে নারীরই প্রয়োজনে। বিশ্বমানবের সভ্যতায় প্রত্যক্ষভাবে নারীর হাত তেমন না দেখা গেলেও পরোক্ষ যে প্রভাব সেখানে তার আছে তা নিতান্ত অপ্রত্যক্ষ নয়। আসলে একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় মানুষের সমাজের আসল গ্রন্থিই হচ্ছে নারী। নারীকেই ধরে' নারীকেই কেন্দ্র করে' সমাজ আকার নিয়েছে। নারী না থাকলে পুরুষের জীবনের ভঙ্গিমা যে কি-রকম হত সেটা একটা মস্ত interesting গবেষণা। পুরুষ হচ্ছে যেন centrifugal force আর নারী, centripetal ; ঐ centripetal forceএর গুণেই সমাজ দানাবেঁধে উঠেছে ও মানুষের সভ্যতা নিরাকার থেকে যায় নি।

সে যা হোক্ তুমি নৌসেরায় ত এলে—এসে সবার প্রথমে এই জিনিষটা আবিষ্কার করলে যে সেখানে তোমার সময় কাটাবার উপাদান ও উপকরণের নিতান্ত অভাব। দেশে নিশ্চয়ই তোমার সময় কাটত কতকটা ঘর কন্নার ব্যাপার নিয়ে আর কতকটা সঙ্গিনীদের সঙ্গে গান গল্প হাসি তামাসা করে' কিন্তু নৌসেরাতে অবশ্য গিয়ে দেখলে সে-সব করণ উপকরণ অধিকরণ সেখানে কিছুই নেই। এক ছিল বই পড়া; কিন্তু সেই God forsaken নৌসেরাতে বই পাওয়াই এক বিষম ব্যাপার আর বই পেলেও একটা মানুষ আর কিছু রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা বই নিয়ে থাক্‌তে পারে না। আর এক ছিল আমাদের সঙ্গে গাল গল্প করা কিন্তু আমাদের মেয়ে পুরুষের মনের মধ্যে এমনি একটা gulf জেগে উঠেছে যে সে gulf এর ওপরে সাঁকো না বেঁধে আর গাল গল্প চলেই না—বলা বাহুল্য সে অবস্থায় সেটা তেমন জমাট বাঁধে না। বিশেষতঃ আমাদের মেয়েদের মানস জগৎ এখনও এম্‌নি সীমাঘেরা আছে যে আধঘণ্টা কথা কইলে সে মনের সব কথা বলা হ'য়ে যায় আর নতুন কিছু বলবার থাকে না।

তোমার তিনমাসের প্রবাসে একটী বাঙ্গালী কিশোরী তরুণীর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুবিধা হ'ল। বলা বাহুল্য আমাদের সমাজের যে অবস্থা ও যে ব্যবস্থা তাতে করে' এ-সুযোগ কারোই ঘটে ওঠে না। আমরা দেখতে পারি একমাত্র আমাদের নিকটতম আত্মীয়াদের। বলা-বাহুল্য সে আত্মীয়াদের আমরা দেখি কেবল চোখ দিয়ে, মন দিয়ে নয়। আর কিশোরী তরুণীকে দেখবার সুযোগ ঘটে বিবাহিতের, কেবল মাত্র তার স্ত্রীকে। সেও শুধু

শয্যাপ্রান্তে ও নিদ্রালস নয়নে, অবগুণ্ঠিতা ও সঙ্কুচিতা। আমাদের মেয়েদের জীবনের যে-সময়টাতে সবার চাইতে আলো বাতাস বেশী দরকার ঠিক সেই সময় থেকেই তা থেকে তারা বঞ্চিত হ'তে থাকে। প্রচুর আলো বাতাসের রসদ পায় না বলে' তাদের জীবনের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি হয় একটা মস্ত কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে তাদের সবারই হয় stunted growth. এই জন্যে তারা সমাজে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও করতে পারে না বা প্রাণ শক্তিও চারিয়ে দিতে পারে না। আমাদের মেয়েরা আমাদের পুরুষদের মনকে রঙিন্ করে' তুলতে পারে না কেবল তাদের দেহের ধর্ম্মকে সঙীন করে' তোলে। আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আমাদের মেয়েরা তাদের প্রাণ-ধর্ম্মকে সজীব করে তুলতে পারছে না।

ঐ-প্রাণ না হলে কিন্তু চলে না কেননা আমরা সবাই আছি প্রাণী-জগতে। আমাদের বাঁচবার পক্ষে বাড়বার পক্ষে প্রাণ অপিরিহার্য্য। তুমি হঠাৎ দার্শনিক হ'য়ে উঠে বলে' ফেলতে' পার—মানুষের প্রাণটা হচ্ছে ছোট জিনিস নীচের স্তরের তার আসল জিনিষ হচ্ছে আত্মা। আত্মা আসল ত বটেই কিন্তু মনে রেখো প্রাণ জিনিসটাও নকল নয়। ঐ প্রাণ বাদ দিলে যে আত্মা প্রেতাত্মাতে দাঁড়ায় সেটা দেখতে হ'লে হেলিগোল্যাণ্ডে যেতে হয় না। পলিটিক্যাল অবস্থার দরুণ আমাদের পুরুষদের প্রাণের ছুটবার পথ নেই আর সামাজিক ব্যবস্থার খাতিরে আমাদের মেয়েদের ও-বস্তুর ফুটবার উপায় নেই। তার উপর আছে আবার আধ্যাত্মিক সালসা। আর ও সালসার এমনি গুণ যে ওর কয়েক ফোঁটা পেটে পড়তেই আমরা দর্শনেন্দ্রিয় হারিয়ে দার্শনিক সাজি ও আত্মাকে হারিয়ে আধ্যাত্মিক বনি।

আমাদের মেয়েরা যে কুড়িতে বুড়ি বনে' যায় আমার মনে হয় তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের প্রাণের ধর্ম্মের উপরে সমাজ-বুড়োর ও আচার-বুড়ীর মস্ত চোখ-রাঙানীটা। জীবনে সংযমের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে এটা কেউ-ই অস্বীকার করবে না। কিন্তু জীবন যেখানে আছে সেই খানেই সংযমের সার্থকতা যেখানে কেবল মৃত্যু সেখানে ও-বস্তুর কোন অর্থই নেই। যা হোক্ যে সমাজে মায়ের জাত কুড়িতে বুড়ি হয় সে সমাজের ছেলেদের আয়ু যে ত্রিশ চল্লিশের মাঝামাঝি এটা নিতান্ত অন্যায় নয়।

কিন্তু সেদিন নৌসেরাতে আমরা একটি বাঙ্গালী মেয়ের ভিতরে কি রকম প্রাণ শক্তি থাকার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে তার পরিচয় পেলুম। আমি তোমাকে তোমার বিয়ের পর দু'একবার দেখেছি কিন্তু সে বাঙালী পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে। কিন্তু সেই নৌসেরাতে যেখানে কোন সমাজই নেই আমাদের কারো তর্জ্জনীর শাসন নেই, কারো চোখের ভ্রূকুটা নেই সেখানে তোমার যে-মূর্ত্তি আমি দেখেছিলুম তোমার মধ্যে সে-মূর্ত্তির সম্ভাবনাকেও যে কল্পনা করতে পারি নি। দেখেছিলুম প্রাণের একটা অতি সহজ অতি স্বতঃ গতিভঙ্গিমা লীলাতরঙ্গ যা চারিদিকে আলোক আর সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আপন মনেই ছুটে চলেছিল। যেন স্রোতস্বিনী যা পাহাড়ের পাষাণ কারার মধ্যে কত যুগ গুম্‌রে গুম্‌রে মরছিল তা হঠাৎ ছাড়া পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। যেন কত যুগের বদ্ধ বায়ুতে রুদ্ধ প্রাণ ছাড়া পেয়ে সুদ সুদ্ধ আপনার প্রাপ্য আদায় করে' নিচ্ছে। যেন হাজার বছর ধরে' যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে তার সমস্তটা একটা ক্ষুদ্র দিনে ক্ষুদ্র হাতে

সে আপনার করে নিতে চায়। আমি সেদিন তোমার মধ্যে যেন বাঙ্গালী জাতির সমস্ত তরুণী-সমাজের হাজার বর্ষ-ব্যাপী ব্যর্থ-হয়ে-থাকা ধর্ম্মের ও মর্ম্মের চেহারা দেখলুম। আমার মনে হ'ল আমরা ত আমাদের নারী-সমাজকে হত্যা করে করেই চলেছিলুম। এ-হত্যায় রক্তপাতের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না বলে' যে তা কম পাপের তা নয়। এ-পাপের বিচার সমাজের বিচারালয়ে হয় না বটে কিন্তু জীবন-দেবতার মন্দিরে যে এ-বিচার অবিরাম চল্‌ছে। সেদিন আমার চোখের সামনে একটা revelation হ'য়ে গেল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম—কিন্তু সে তোমার দৈহিক সৌন্দর্য্যে নয়, তোমার ঠোঁটের হাসিতে নয়, তোমার চোখের কটাক্ষে নয়—সে তোমার ঐ প্রাণের লীলার সঙ্গীতে। সেদিন যেন একটা জীবন্ত প্রাণ সাবয়ব হ'য়ে আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হ'ল এমন কোন কল্যাণ থাক্‌তেই পারে না যা এই প্রাণকে নষ্ট করবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাঁড়াতে পারে।

সেদিন আমি স্পষ্ট দেখলুম, এই যে নারী-সমাজের চারিদিকে একটা কঠিন দেয়াল খাড়া করে' তোলা হয়েছে তার পিছনে আছে আমাদের পুরুষ-সমাজের একটা বিরাট কাপুরুষতা। এ কাপুরুষতা উদ্ভূত হয়েছে সামর্থ্যহীন অহঙ্কার থেকে। সামর্থ্যহীন অহঙ্কারের ধর্ম্মই হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা negativism দিয়ে। জীবন-সংগ্রামে তার লাফিয়ে পড়বার সাহস নেই জীবন-সংগ্রামকে তাই সে বাইরেই রেখে দেয়। জাত বাঁচাতে হ'লে সে আর সবাইকে অস্পৃশ্য করে তোলে। এর ভিতরের কথাটাই হচ্ছে এই যে সামর্থ্যহীন অহঙ্কারের আপন আপন ধর্ম্মের উপরে তেমন বিশ্বাস নেই তেমন আস্থা নেই। ধর্ম্ম কথাটা এখানে আমি সংস্কৃত

অর্থে ব্যবহার কর্‌ছি। যেখানে আত্ম-বিশ্বাস রয়েছে যেখানে আত্ম-প্রত্যয় এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নি সেখানে "শিক্ষার মিলনে" ভয় থাকে না বরং মনে হয় শিক্ষার মিলন আত্মাকেই আরো পুষ্ট করবে সম্পদশালী করে তুল্‌বে। কিন্তু "শিক্ষার বিরোধ" আমরা সেই-খানেই গড়ে তুলি যেখানে মনে করি পরের চিন্তার ধাক্কায় কর্ম্মের ধাক্কায় আমরা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারব না আমাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। জার্ম্মাণীতে সংস্কৃতের চর্চ্চা হয় এবং বেদ বেদান্তের আলোচনা হ'য়ে থাকে কিন্তু সেখানে এ-প্রশ্ন কোনদিন ওঠে না যে ও-শিক্ষা তাদের শিক্ষার বিরোধ কি না। ও-প্রশ্ন ওঠে নি কেননা ও-রকম কোন প্রশ্নই নেই। আসলে শিক্ষার বিরোধ বলে' কোন বিরোধ নেই যে-বিরোধটা আছে সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ন্যাশানালিজ্‌ম্‌এর। শিক্ষার বিরোধকে মেনে নেওয়ার অর্থ আত্মাকে ছোট করে' দেখা, আত্মার সামর্থ্যহীনতা ও পরাজয় স্বীকার করে' নেওয়া।

মুসলমানী যুগের non-touchism আমাদের আত্মার দৈন্যই ঘোষণা করেছে'। আত্মার দৈন্য যখন ছিলই তখন non-touchism হয়ত আমাদের উপকারেই লেগেছে। কিন্তু আজ এই ইয়োরোপীয় যুগে ঐ non touchismকেই যে আমরা জীবন-বেদের ভিত্তি বলে' মানছি সে সেটা এরি চিহ্ন যে আমরা আমাদের আত্মার দৈন্যাবস্থা কাটিয়ে উঠ্‌ছি। নিজের মধ্যে যখন জোর পাই তখনই পরের সঙ্গে কোলাকুলি কর্‌তে ভয় পাইনে।

এই যে non-touchism এ কিসের নামে? ধর্ম্মের নামে। ডাক্তারদের কাছে যেমন কুইনাইন আমাদের কাছে তেম্‌নি ধর্ম্ম।

ও Politics বল Cow conference বল, ও Afgan invasion বল বা Everest Expedition বল সব সম্বন্ধেই আমরা মুখ খুলি ধর্ম্মের নামে। এ ধর্ম্ম কিন্তু সংস্কৃত অর্থে নয় ইংরাজি অর্থে। তার কারণ সংস্কৃত আমরা জানিনে সুতরাং ওর সংস্কৃত অর্থও আমরা জানিনে কিন্তু ইংরাজি জানি সুতরাং ওর ইংরেজি অর্থও জানি। ওর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে আমাদের সকল কাজে আত্মার পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতি যতটা লোভ জাগে দেহের পুষ্টি সাধনের দিকে ততটা দৃষ্টি পড়ে না। ওর ফলে স্বর্গরাজ্যের প্রতি আমাদের যতটা দৃষ্টি পড়ে মর্ত্ত্যলোকের প্রতি ততটা মন পড়ে না। কিন্তু মর্ত্ত্যশক্তি আয়ত্ত্ব না করেও মানুষের অমৃতত্ব লাভ হয় কিনা জানিনে কিন্তু মৃত্যু যে লাভ হয় তার প্রমাণ ভারতবাসীর ঘরে বাইরে পড়ে আছে।

মুসলমানী যুগে মুসলমানকে অস্পৃশ্য করে' তুলেছিলুম আমরা ধর্ম্মের নামে আজ আবার দেখছি তাকে স্পৃশ্য না করে' তুল্‌লে চলে না কেননা নইলে আমাদের পলিটিক্স অচল হ'য়ে পড়ে। এই অস্পৃশ্যতার ফলে কত শতাব্দী ধরে' হিন্দু মুসলমানের অন্তরে যে বদ্ধমূল ভেদবুদ্ধি শিকড় গেড়েছে এমন কোন্ পলিটিয়ান আছেন যাঁর আজ লোভ না হয় সেই ভেদবুদ্ধির শিকড়কে একটানে সমূলে উৎ-পাটিত কর্‌তে। কিন্তু যে-রস সঞ্চিত হয়েছে শতাব্দী ধরে সে রস যে শুকিয়ে যাবে এক পহরে তা নয়। অতীত কর্ম্মের ফল ভোগ আমাদের কর্‌তেই হবে তা সে বর্ত্তমানের প্রয়োজনের তাড়া যত জরুরীই হোকনা কেন।

যে-অবস্থায় পড়ে' যে-অভিমানে অভিমানী হ'য়ে একদিন আমরা মুসলমানকে অস্পৃশ্য বলে' ভেবেছিলুম আজ আবার ঠিক সেই

অবস্থায় পড়ে' সেই অভিমানে অভিমানী হ'য়ে ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানকে অপবিত্র বলে' মেনে নেবার চেষ্টা করছি। ওর ফলে যে কেবল আমাদের জাতীয় মনই শুচিবাইগ্রস্থ হ'য়ে উঠবে তাই নয় এ সম্ভাবনাও থাক্‌বে যে মানুষের বড় প্রয়োজনের পথে ওটা একদিন একটা মস্ত বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে আমরা আদার ব্যাপারী হ'য়ে যেটার সম্ভাবনাকে কল্পনাও করতে পারছি নে জাহাজের মালিক হ'য়ে হয়ত আর একদিন দেখব যে সেইটে আমাদের সবার চাইতে বড় পাপের জন্ম দিয়ে বসে' আছে।

লিখতে লিখতে চিঠিটা বড় হ'য়ে গেল আজ এইখানে খতম্‌। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ রায়ের সিকিম যাবার কথা ছিল—গেছেন না কি? না গিয়ে থাক্‌লে তাঁকে বোলো আমার কুশল—তাঁকে আর ভিন্ন চিঠি এবার লিখলুম না। সভ্য ও conventional জগতে ফিরে অবধি একটু foreign foreign লাগ্‌ছে। ইতি—

হাবিলদার।

হিন্দু জাতির পরিণাম।

——:o:——

যাঁহারা বলেন যে "সনাতন" হিন্দুজাতি অক্ষয়, অব্যয়, অমর, তাঁহাদের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ লিখিতেছি না। পৃথিবীর সমস্ত জাতির ন্যায় হিন্দুজাতিও জরা ও মৃত্যুর স্বাভাবিক নিয়মের অধীন ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই বিবেচনার জন্য, এই "জাতীয়তার" দিনে কয়েকটী কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

"হিন্দু" কথাটা অনেক কলহের কারণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন রঘুনন্দনের ব্যবস্থিত শৌচাশৌচ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয় সমন্বিত স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পি, এম, বাগ্‌চির পঞ্জিকান্তর্গত "শুক্‌নো ডালে ডাকে কা" ও হাঁচিটিক্‌টিকিরহস্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় যাঁহারা বরাবর পালন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারাই হিন্দু; অপর পক্ষ বলেন যে ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিন্তা ও ঈশ্বরারাধনার নির্দ্দেশ এই দুই বিষয় মাত্র যিনি পালন করিবেন তিনিই হিন্দু এবং বাহ্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি শুধু স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনুসরণ করিলে তাঁহার হিন্দুত্ব লোপ পাইবে না। আরও সোজা কথায় বলিতে গেলে শেষোক্ত শ্রেণীর মতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্য্য-সমাজীরাও হিন্দু। কিন্তু অপর পক্ষ ইহা স্বীকার করেন না। যাহা হউক, লোক গণনার সময় যাঁহারা নিজেকে হিন্দু বলিয়া লিখাইয়া থাকেন, আমি সোজাসুজি সেই অর্থে হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিব।

যাঁহারা হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে এই "জাতীয়

জাগরণের” দিনেও যে দিক হইতে তাহার মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যাধ শরাসনে শরসন্ধান করিতেছে, হিন্দু সমাজ একচক্ষু হরিণের মত ঠিক সেই দিকেই দৃষ্টিহীন চক্ষুটী মেলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছে। যদি কেহ তাহাকে ডাকিয়া বা খোঁচা দিয়া সতর্ক করিতে চায় তবে সে শিং নাড়িয়া সতর্ককারীকে আক্রমণ করিতে আসে। মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে একটা অমূলক প্রবাদ আছে যে সরস্বতীর কৃপা পাইবার পূর্ব্বে তিনি এত নির্ব্বোধ ছিলেন যে একদা এক ডালের আগায় বসিয়া সেই ডালের গোড়া কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রূপকথা ছাড়িয়া দিয়া সরল ভাষায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে হিন্দু সমাজের কতকগুলি আচরণ লক্ষ্য করিলে অনেকেই একথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে এই “সনাতন” সমাজের মতি গতি আত্মধ্বংসকর। যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু স্বরাজ লাভের জন্য বাহ্বাস্ফালন করিতেছে সেই ভিত্তিই মাটিতে বসিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি একথা বুঝেন যে সমাজ বা জাতি ঠিক একটী প্রাণীদেহের ন্যায়। প্রত্যেক অঙ্গের পুষ্টি না হইলে যেমন প্রাণীশরীরের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না, সেইরূপ জাতিরও প্রত্যেক অংশকে উপযুক্ত পুষ্টিদান না করিলে সমগ্র জাতির উন্নতি হয় না। জীবন্ত প্রাণীদেহে যেমন কোন অংশ ব্যথিত হইলে সে ব্যথায় অপর সকল অবয়বই সাড়া দিয়া উঠে কিন্তু মৃতদেহে সেরূপ হয় না, কোন জীবন্ত জাতির পক্ষেও ঠিক সেকথা। ইহার সত্যতা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বুঝেন, অথচ তাঁহাদের অনেকেরই এ বিষয়ে খেয়াল নাই।

ভারতের সাত কোটি মুসলমান ও তেইশকোটি হিন্দুকে লইয়া ভারতীয় "নেশন "বা জাতি। হিন্দু ও মুসলমানের একতা কাগজে ও বক্তৃতায় একপ্রকার মানিয়াই লওয়া হইতেছে, সুতরাং আমিও সে কথা মানিয়া লইয়া, হিন্দুর কথাই বলিব। তেইশকোটি হিন্দুর মধ্যে প্রাদেশিক প্রভেদ লইয়া বহু থাক্ বা শ্রেণী আছে এবং কোন শ্রেণীর সঙ্গে অপর কোন শ্রেণীর আন্তরিক তত মিল নাই যত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মুসলমানের আছে। বাঙ্গালী মুসলমান বিপদে পড়িলে পাঞ্জাবী বা অযোধ্যার মুসলমানের প্রাণে যত লাগিবে, মৎস্যভোজী বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য রুটীভোজী পশ্চিমে হিন্দুর তত দরদ হইবে না। বিবাহাদি ব্যাপারেও তাহাই। হিন্দুর মধ্যে এই প্রাদেশিক প্রভেদ ব্যতীত আরও যে এক ভীষণ বিষমতা আছে, উহাই কিন্তু আরও সর্ব্বনাশের কারণ। এই বিষমতা সকল প্রদেশেই আছে। বাঙ্গালার কথাই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাউক।

সকলদেশেই যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলা হয় তাহারাই জাতির প্রকৃত শক্তির আধার। যাহাদ্বারা সমস্ত জাতির অস্তিত্ব বজায় থাকে এমন সমস্ত পরিশ্রমের কার্য্যই নিম্নশ্রেণীর লোক করিয়া থাকে। হাল চালনা, কলে মজুরের কাজ, নৌচালনা, ভদ্রলোকের বাড়ী ঘর, বাগান পরিস্কার সংস্কার ও রক্ষা সাধারণতঃ উহারাও করিয়া থাকে। অথচ ইহারা ধনহীনতার জন্য সকল দেশেই অল্প বিস্তর ঘৃণার পাত্র হয়; কিন্তু আমরা অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্ণেরা জাত্যাভিমান দ্বারা উহাদের কাটা ঘায় নুনের ছিটা দিয়া উহাদিগকে আরও নির্য্যাতিত করি; ধনহীনতা ভদ্র ও অভদ্রের পার্থক্য মানে না, এবং ধনসঞ্চয় দ্বারা নির্ধনতার অগৌরব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু জাতি সম্বন্ধীয় ঘৃণা

বা বিদ্বেষ যেমন আজীবন কষ্টদায়ক তেমনি মর্ম্মঘাতী। আমি আমার পোষা বিড়ালটীকে বিছানায় লইয়া আদর করিতে করিতে যদি শূদ্র চালের তলে আসিয়াছে বলিয়া জলের কলসী ফেলিয়া দিই, তবে সে মর্ম্মাহত হইয়া যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তবে তাহাকে দোষ দিতে পারি না। সুতরাং ঐ ঘৃণা ষোল আনা মনে পোষণ করিয়া যদি শূদ্রকে "দেশের কাজ উপলক্ষ্যে" ডাকি, আর যদি সে সে-ডাকে সাড়া না দেয় তবেও তাহার দোষ হয় না। এই জন্য বর্ত্তমান "অ-সহ-যোগীতা" নামক নূতন "দেশের কাজে" বাঙ্গালার নমঃ-শূদ্র-সমাজ সর্ব্বান্তঃকরণে যে যোগ দেয় নাই, সেজন্য সে ততটা দোষী নয়, যতটা উচ্চবর্ণেরা। মাদ্রাজের আদিদ্রাবিড় জাতি কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সভা করিয়া উচ্চবর্ণ হিন্দুকে সেনাপতি ডায়ার অপেক্ষাও সহস্রগুণ নিষ্ঠুর বলিয়াছিল, তখন তাহারা এই যুক্তি দেখাইয়াছিল যে একজন ইংরাজ দশ বা পনর দিন কয়েকজন ভারতবাসীকে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আদেশ দিয়া এবং আরও কয়েকপ্রকারে অপমানিত করিয়াছিলেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু নিম্নশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে সহস্র বৎসর ধরিয়া পদে পদে অধিকতর মর্ম্মান্তিক অবমানে অবমানিত করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীরা রুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু কথাটার মধ্যে অনেক সত্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

হিন্দু সমাজের মধ্যে পরস্পারের প্রতি আত্মধ্বংসকারী ঘৃণা ও বিদ্বেষ কতদূর বদ্ধমূল তাহা দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে [illegible] একটা উকিল নমঃশূদ্র। কিছুদিন পূর্ব্বে তত্রত্য উকিল সম্প্রদায় সভা করিয়া এই স্থির

করিয়াছেন যে (Bar library র) উকিল সভার কায়স্থ জাতীয় ভৃত্য উক্ত নমঃশূদ্র উকিলকে জলপান ইত্যাদি দিলে তাহার আভিজাত্য নষ্ট হইবে, অতএব জলপান দেওয়া বন্ধ হউক। এ ঘটনা অনেক সংবাদ পত্রে আলোচিত হওয়ার পরও নড়াইলের উকীলগণ (দুই একজন বাদে) লজ্জিত না হইয়া বরং দর্পের সহিতই আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করিয়া মহা আনন্দ অনুভব করিতেছেন। অথচ ঐ স্থানে দুই একজন মুসলমান উকীল আছেন, তাঁহাদের সেবাদ্বারা কায়স্থ চাকরের "জাতি" নষ্ট বা কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা কেহ করেন নাই; "জাতি" যায় হিন্দু নমঃশূদ্রকে পান তামাক দিলে। শুনা যায় ঐ উকিল সম্প্রদায় নাকি বর্ত্তমান কংগ্রেসের অনুগত অনুচর এবং প্রায় অনেকেই নাকি চারি আনা পয়সা দিয়া সভ্যের খাতায় নাম লিখাইয়াছেন। নিজসমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিকেও সম্মান এবং সেবা করিব, অথচ স্বজাতীয় নিম্নবর্ণের সংস্পর্শে "জাতি" যাইবে এরূপ ঘৃণিত ও আত্মবিনাশকর ব্যবহার-নীতি জগতের আর কোন সমাজে আছে কি? অথচ এইরূপ কার্য্যেরই আমরা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিই এবং মনকে চোখ ঠারিয়া ভাবি আমাদের মত বুদ্ধিমান পৃথিবীতে আর কেহ নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে নিম্নজাতীয় হিন্দু আদি-দ্রাবিড়গণকে জব্দ করিবার জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমানের সহিত একজোট হইয়া দাঙ্গা করিতেছেন, সংবাদ পত্রে কিছুদিন ধরিয়া এই খবর বাহির হইতেছে। কিন্তু কেহ কখন শুনিয়াছেন কি যে কোন মুসলমান সম্প্রদায় অপর কোন মুসলমান সম্প্রদায়কে জব্দ করিবার জন্য হিন্দুর সহিত মিলিয়া মারধর করিয়াছেন? "দেশের কাজের" জন্য সভা সমিতিতে যে সকল রেজোলিউসন বা মন্তব্য প্রকাশ

হইতেছে তাহার কয়টাতে আমাদেরই সমাজস্থ আমাদিগকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অবমানিত নিম্নবর্ণ ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইতেছে? কংগ্রেসের অন্যান্য রেজোলিউসন লইয়া যত আড়ম্বরের সহিত কাজের চেষ্টা হইতেছে অস্পৃশ্যতা মোচনের নিমিত্ত তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে কি? বর্ত্তমানে "দেশের কাজের" জন্য যে দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে যে সকল উচ্চবর্ণের হিন্দু বক্তা, প্রচারক ও লেখক আছেন, দেশশাসনের ষোল আনা ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা যে তাঁহাদেরই পদদলিত ভাইদের প্রতি সেই সাম্যভাব দেখাইবেন যে সাম্যভাব তাঁহারা সাহেবদের নিকট পাইতে চাহেন, তাহার কোনই প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বহুযুগ সঞ্চিত এই মজ্জাগত আত্মম্ভরিতার ফলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশ্রেণীর প্রতি যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হইতেছে, উচ্চশ্রেণী যদি এখনও সাবধান না হন তবে পরিণামে ঐ ক্রোধ বহ্নিতে তাঁহাদিগকে সকল দর্প ও গর্ব্ব লইয়া ভস্ম হইতে হইবে। স্কুলের বালক হইতে কংগ্রেসের সভাপতি পয্যন্ত সকলেই স্বজাতিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন; কিন্তু এক দাস আবার অপর দাসকে পদতলে রাখিতে চায় কেন? বিজাতির পদতলে পতিত দাসের এ আস্পর্দ্ধা কেন? আমরা যখন দাস হইয়াছি, তখন সব দাস এক হইয়া থাক্। খবরের কাগজ ও বক্তৃতাদ্বারা কোন কৃত্রিমভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে "জাতীয় জাগরণ" ইত্যাদি নামে ভূষিত করিলেই জাতিগঠন হয় না; এবং অভদ্রজাতির তুলনায় যাহাদের সংখ্যা শতকরা ৬ ছয়জন মাত্র এমন জনকয়েক লোকে মিলিয়া সভা করিলে সে সভাকে সমগ্রজাতির প্রতিনিধি বলা যায় না

এতো গেল হিন্দু সমাজের অন্তর্গত নিম্নজাতির প্রতি উচ্চজাতির ঘৃণা ও অবহেলা। ইহা ছাড়া ছুঁৎমার্গের দ্বারদিয়া সমাজের কত লোককে আমরা গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছি তাহাও বিবেচ্য। পুরুষানুক্রমে নির্য্যাতন ভোগ করিয়া নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য; এখনও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে অনেকে খৃষ্টান ও মুসলমান হইয়া স্বধর্ম্মীকর্ত্তৃক অপমান ও নিগ্রহের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যদি কেহ ফিরিয়া আসিতে চায় আমরা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কি তাহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি? একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান পর্য্যটক আল্‌বেরুণী দেখিয়া গিয়াছেন যে সুলতান মামুদ প্রভৃতি মুসলমান আক্রমণকারীরা যে সকল হিন্দুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া চিরদাসত্বে এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে যদি কোন হতভাগ্য অনেক বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়া পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া আশাপূর্ণহৃদয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, হিন্দু ভাইরা তাহাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; এবং সে মায়ের দুয়ারে মাথা কুটিয়া চোখের জলে মাটি ভিজাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। নয়শত বৎসর পরে আজও আমরা সেই সনাতন নিয়মই পালন করিতেছি; শুধু তাহা নয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কোন নিয়মই যে পরিবর্ত্তন হয় না, এই বলিয়া বুক ফুলাইয়া গর্ব্বও করিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত বহিস্করণ নীতির ফলে হিন্দুজাতি কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, হিন্দু সমাজ কি তাহা ভাবিয়া দেখেন?

নড়াইল।

শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

টিপ্পনী

—————ঃ*ঃ—————

মহাত্মা গান্ধি সে দিন বাঙলা দেশটা প্রদক্ষিণ করে গেলেন, কিন্তু শুনতে পাই যে তিনি বাঙালীর প্রতি যে মনোভাব নিয়ে ফিরেছেন—তাকে ঠিক দক্ষিন বলা যায় না।

তিনি নাকি আবিষ্কার করেছেন যে বাঙলা দেশের বেশির ভাগ লোক সহযোগীও নয়, অসহযোগীও নয়। তবে তারা কি? আমাদের দার্শনিকদের মধ্যে দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী ছাড়া যেমন আর একদল দ্বৈতাদ্বৈতবাদী আছেন তেমনি আমাদের পলিটিক্সেও নাকি সহযোগী অসহযোগী ছাড়া আর একদল আছেন যাঁদের নাম হওয়া উচিত সহাসহযোগী। অর্থাৎ তাঁরা যাঁরা মুখে অসহযোগী, কাজে সহযোগী। উপরন্তু বাঙালীদের ভিতর জন কয়েক বিশিষ্টাসহযোগবাদীও আছেন। ফলে এখানে এক বাক্ বিতণ্ডা ছাড়া আর কিছু হবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। এ কথা একেবারে মিছে নয়।

২

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কি কথোপকথন হয়েছে তা জানবার জন্য যেমন কৌতুহল হয়েছে অসহযোগীদের তেমনি হয়েছে সহযোগীদের। অথচ এ কৌতূহলের কোনও মানে মোদ্দা নেই। এঁদের দুজনের ভিতর কথাবার্ত্তা গোপনে হয়েছে বলে যে গুপ্তমন্ত্রণা হয়েছে এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত। এ ত রেডিং-গান্ধী সংবাদ নয় যে তা গুহ্য হতে বাধ্য।

আমরা ধরে নিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বসাধারণের কাছে যে মত প্রকাশ করছেন মহাত্মা গান্ধীর কাছেও সেই মতই প্রকাশ করছেন এবং মহাত্মা গান্ধীও তাই করেছেন। উভয়ের মতামত ত আমরা সবাই আজ জানি, সুতরাং আমরা মনে মনেই সে কথোপকথন রচনা করে নিতে পারি তার জন্য রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর কোনও চরের দ্বারস্থ হবার কারও প্রয়োজন নেই।

আমি আন্দাজ করছি এই কথোপকথনের ফলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই রয়ে গেছেন আর মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্র-নাথ নিশ্চয়ই বীণা ছেড়ে চরকা ধরবেন না আর মহাত্মা গান্ধীও চরকা ছেড়ে বীণা ধরবেন না। আমাদের পক্ষে এ অতি আনন্দের কথা, কেননা সভ্য সমাজের মানুষের পক্ষে জ্ঞানও চাই কর্ম্মও বাণীও চাই কানীও চাই অতএব বীণাও চাই চরকাও চাই। জ্ঞান মার্গ কর্ম্ম মার্গের বিপরীত নয়। এ দুই শুধু বিভিন্ন।

আমার এ অনুমান যে সত্য তার প্রমাণ, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে তাঁর কাজের ও তাঁর নিজের রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোনও বিপদ নেই। অপর পক্ষে তাঁর চেলাদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথেরও তাঁর কথার যে কোন বিপদ না হোক আপদ নেই একথা বলা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি কলকাতায় যে কটি বক্তৃতা দিয়েছেন তার মধ্যে সেরা দুটি হচ্চে "শিক্ষার মিলন" ও "সত্যের আহ্বান"। এ দুটি বক্তৃতায় তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা শুনে নাম-লেখানো অসহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁরা "শিক্ষার মিলনের" প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্ত করেছেন। "শিক্ষার মিলন"

নাকি কবির কবিত্ব অতএব তার খণ্ডনের জন্য অবশ্য চাই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস। এ রকম ব্যবস্থা এক বাঙলা ছাড়া আর কোথায়ও আর কারোও মনে আসত না। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে "শিক্ষার মিলনের" উপর আক্রমণ করবেন এমন ত মনে হয় না। তাঁর প্রবন্ধের নাম থেকেই বোঝা যায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের উতোর গাইবেন না। "শিক্ষার মিলনের" পাল্টা জবাব "শিক্ষার বিরোধ" নয়, তা হচ্ছে "অশিক্ষার মিলন"। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন "শিক্ষার বিরোধের" বিষয় বলবেন তখন তিনি সে বিরোধের যা হয় একটা সমন্বয় করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন। শিক্ষার আসল বিরোধটা হচ্ছে অশিক্ষার সঙ্গে,—অপর শিক্ষার সঙ্গে নয়। কেননা শিক্ষার অর্থই হচ্ছে পরের কাছে শিক্ষা।

আলি ভ্রাতাদ্বয়কে গ্রেপ্তার করায় সরকার বাহাদুর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কিনা এ নিয়ে দেখ্‌তে পাই অনেকে মাথা বকাচ্ছেন। এসব নিয়ে আলোচনা করাটা আমার মতে আমাদের পক্ষে, চিন্তাশক্তির একান্ত বাজে খরচ করা। সরকারের ভাবনা ভাববার দায় সরকার আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেননি। সরকার যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। এর ফল সরকারের পক্ষে ভালই হোক আর মন্দই হোক সে ফল সরকারই ভোগ করবেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা সরকারের চরকায় তেল দিতে সদাই ব্যস্ত আশাকরি এ গ্রেপ্তারের ভিতর তাঁদের হাত নেই।

সরকারের এ পলিসি ভাল কি মন্দ সে হচ্ছে পরের কথা, সরকারের পলিসিটি যে কি আগে তাই বোঝবার চেষ্টা করা যাক্। এ কি অসহযোগীতা দমনের সূচনা? জেলে পুরলে অসহযোগীরা

যে সহযোগী হয়ে উঠবে এ সম্ভাবনা খুব কম। কারাগারের বন্দীদের যে ক্রিয়া অভ্যাস করতে হয় সে হচ্ছে হঠ-যোগ, রাজ-যোগ নয়। অপরপক্ষে এই ধর পাকড়ের ফলে অনেক সহযোগীও অসহযোগী হয়ে উঠতে পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রে একের জেল-যোগ প্রায়শই বহুর পক্ষে অসহ।

তবে কি এই সব গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্য খিলাফৎ দমন? খুব সম্ভব তাই। স্বদেশী যুগে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল ইংরাজ রাজের স্যুয়োরাণী আর এই স্বরাজী যুগে হয়েছে "দুয়োরাণী"।

এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কবিই ত বলেছেন—

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"

এখন দেখা যাক এই দমন-নীতির দৌড় কত দূর। সরকারের পক্ষে আলিভ্রাতাদ্বয়কে ধরা ত সাপে ছুঁচো ধরা হয় নি?

রাজ্যশাসন প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপারের রহস্য উদঘাটন করবার বৃথা চেষ্টা না করে এখন একটা ঘরের কথা বলা যাক। শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির গ্রেপ্তারে আমি নিতান্তই দুঃখিত হয়েছি কেন না তিনি আমার বহুদিনের বন্ধু। এবং সে বন্ধুত্ব বরাবর বজায় আছে যদিচ পলিটিক্সে আমি তাঁর সঙ্গে কখনও একমত হতে পারিনি। স্বদেশী যুগে তিনি আমার সহযোগী হতে পারেন নি। আর এই স্বরাজী যুগে আমি তাঁর সহযোগী হতে পারি নি। আমাদের পরস্পরের পলিটিকাল মতের অমিলের মূলে আছে আমাদের মনের পলিটিকাল প্রস্থান ভূমির প্রভেদ। সে প্রভেদ হচ্ছে Indian Nationalism এর সঙ্গে Pan-islamism—এর যে প্রভেদ।

এ প্রভেদ সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির সঙ্গে আমার সখ্য অদ্যাবধি যে অটুট রয়েছে তার কারণ, রাজনীতির বাইরে একটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা দুজনে Comrade। আমরা দুজনে হচ্ছি এক কলমের ইয়ার। Comrade এর লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির কলমের স্পর্শে ইংরাজি ভাষা কেমন হেসে খেলে নেচে কুঁদে বেড়ায়। আমার দুঃখ আমি উর্দ্দু জানিনে যদি জানতুম তাহলে তার উর্দ্দু লেখা যে আমার অতি প্রিয় হত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক; বহুকাল পরে সেদিন শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার সঙ্গে তাঁর মিলনের আলিঙ্গন যে আসলে বিদায়ের আলিঙ্গন এ কথা সেদিন জানতুম না। আজ তাই কলমের মুখ দিয়ে তাঁকে Au revoir বলতে বাধ্য হচ্চি। আশা করি তাঁর পুনর্দ্দর্শন অচিরে পাব।

বীরবল।

সেপ্টেম্বর ১৯২১

ভারতের শিক্ষার আদর্শ।*

—:•:—

১ম পরিচ্ছেদ।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথারই আলোচনা করবার সংকল্প করছি।

বিশ্বের দেয়ালী যজ্ঞে যোগ দিবার জন্য প্রত্যেক জাত্‌কেই তার চিত্ত-প্রদীপটীকে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হয়। কোনও জাতি এই দীপটীকে নষ্ট কর্‌লেই বিশ্বের উৎসবে যোগ দেবার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়। যার এই আলোকেব সঞ্চয় নাই সে ভাগ্যহীন বটে; কিন্তু তার চেয়েও অধিক ভাগ্যহীন সে যে এ থাকা সত্ত্বেও এর ব্যবহার থেকে ভ্রষ্ট কিম্বা এর সম্বন্ধে উদাসীন।

ভারতের যে একটী বিশেষ স্বকীয় চিত্ত আছে সে যে এই চিত্তের দ্বারা গভীর ভাবে চিন্তা করেছে এবং নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছে সে যে এরই আলোকে জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছে আমরা তার প্রচুর প্রমাণ পেয়েছি। ভারতের এই চিত্তকে সত্য আবিষ্কার কর্‌বার্ এবং সেই সত্যকে আত্মসাৎ করে জীবনের মধ্যে প্রকাশ কর্‌বার যোগ্য করে তোলাই ভারতের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

---

*রবীন্দ্র নাথের The Centre of Indian Culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

এই উদ্দেশ্যটাকে সার্থক করতে হলে প্রথমেই ভারতের সমস্ত চিত্তকে একই কেন্দ্রে সংহত এবং তার আত্মবোধকে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত করে তুলতে হবে। একমাত্র এই উপায়েই সে তার গুরুর নিকট হতে যথার্থভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবার অধিকারী হবে এবং এরই দ্বারায় সেই লব্ধ শিক্ষাকে সে নিজের আদর্শে বিচার করবার এবং তার নিজের সৃজন শক্তির সহযোগে তাকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে পরিস্ফুট করে তুলবার ক্ষমতা লাভ করতে পারবে। গ্রহণ করবার সময় যেমন হাতের আঙ্গুলগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করতে হয় দান করবার বেলাতেও তাই। অতএব আমরা যখন ভারতের এই সব বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একই চেষ্টার মধ্যে মিলিত করতে পারব তখন তারা যেমন একদিকে গ্রহণক্ষম হবে তেমনি আর একদিকে তাদের সৃষ্টি-শক্তিরও উন্মেষ হবে। তখন আর বিক্ষেপের ফাঁক দিয়ে জীবনের রসধারা স্খলিত হয়ে যাত্রাপথকে পিচ্ছিল করবে না।

তারপর শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দান করতে হলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে সৃষ্টির উদ্যমকে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট রাখতে হয়। এই কারণেই জ্ঞানের সৃজন-ক্ষমতার অনুশীলনের দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এর জন্যে মানুষকে একত্র সমবেত করতে হবে এবং তাদের মানসিক অনুসন্ধান ও সৃষ্টির কাজে তাদের অবাধ এবং সম্পূর্ণ অবকাশ দিতে হবে। উৎসের উদ্বেল জলধারার মত আমাদের শিক্ষা তখন এই অনুশীলনের মধ্যে থেকে স্বতঃই উৎসারিত হতে থাকবে। শিক্ষা যখন এমনি সজীব এবং বর্দ্ধমান জ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয় তখনই তা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠে।

আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবন যাত্রার সম্পূর্ণ যোগ থাকা চাই। সে শিক্ষাকে আমাদের আর্থিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্থান দিতে হবে। আমাদের শিক্ষালয়কে সমাজের মধ্যেই স্থাপিত করতে হবে। বিচিত্র সজীব সহযোগিতার বন্ধনে একে আমাদের সমাজের সহিত যুক্ত করে রাখতে হবে। আমাদের চতুর্দ্দিকের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার যে একটা যান্ত্রিক সম্বন্ধ আছে প্রতিপদে তাকে উপলব্ধি করাই প্রকৃত শিক্ষা।

২য় পরিচ্ছেদ।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট অসন্তোষ ভারতের সকল স্থলেই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে যে একটা পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তার চিহ্ন যেখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমাদের জাতীয় চিত্তের অভ্যন্তরে যেন একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। নূতন ব্যবস্থা এবং নূতন পরীক্ষা করবার জন্য আমাদের মধ্যে যেন একটা তাগিদ এসেছে। কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যখন আমাদের কোনও ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে তখন তা' আমাদের একান্ত অব্যবহিত হওয়ায় আমরা সকল সময় তার কারণ ঠিক করতে পারি না এবং তার লক্ষ্য যে কি তাও ঠিক করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত এই বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থার বেষ্টনের মধ্যেই তৈরি হয়ে উঠেছে। এ আমাদের এই শরীরের মতই একান্ত আপনার হয়ে পড়েছে এর যে কোনও রকম পরিবর্ত্তন হতে পারে একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। এর সীমার বাহিরে যেতে আমাদের কল্পনার সাহস হয় না। একে বাহির থেকে দেখে এর সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের একেবারে সাধ্যাতীত। আর কিছুকে যে এর আসনে স্থান দিতে পারা যায় একথা বল্‌তে আমাদের মনও উঠে না এবং ভরসাও হয় না। তার কারণ আমাদের মন এই ব্যবস্থারই বিশেষ সৃষ্টি বলে এর প্রতি স্বভাবতঃ আমাদের একটা মমতার পক্ষপাতিতা এবং আসক্তি আছে।

তা হলেও এই আত্মপ্রসাদের গভীরতার মধ্যে কোথায় যেন একটা পীড়ার হেতু আছে—তাই থেকে আমাদের যে শান্তির ব্যাঘাৎ হচ্ছে একথা আমরা যেন বেশ অনুভব করছি। কিছু দিন এই গুপ্ত পীড়া ভোগ করবার পর আমরা শেষে রাগের মাথায় বাইরের ঘটনা বিশেষকে তার হেতু বলে নির্দ্দেশ করতে আরম্ভ করেছি। আমরা বলে থাকি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গলদ এই যে ইহা আমাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন নয়—অর্থাৎ এই জাহাজটী সমুদ্র যাত্রার পক্ষে অপর সকল বিষয়েই উপযোগী এর হালটী কেবল আমাদের হাতে দিলেই আমরা পাড়ি জমাতে পারব। সম্প্রতি আমরা যে সকল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করছি এই বাহিরের স্বাতন্ত্র্য লাভ করাই যেন সেই সব উদ্যোগের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা একথা বিস্মৃত হই যে চরিত্রের যে দুর্ব্বলতা এবং অবস্থার যে হীনতা আমাদের অনুকরণের পথে নিয়ে যায় শুধু বাহিরের স্বাধীনতা

লাভ করলেই আমরা তাদের হাত এড়াতে পারব না—তারা তখনও সেই একই ভাবে আমাদের অনুসরণ করতে থাকবে। আমরা এই বাহিরের স্বাতন্ত্র্য থেকে অনুকরণ করবার স্বাধীনতা পাব মাত্র তখন অনুকরণ করবার পথে আমাদের আর কোন বাধাই থাকবে না। অনুকরণ এবং অনুকরণের নিকৃষ্টতা এই দুই মন্দগ্রহের প্রভাবে আমাদের মন্দভাগ্য আরও মন্দ হবে। এখন আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় কলের সামগ্রী বটে, কিন্তু তখন আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করব তা' হবে খারাপ কলের খারাপ সামগ্রী।

কোনও ক্রীড়ায় যখন এক পক্ষের পরাজয় হয় তখন যেমন পরাজিত পক্ষের অন্তর্গত খেলোয়াড়রা তাদের বিফলতার জন্য পরস্পরকে দোষী করতে থাকে তেমনি আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটী নিয়ে আমাদের ও বিদেশী কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দোষারোপ করা-করি চলেছে। এর জন্যে যে আমরা উভয় পক্ষেই দোষী একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তাহলেও আমরা যখন স্বয়ং এই দোষে গভীর ভাবে লিপ্ত তখন এই ব্যর্থতার তরে কে কতটুকু দায়ী তা' নিয়ে আলোচনা করলে তাতে শুধু মিছে তক্‌রার ব্যতীত অপর কোনও লাভ হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আমরা স্বয়ং এর জন্যে কতটুকু দায়ী তা' স্থির করাই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

অনেকে শূদ্রের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বলে থাকেন ব্রাহ্মণেরাই শূদ্রদের দুর্গতির জন্য দায়ী। এই অপবাদ সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক—একথা স্বীকার করতেই হবে যে শূদ্ররা যে একান্ত কাপুরু-

-ঘর- মত তাদের উপর অত্যাচার করবার জন্যে ব্রাহ্মণদের অবসর দিয়েছিল এর জন্য বস্তুতঃ দায়ী শূদ্ররা। ব্রাহ্মণদের একমাত্র অপরাধী না করে শূদ্রদের নিজেদের এই দায়িত্বের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে আমার বোধ হয় তাদের সত্যকার উপকার করা হবে।

অতএব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য অপর পক্ষ কি পরিমাণে দায়ী সে কথা বিস্মৃত হওয়াই এখন আমাদের উচিত। আমাদের পা নাই, এই কল্পনা করে আমরা যে এতদিন বিদেশে প্রস্তুত কাঠের পা'ওয়ালা কৃত্রিম শিক্ষার মুখ চেয়েছিলেম আমাদের এই পরাসক্তির দুর্ব্বলতাকেই অপরাধী করতে হবে। গল্পে শুনেছি এক ব্যক্তি ডুব-জলে গেছে এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই একান্ত অগভীর জলের মধ্যেও প্রাণ হারিয়েছিল। আমাদের শিক্ষার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ দাঁড়িয়েছে।

মুস্কিল এই যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমাদের মনে হয় তখন হয় কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটী না হয় অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটী কিম্বা কোনও না কোনও একটা ইউরোপীয় ইউনিভারসিটীর চিত্র আমাদের মনের সম্মুখে জেগে উঠে সমস্ত মনটাকে পেয়ে বসে। তখন আমরা ভাবি তাদের প্রত্যেকের উত্তম অংশ গুলিকে নির্ব্বাচন করে নিয়ে তাদের জোড়তাড় দিয়ে একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবয়ব গড়লেই আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে। একথা আমরা ভুলে যাই যে ইউরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ইউরোপের জীবনেরই সজীব ও অঙ্গীভূত অংশ—সে-বিশ্ব-বিদ্যালয় সেখানে স্বভাব থেকেই উদ্ভূত হয়ে উঠেছে। অপর দেহ থেকে মাংস কিম্বা অস্থি নিয়ে নাসিকা ইত্যাদি দেহের খণ্ডাংশের সংস্কার করার বিধান বর্ত্তমান অস্ত্র-চিকিৎসা শাস্ত্রে আছে

বটে ; কিন্তু বাহির থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংকলন করে তাকে গ্রথিত করে একটা আস্ত মানুষ গড়ে তোলার বিদ্যা এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্বাধীন হয় নাই এবং আশা করি ভবীষ্যতে কখনও হবে না।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূর্ণ মূর্ত্তিতেই আমাদের কল্পনায় উদিত হয়। এরই তরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মূর্ত্তি ছাড়া অপর কিছুর ধারণা কর্‌তে পারি না। আমাদের প্রতিবেশীকে তাঁর পূর্ণবয়স্ক সন্তানের নিকট হতে সাহায্য এবং শুশ্রূষা লাভ কর্‌তে দেখে আমাদের মনে সন্তানের কামনা স্বভাবতঃই জেগে উঠে; কিন্তু যদি এই মুহূর্ত্তেই আমরা পূর্ণবয়স্ক সন্তানের কামনা করি তাহলে সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে হয়তঃ একটা পোষ্যপুত্র পেতে পারি কিন্তু এমন ভাবে হঠাৎ আসল পুত্র পাওয়া অসম্ভব। ফল লাভের অত্যাকাঙ্ক্ষা থেকে অনুকরণের যে জঘন্য প্রবৃত্তি জন্মায় তা' দুর্ব্বলতা মাত্র। সেই দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হওয়াতেই আমাদের মনে একেবারে প্রথম থেকেই পূর্ণ পরিণত বিশ্ববিদ্যালয় লাভ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়। এর ফলে আমাদের অধিকাংশ চেষ্টাই বিফল হয় কিম্বা যদি তা' কচিৎ কখনও সফল হয় তাতে করে আমরা মৃত্তিকানির্ম্মিত নকল ফল পাই। সেই ফল অবয়বে এবং আয়তনে আসল ফলের অনুরূপ হলেও তাকে যখন গলাধঃকরণ করি তখন আমাদের অকল্যাণই হয়ে থাকে। এই যে পূর্ণ পরিণত বিশ্ববিদ্যালয় লাভের সংকল্প আমাদের দেশের চিন্তাকে অধিকার করে আছে এ' সিদ্ধকরা ডিমেরই অনুরূপ—এ থেকে কখনও শাবক উদ্ভূত হবে এ প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। [illegible] নরা নই—আমাদের ইউরোপীয় গুরুমহাশয়রাও এ কথা বিস্মৃত হন যে তাঁদের দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে গঠিত হয়ে উঠেছে। আরম্ভে তাদের কোনও বাহ্য উপকরণের ঐশ্বর্য্য ছিল না এবং এই বাহ্য উপকরণের সহিত তাদের আসল সত্যেরও কোনও সম্পর্ক নাই। প্রথম অবস্থায় দরিদ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই যে তার শিক্ষার পৈত্তাদান করেছিল এবং তার বিদ্যার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ যে তখন দরিদ্র ছিল আজ ইউরোপ তার এই উন্নতির দিনে সে কথা বিস্মৃত হতে পারে; কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র দেশে বাহ্য উপকরণের দ্বারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারাক্রান্ত করার যে কোনও প্রয়োজন নাই এ কথা সে যদি বিস্মৃত হয় তাহলে তার ফল আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হবে। আমাদের দেশে এখন যে সব বিদ্যালয় আছে আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে তা' যথেষ্ট নহে; সুতরাং একথা মান্‌তেই হবে যে উপকরণ এবং আসবাব বৃদ্ধি করে তাদের প্রসারের পথে বাধার সঞ্চার করা কোনও মতেই বিধেয় হতে পারে না।

খাদ্যকে রাখ্‌বার জন্য পাত্রের যে একটা প্রয়োজন আছে এ কথা আমি বেশ বুঝি; কিন্তু যেখানে খাদ্যেরই অভাব সেখানে পাত্রের সম্বন্ধে কৃপণতা করা অশোভন হয় না। শিক্ষার আসবাবকে বাড়িয়ে তাকে দুষ্প্রাপ্য করে তোলা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে লোহার সিন্দুক খরিদ করারই অনুরূপ।

এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে আমাদের নিজের ভাবেই আমাদের জীবন সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে হবে। আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাবকে যথাসম্ভব খর্ব্ব করে রেখেছি। আমাদের এখানের জলবায়ু আমাদের একাজে যথেষ্ট সহায়তা করে। আমাদের এখানে প্রাচীরের আবরণের চেয়ে খোলা জায়গার বেশী দরকার। আমাদের

পোষাকে বাতাস আলোর পথ যত থাকে ততই ভাল। বস্ত্রস্তূপে আমাদের শরীরের তত দরকার হয় না। দেহের উত্তাপ রক্ষার তরে অপর দেশে উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার কর্‌তে হয়; কিন্তু আমাদের দেশে সূর্য্যের উত্তাপই দেহের উত্তাপ উৎপাদন ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এই সব প্রাকৃতিক সুবিধার ফলে আমাদের জীবন—যাত্রায় যে উপকরণ-বিরলতার বিশেষত্ব সম্ভব হয়েছে আমাদের শিক্ষা বিষয়ে সেই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করায় আমাদের কখনই কল্যাণ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

দারিদ্র্যকে মহিমান্বিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পল্লবিত বিলাসিতার চেয়ে নগ্ন সরলতা যে অধিক উপাদেয় একথা স্বীকার কর্‌তেই হবে। শুধু প্রাচুর্য্যের অভাবই যে এই সরলতা তা' নয় — ইহাই পূর্ণতার লক্ষণ। আমরা যখন এই সরলতাকে লাভ কর্‌তে পার্‌ব তখনই আমাদের গতিপথ থেকে সব অন্তরায় দূর হয়ে যাবে। এই সরলতার অভাব থেকেই আমাদের জীবন-যাত্রার উপকরণ সকল এমন দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

সভ্য জগতের অনেক অভাবই বাহুল্য মাত্র। আমরা এমন অনেক ভার বহন করি যা' একান্তই অনর্থক। এতে আমাদের বলের পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ কার্য্যদক্ষতার লক্ষণ নয়।

পশ্চিম যে দিন পূর্ণতার মধ্য দিয়ে এই সরলতাকে লাভ কর্‌বে, সেই দিন সে তার কর্ম্ম এবং শিক্ষা কে সহজ করার মধ্যেই নিজের শক্তির গৌরব অনুভব কর্‌বে। সে দিন কবে আস্‌বে জানি না; কিন্তু সে দিন না আসা পর্য্যন্ত আমাদের একথা পুনঃ পুনঃ শুন্‌তেই হবে যে উচ্চ শিক্ষা একমাত্র উচ্চতম অট্টালিকা হতেই পাওয়া যায়।

এই বাহ্য অবয়ব ও আসবাব যে পরিমাণে আত্মার বিকাশের অনুকূল হয় সেই পরিমাণে তাদের স্বীকার করতেই হবে। সেখানে তাদের অস্বীকার করলে আত্মাকেই খর্ব্ব করা হয়—এ কথা আমি জানি। তবে সেই পরিমাণটী যে কি, ইউরোপ বহু চেষ্টা সত্বেও এখনও তা' স্থির করতে পারে নি। আমরা যদি নিজে তাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি তাহলে তাতে বাধা দেওয়া কেন? দরিদ্র না হয়ে কি করে সরল হওয়া যায় এই সমস্যাকে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী মীমাংসা করতে হবে। আমরা বাহির থেকে শিক্ষার বিষয়কে গ্রহণ করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি; কিন্তু সেই সঙ্গে যদি বাহিরের প্রকৃতিকে আমাদের মধ্যে বল-পূর্ব্বক প্রবেশ করাবার চেষ্টা করা হয় তা' একান্তই অন্যায় হবে এবং আমরা তা কখনই সইব না। আমাদের গুরুমহাশয়দের এইরূপ অন্যায় চেষ্টার দ্বারাই আমাদের চিত্ত বিকৃত হয়ে গেছে। আমরা আয়তনের অনুসরণ করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছি এবং হারাচ্ছি।

৩য় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

বাঙলায় যখন জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল সে সময় তার একজন প্রধান উদ্যোগীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। একদিনের মধ্যে একটা ফুলে ফলে পূর্ণ পরিণত বিশ্ববিদ্যালয় রচনা করা সম্ভব বলে তিনি প্রকৃত বিশ্বাস করেন কি না একথা

তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে এই উত্তর দিয়েছিলেন যে যদি উহা সম্ভব না হয় তা' হলে ওর দ্বারা দেশের মন আকর্ষণ করাও সম্ভব হবে না; অতএব অগত্যা সম্পূর্ণ জিনিসটাকে দেশের সম্মুখে গোড়া থেকেই ধরা চাই। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটাকে দেশের সম্মুখে উপস্থিত করা হল—দেশও মুগ্ধ হল—অজস্র অর্থও সংগৃহীত হল—আর সমস্ত অভাবই প্রায় পূরণ হল; কেবল সেই সত্য—যা আরম্ভের ক্ষুদ্র আয়োজনকে কখনও অবজ্ঞা করে না—যে তার ক্ষীণ পর্ণপুটের মধ্যে সুমহৎ ভবিষ্যতকে বহন করতে লজ্জিত হয় না—ওই অনুষ্ঠানের মধ্যে কেবলি তারই স্থান হল না! এই নকল শিক্ষা-পরিষদরূপ গাছটা নিজেকে ফলাও কারবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টায় সঞ্চিত শক্তির ক্রমশঃ অপচয় করে করে এখন এমনি দুরবস্থার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে যে নিজের কাছেও ঠাট বজায় রাখতে পারে এমন সম্বলও তার নাই। এই থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে যে কেবল মাত্র নিজেদের একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করে তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানের অধীনে রাখলেই আমরা তাকে আমাদের করতে পারব না।

আমাদের মন যে অসন্তোষে পীড়িত হচ্ছে তার মূল কারণটা কি তা ঠিক করাই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আজ এক শতাব্দী অতীত হল আমরা ইংরাজি পাঠশালে প্রবেশ করেছি। সে অনেক দিনের কথা বটে; কিন্তু এখনও আমরা সেখান থেকে বের হতে পারি নি—এখনও আমরা সেই পাঠশালার পড়ুয়াই রয়ে গেছি। ইঁদুর কলের মধ্যে ইঁদুর আশ্রয় পায় বটে কিন্তু সেই কল তাকে বদ্ধ করারই যন্ত্র। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিও আমাদের পক্ষে

তেমনি হয়েছে। ভয় হয় পাছে এই অবস্থাটা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

কেউ জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারে না; কারণ জীবন প্রতি মুহূর্ত্তেই তার উপাদান সমূহকে অতিক্রম করে চলেছে,—একে বিশ্লেষণ করে আমরা যা' পাই এ অখণ্ডরূপে তার চেয়ে ঢের বড়। এ যে সব উপাদান গ্রহণ করে তাদের সমষ্টির চেয়ে এ ঢের বেশী। আমাদের মনও এইরূপ। সে যে সব তথ্য এবং শিক্ষা বাহির থেকে গ্রহণ করে তার চেয়ে তার দান খুব বেশী। যে শিক্ষা মনকে সজীব বলে স্বীকার করে এবং মন বাহির হতে যা গ্রহণ করে তার চেয়ে বেশী দান করবার প্রবৃত্তিকে যে শিক্ষা মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই আদর্শেই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিচার করতে হবে।

অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বাহির থেকে আমরা যা' পেয়েছি আমরা কি বিশ্বকে তার চেয়ে বেশী কিছু দিয়েছি কিম্বা আমরা কি নিজের মধ্য থেকে নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি। যখন কোনও জাত বিশ্বের গলগ্রহ হয়ে পড়ে—যখন বিশ্বের সহিত তার দেনা পাওনার হিসাব করলে দেখা যায় তাকে বহন করতে বিশ্বকে যে খরচের দায়ী হতে হয় তার মূল্য তার দানের চেয়ে বেশী হয়ে পড়েছে তখন তার সেই অবস্থায় বেঁচে থাকার অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। কেননা এইরূপে কেবলি পরের সামগ্রী অপহরণ করে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয় অবস্থা।

আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যা' গ্রহণ করি তাকে তার চেয়ে বেশী দেওয়া দূরের কথা আমরা ততটুকুও তাকে ফেরত

দিই না। আমরা বড় বড় কথা কই—আমরা অনেক সত্য তত্ত্ব শিক্ষা করি—অনেক সুমহৎ দৃষ্টান্তেরও পরিচয় পাই; কিন্তু তার ফলে আমরা হয় কেরাণী না হয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা বড় জোর উকীল না হয় ডাক্তার হই।

ডাক্তার হওয়া যে সামান্য ব্যাপার একথা বলছি না; কিন্তু যদিও আমাদের ডাক্তারেরা আজকাল দেশের সর্ব্বত্রই চিকিৎসা করছেন—যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনও করেছেন তাহলেও তাঁদের এই বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে কোনও নূতন তত্ত্ব কিম্বা কোনও নূতন ঘটনা উদ্ভূত হয় নাই, তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের মধ্যে এতটুকু মাত্রও নিজেদের নূতন সৃষ্টি দান করতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত তাঁরা যা' শিখেছেন তাহাই অতি সতর্কভাবে প্রয়োগ করে আসছেন। ছাত্রই কালক্রমে শিক্ষকে পরিণত হয়। যখন এর ব্যতিক্রম হয় যখন ছাত্ররা ছাত্রই থেকে যায় এবং শিক্ষকের যোগ্যতা লাভ করতে পারে না তখন দেশের যে দারুণ ক্ষতি হয় তা' পূরণ করবে এমন সাধ্য কারও এবং কিছুরই নাই।

অবশ্য আমাদের স্বাভাবিক শক্তির অভাব থেকে যে এরূপ হচ্ছে এ কথা আমি স্বীকার করি না। আমাদের ইতিহাস থেকে দেখতে পাই আমাদের অতীতের মধ্যে এমন একটা সুদীর্ঘ যুগ এসেছিল যখন আমাদের দেশের আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সজীবতা ছিল, যখন ইহা সজীব বৃক্ষের মতই দেশের সর্ব্বত্রই শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছিল। এই থেকে অন্ততঃ আমরা এইটুকু শিক্ষা লাভ করি যে সেই বিগতযুগে আমাদের চিত্ত যা' লাভ

করত তার সঙ্গে তার একটা সজীব বন্ধনের সূত্র ছিল—তখন আমরা কেবলি মুখস্থ করতাম না তখন আমরা পর্য্যবেক্ষণ করতাম পরীক্ষা করতাম এবং নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করে তাকে জীবনের কাজে প্রয়োগ করবার প্রয়াস পেতাম।

আমাদের চিত্তের এই উদ্যম ও সৃষ্টি-শক্তি আজ কোথায় অন্তর্হিত হল? কেনই বা আজ আমরা শিক্ষার ভারে অভিভূত হ'য়ে ভয়ে ভয়ে এমন জড় সড় হয়ে ফিরছি? তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে চিরকাল আমরা কেবলি পরের শিক্ষার ভারবাহী কৃতদাস হয়ে থাকব? আমি বলি—"তা হতেই পারে না; কেননা আমাদের সুযোগের এই বিরলতা এবং ক্ষেত্রের এইরূপ সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও এই প্রাণহীন শিক্ষার মধ্য থেকেই যখন জগদীশ চন্দ্র বসুর এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ন্যায় বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তার শীলের ন্যায় চিন্তাশীল পণ্ডিতের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে তখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টি শক্তির অভাব নাই সেই শক্তি কেবল যন্ত্র তন্ত্রের অতি-ভারে এবং নির্ম্মম অবজ্ঞা এবং অসুবিধার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মাত্র।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্য রতন প্রামানিক।

নারীর পত্র

—:*:—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়"

কবির এ প্রশ্নের সোজা উত্তর, আমরা চাই কেননা আমরা স্ত্রীলোক। স্বাধীনতা হীনতায় আমরা যে বাঁচতে চাই তার কারণ আমাদের বিশ্বাস ঐ অবস্থাতেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচেবর্তে থাকতে পারি।

এরূপ ইচ্ছা যে আমাদের হয় আর এরূপ বিশ্বাস যে আমাদের আছে তার অবশ্য কারণও আছে।

পরাধীনতায় আমরা যুগ যুগ ধরে এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে সেই অভ্যাসের গুণেই স্বাধীনতা আমাদের আরামের ব্যাঘাত করবে। আর বে-আরামে কার লোভ হয়?

তার পর আমাদের গুরুজনেরা আর গুরুরা, ভর্ত্তারা এবং কর্ত্তারা যুগ যুগ ধরে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে অধীন থাকাতেই, পুরুষের সেবা করাতেই, নারীর নারীত্ব। পুরুষের আমরা যত বেশী অধীন হব, যত বেশি আজ্ঞাবহ হব, আমাদের জীবন পুরুষে যত বেশি লীন হয়ে যাবে, আমাদের আত্মা তত বেশি উর্দ্ধগামী হবে এবং শেষটা একদম স্বর্গে গিয়ে উঠবে। এক কথায় আমরা যত বেশি দাসী হব তত বেশি দেবী হব। এ সকল ধর্ম্ম উপদেশ আমাদের

মনে এতটা শিকড় গেড়েছে যে আমাদের আশঙ্কা যে স্বাধীনতা লাভ করলেই আমরা আমাদের দেবীত্ব হারাব। এই ভয়েই আমরা স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচতে চাই স্বাধীনতা নিয়ে মরতে চাই নে।

ইংরাজ-রাজ যখন আমাদের পুরুষদের স্বাধীনতা লাভের ছট-ফটানি দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন তখন আমার মনে হয় যে ইংরাজ বেচারাদের মাথায় মগজ নেই আছে শুধু কাগজ। ইংরাজ যদি আমাদের পুরুষদের দিবারাত্র বলত যে তোমাদের মত আধ্যাত্মিক জাত পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। অপর পক্ষে আমাদের ইংরাজদের মত ঐহিক-ভোগ-ঐশ্বর্য্য-লুব্ধ-দেহাত্মজ্ঞানী জাত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই, এক কথায় দাস মাত্রেই দেবতা তাহলে এদেশের পুরুষরা পাছে তাদের দেবত্ব নষ্ট হয় সেই ভয়ে তাদের দাসত্ব কিছুতেই ছাড়্তে চাইত না। কিন্তু গোরা লোকে বলে যে তারা কালা আদমির চাইতে শ্রেষ্ঠ জীব কাজেই দেশের লোকের মেজাজ বিগড়ে যায় এবং তখন তারা মরিয়া হয়ে গান ধরে দেয়ঃ—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়"

এইত গেল স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে আমাদের অপ্রবৃত্তির কারণ।

তারপর পুরুষরা যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার ধূয়ো ধরেন, তখন যে আমরা তার দোহার দিতে কুণ্ঠিত হই, তার কারণ পুরুষদের ও কথায় আমরা বিশ্বাস করি নে। তাঁরাও বিশ্বাস করেন কি না বলা কঠিন, কেননা ও কথার বিলেতে জন্ম। সে যাই হোক আমাদের সন্দেহ হয় যে আপনাদের মুখে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথাটা মিছে। মুখের কথায় আমাদের ভোগা দিয়ে আপনারা আমাদের দ্বারা আপনাদের কোনও

মতলব হাসিল করিয়ে নিতে চান। আপনাদের কথায় যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাতে আমাদের দোষ নেই, কেননা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেই বলে যে স্ত্রীলোকের কাছে মিথ্যে কথা বলায় পুরুষের কোনও দোষ নেই। তা ছাড়া আমাদের কাছে পুরুষেরা কত সত্য কথা বলেন সে বিষয়ে আমাদের নিজেদেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। যাক্ ও সব সাধারণ কথা। এখন একটা কাজের কথায় আসা যাক।

কি কাউন্সিল কি কংগ্রেস দুদিক থেকেই আমাদের ডাক পড়েছে ভোট নেবার জন্যে। এ ডাকাডাকির মানেটা কি? যাদের কোনও স্বাধীনতা নেই তাদের একলম্ফে পলিটিকাল স্বাধীনতায় উঠে যাও বলাটা কি ঠাট্টার মত শোনায় না। "ওঠ ছুঁড়ি তোর পলিটিকাল বিয়ে" কথাটা হুকুমের মত শোনায়। আমাদের জন্ম যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, আমাদের মৃত্যু যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, আমাদের বিবাহও তেমনি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। আমাদের কুমারী থাকা না থাকার উপর আমাদের কোনরূপ এক্তিয়ার নেই, আমরা পরের হুকুমে সধবা হতে বাধ্য, অপর পক্ষে একবার বিধবা হলে দ্বিতীয়বার সধবা হবারও আমাদের এক্তিয়ার নেই, আমরা বিধবা থাকতে বাধ্য। কুমারী আমরা থাকতে পাব না কিন্তু বিধবা আমাদের থাক্‌তেই হবে। যার নিজের বিয়েতে ভোট নেই নিজের প্রভু সম্বন্ধে যে স্বয়ম্বরা হতে পারে না তাঁর পক্ষে দেশের প্রভু সম্বন্ধে স্বয়ম্বরা হবার অধিকারের কি কোনও অর্থ আছে? এই থেকেই মনে হয়, যে কারণে পলিটিসিয়ানরা জনগণকে নিয়ে টানাটানি করছেন সেই একই কারণে আমাদের নিয়েও টানাটানি কর্‌ছেন অর্থাৎ তাঁদের নিজের যে অভাব আছে, আমাদের

দিয়ে তা পূরণ করিয়ে নিতে। পলিটিসিয়ানরা জনগণকে দলে টানছেন তাদের বাহুবলের জন্য আর আমাদের টানছেন আমাদের চরিত্রবলের জন্য। এই দুই বল যে পেশাদার পলিটিসিয়ানদের দেহে নেই, এ সত্য কে না জানে।

অপর পক্ষে যাঁরা স্ত্রী-ভোটের বিরোধী তাঁদের ভয় যে ভোট পেলে আমরা সকলে পুরুষ হয়ে যাব। এ আশঙ্কা অমূলক। ভোটের এমন কোনও শক্তি নেই যে ভগবানের সৃষ্টি উল্টে দিতে পারে। ভোট বনমানুষের হাড় নয় যে নুনকে চুন ও চুনকে নুন বানাতে পারে। অবশ্য আজ ভোট পেলে কাল আমরা সবাই পুরুষ মতের নীচে ঢেরাসই দেব, কেননা আমাদের স্বমত বলে আজ কোনও জিনিষ জন্মায়নি। কিন্তু আমরা যদি কখনো সত্যি সত্যি স্বাধীনতা পাই তাহলে দুনিয়ার লোক দেখতে পাবে যে স্ত্রীমত বলেও একটা পদার্থ আছে যা পুরুষ মতের অপভ্রংশ নয়। ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিন বর্ত্তমানেই দেখতে পাচ্ছি যে বর্ত্তমান রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি আমাদের মনের সহজ আনুকূল্য নেই। কেন নেই শুনতে চান? বলছি—

নিরুপদ্রব অসহযোগীতা আমাদের ধাতে নেই কেননা সৃষ্টির আদি থেকে আমাদের প্রভুদের সঙ্গে আমাদের যা সনাতন সম্বন্ধ সে হচ্ছে সোপদ্রব-সহযোগীতা। আর আমার বিশ্বাস সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত আমাদের পরস্পরের ভিতর এই সম্বন্ধই কায়েম থাকবে, যেহেতু তা থাকা উচিত।

একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবেন যে আমার কথা ঠিক। ধরুন যদি আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য পুরুষদের সঙ্গে নিরুপদ্রব

অসযোগীতা স্বরু করি তাহলে তার ফলে আমাদের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিও লোপ পাবে। আর ইতিমধ্যে আমাদের প্রভূরা যদি চটেমটে হঠাৎ একদিন সমুদ্র-যাত্রা করেন ত জলে পড়্ব আমরা। সুতরাং পুরুষদের দিক দিয়েই দেখুন আর স্ত্রীলোকের দিক দিয়েই দেখুন পুরুষদের সঙ্গে সহযোগীতা আমাদের কর্ত্তব্য এবং সে সহযোগীতা সোপদ্রব হতে বাধ্য, যেহেতু পুরুষ আর স্ত্রীলোক এক জাত নয়। স্বাধীন স্ত্রী-জাতীয়তার সঙ্গে স্বাধীন পুরুষ-জাতীয়তার দিবারাত্র সংঘর্ষ হবেই হবে।

এত কথা যে বল্লুম সে স্বধু এই বোঝাবার জন্য যে পুরুষের পলিটিকসের সঙ্গে স্ত্রীলোকের পলিটিক্‌সের আশমান জমিন ফারাক। উদাহরণ স্বরূপে হাল পলিটিক্সের কেজো কথাগুলি ধরা যাক। বলা বাহুল্য সে পলিটিক্সের আধ্যাত্মিক অংশের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই—কেননা পুরুষেই ত আবিষ্কার করেছে যে স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। চলতি পলিটিক্সে তিনটি বড় কাজের কথা আছে। প্রথম উকিলের আদালত ত্যাগ, দ্বিতীয় ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়া তৃতীয় দেশী বিলেতি মিলের কাপড় পোড়ানো। এ তিনটির কোনটিই আমরা হিসেবী কাজ বলে মানি নে।

আদালতে যে উকিলের ভিড় কমা দরকার তা আমরাও জানি তাই বলে সবাইকে যে ওকালতী ছাড়তে হবে এ কথা মানি নে। উকিল আদালতে যায় সরকারের সঙ্গে সহযোগ করতে নয় সপরিবার নিজের অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করতে। এ ক্ষেত্রে ওকালতি ত্যাগ করতে তিনিই পারেন যিনি আদালতে দেদার পয়সা করেছেন কিম্বা এক পয়সাও করতে পারেন নি—অর্থাৎ আদালতের আমির ও ফকিরের

দল। বাদবাকী যারা খেটে খায় তারা যদি না খাটে তাহলে তাদের যাই হোক তাদের স্ত্রীদের হবে সধবার একাদশী। তার পর কাপড় পোড়ানোর সার্থকতা আমরা দেখতে পাইনে। বোধ হয় তার কারণ আমরা শিক্ষিত নই। আমাদের মনে হয় বিলেতি কাপড় না পুড়িয়ে ছিঁড়লে স্বরাজ্যের কোনও ক্ষতি হত না অপর পক্ষে তাতে আমাদের গৃহরাজ্যের ঢের লাভ হত। ন্যাতাকানী যে গেরস্থালীর বহুকাজে লাগে সে সত্য অবশ্য আপনাদের কাছেও অবিদিত নেই। আর যদি পোড়ানটা আপনাদের মোক্ষলাভের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে কাপড় ছিঁড়ে আমাদের হাতে দিলে আমরা তার সলতে পাকিয়ে তৈলসিক্ত করে প্রদীপ জ্বালাতুম, তাতে সে কাপড়ও পুড়ত এবং সেই সঙ্গে আমাদের ঘরও আলো হত।

কিন্তু আপনাদের কাছে এ সকল যুক্তি দেখানো বৃথা, যেহেতু কাপড় পোড়ানোর আপনারা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করেছেন। বস্ত্রদাহের নাম যখন হয়েছে বস্ত্রযজ্ঞ তখন তার উপর আর কথা বলে চলে না, বিশেষত আমাদের তরফ থেকে। আপনারা যখন আমাদের আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য, ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমাদের জ্যান্তে পুড়িয়ে ছাই করতেন তখন আপনাদের নিজের আত্মার পবিত্রতা রক্ষার জন্য আপনারা ঢাকঢোল বাজিয়ে যে কাপড় পুড়িয়ে ছাই করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আশা করি সতীদাহের ফলে আমরা যেমন হাত হাত স্বর্গরাজ্য লাভ করতুম বস্ত্রদাহের ফলে আপনারাও তেমনি হাত হাত স্বরাজ্য লাভ করবেন।

আর এক কথা না বলে থাকতে পারছি নে। জানেনই ত আমরা কিছু বেশি বকি। যাদের হাত চলে না তাদের মুখ চলে—

এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। ধূতির সঙ্গে শাড়ী সহমরণে যেতে পারবে না। ধূতি পুড়িয়ে আপনারা কৌপিন ধারণ করতে পারেন তাতে আপনারা হয়ে উঠবেন মহাপুরুষ যেমন সেকালে পুরুষেরা পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হতেন। বলা বাহুল্য আমাদের পক্ষে বসনের ওরূপ সংক্ষিপ্ত সার অঙ্গীকার করা অসম্ভব। অথচ আমরা যদি বসন সঙ্কোচ না করি, তাহলে দেশে কাপড়ের অভাব ঘুচবে না। পুরুষের চাইতে কাপড়ের খরচ আমাদের যে কেন ঢের বেশি তার হিসেব দিচ্ছি। আমরা পরি দশহাত শাড়ী বেহারী স্ত্রীলোকে বারো হাত, গুজরাটী স্ত্রীলোক চৌদ্দ হাত, মাদ্রাজী স্ত্রীলোক ষোল হাত, মারহাট্টি স্ত্রীলোক আঠারো হাত। আর যারা শাড়ী না পরে ঘাঘরা পরে, তাদের কাপড় চাই দশগজ থেকে বিশ গজতক্। এই হিসাব দৃষ্টে আমার মনে হয় পুরুষরা যদি সবাই ধূতি ছেড়ে লুঙ্গি পরেন তাহলে পুরুষ পিছু পাঁচ হাত করে কাপড়ের সাশ্রয় হয় উপরন্ত তাতে হিন্দু মুসলমানের স্ত্রী পুরুষের গৃহস্থ সন্ন্যাসীর প্রত্যক্ষ প্রভেদটা দূর হয় এক কথায় বেশের হিসেবে ও দেশের হিসেবে দু-হিসেবেই এই লুঙ্গীধারণ পুরুষদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য! বিশেষত যখন লুঙ্গিই হচ্ছে আপনাদের এ যুগের বিকচ্ছ বীরত্বের উপযুক্ত প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

তারপর স্কুল কলেজ ছাড়বার কথা। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে পুরুষরা যদি ছেলেদের পক্ষে স্কুল কলেজ ছাড়া একান্ত আবশ্যক মনে করেন ত ছেলেরা তা ছাড়ুক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে স্কুল কলেজ ভাঙ্গবার কোনও প্রয়োজন দেখি নে। স্ত্রী-স্বাধীনতার গোড়া পত্তন ত স্ত্রী-শিক্ষাতেই হবে। অতএব সরকারি স্কুল কলেজে আমাদের সব ভর্ত্তি করে দেওনা

কেন? স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে তোমাদের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে স্ত্রী পুরুষের এক শিক্ষা হওয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সে আপত্তি ত আর টেকে না। কেননা ছেলেরা যখন ন্যাসনাল স্কুলে চরকা কাটতে বসল তখন সরকারী স্কুলে আমরা জ্ঞান বিজ্ঞান কাব্য দর্শনের চর্চা করলে, পুরুষদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের শিক্ষার আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকবে। আর সরকারী স্কুলে ছেলে পাঠানো সম্বন্ধে তোমাদের প্রধান আপত্তি সেখানে ছাত্রের অন্তরে দাস মনোভাব জন্মে। ছাত্রী সম্বন্ধে সে আপত্তি ত খাটে না। সরকারী স্কুলে পড়ে আমাদের দাসী মনোভাব পাকা হয় তাহলেই ত আমরা পুরো দেবী হব।

আমার শেষ কথা এই যে এ সব স্বরাজ লাভের নিকপায়ের উপায় হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। কেননা স্বরাট ভারতবর্ষেও, অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা ও শিক্ষা সমস্যা সমান বজায় থাকবে যেমন অপরাপর সকল স্বরাট দেশে পূর্ণমাত্রায় আছে।

জনৈক সন্নারী।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

[illegible]কারী সম্পাদক—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

*লেখকের প্রার্থনা

—:*:—

(১)

চুয়ান্ন মাস আগে যে কলম আমার হাতছাড়া হয়েছে, সেই কলম আবার ধরবার মুহূর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে, হে মানবের আত্মা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। যে ভীষণ প্রলয়কাণ্ড পার হয়ে আমরা এসেছি, তার মধ্যে তুমি সর্ব্বদাই নিজের পথ ও দিক নির্ণয়, নিজের স্বাধীনতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার চেষ্টায় ফিরেছ, এবং তা পাবার আশা কখনও ত্যাগ করনি ;

হে মানবের বেদনা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। নীরব তুমি, অসীম তুমি, কখনো তুমি পরীক্ষাদানে কুণ্ঠিত হওনি, সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা তুমি বুক পেতে নিয়েছ,—গোলাবর্ষণ, বারুদ-উৎক্ষেপ, বিষবাষ্প, অগ্নিবাণ, দুষ্টক্ষত, অঙ্গচ্ছেদ, ক্ষুধা, শৈত্য, ভয়, সংশয়, বিচ্ছেদ ও হতাশা ;

হে মানবের করুণা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। পৃথিবীময় তুমি বিনীত ও একনিষ্ঠ সেবক জাগিয়ে তুলেছ, এবং সর্ব্বত্র যেখানে ব্যথা সেখানে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছ। সংক্রামক রোগ কর্দ্দম ও শীত, বস্ত্রাভাব ও গৃহদাহ, হিংসা নিরাশা ও নিঃসঙ্গতা,—এরাই ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দী ;

*Jean Richard Bloch-এর Carnaval est mort নামক ফরাসী গ্রন্থ হইতে। এই ফরাসী লেখক চুয়ান্ন মাস ইয়োরোপীয় মহাসমরে যুদ্ধ করে' করে' কাটিয়েছেন। ফিরে এসে তিনি উপরিউক্ত গ্রন্থ লিখেছেন।

হে মানবের বন্ধুতা,—পুরুষে পুরুষে বন্ধুতা ও মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুতা,—তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। মনুষ্যজাতির উচ্ছেদসাধনের এই যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, সে সময় তুমি প্রকৃতই জাতি-সংযোজনের কাজ করেছ। তুমি আমাদের সকলকে সহ্য করবার ও অগ্রসর হবার শক্তি দিয়েছ, আনন্দ ও আশাপূর্ণ মনে থাকবার বল দিয়েছ;

মানবের আত্মা, মানবের বেদনা, করুণা ও বন্ধুতা,—তোমাদের এই চতুষ্টয়ের কাছে আমি মাথা নত করি, কারণ তোমরা আমার মনুষ্যজন্মগ্রহণের লজ্জানিবারণ করেছ। তোমরা আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছ যে, নরজন্ম বা নারীজন্ম লাভ করায় যেমন বিপদভয় আছে, তেমনি গৌরবও আছে; নর এবং নারীর প্রতি তোমরা আমার ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্দ্ধন করেছ।

(২)

আজ আমি ফিরে এসে এক নতুন পৃথিবী দেখছি। এ পৃথিবী যুদ্ধের আগেকার মতই আছে, সে কথা বল্লে শুনব না; আমাদের ছেলেরাই ঠিকমত বল্‌তে পারবে যে কি-পরিমাণে এখনই আমরা এক আলাদা পৃথিবীতে বাস করছি, এবং কি-পরিমাণে আরও বেশি বদল হবার উপক্রম দেখা যাচ্ছে,—শুভস্য শীঘ্রং।

যে পুরাতন পৃথিবীতে আমরা মানুষ হয়েছি ও যেটি আমাদের সামনে আদর্শরূপে ধরা হয়েছে,, সেই পৃথিবী থেকে হিংসা, অবজ্ঞা, শক্তিমত্তা, আত্মাভিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি অবতারবিশেষ লোপ পেয়েছে।

আবার কলম ধরবার মুহূর্ত্তে আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী আমাদের সকলেরই ভার অতি সহজে বহন করতে পারে, এ.

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যেক মানুষে যেন আশ্রয়নিমিত্ত একটি সুভব্য চাল, এবং ছেলেদের স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ করবার নিমিত্ত একটি সুযোগ্য ভূমিখণ্ড লাভ করে;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী আমাদের সকলকেই অতি সহজে পোষণ করতে পারে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে শরীরের খাদ্য এবং মনের খাদ্য যেন সমান সুপ্রাপ্য হয়;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবীতে সকলকারই পক্ষে পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র, সাগর এবং খনি রয়েছে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কখনো যেন বলবীর্য্য, গৌরব, সাম্রাজ্য, আত্মাভিমান, স্বার্থ বা জাতীয় প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়ে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট না করা হয়;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবীর বাতাসে ও ধান্যে কারোর চেয়ে কারো অধিকার কমবেশি নয়, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক, অথবা কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দল যেন তার ঐশ্বর্য্য, বংশমর্য্যাদা বা দারিদ্র্যের নামে বাদবাকি সকলের উপর এমন কোন অন্যায় শাসনতন্ত্র স্থাপন করতে না পারে, যার ফলে দুর্দ্দান্ত. ক্রুর এবং শঠ লোকের অভ্যুদয় অনিবার্য্য;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী, যেখানে "কিছু না" থেকে 'কিছু' উৎপন্ন হয় না, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে যেন শ্রমকে সকলের পক্ষেই সমান কর্ত্তব্যের ও সমান সম্মানের পদবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়,— অথচ এমন ধীরভাবে যা'তে প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রবণতার ব্যাঘাত না ঘটে।

(৩)

আবার কলম ধরবার মুহূর্ত্তে, যারা এই যুদ্ধে হত হয়েছে, সেই

পরিচিত-অপরিচিত বয়স্যদের আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে;

যারা চিন্তাক্লিষ্ট মনে অথচ হাস্যমুখে নিয়তির সম্মুখীন হয়েছে, আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তাদের জানাই, কারণ তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে;

এই যুদ্ধব্যাপারের সময় যাদের মনে নিঃস্বার্থ কোন ভাব স্থান পেয়েছে, আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তাদের জানাই, কারণ তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে।

এই মুহূর্ত্তে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মানুষের দুঃখকষ্ট যেখানে দেখ্‌ব সেইখানেই তার খোঁজ করা, প্রতিবাদ করা এবং দূর করার কাজে আরো বেশি করে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব;

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মানুষের মর্য্যাদার যে সকল উপাদান—আত্মশক্তি, বেদনা, করুণা, বন্ধুতা, সহিষ্ণুতা, বিদ্রোহভাব, কাজ, স্বাধীনতা, আনন্দ ও নিঃস্বার্থপরতা,—আমার লিপিচাতুর্য্যকে তারই সাহায্যে ব্রতী করব;

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে কখনো ভুলব না।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ*

———:*:———

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সজীব পদার্থ মাত্রেই শিক্ষার মত নিজেকে অতিক্রম করে অনেক দূর ব্যপ্ত হয়ে থাকে। অতএব তার একটী ক্ষুদ্র এবং একটী বৃহৎ সত্তা আছে। এর এই ক্ষুদ্র সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়—একে আমরা স্পর্শ কর্‌তে—ধারণ কর্‌তে এবং আয়ত্ত করতে পারি। এর অপর সত্তাটী অনির্দ্দিষ্ট। এর কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই—এ দেশে এবং কালে অসীম হয়েই বিস্তৃত হয়ে থাকে। যখন আমরা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেখি তখন তাদের এই ক্ষুদ্রতর সত্তা অর্থাৎ তাদের অট্টালিকাশ্রেণী- তাদের আসবার পত্র ও তাদের আইন কানুনই প্রধানতঃ আমাদের চোখে পড়ে। এর বৃহত্তর সত্তা আমরা দেখতে পাই না। নারিকেলের শাঁস যেমন সমগ্র নারিকেলকেই আশ্রয় করে থাকে তেমনি ইউরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলিও তাদের সমগ্র দেশকে আশ্রয় করে আছে। কি সমাজে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যে দেশের সমস্ত চেষ্টার মধ্যেই তারা স্থান পায়। যে সব ভাব তাদের পাঠ্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় সেই সব ভাব যে সব মানুষের চিন্তা—চেষ্টা ও সমালোচনা থেকে উদ্ভূত সেই সব মানুষ সজীব ভাবেই তাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে।

*রবীন্দ্রনাথের The centre of Indian culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

সজীব চিত্তের সাধারণ যোগসূত্রের দ্বারা তাদের শিক্ষক এবং ছাত্র-মণ্ডলী একই শিক্ষার সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে থাকে, তাদের এই যোগ সজীব ও জ্যোতির্ম্ময়। মোটের উপর তাদের শিক্ষার একটী চিরস্থায়ী আধার আছে—সেটী তাদের চিত্ত; তার একটী উৎস আছে—সেটী তাদের অনুশীলন এবং সেই শিক্ষাকে প্রয়োগ করবার একটী ক্ষেত্র আছে—সেটী তাদের সামাজিক জীবন। তাদের চিত্ত অনুশীলন ও জীবন যাত্রার মধ্যে এই যে একটী সজীব যোগ আছে এরই দ্বারায় তারা ভিন্ন ভিন্ন কাল হতে সত্য আহরণ করে—তাকে অনুশীলনের দ্বারা জীর্ণ করে তাই দিয়ে তাদের সভ্যতাকে নব নব সম্পদে মণ্ডিত কর্‌তে পেরেছে।

পক্ষান্তরে যারা আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মত বাস্তবিক মানসিক উন্নতির জন্য নয়—কেবল বাহিরের সুবিধা লাভের তরে গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদের মন ও বুদ্ধি স্বভাবতঃই শীর্ণ হয়ে পড়ে। যে সব শিশু কৃত্রিম দুধ খায় তাদের স্বাস্থ্যের যে দশা হয় এইরূপ লোকের মন ও বুদ্ধিরও সেই দশা হয়ে পড়ে। তাদের বুদ্ধিতে সাহস থাকে না তার কারণ তারা যে সব ভাব শিক্ষা কর্‌তে বাধ্য হয় সেই সব ভাব যে বেষ্টন এবং যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত তারা তার পরিচয় লাভ কর্‌বার আদৌ অবকাশ পায় না। এই রূপে সেই সব ভাবের ইতিহাস তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় এবং তাদের সম্বন্ধে তাদের এই পরিপ্রেক্ষিত ধারণার অভাব বশতঃ তারা তাদের তাৎপর্য্য যথাযথ গ্রহণ কর্‌তে পারে না। তারা শাদার উপর কাল রঙের মুদ্রিত অক্ষরের মায়ায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে; সেই অক্ষরের আদি যে মানুষ তাকে বিস্মৃত

হয়। তারা যে এইরূপে শুধু বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ করে তাহা নহে—তাদের বিচারের আদর্শকেও তারা বিদেশীর কাছে ধার করতে থাকে। অতএব শুধু যে টাকাটা তাদের নিজের নয়—তা নয়—এই টাকা তারা যেখানে রাখে সে পকেট্টা পর্য্যন্ত অপরের। আমাদের এই শিক্ষার বাহনটী আমাদের তার মধ্যে চড়িয়ে বহণ করে না—এ তার পশ্চাতে আমাদের বেঁধে টেনে হিঁচড়ে চলে। এই দৃশ্য যেমনি করুণ তেমনি হাস্যকর। যে ইউরোপীয় সভ্যতার সত্য ও শক্তি তার গতিশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই আমাদের কাছে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের মত আড়ষ্ট হয়ে উপস্থিত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রকে আপ্ত বাক্য বলে আমাদের মন যেমন তার সমালোচনা করতে সাহসী হয় না—ইউরোপীয় সভ্যতার সম্বন্ধে আমাদের আচরণও সেইরূপ দাঁড়িয়েছে।

এই করে আমরা সজীব সত্যের গতিশীলতাকে হারিয়েছি। ইংরাজের চিত্ত আদি ভিক্টোরিয়া যুগ থেকে মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগে এবং মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগ থেকে ভিক্টোরিয়ার পরবর্ত্তী কালে কত ভাব—কত আদর্শ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে তা' দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়।

আর আমরা? আমরা যদিও সেই ইংরাজের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করছি—তথাপি আমরা সেই সব ভাব ও আদর্শের একটা না একটাকে ধরে তাদেরই সনাতন বলে ধরে বসে আছি। আমরা আমাদের শিক্ষকদের চলমান চিত্তের তালে তালে চালাতে পারছি না—আমরা কেবল এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে লাফিয়ে চল্‌তে চল্‌তে জীবনের সামঞ্জস্য থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি। আমাদের মধ্যে

কেহবা মিল—বেন্থাম্, কেহবা চেষ্টারটণ্—বার্ণার্ড সর মতের মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে চলেছি। তাদের পরস্পরের মধ্যে যে একটা ঘাত প্রতিঘাতের অনিবার্য্য যোগ আছে তা'আমরা দেখ্‌তে পাই না। আমরা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বলে যখন গর্ব্ব করি তখন একথা বিস্মৃত হই যে বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে উত্তীর্ণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৫ম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সজীব সূত্রের মধ্য দিয়েই জীবনের সহিত জীবনের সম্মিলন ঘটে; সুতরাং চিত্তের প্রাণ যে শিক্ষা তা কেবল জীবন্ত মানুষের মধ্য দিয়েই জীবন্ত মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যা এবং শাস্ত্রের সূত্র কেবল আমাদের বিদ্যাভিমানকে বাড়িয়ে তোলে মাত্র। এই সব শিক্ষা স্থাবর বলে পরিমানে সহজেই বেড়ে যায়। এইরূপে অর্জ্জিত শিক্ষার সঞ্চয়কে সতর্কতার সহিত রক্ষা করায় আমরা এক প্রকারের ভোগসুখ অনুভব করি। কিন্তু প্রকৃত যা' শিক্ষা তা অনুশীলনের দ্বারায় কেবলি চল্‌তে থাকে, বাড়্‌তে থেকে এবং দিন দিন অধিকতর প্রাণময় হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে শুধু তাদের সমাজে শিক্ষিত মানুষের বেষ্টনেব মধ্যে বাস করে তা নয় তারা তাদের

শিক্ষকের কাছ থেকে অব্যবহিত ভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা সিদা সূর্য্যের নিকট হতেই আলোক পায়। শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে যে একটী মানবীয় সম্বন্ধ আছে তাহাই এ স্থলে সূর্য্যের কাজ করে। আমাদের এই সূর্য্যের স্থলে আছে কঠিন চকমকি পাথর অনেক পরিশ্রমের পর অনেক ঠোকাঠুকি করে আমরা তা থেকে অসম্বন্ধ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করি মাত্র। তাতে যতটা আলোক উৎপন্ন হয় তার চেয়ে শব্দটাই বেশী হয়ে পড়ে। বস্তু বিবর্জ্জিত পুঁথিগত শিক্ষাই এই চকমকি। এ এক কঠিন প্রথার মধ্যেই আবদ্ধ।

আমাদেয় দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আসবাবই আছে, নাই কেবল শিক্ষা দিবার এই মানুষটী। তার পরিবর্ত্তে আমাদের এখানে আছে পুঁথিগত শিক্ষা সরবরাহ করবার একপ্রকারের যোগাড়ে। মনে হয় পুস্তকালয়ের অধিদেবতাটী যেন মুর্ত্তিমান হয়ে তাদের মুখে কথা কইছে। তারা এই দেবত্বের গর্ব্বে আমাদের ছাত্রদের স্বভাবতঃ অস্পৃশ্য ভেবে দূরে রেখে চলেন। এই দূর থেকে তারা ধীরে ধীরে আলগোচে আলগোচে ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার দান বিতরণ করতে থাকেন এবং পাছে জাত যায় এবং শুচিতা নষ্ট হয় এই ভয়ে তারা তাদের নিজেদের এবং ছাত্রদের মধ্যে নোটবুকের প্রাচীর তুলে ব্যবধানের পর ব্যবধান রচনা করেন। এইরূপে অবজ্ঞার মধ্যে আমরা যে খাদ্য পাই তাতে রুচিও থাকে না এবং পেটও ভরে না। দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বাহাদুর অনশন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে রসদ বিতরণ করেন তাতে যেমন তুষ্টি হয় না কোনও ক্রমে প্রাণটা বাঁচে মাত্র এও ঠিক তাই। যে শিক্ষা মানুষের প্রয়োজনকে

অতিক্রম করে করে চলে এ সে শিক্ষা নয়। এ এমন কি আমাদের একান্ত প্রয়োজনের চেয়েও কম।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা একথা প্রমাণ কর্‌তে না পার্‌ব যে আমাদের নিয়ে বিশ্বের দরকার আছে আমাদের ছেড়ে সে টিক্‌তে পারে না আমরা এ জগতে পরের সাধনার উপজীবি হয়ে একান্ত গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাক্‌তে আসি নি—আমরা ভিক্ষুক নহি এবং আমাদের দেনা পরিশোধ দেবার যোগ্যতা আছে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে পরের অনুগ্রহের অপেক্ষা করে থাক্‌তেই হবে। কখনও অপেক্ষা করে, কখনও তোযামোদ করে কখনও বা দাসত্ব করে কিম্বা অপর কোনও না কোনও লাঙ্গুল সঞ্চালন বিদ্যার দ্বারাই আমাদের এই অনুগ্রহটুকু পেতে হবে।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বিশ্বকে শ্রদ্ধার যোগ্য কিছু দিতে না পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কিছু দিবার তরে কারও আগ্রহ থাক্‌তে পারে না। কিন্তু এর তরে আমরা কাকে অপরাধী কর্‌ব? যে মানুষ কেবল বেঁচেই থাকে কিছু উৎপাদন কর্‌তে পারে না তাঁকে নিখিল বিশ্বের সমগ্র পতিত ভূমি দান কর্‌লেও তার অন্ন সংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তাহলে সমস্ত দেশটাকে আতুর-শালায় পরিণত কর্‌তে হয়। কঠোর হলেও এই সত্যটীকে আমাদের হৃদয়ঙ্গম কর্‌তেই হবে যে যদি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের কেউ দানও করে তাহলেও এইরূপ অবস্থায় আমরা সে দান বস্তুতঃ লাভ কর্‌তে পার্‌ব না। কেন না জলেই জল বাধে হ্রদই বৃষ্টির জলকে গ্রহণ করে রক্ষা কর্‌তে পারে, মরুভূমিতে বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়। হ্রদের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ এবং দান এই দুই তত্ত্বই পাশাপাশি

আছে বলেই তার এই যোগ্যতা। যার আছে সেই পায়; তা না হলে দানেরও সম্মান থাকে না এবং যে গ্রহণ করে সেও অসম্মানিত হয়। কিন্তু আমরা ভিক্ষুবৃত্তিতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আমরা এই সরল সত্যটীকেও উপলব্ধি করতে পারি না। পাছে সত্যশিক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে তুচ্ছ একটা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি এই ভয়েই আমরা শঙ্কিত হয়ে থাকি। কেরাণীগিরির যোগ্যতার জন্য প্রস্তুত হবার পথে পাছে বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে আমরা সত্যশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা করতেও সাহসী হই না। ঘোড়ার পক্ষে গাড়ী যেমন আমাদের শিক্ষাও আমাদের পক্ষে ঠিক তেমনি। গাড়ী ঘোড়ার পক্ষে এক প্রকারের বন্ধন তাকে টানলেই সে তার প্রভুর আস্তাবলে ঠাঁই এবং আহার পায় বটে কিন্তু গাড়ীর উপর মালিকের যে স্বাধীন অধিকার আছে ঘোড়ার তা' নাই, এরই তরে গাড়ীটা চিরকালই ঘোড়ার পক্ষে একটী বিভীষিকাময় ভার হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষাও আমাদের পক্ষে তাই হয়েছে। পেটের দায়ে প্রয়োজনের তাগিদেই একে আমরা বহন করে ফিরি।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:o:—

কেমন করে জাতীয় জীবন থেকে জন্ম-লাভ করে একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রম বিকাশের দ্বারা গড়ে উঠে যথাকালে কার্য্যকরী হয় এবং কোন অবস্থার ফেরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয় তারই নজীর স্বরূপ আমি এইবার একটী ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

ইউরোপে যে যুগকে তমিস্র যুগ বলে অভিহিত করা হয়—যখন বর্ব্বরদের আক্রমণে রোমের চিত্তপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়ে গেল সেই সময় পশ্চিম মহাদেশের মধ্যে আয়র্ল্যাণ্ডেই শিক্ষা মাথা তুলেছিল। ইউরোপের অপরাপর দেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডে সমবেত হত। আমাদের সংস্কৃত পাঠশালার মত ছাত্ররা সেথায় বিনা খরচায় বাসস্থান, আহার এবং পুস্তক পেত। আইরীস্ সন্ন্যাসীরাই নির্ব্বাপিত প্রায় খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং খৃষ্টান সভ্যতার ধুমায়মান শিখাকে পুনর্জ্জীবিত করেছিল। চার্‌লমেন্ প্যারিসের বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের সময় ক্লেমেন্স নামক একজন আইরিস্ সন্ন্যাসীর সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। আইরিস্‌রা যে সে সময় সভ্যতার অনেক উচ্চতা লাভ করেছিল এর আরও অনেক প্রমাণ আছে। যদিও রোম এই সভ্যতার আদিভূমি তথাপি দীর্ঘকালব্যাপী মিলনের দ্বারা আইরিস্‌দের চিত্ত এবং জীবনের সহিত এ এমনি অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছিল যে একে সম্পূর্ণ ভাবে আইরিস্ বলেই ভ্রম হত এবং আইরিস্ ভাষাই এই সভ্যতার বাহন ছিল।

যখন ডেন্ এবং ইংরাজরা আয়ার্ল্যাণ্ড আক্রমণ কর্‌ল তখন তারা আইরিস্ বিদ্যা-মন্দিরগুলিতে আগুণ ধরিয়ে ছিল—পাঠাগার নষ্ট কর্‌ল এবং শিক্ষালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদের হত্যা কর্‌ল বা উৎপীড়ন করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। এর পরও দেশের যে সব অংশ স্বাধীন রৈল এবং এই সব অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল সেখানে এখনও আইরিস্ ভাষাতেই শিক্ষার আদান প্রদান চল্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে এলাইজেবেথের সময় যখন আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পূর্ণ ভাবে ইংরাজের অধিকারে গেল তখনই সে তার স্বদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়

প্রকৃতপক্ষে হারাল। তারপর থেকে শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে আইরিস্ ভাষা ক্রমে ক্রমে অবজ্ঞেয় হয়ে দেশের ইতর শ্রেণীকে আশ্রয় করে বেঁচে রৈল মাত্র। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে আবার জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্দোলন আরম্ভ হ'ল। আইরিস্‌রা তাদের শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা বশে এই আন্দোলনকে সাগ্রহে বরণ করে ছিল। এ্যাংগ্লো-সাক্সন্— ছাঁচে আইরিস্‌দের গড়ে তোলাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু ভালর তরেই হউক কিম্বা মন্দর তরেই হউক বিধাতা ভিন্ন ভিন্ন জাতকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সৃষ্টি করেছেন; তাদের একজন যদি আর একজনকার জামা পরে তা বেমানান্ না হয়ে থাক্‌তে পারে না। যখন এই আন্দোলন সূচিত হল তখন শতকরা ৮০ জন আইরিস্ মাতৃভাষা ব্যবহার কর্‌ত; কিন্তু দণ্ডের ভয় দেখিয়ে একান্ত জবরদস্তি করেই তাদের মাতৃভাষা এবং স্বদেশের ইতিহাস আলোচনা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য করা হয়েছিল।

এর পরিণাম যে শোচনীয় হয়ে ছিল তার উল্লেখ মাত্রই বাহুল্য। সমস্ত দেশের মন যেন একেবারে মন্ত্র-বলে অসাড় হয়ে গেল। আইরিস্ ছাত্ররা এই সব বিদ্যালয়ে সজীব বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষার কৌতূহল নিয়ে প্রবেশ কর্‌ত; কিন্তু সেখান থেকে যখন বের হত তখন তাদের বুদ্ধি পঙ্গু হয়ে যেত এবং শিক্ষার রুচিও লোপ পেত। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উৎপন্ন হ'ত তোতাপাখী।

এক দেশের অবস্থা কখনও অপর দেশের সমান হতে পারে না। ইংরাজ আয়ার্ল্যাণ্ডে শিক্ষার যে প্রণালী অবলম্বন করেছিল ভারতে সে ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন না করেও থাক্‌তে পারে; কিন্তু

তার পরিণামের মধ্যে যেন এক জায়গায় একটা সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের চিত্ত আমাদের শিক্ষার মধ্যে ধরা পড়ে না। আমাদের নিজেদের মন বলে যে একটা জিনিষ আছে এই শিক্ষা ব্যবস্থাতে তাকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়; অর্থাৎ আমাদের দেশে শিক্ষার যে সব খাল কাটা হয় তাতে কর্ত্তাদের দক্ষতার যে পরিচয় পাই তাতে বিস্মিত হতে হয় বটে এবং তার খরচও খুব বেশী হয়ে পড়ে; কেবল তাতে অভাব থাকে জলের। তার ফল এই হয় কর্ত্তারা জলের দোষ দেন এবং আমরা জলের পক্ষ নিয়ে কর্ত্তাদের দোষ দিই। ইতিমধ্যে খাল থেকে যায় শুষ্ক। কর্ত্তাদের পাছে ক্রোধের উদ্রেক হয় এই আশঙ্কায় আমার বল্‌তে সঙ্কোচ হচ্চে বটে; কিন্তু এ সম্বন্ধে সত্য গোপন কর্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না। সেই সত্যটী এই যে দেশের স্বাভাবিক পয়োপ্রণালীকে রুদ্ধ করা হয়েছে বলেই দেশও এইরূপে প্রতিশোধ তুলছে।

৭ম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

পরভাষার মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষা যে সফলতা লাভ কর্‌তে পারে না এ কথাটি স্বতঃসিদ্ধ। অপর কোনও দেশে এ সম্বন্ধে কোনও তর্কই উঠ্‌ত বলে অনুমান হয় না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটী প্রচলিত মতের বিরোধী হয়ে পড়ায় এর উল্লেখ মাত্রেই আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান আত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠে

তাহলেও সত্য মাত্রেই উপাদেয়। তার উল্লেখে আর যাই হোক তাতে কারও বস্তুতঃ কোনও ক্ষতি হতে পারে না। এই বিশ্বাসে অনেকের অপ্রিয় হলেও আমি একথা বল্‌তে সাহসী হচ্ছি যে যখন আমরা ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হই তখন সেই ভাষার দুয়ারে ঘা দিতে দিতে আর তার চাবি খুল্‌তেই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটা কেটে যায়। ঘরের ভিতরে ভোজনের সকল আয়োজন প্রস্তুত হয়ে থাক্‌তে পারে কিন্তু সেই ঘরে প্রবেশ কর্‌তে আমাদের যে কষ্টভোগ এবং কালবিলম্ব করতে হয় তাতে ভোজনের রুচি চলে যায় এবং দীর্ঘ উপবাসের দ্বারায় পেটেরও হজম শক্তি হ্রাস পেয়ে আসে। ব্যাকরণের সূত্র এবং শব্দের বানান চিবুতে চিবুতেই চোয়াল ধরে আসে—শিক্ষার যা আসল রস ভাব তা' যখন অবশেষে গ্রহণ কর্‌বার সময় আসে তখন তা গ্রহণ কর্‌বার রুচিও ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

যদি কেহ বালুময় জলহীন মরুভূমির উপর বৃক্ষরোপন কর্‌বার সংকল্প করে তাকে যে শুধু দূর থেকে বীজ আহরণ কর্‌তে হবে তা' নয়; তাকে মাটি এবং জলও দূর থেকে বহন করে আন্‌তে হবে। এইরূপ কষ্ট স্বীকার করবার পর যদি বা মরুভূমিতে গাছ গজায় তা' নিশ্চয়ই খর্ব্ব হয়ে জন্মাবে। তাতে যদি ফলও ধরে তথাপি সে ফল থেকে কখনই বীজের উদ্ভব হবে না। আমরা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে যে শিক্ষা-লাভ করি তা' এই মরুভূমির আবাদের শস্যেরই অনুরূপ। এখানে শুধু যে জ্ঞান এবং আদর্শ বিদেশ থেকে আন্‌তে হয় তা' নয়; ভাষাটী পর্য্যন্ত সাত সমুদ্র তের নদী পার করে না আমদানী কর্‌লে এখানে চলে না। এর ফলে আমাদের শিক্ষা

যেমনি অস্পষ্ট তেমনি দূর ও অসত্য হয়ে পড়েছে—এর সহিত আমাদের জীবন যাত্রার কোনও যোগ নাই। সময়—স্বাস্থ্য এবং অর্থের দিক থেকে এ আমাদের পক্ষে অসম্ভবরূপে ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে; কিন্তু এর থেকে যে ফল পাই তা শূন্যতা ভিন্ন অপর কিছুই নয়।

শিক্ষকতা সম্বন্ধে আমার যে টুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমার বোধ হয় অধিকাংশ ছাত্রেরই ভাষা শিক্ষা কর্‌বার শক্তি নাই। এই শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে ইংরাজি ভাষার মধ্য দিয়ে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হওয়া যদিও সম্ভব হয়; কিন্তু তার পরবর্ত্তী উচ্চতর সোপানে তাদের ভাগ্যে দুর্দ্দৈব-ঘটনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ভারতীয় ছাত্রের দ্বারা ইংরাজি ভাষা আয়ত্ব করার পক্ষে অনেক বাধা দেখ্‌তে পাই। আমাদের যে মন আজন্ম মাতৃভাষায় চিন্তা করে তার মধ্যে এই বিদেশী ভাষাকে প্রবেশ করানর চেস্টা দেশী খাঁড়ার খাপে বিলাতী তলোয়ার প্রবেশ করানর চেষ্টারই অনুরূপ। তা' ছাড়া ইংরাজিতে পারদর্শী শিক্ষকের সহায়তা পাওয়া আমাদের শিক্ষার প্রথমাবস্থায় অনেকরই ভাগ্যে ঘটে না বলে আমাদের ভিত্‌টা প্রায়ই কাঁচা এবং বিকৃত হয়ে থাকে। অতএব রামায়ণের হনুমান বিশল্যকরণী চিন্‌ত না বলে তাকে যেমন সমগ্র গন্ধমাদন পর্ব্বতটা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল আমাদের ছাত্রদেরও সেই দশা হয়—ভাষার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অগত্যা তাদের সমস্ত পুস্তকটাকে আদ্যন্ত মাথার মধ্যে বহন করে ফির্‌তে হয়। যাদের অসামান্য মেধা এমন দু'একজন এই অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত যায় বটে; কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের কাছে এতটা প্রত্যাশা করা অন্যায়।

এখন কথা হচ্ছে এই যে জন্মাবধি—সঞ্চারিত স্বভাবের কোনও বিকলতা—বলে হউক কিম্বা দৈব-দুর্ব্বিপাকেই হউক যে সব ছাত্র ইংরাজি ভাষা আয়ত্ব করতে পারে না তাদের এই অপরাধ কি এতই গুরুতর যে তাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে একেবারে চিরতরে নির্ব্বাসিত করতে হবে। এক সময়ে ইংলণ্ডে চোরের ফাঁসি হত। আমার বোধ হয় আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই আইন তার চেয়েও কঠোরতর। এখানে চুরি করতে না পারার তরে নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। যদি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে পরীক্ষাগারে বই নিয়ে যাওয়া দোষাবহ হয় তাহলে মস্তিষ্কের ভিতর একটা বই পুরে নিয়ে যাওয়া কেন যে দণ্ডনীয় হবে না আমি বুঝতে পারি না।

যারা মুখস্থ করে কোনও গতিকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই সব ভাগ্যবান ছাত্রদের অভিযুক্ত করা আমার অভিপ্রেত নয়; কিন্তু যারা পিছু পড়ে থাকে তাদের পক্ষে যদি হাওড়ার পুলের উপর যাতায়াত করা নিষিদ্ধ হয়েও যায় তাহলেও তাদের পারাপারের তরে একটা খেয়া ষ্টীমার কিম্বা একটা দেশী খেয়া নৌকারও ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি? যারা কেবল মাত্র ইংরাজি ভাষা আয়ত্ব করতে পারল না অথচ যাদের শিক্ষার ইচ্ছা আছে এবং শিক্ষার অপর বিষয় আয়ত্ব করবার যোগ্যতাও আছে এমন হাজার হাজার ছাত্রকে শিক্ষার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আমরা জাতীয় শক্তির যে অপব্যয় করছি তা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয় এবং তার পাপ যে প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় পুঞ্জিত হচ্ছে একথা বলাই বাহুল্য। এইখানে এই কথা উঠতে পারে:—"তুমি দেশী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেব বলছ; কিন্তু দেশী ভাষায় উচ্চ শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য গ্রন্থ যে নাই সে কথা

স্মরণ করেছ কি ?" এর উত্তর এই যে আমি জানি 'দেশী ভাষায় যতদিন পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না হয় ততদিন দেশী ভাষায় উচ্চ শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ রচিত হতেই পারে না। যে টাকার প্রচলন নাই এমন টাকা টাকৃশালে তৈরি হবে এ প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

৮ম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা আর একটী শিক্ষা-লাভ করতে পারি। আগে জলের সঞ্চয় হলে তবে তাতে যেমন মাছ আসে তেমনি প্রকৃত শিক্ষক থাকলে তবে তাদের দিকে ছাত্ররা আকৃষ্ট হয়। প্রকৃত শিক্ষাই তখন ছাত্রদের লক্ষ্য হয়। তখন আর তাদের তক্মার লোভ থাকে না। বাজার দরের ছাপ পিঠের উপর মুদ্রিত করে দিতেও তাদের আর প্রবৃত্তি হয় না।

একদা মানসিক উন্নতির যুগে যখন ভারতবর্ষে এমন লোক ছিল যাদের চিত্ত চিন্তা এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকৃত তখনই ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশীলার ন্যায় শিক্ষা-কেন্দ্র স্বভাবতঃ গঠিত হয়ে উঠেছিল। এখন যে হেতু ছাপ নেওয়াই আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হয়েছে সেই জন্যই আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উল্টা দিক থেকেই আরম্ভ করি—প্রথমে শিক্ষকের যোগাড় না করে ছাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত হই। এ ঠিক ন্যাজের দিক থেকে মূর্ত্তি গড়ারই অনুরূপ

কিম্বা প্রথমে পাত করে অভ্যাগতদের বসিয়ে দিয়ে রান্নার যোগাড় করতে যাওয়ার মতই হাস্যকর। তখন কাজেই নিমন্ত্রিতদের মন ভুলাবার তরে ভোজ্যতালিকাকে অতি রঞ্জিত করতে হয়। ওরে এ জিনিসটা আন ও জিনিসটা আন বলে কেবলি চিৎকার করতে থাকি. কিন্তু কোনও জিনিসই এসে জুটে না—আমরা তখন একথা ভুলে যাই যে শুধু চিৎকার করে শূন্যতাকে ঢাকতে পারা যায় না এবং চিৎকারে পেটও ভরে না।

যখন ছাত্র সংগ্রহের তরে আমরা অতীব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি তখন মানুষের মন ভুলাবার ছলা কলার দরকার হয়ে পড়ে—তা' না হলে চার জমে না। তখন একরাত্রের মধ্যে আমাদের সুদীর্ঘ পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করে তুলতে হয়—তখন বিদেশীর প্রতি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করতে হয়—তখন মানুষের মনকে পথভ্রষ্ট এবং বিশৃঙ্খল করে দেবার তরে নানাবিধ মায়া জাল বিস্তার করাই আমাদের কাজ হয়ে পড়ে।

আমাদের মনকে মত্ততার হাত থেকে বাঁচাবার তরে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার তরে পাঠ্যতালিকার বিস্তারের এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্বেগকে দূর করে দিতে হবে এবং আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে হবে।

তারপর যারা তপস্যা দ্বারা নিজেদের চিত্তকে উৎকর্ষিত করেছেন—যারা জ্ঞান রাজ্যে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা লাভ করেছেন—এক কথায় যারা বিদ্যাদান করবার যোগ্য হয়েছেন সেই সব মনিষীদের সমবেত করে সত্য সন্ধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত করতে হবে। এই পথেই আমরা সেই শক্তি লাভ করব যার দ্বারায় সত্যকার বিদ-

বিদ্যালয় আমাদের ভিতর থেকে স্বতঃই সৃষ্ট হয়ে জীবনের সত্যের মধ্যে সার্থক হবে।

আমাদের একথা বুঝ্‌তেই হবে যে দেশের চিত্ত-শক্তিকে এই ভাবে সংহত করাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ; কেননা ইহাই সৃষ্টি-শক্তির যথার্থ কেন্দ্র এবং এই খানেই দেশের শক্তি সমুহ দানা বেঁধে উঠ্‌বে।

৯ম পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

অনেকে বলেন ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত থাকায় এখানে এইরূপ চিত্তের একতা আনয়ন করা খুবই দুরূহ এমন কি অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি একথা মানি কিন্তু সকল জাত্‌কেই সার্থকতা লাভ কর্‌বার তরে একটা না একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে—যে জাত তাতে অকৃতকার্য্য হয়েছে তারা অধঃপাতে গেছে। সকল সভ্যতাই দুরূহতার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। যে গ্রামে নদী আছে সেখানের জলের সচ্ছলতা আপনিই হয়; কিন্তু যেখানে নদী নাই সেখানের অধিবাসিরা যদি শুধু তাদের হিংসা কর্‌তে থাকে তাহলে তাদের নিজেদের জলকষ্ট নিবারণ হয় না—এর তরে কূপ খনন করবার কষ্টকে তাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে। ধূলি সুলভ বলে তার দ্বারা জলের কাজ মিটাবার চেষ্টা পাগলেই করে থাকে।

আমদের দেশের ভাষায় বহুতর অসুবিধা আমাদের স্বীকার করতেই হবে এবং একথাও স্বীকার করতে হবে যে বিদেশ থেকে মাটি এনে টবের একটা আধটা সখের ফুলগাছ তৈরি সম্ভব হতে পারলেও তা দিয়ে দেশের ধান চাষ যার উপর দেশের জীবন নির্ভর করে তা' কখনও হতে পারে না।

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এ সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আমরা একটা ঐক্য দেখতে পাই। অতএব ইহা বেশ বুঝা যাচ্ছে যে সভ্যতার ঐক্য ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করে না।

ইউরোপীয় সভ্যতার আদি যুগে ল্যাটিন্ তাহার বাহন ছিল। এই যুগে তার জ্ঞানপুষ্পা মুকুল—অবস্থাতেই ছিল অর্থাৎ তার আত্ম-বিকাশের দলগুলি তখন একই বিন্দুর মধ্যে মুদ্রিত হয়ে ছিল। তার ভাষার সেই একতা তার মানসিক বিকাশের পূর্ণতার নিদর্শন নহে। যখন ইউরোপের প্রদেশ সকল নিজ নিজ ভাষাকে আশ্রয় করল তখনই তাদের চিন্তা ও জ্ঞানের সম্মিলনে ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব হল এবং এই বৈচিত্র থেকেই তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান এমন বিস্তৃত এবং সচল হয়ে উঠতে পেড়েছে। স্বভাবগত বৈচিত্র যখন সামঞ্জস্য—লাভ করে তখনই বাস্তবিক সত্যকার ঐক্য সম্ভব হয়। কৃত্রিম একতা জড়তার সৃষ্টি করে মাত্র। আজ যদি ফরাসী, ইতালী, জার্ম্মাণী এবং ইংলণ্ড ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ ভাণ্ডারে তাদের নিজ নিজ অর্জ্জিত জ্ঞানের অংশ দেওয়া রহিত করে তাহলে ইউরোপীয় সভ্যতার যে ক্ষতি হবে তা' কল্পনা করলেও স্তম্ভিত হতে হয়। জার্ম্মাণী যখন ইউরোপীয় সভ্যতার

উপর একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছিল তখন তার সেই উদ্যোগ এই কারণেই ইউরোপের অন্যান্য দেশের চক্ষে সঙ্কট বলে বিবেচিত হয়েছিল।

আমাদের দেশেও এমন একটা সময় ছিল যখন সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষের শিক্ষার একমাত্র বাহণ ছিল। কিন্তু আজ ভাবের হাটে ব্যাপার জমাবার তরে তার প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে পরিপুষ্ট করে তোলা তার পক্ষে একান্তই দরকারী হয়ে পড়েছে। এই প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়েই তার বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ নিজ নিজ প্রতিভার বৈচিত্র্যকে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে তুল্‌তে পার্‌বে। এ কাজ পরের ভাষায় কখনই সম্ভব হতে পারে না। পরের ভাষায় এমন অনেক বিশেষত্ব আছে যা' আমাদের চিন্তা এবং চেষ্টার স্বাধীনতাকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ কর্‌তে থাকে। আমরা যখন ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করি তখন আমাদের মন স্বভাবতঃই ভাবের তরেও পশ্চিমের মুখ তাকিয়ে থাকে; কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের এই পথ চাওয়াই সার হয়—ভাবের নাগাল পাই না। এরই তরে আমাদের শিক্ষা হয় বদ্ধ হয়ে থাকে না হয় কেবলি অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে যে ভাষার পার্থক্য আছে তাতে ভয় পাবার কারণ নাই এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আমাদের শিক্ষার জন্য ইংরাজি ভাষা আমদানী করার ব্যর্থতার সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আমাদের একান্তই প্রয়োজন। ইংরাজি ভাষা তার উৎপত্তি স্থলে সচল এবং তরল বটে; কিন্তু এই দূর পথ অতিক্রম করে আস্‌তে আস্‌তে সে যে শুষ্ক, বদ্ধ এবং কঠিন হয়ে পড়ে একথাটা আমাদের বুঝবার দরকার আছে।

অবশ্য আজই যে আমরা ইংরাজি ভাষায় চাকরীর দরখাস্ত লেখা থেকে বিরত হতে পারব কিম্বা আজই যে আমরা রাজ কার্য্য থেকে অবসর নিতে পারব আমি এমন আশা কল্পনা করতেও প্যারি না। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে ইংরাজি রাজ—ভাষা হওয়ায় এ কৃত্রিম শুল্কের মত আমাদের মাতৃ-ভাষাকে জবরদস্তি করে শিক্ষা-ক্ষেত্র হতে গৃহস্থালীর ব্যবহারের মধ্যে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে।

আবার এই কারণেই বিদেশী শাসন-যন্ত্রের এমন অনেক ব্যয়-সাধ্য ভার আমাদের বহন করতে হয় যা দেশের জন সাধারণের কোনও কাজেই আসে না। একটা সামান্য কথাকেও সরকারের শ্রুতিগোচর করতে দেশের অধিকাংশ লোককেই ইংরাজি নবীশকে রসুম দিতে হয়। আমার অনুমান জগতের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই সরকারের কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এমন ভাষায় তাদের কার্য্য-বিবরনী প্রকাশ করেন যে ভাষায় দেশের কৃষিজীবিদের আদৌ অভিজ্ঞতা নাই। এটা একপ্রকারের বিদ্রূপ; কিন্তু তা বলে একে হেসে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না; কেননা যাদের উপর এই বিদ্রূপ করা হয় তাদের কাছ থেকেই এর খরচ আদায় করা হয়। দেখতে পাই দেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সুবিধার খাতিরে বাঙ্গলা ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করবার জন্য আমাদের সরকার অজস্র অর্থব্যয় করে থাকেন কিন্তু এই যে ত্রিশ কোটি লোক যারা এই দেশের অধিবাসী—যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে পরিশ্রম করে দেশের শাসন—ব্যয় নির্ব্বাহ করে তাদের জন্য ইংরাজি ভাষায় লিখিত সরকারী আইন কানুনকে তাদের বোধগম্য করবার

কোনও ব্যবস্থাই দেখি না। সরকারী আইনকানুন পরভাষার অন্তরালে তাদের কাছে চিরকালই পরদানসীন থেকে যায়। রেলওয়ে ষ্টেসনে যখন ষ্টেসনের নাম দেশী ভাষায় লিখিত দেখি তখন কর্ত্তাদের কর্ত্তব্য বোধের এই ভগ্নাবশেষ টুকুতে আর ও বিস্মিত হতে হয়। এই সব দেখে শুনে বেশ বুঝতে পারা যায় যে আমাদের যারা শাসন করছেন তারা একদিকে তাদের কর্ত্তব্যভারকে যেমন যথা সম্ভব লঘু করেছেন আর একদিকে তেমনি আমাদের দায়ভারকেও অযথারূপে বাড়িয়ে গুরুতর করে তুলেছেন—এ ঠিক গণ্ডস্য উপরি বিস্ফোটকং।

যাই হোক এই থেকে আমরা এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি—আমাদের মাতৃভাষা আমাদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আমরা তাই ইংরাজি ব্যাকরণের সূক্ষ্ম সূতার উপর দিয়ে চল্‌তে পারলেই গর্ব্বিত হয়ে উঠি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে সব সাংঘাতিক দোষ আছে শুধু এরই তরে তাদের উপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের অন্য গতি থাকে না এবং পরিণামে যখন রুটির পরিবর্ত্তে লোষ্ট্র লাভ হয় তখন কৃতজ্ঞ অন্তরেই তা গ্রহণ করতে হয়। আমরা বর্ত্তমান শাসন-কার্য্যের ব্যয়ের তরে শুধু যে রাজস্ব দিয়েই নিষ্কৃতি পাই তা নয়—এর জন্য আমাদের দেশের ভাষা এবং দেশের সভ্যতাকেও বলি দিতে হয়েছে। এই দেশের ভাষা এবং দেশের সভ্যতার উদ্ধারের উপরেই যে আমাদের মুক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে একথা আমাদের বুঝতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যরতন প্রামানিক।

পত্র

—:*:—

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যানীয়েষু

কিঞ্চিৎ দেরিতে হলেও, তুমি যে মনে করে, চিঠির মারফৎ আমাকে তোমার বিজয়ার প্রণাম পাঠিয়েছ তাতে আমি যথার্থই খুসি হয়েছি, কেননা দেখতে পাচ্ছি এই এক বৎসরের মধ্যে আমার অধিকাংশ যুবক বন্ধুই আমার অস্তিত্ব ভুলে গেছেন। ভুলে যে গিয়েছেন তার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই আমাদের মত মাত্র-লেখকদের এক সাহিত্যিক অস্তিত্ব ছাড়া অপর কোনও অস্তিত্ব নেই। সেকালের ভাষায় বলতে গেলে, আমরা হচ্ছি সব "বাক্যকায়"। নীরব হলেই আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। আমরা আছি শুধু দেশের শ্রুতির মধ্যে তার স্মৃতি পর্য্যন্ত পৌঁছবার শক্তি আমাদের বাক্যদেহ ধরে না।

প্রণামান্তে তুমি আমার কাছে আমার সাংবাৎসরিক নীরবতার কৈফিয়ত তলব করেছ। তোমার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে আমি তোমাকে একটি পাল্টা প্রশ্ন করছি। সেই প্রশ্নই হবে আমার উত্তর।

মানুষে কথা কয় কেন সেইটিই কি আসল জিজ্ঞাস্য নয়? দেহ প্রাণের নৈসর্গিক যোগ রক্ষা করবার জন্য মানুষ মাত্রেরই পক্ষে যথেষ্ট অন্ন চাই। মানবদেহের কেন্দ্র যে উদর মানুষ মাত্রেরই চোখ তার সাক্ষী। তার পর দেহের সঙ্গে বস্ত্রের কোনও নৈসর্গিক যোগ না থাকলেও, সভ্য মানবের পক্ষে কিঞ্চিৎ বস্ত্রও চাই। এ পৃথিবীতে আমরা কাপড় পরে না এলেও এখানে এসে কাপড় পরি।

বস্ত্র মানবজীবনে একটা প্রক্ষিপ্ত পদার্থ হলেও—ক্ষিপ্ত না হলে মানুষে তা প্রক্ষেপ করতে পারে না, কেননা মানুষের সনাতন সমাজ বন্ধন হচ্ছে বস্ত্রের বন্ধন, ভাষায় যাকে বলে গাঁঠছড়া। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে কেন আসে? এ দার্শনিক প্রশ্নের সহজ ও চূড়ান্ত উত্তর—খেতে-পরতে ও মরতে। সুতরাং এই খাওয়া পরা ও মরার সংস্থান করতে যে কটি কথা কওয়া দরকার সেই কটি কথা বলাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে যুগপৎ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। উপরন্তু একটি কথা বলা কারও পক্ষে উচিত কি না জানিনে, তবে অধিকাংশের পক্ষে যে অকর্ত্তব্য তা ভুক্তভোগী শ্রোতা মাত্রেই জানেন। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে চুপ করে থাকায় কারও কোনও লাভ লোকসান নেই। অপর পক্ষে বেশির ভাগ লোকের পক্ষে বেশি কথা কওয়াটা একটা সামাজিক উপদ্রব বিশেষ। এই যখন আমার ধারণা তখন বর্ত্তমানে কেন যে আমার বাকরোধ হয়েছে তার লম্বা কৈফিয়ত দেবার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

তবে তোমরা যে সে কৈফিয়ত চাও তার কারণও স্পষ্ট। এ কালের যুগ ধর্ম্ম হচ্ছে বাচালতা। কাযেই তোমরা না ভেবেচিন্তে ধরে নিয়েছ যে যে-দেশের যত বেশি লোক যত বেশি কথা কয় আর যত বেশি লোক তা হাঁ করে শোনে সে দেশ তত সভ্য হয় তত উন্নত হয়, এক কথায় তত তার progress হয়। ফলে জাতির পক্ষে পরম পুরুষার্থ হচ্ছে একদিকে সংবাদপত্রের প্রকাশ ও প্রচার বৃদ্ধি করা আর একদিকে বক্তার সংখ্যা ও বক্তৃতার দৈর্ঘ্য বাড়ানো। এ যুগে পৃথিবীতে শব্দ যথার্থই ব্রহ্ম হয়ে উঠেছে। এই যুগধর্ম্ম

অনুসরণ করে মানব সভ্যতা যে চরমে শব্দব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এরূপ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভে সকলের সমান লোভ হয় না। অনর্গল কথন ও অবিরাম শ্রবণের মহা দোষ এই যে এ ব্যাপারে বক্তারা বক্তৃতা করবার পূর্ব্বে চিন্তা করবার অবসর পান না এবং শ্রোতারা শ্রবণ করবার পরে তা বিচার করবার অবসর পান না। ফলে রসনা মস্তিষ্কের সঙ্গে নিঃস্বম্পর্ক হয়ে একমাত্র উদরমূল হয়ে পড়ে। তখন মানুষের আদিম ভাবনা, পেটের ভাবনা, তার একমাত্র ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় এবং মানব সমাজ বৈশ্য সমাজ হয়ে পড়ে। সভ্যজগতে আজ হয়েছেও নাই। সে জগতে ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই আজ বৈশ্যেরই এপিঠ আর ওপিঠ। যদি জিজ্ঞাসা করো যে ক্ষত্রিয় নেই কেন? তার উত্তর গত যুদ্ধে পৃথিবী নিক্ষত্রিয় হয়েছে। এরূপ যে হয়েছে তার কারণ এ যুগে ক্ষত্রিয় হয়ে পড়েছিল ধর্ম্মের নয় অর্থের, ব্রাহ্মণের নয় বৈশ্যের বশ। এ যুগের আদর্শ হচ্ছে ডিমোক্রাসি অর্থাৎ সেই সমাজ যাতে মানুষের মনের চরিত্রের জাতিভেদ আর থাকবে না। অর্থাৎ মানবসমাজে অধিকারীভেদ আর থাক্‌বে না, কিন্তু অধিকারভেদ আরও বাড়্‌বে। একমাত্র কথার সাহায্যে এই আদর্শের দিকে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। আজকের দিনে সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ যে বাগযুদ্ধ আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা যে কথার ব্যবসা—এ ত মর্ত্তলোক-প্রসিদ্ধ শ্রুতিকটু সত্য। আমার এসব কথা শুনে তুমি হয় ত চমকে উঠবে আর মনে ভাববে যে আমার মতভ্রংশ ঘটেছে। Demos জাগছে দেখে মরা বেঁচে উঠছে দেখে, আমি ভয় খেয়ে গিয়েছি ফলে ডিমোক্রাসি সম্বন্ধে আমার মত এখন অমত হয়ে

গিয়েছে। কিন্তু আসলে ঘটনা তা নয়। মনো-জগতে আমি কোন রকম বাজি জানিনে, এমন কি ডিগবাজিও নয়। আমি গণতন্ত্রের বিপক্ষে নই মনতন্ত্রের স্বপক্ষে। গণতন্ত্র যদি মনতন্ত্রের বিরোধি হয়ে ওঠে তাহলে আমাকে অগত্যা জনগণকে ছেড়ে মহাজনের শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু এ বিরোধ জন্মাবার কোনই কারণ নেই। উদরের মর্ম্ম আমি জানি কিন্তু তার ধর্ম্ম আমি মানিনে। ক্ষুধার শক্তি প্রলয়ঙ্করী সৃষ্টিকরী নয়। উদর অন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে কিন্তু রসনা তার মীমাংসা করতে পারে না। এইহেতু আমার বিশ্বাস যে একটা সমগ্র জাতির পক্ষে রসনার জোর আস্ফালনটা শুধু অনর্থক নয় অনর্থকরও বটে। Demos যদি Demosthenes হয়ে ওঠে, তাহলে কার না মনের ধাত ছেড়ে যায়?

কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে এই জাতীয়-বকুনিটে হচ্ছে একটা বিলেতি রোগ। অতএব ওর হাত থেকে বাঁচা কঠিন। বিলেতি রোগ এদেশে একবার এলে দেখতে না দেখতে তা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে ও কায়েম হয়। এক কথায় বিলেতি epidemic এদেশে এসে endemic হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ ইনফ্লুয়েঞ্জা ওরফে যুদ্ধজ্বরের নাম করা যেতে পারে। তারপরে বিলেতি রোগে সাদা লোক তেমন মরে না যেমন মরে কালা আদমি। যে যুদ্ধ থেকে জন্মালো যুদ্ধজ্বর সেই যুদ্ধে ইউরোপে যত লোক না মারা গেল তার দশগুণ মারা গেল এ দেশে যুদ্ধজ্বরে। এখন এই বকুনিটে যে শুধু বিলেতি নয়, উপরন্তু বিষম রোগ তার প্রমাণ, ইউরোপ মরতে বসেছিল এই বকুনির চোটে। শান্তির সময়ে ইউরোপের লোলুপ রসনা যুদ্ধের জন্য লেলিহান হয়ে পড়েছিল, আর যুদ্ধের পর সেই

লেলিহান রসনা শান্তির জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে। এই বকুনি বেজায় সংক্রামক আর দুনিয়ার যত সংক্রামক রোগ বিশেষ করে ঠেসে ধরে আমাদেরই। এবং তার সমস্ত লক্ষণ একসঙ্গে দেখা দেয় আমাদেরি শরীরে। ইউরোপে এই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ ছিল যুদ্ধ পিপাসা আর তার পর লক্ষণ হয়েছে শান্তি পিপাসা আমরা একসঙ্গে ও দুয়ের সমন্বয় করে নিয়েছি। আমাদের রসনা এখন লালায়িত হয়েছে শান্ত-যুদ্ধের জন্য।

এ বিলেতি রোগের অবশ্য একটী অব্যর্থ দেশী ওষুধ আছে। এবং সে ওষুধ প্রয়োগ করতে পারতেন এমন একটি মহাপুরুষও ভারতবর্ষে এখন অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী যখন স্বজাতির তন-মন-ধন থেকে বিলেতি সভ্যতা নামক রোগ দূর করতে ব্রতী হয়েছেন, তখন তাঁর কর্ত্তব্য ছিল, দেশের লোককে অন্তত এক বৎসরের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করতে আদেশ দেওয়া। সে ব্রত অবলম্বন করলে বছর না পেরুতে আমরা স্বদেশের স্বরাজ্য হয়ত লাভ করতে পারতুম না কিন্তু স্ব-মনের স্বরাজ্য অনেকটা লাভ করতুম। আর উক্ত উপায়ে বাহ্য স্বরাজ্য যে একেবারেই লাভ করতে পারতুম না, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। হট্টগোলে মানুষের মাথা খারাপ হয় কিন্তু ঘোর নিস্তব্ধতায় মানুষে ঘোর ভয় পায়। জ্ঞাতর চাইতে অজ্ঞাত, ব্যক্তর চাইতে অব্যক্ত, আলোর চাইতে অন্ধকার, জীবনের চাইতে মৃত্যু যে ঢের বেশি ভয়ঙ্কর এ ত মানুষ মাত্রেই জানে। সুতরাং নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত আমাদের জাতীয় আত্মা যদি বৎসরাবধিকাল নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌তে পারত তাহলে ইংরাজরাজ যে অসম্ভব রকম অস্থির

হয়ে পড়তেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে। ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ভারতের বিশেষ বাণী কি? এ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি নীরব হয়ে থাকতুম অর্থাৎ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতুম যে ভারতের গীর্ব্বাণী হচ্ছে—নির্ব্বাণী।

বক্তারা আমার এ সব কথার কি জবাব দেবেন তা আমি জানি। তাঁরা বলবেন যে তাঁরা বক্তৃতা করেন ইংরাজ রাজাকে ডরিয়ে দেবার জন্য নয়, দেশের লোককে জাগিয়ে তোলবার জন্য। এবং সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও করবেন যে বিলেতি যুদ্ধজ্বর থেকে দেশের লোককে রক্ষা করতে গিয়ে কি স্বদেশী Sleeping sickness এর প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য? অবশ্য নয়। রোগ মাত্রেই মারাত্মক তা' দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। তবে দেশী রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে যে বিদেশী রোগকে অঙ্গীকার করতে হবে এমন কোনও বিধির নিয়ম নেই। তা ছাড়া নীরবতার সঙ্গে নিদ্রার ও সরবতার সঙ্গে সজাগতার সম্বন্ধ নৈসর্গিকও নয়; অবিচ্ছেদ্যও নয়। মানুষে জেগেও চুপ করে থাকতে পারে আর ঘুমেও বকে। বক্তাদের এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে কথা কয়েও মানুষকে ঘুম পাড়ানো যায়। এক কথা বার বার বললে শ্রোতার তন্দ্রার আবেশ হয়। আর আজ বেশির ভাগ বক্তারা যা করছেন সে হচ্ছে একই কথার অবিরাম পুনরাবৃত্তি। অবশ্য এঁরা বলবেন যে এঁরা যা বলছেন সে কথা নয়, মন্ত্র। তথাস্তু। তবে মানুষে মন্ত্রজপ করতে করতে নিজেও মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে পড়তে পারে। যোগনিদ্রাও নিদ্রা; অসাধ্য সাধন করবার যথার্থ উপায় জপ নয়, তপ।

সে যাই হোক, আমাদের জনগণকে পলিটিক্সের বিলেতি মদ অতি মাত্রায় পানকরানো নিশ্চয়ই নিরাপদ নয়। কারণ সে মদ তারা শোধন করে নিতে শেখেনি। ফলে যে সুরা পানকরে শিক্ষিত লোকের মনের অবস্থা হয় মদালস সেই সুরা পানকরে জনগণের মনের অবস্থা হয়ে উঠবে মদমত্ত। এবং তখন তাদের প্রলাপী নেশা দেখে আমাদের গোলাপী নেশা হয়ত ছুটে যাবে। তবে যুগধর্ম্ম কেউ অতিক্রম করতে পারে না, আমরাও পারব না। আমরা চাই আর না চাই কথার স্বরাজ্যের দিকে আমাদের progress করতেই হবে অর্থাৎ international হট্টগোলে আমাদের যোগ দিতেই হবে, তারপর যা থাকে কুল কপালে। এ ঐকতানে আমি যে যোগ দিতে নারাজ তার কারণ আমার স্বর আজ হয়ত লোকের কাণে একটু বেসুরা লাগবে। আমার এ বকুনি শুনে তোমার ধৈর্য্য বোধ হয় তুমি আর রক্ষা করতে পারছ না। আমি অন্তঃকর্ণে শুনতে পাচ্ছি যে তুমি বলছ যে, কথার বিরুদ্ধে কথা আমার মুখে শোভা পায় না; আমি নিজেই যখন বাক্যকায় বলে নিজের পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু এ ত আর নতুন কথা নয়। বাক্য-জগতের বাইরে বস্তু-জগতে বীরবলের যে কোনও অস্তিত্ব নেই, এ সত্য সর্ব্বপাঠক বিদিত। তবে নিজে সাফাই হবার জন্য এ কথা আমি বলতে বাধ্য যে বাক্য ও শব্দ এক বস্তু নয়। বাক্য মাত্রেই শব্দ কিন্তু শব্দ মাত্রেই বাক্য নয়। আমি এতদিন বাগ-বিন্যাস করে এসেছি এই বিশ্বাসে যে উক্ত উপায়ে আমি বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরের দেয়াল গাঁথছিলুম কিন্তু যখন আবিষ্কার করলুম যে আমরা সবাই মিলে যে অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়ে তুলছি সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষীয়

Tower of Babel তখন হাত গোটাতে বাধ্য হলুম। এই হচ্ছে আমার নীরবতার কৈফিয়ত। যদি বলো-যে এতক্ষণ যা বকলুম তা আগাগোড়া নিরর্থক কথা তাহলে তোমার মতে আমিও সায় দেব। যে কথার অর্থ আছে তার যখন কোনও সামর্থ্য নেই তখন যে কথার অর্থ নেই, তার সামর্থ্য থাকতে পারে সেই ভরসায় এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা রচনা করলুম। ইতি—

বীরবল।

ফরাসি-কবি "বোদেলের"

—:*:—

স্বর্গের সৌন্দর্য্য অনেক কবি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য যে কত কবি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু নরকের সৌন্দর্য্য কয়জন দেখিয়াছেন বা দেখাইতে পারিয়াছেন? সুন্দরের সৌন্দর্য্য সকলেই অনুভব করিতে ও করাইতে চায়, কিন্তু কুৎসিতের সৌন্দর্য্যে কে বিমোহিত? আমি নরকের, কুৎসিতের শুধু চিত্রাঙ্কণ বা বিবরণের কথা বলিতেছি না—বীভৎস রসের উদাহরণ অপর্য্যাপ্ত না হইলেও বহু যে মিলে, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু শুধু এইটিকেই যিনি একান্ত করিয়া ধরিয়াছেন, এইটিকেই লইয়া যাঁহার সমস্ত কবিত্ব খেলিয়াছে এমন কবির কথা আমার জানা নাই। কুৎসিতের বীভৎসের নরকের ছবি যে কবি দিয়াছেন তিনি দিয়াছেন তাহা বৈচিত্রের জন্য, মুখ বদলাইবার জন্য, এক মুহূর্ত্ত দেখাইয়া আবার সুন্দরের দিকে সহজের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। কুৎসিতকে তিনি নিতান্ত কুৎসিত, বীভৎসকে নিতান্ত বীভৎসই দেখেন—কবি নিজেও তাঁহার অন্তরাত্মার পূর্ণ সহানুভূতি ইহাদের উপর ছড়াইয়া দিতে পারেন নাই। বর্জ্জন করিতে হইবে যাহা, এমন জিনিষটিই যেন তিনি দূর হইতে অঙ্গুলসিঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন।

আমি বলিতেছি এমন লোকের কথা কুৎসিতকে কুৎসিত বলিয়া যে সুন্দর দেখে, নরককে নরক জানে বলিয়াই নরকের মধ্যে যাহার প্রাণের আনন্দ ও মুক্ত-বিলাস; প্রকৃতির সুশোভন দৃশ্য, সৌখীন-জনের মনোহারী ঐশ্বর্য্য, পুণ্যহৃদয়ের উচ্চবৃত্তি মহৎ করুণা প্রভৃতির দিকে যে তাকাইয়া দেখে নাই, যাহার ধ্যানে আসিয়াছে কেবল যেখানে যাহা কিছু অসুস্থকর অস্বস্তিকর, যাহার প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছে হীনকে কদর্য্যকে উৎকটকে দেখিয়া দেখিয়া; মানুষের মধ্যে দেবভাবের, এমন কি অসুরভাবের কথা পর্য্যন্ত যিনি ভুলিতে বলিয়াছেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন ব্যক্ত করিয়াছেন পিশাচে কি রকম আনন্দ পাইতে পারে, কি রস ভোগ করিয়া থাকে; জগৎকে মানুষকে যিনি দেখিয়াছেন শরীরের দিক হইতে, শুধু তাহাই নয়, যাঁহার লক্ষ্য হইতেছে এই শরীরের মধ্যে যাহা আবার যত ব্যাধিগ্রস্ত পূতিগন্ধময়, ঘৃণাকার-জনক।

শুনুন আমাদের কবি কি বলিতেছেন—

"এখানে সেখানে এক একটি করিয়া গৃহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। নরনারী সব তাহাদের পাংশুবর্ণ চোখের পাতা মুদিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া জড়পিণ্ডের মত ঘুমঘোরে অচেতন; ভিখারিনীদের বিশীর্ণ তুহিনশীতল স্তন ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বসিয়া বসিয়া তাহারা একবার আগুণে একবার নিজের আঙ্গুলের উপর ফুৎকার দিতেছে। ঠিক এই সময়েই, হিমের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে গর্ভিণীর প্রসব বেদনা বাড়িয়া উঠিল; দূরে কুক্কুটের চীৎকার কুয়াসাময় আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, যেন কোন আর্ত্তনাদ রক্তবমনের ফেণা ভেদ করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। কুজ্ঝটিকা-সাগরে প্রাসাদরাজি ডুবিয়া আছে।

আতুরাশ্রমের কোণে কোণে মুমূর্ষুদের হিক্কা-দিয়া নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, লম্পটেরাও এখন কর্ম্মশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ঘরে ফিরিতেছে"। (১)

প্রাচ্য সাহিত্যে ইহার কিছু জুড়ি মিলে না, জগতের কোন প্রাচীন সাহিত্যেও এ রকম ভাব ভঙ্গিমা কোথাও পাই না। ভারতবাসীর প্রাণ এই রকম কথা এই রকম সুর শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াই যাইবে। কিন্তু কেবল ঐটুকু বলিয়াই আমাদের কবি নিশ্চিন্ত হন নাই। শুনুন কবির কথা—

"এক রাত্রিতে যখন আমি একটি ইহুদী রমণীর পাশে—শবের পাশে শবের মত—টান হইয়া শুইয়া ছিলাম—(২)

এ কি অসহ্য নয়? কিন্তু এটুকু ত সহ্য করিতেই হইবে; কানে আঙ্গুল দিবেন না, শুনুন আরও—

---

(1) Les maisons ça et la commençaient à fumer.
Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;
Les pauvresses, trainant leurs seins maigres et froids,
Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts.
C'etait l'heure où parmi le froid et la lésine
S'aggravent les douleurs des femmes en gésine;
Comme un sanglot coupé par un sang écumeux
Le chant de coq au loin dechirait l'air brumeux;
Une mer de brouillard baignait les édifices,
Et les agonisants dans les fond des hospices
Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux.
Les debauchés rentraient, brisés par leurs travaux.

(2) Une nuit que j'étais prés d'une affreuse Juive,
Comme au long d'un cadavre un cadavre etendu—

"জীবন থাকিতে তুমি তোমার এতখানি প্রেম দিয়াও যে পুরুষটিকে পরিতৃপ্ত করিতে পার নাই, সে কি তবে তোমার অসাড় অবশ মাংশ পিণ্ডের সহায়ে তাহার অপরিসীম বাসনা ভরাট করিয়া লইয়া সকল ক্ষোভ মিটাইল ?

"বল্ ওরে অস্পৃশ্য শব ! তোর রুক্ষ কেশরাশি ধরিয়া সে কি তোকে তাহার অস্থির বাহুপাশে তুলিয়া লইয়া ছিল ? বল্ দেখি ওরে বিকট দশনা ! তোর হিমদন্তপংক্তির উপর সে কি তবে তাহার শেষ বিদায়ের আদরগুলি আঁটিয়া দিয়া ছিল ?" (১)

আপনারা যাঁহারা পশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিক গতিবিধি কিছু জানেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রথমেই হয় ত বলিয়া উঠিবেন, এ কবিতাকে ত চিনি, এখানে 'জোলা' (Zola)—সম্প্রদায়ের স্থূল হস্তাবলেপ স্পষ্টই দেখিতেছি; যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে বলিব ইহা জোলাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, এ যে ঘোর বস্তুতান্ত্রিকতা, প্রাকৃতবাদের চূড়ান্ত। ফলতঃ 'বোদেলের' যখন প্রথম সর্ব্বসাধারণের সহিত পরিচিত হইলেন তখন Realist ও Naturalist এর দল তাঁহাকে সাগ্রহে নিজেদেরই মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন, এমন

---

(1) L' homme vindicatif que tu n'as pu, vivante,
Malgré tant d'amour, assouvir,
Combla—t-il sur ta chair inerte et complaisante
L' immensite' de son désir ?
Réponds, cadavre impur ! et par tes tresses roides
Te soulevant d'un bras fiévreux,
Dis-moi, tête effrayante, a t il sur tes dents froides
Collé les suprêmes adieux ?

প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিমান শিল্পীকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। বাস্তবিক যখন শুনি কবি বলিয়াছেন—

"ফাঁসিকাঠে একটা বাসি মড়া ফুলিয়া রহিয়াছে—আর হিংস্র পাখীসব তাহাদের এই আহার্য্যের উপর চড়িয়া বসিয়া উৎকট উল্লাসে তাহাকে ছিঁড়িতেছে ফাড়িতেছে; প্রত্যেকেই আপন আপন দূষিত চঞ্চু এক একখানি অস্ত্রের মত এই গলিত পদার্থটার রক্তমাখা কোণে কোণে বিঁধাইয়া দিতেছে।

"চক্ষু যেন তাহার দুটি গর্ত্ত—বিদীর্ণ উদর হইতে অন্ত্র সব খুলিয়া পড়িয়া উরুর উপরে বহিয়া চলিয়াছে; বীভৎস তৃপ্তিতে ভরপূর সে নারকীয় জীবেরা চঞ্চুর আঘাতে আঘাতে তাহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।" (১)

তখন ইহাকে আবরুপর্দ্দাহীন নির্লজ্জ বস্তু-তান্ত্রিকতা ছাড়া আর কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয় কি?

কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনুন আরও একটু—ইতি মধ্যেই কবির কথার মধ্যে অভিনব কিছুর ইঙ্গিত যদি না পাইয়া থাকেন, তবে কবিকে তাঁহার বক্তব্যটি শেষ করিতে দিন। ফাঁসিকাঠ, গলিত সব, শকুনি

---

(1) Des féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu dejà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tous les coins saignants de cette pourriture;
Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré
Les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses,
Et les bourreaux, gorgés de hideuses délices,
L'avaient à coups de bec absolument châtré.

গৃধিনী—এ সকলের কথা কবি বলিতেছেন; কিন্তু এ সব কি, কোন্ রহস্য ইহারা মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেছে? কবির দৃষ্টি যে সেইখানে। শুনুন—

"প্রেম যে দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই দেশে তোমার বসবাস, আকাশ যে দেশের এমন স্বচ্ছ সুন্দর সেইখানে জন্ম তোমার। তোমার ব্রত অনুষ্ঠান লোকের কাছে হেয়, নানা পাপের জন্য তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি পর্য্যন্ত হইতে তুমি বঞ্চিত; সেই সকলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই এই তুমি নিঃশব্দে এত অপমান সহ্য করিতেছ!" (১)

একি নূতন কথা, নূতন সুর! বস্তুতান্ত্রিকতা প্রাকৃতবাদ সব এখানে কি আস্তে আস্তে গলিয়া যাইতেছে না? শুনুন তবে শেষ পর্য্যন্ত—

"তুচ্ছ পদার্থ তুমি, তোমাকে দেখিয়া হাসি পায়, কিন্তু তোমার দুঃখ যে আমারই দুঃখ। তোমার অঙ্গ সব বাতাসে দুলিতেছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইতেছে কি যেন একটা অতি পুরাতন বেদনার সুদীর্ঘ বিষাক্ত নদ বমির মত আমার তালু পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছে।

"হায় রে অভাগা, কত মহার্ঘ স্মৃতি তোমার সাথে জড়িত! তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমিও অনুভব করিয়াছি সেই যত সব হিংস্র বায়সের করাল চঞ্চুস্পর্শ, কৃষ্ণকায় শ্বাপদের বিকট

---

(১) Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau,
Silencieusement tu soufirais ces insultes
En expiation de tes infâmes cultes
Et des pêchés qui t'ont interdit le tombeau.

দন্তাঘাত—এক সময়ে যাহারা আমার মাংসপিণ্ডকে বিধ্বস্ত করিয়া এত আনন্দ পাইত।

*** *** *** "

"ওগো প্রেমের দেবতা! তোমার রাজ্যে আমি শুধুই দেখিতে পাইয়াছি ফাঁসিকাঠের একটা প্রতিমা আর তাহাতে ঝুলিয়া আছে আমারই ছায়াটি······হা ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, সাহস দাও, যেন নিজের হৃদয় নিজের দেহের প্রতি চাহিয়া দেখিতে আমার ঘৃণা না হয়!" (১)

এ ত মোটেই 'জোলা'-সম্প্রদায়ের মত কথা নয়! ফলতঃ "বোদেলের" আর বস্তুতান্ত্রিকের মধ্যে আছে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উভয়ের উপকরণ মালমশলা একই রকম হইতে পারে, কিন্তু দুইজনে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন দুই ভাবে-ভঙ্গিমায়। বস্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতবাদী জগতের মানুষের স্থূলতম দিকটাই শুধু

---

(1) Ridicule pendu, tes doulcurs sont les miennes!
Je sentis, à l'aspect de tes membres flottants,
Comme un vomissement, remonter vers mes dents
Le long fleuve de fiel des douleurs enciennes.
Devant toi, pauvre diable au sonvenir si cher,
J'ai senti les becs et toutes les mâchoires
Des corbeanx lancinants et des panthères noires
Qui jadis aimaient tant à torturer ma chair.

*** *** ***

Dons tòn île, ô venus! je n'ai trouvéé debout
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image——
—Ah! Seigneur! donnez moi la force et le courage
De contempler mon cœur et mon corps sans degoût!

দেখিয়াছেন, কদর্য্য কুৎসিত রোগগ্রস্ত যাহা তাহার ফটোখানি তুলিয়া লইয়াছেন মাত্র, তিনি এ সকলের অন্তরে প্রবেশ করেন নাই, ইহাদের মধ্যে কিছু গুপ্তবার্ত্তা বা রহস্য খুঁজিয়া পান নাই। বোদেলের এ সকল দেখিয়াছেন, এ সকলের চিত্র দিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের ভিতরের একটা নিগূঢ় সত্যের ও সৌন্দর্য্যের প্রতীকরূপে; স্থূলকে একটা সূক্ষ্মের মধ্যে, বস্তুকে একটা ভাবের মধ্যে, অল্পকে ক্ষুদ্রকে একটা ভূমার অনন্তের মধ্যে উঠাইয়া ধরিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন, এই রূপান্তরই খাঁটি কবিতার মূল কথা; ইহা ছাড়া কাব্যরস নাই, থাকিতে পারে না। বস্তুতান্ত্রিকগণ এই রূপান্তরের তোয়াক্কা রাখিতেন না, ইহার কোন প্রয়োজন অনুভবই করিতেন না। বোদেলের কিন্তু গোড়ায় পাইয়াছিলেন ঐ লোকান্তরের ভাবজগতের একটা বিশেষ উপলব্ধি, এবং উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সাজাইয়া ধরিয়াছিলেন ঐ নিগূঢ় উপলব্ধিটিকে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবার জন্য। ঠিক এই জন্যেই দেখিতে পাই, উপকরণ চয়নেও বস্তুতান্ত্রিক ইহাতে তাঁহার বিশেষ পার্থক্য আছে। বস্তুতান্ত্রিকগণ স্থূল কদর্য্য জিনিষ সব সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত বটে, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে খুব সাধারণ সহজ সুলভ জিনিষের উপর, যাহা সকলেই সর্ব্বত্র দেখে শুনে জানে। বোদেলের কিন্তু তাহা করেন নাই; কুৎসিত বীভৎস ন্যাক্কারজনক জিনিষের মধ্যে যাহা আবার অতি কুৎসিত বীভৎস ন্যাক্কারজনক, যাহা সচরাচর যেন নজরে পড়ে না, পরিচিত হইলেও যাহা লোকে দেখে না বা দেখিতে চায় না, তিনি সেই সমস্তই খুঁজিয়া পাতিয়া বহির করিয়াছেন, এমন কি বস্তুজগতে যাহার সন্ধান পান নাই, কল্পনা লোক হইতে তাহাকে গড়িয়া লইয়াছেন। কারণ তিনি

ত যেমন তেমন রূপ চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছেন এমন রূপ যাহা তাঁহার বিশেষ ভাবটির প্রকাশ বা অভিব্যঞ্জনা significant forms—এই form রূপ আশ্রয় মাত্র; তাঁহার লক্ষ্য ভিতরের significance অর্থ, ব্যঞ্জনা, একটা নিগূঢ় রস। তাই দেখি তিনি যখন বিকট উৎকট বীভৎস জিনিষের চিত্র দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন আলোছায়া খেলাইয়া তুলিয়াছেন, এমন একটা বর্ণগন্ধ মিশাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে এমন একটা ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে সে জিনিষটি আর ঠিক সে জিনিষ বলিয়া মনে হয় না, যেন আর একটা লোক হইতে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও গরিমা লইয়া, কি চিরন্তন সত্য লইয়া দেখা দিয়াছে; সে আর Realist-দের la verité vraie, লব্ধ বাস্তব বস্তু নয় তাহা হইতেছে একটা দৃষ্টি, Revelation.

কবি ফাঁসি কাষ্ঠে দোদুল্যমান যে পলিতশবের বীভৎস চিত্র রক্তবর্ণের—না. মরোর পাংশুটে ফ্যাকাসে রঙে আঁকিয়া দিয়াছেন, সে কি তিনি একান্ত বাস্তব পার্থিব লোক হইতেই তুলিয়া ধরিয়াছেন? না। কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতেছে—

"একটা রূপক ফাঁসিকাষ্ঠ আর তাহাতে ঝুলিয়া আমারই প্রতিমূর্ত্তি"। বস্তুত আমাদের কবির দিব্যদৃষ্টিতে এই সত্যটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে একটা বিরাট ফাঁসিকাষ্ঠ, তুমি আমি বিশ্বের সকল জীব তাহাতে ঝুলিয়া আছি। কবি জগতের সেই দিকটাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে দিকে তাকাইলে আমরা দেখি আছে সেখানে একটা বিরাট নির্য্যাতনের যন্ত্র, বিশ্বের সামগ্রী যেখানে দলিত পিষ্ট হইতেছে। অথবা ভারতীয় রূপকে আমরা বলিতে পারি সৃষ্টি হইতেছে একটা

বিরাট বিকট যজ্ঞ, সেখানে মনোরম মোলায়েম বলিয়া কিছু নাই, জীব সেখানে বলি মাত্র—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাদ্
লোকান্ সমগ্রাণ্ বদনৈর্জ্জলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

শিবকে মানিতে হয় মানিতে পার, কিন্তু রুদ্রই হইতেছে জাগ্রত দেবতা—জগৎ হইতেছে শ্মশান কালীর লীলা-ভূমি।

ভগবান সত্য হইতে পারে, কিন্তু রুদ্রই হইতেছে শয়তান। তুমি শয়তানকেও ভগবানেরই মূর্ত্তি বলিয়া ধরিতে পার, কিন্তু শয়তান শয়তানই। দেখ চারিদিকে, দেখ নিজের ভিতরে তাকাইয়া, দেখ সহজ দৃষ্টি দিয়া, অকুণ্ঠিত চিত্ত লইয়া, কিছু লুকাইতে, ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও না। তবুও যদি বল তুমি শয়তানকে দেখিতে পাইতেছ না, তবে বলিব তুমি স্বেচ্ছাকৃত অন্ধ, তুমি ঘোর মিথ্যাচারী, কাপুরুষ। আমি ত স্পষ্টই দেখিতেছি—

"আমরা পুতুলের মত নড়িতেছি চড়িতেছি আর শয়তানেই ধরিয়া আছে তার কলকাঠি। বীভৎস জিনিষেই আমাদের পরম তৃপ্তি। কোন ঘৃণাভয় নাই প্রতি দিবসে এক পা এক পা করিয়া আমরা পূতিগন্ধময় অন্ধকারের ভিতর দিয়া ক্রমাগত নরকের অভি-মুখে নামিয়া চলিয়াছি।" (১)

---

(1) C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objets repugnats nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas
Sans horreur, à tiavers des ténèbres qui puent.

প্রকৃতির বুকে কুয়াসা কুজ্ঝটিকা অন্ধকার ঝড়বৃষ্টি জলকাদা বৃষ্টি পচা আবর্জ্জনা দূষিত পূতিগন্ধময় হাওয়া নাই ? কৃমি কীট বিকট সরিসৃপ ভূত প্রেত বিভীষিকা নাই ? মানুষের মধ্যে রোগ নাই জরা দৈন্য নাই মৃত্যু নাই ? চিন্তা নাই, হতাশা নাই, শোক নাই, বেদনা নাই, যন্ত্রনা নাই ? অনাচার অত্যচার উচ্ছৃঙ্খলতা --এ সব কি ? কাম ক্রোধ লোভ মোহ, এসব কি ? অধর্ম্ম, পাপ, পতন, অমঙ্গল সহস্র রকম মোহের মধ্যে মানুষ ভিতরে বহিরে ডুবিয়া নাই কি ?

আমি ত দেখছি, মানুষ হইতেছে—

"অভিশপ্ত জীব, কোন আলো না লইয়া সে একটা গভীর গহ্বরের মুখে নামিয়া যাইতেছে; গন্ধেই পরিচয় দিতেছে সে গহ্বরের সিক্ত অতল, আর তার অবলম্বনহীন অনন্ত সোপানাবলী।

"সেখানে জাগে তৈলাক্তদেহ বিকটাকার জানোয়ার সব; তাদের প্রস্ফুরকদীপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চক্ষু, সেখানের এক টানা রাত্রিকে আরও অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে; সে চক্ষু ছাড়া আর কিছু সেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না।" (১)

শুধু তাই নয়, আরও এক কথা—দুঃখের ক্ষোভের কি না জানি না—তাহা হইতেছে এই যে, পৃথিবী নরকের তুল্য, মানুষ শয়তানের

---

(1) Un damné descendant sans lampe
Au bord d'un gouffre dont l'odeur
Trahit l'humide profondeur,
D'eternels escaliers sans rampe,
Où veillent des monstres visqueux
Dont les larges yeux de phosphore
Font une nuit plus noire encore
Et ne rendent visibles qu'eux !

আত্মজ, নিজেরই ইচ্ছায়, আনন্দেরই টানে। কুৎসিত হইতেই মানুষের ভাল লাগে, কুকর্ম্মেই তাহার বিলাস; কি একটা তুষ্টি তৃপ্তিই সে পাইতেছে তাহার দুঃখে, কষ্টে, অভাবে, অতৃপ্তিতে—তাহার জীর্ণ আবাসে, জীর্ণ দেহে, জীর্ণ মনে প্রাণে—তাহার সকল পাপ সকল কলুষতার মধ্যে। ভক্ত এ সকলকে ভগবানেরই লীলা বলিবেন, কিন্তু আমি দেখিতেছি—

"আমার যে সুবিস্তৃত রাত্রির পট, তাহার উপর যে ভগবান নিপুণ হস্তে কেবলই একটা বিচিত্র দুঃস্বপ্ন অবিশ্রান্ত আঁকিয়া চলিয়াছেন।" (১)

কেন এমন হইল? সেই চিরন্তন প্রশ্ন অমঙ্গল আসিল কেন, কোথা হইতে? সেই যে দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা, তাহার উত্তর কি? মানুষ যে নরক চায় না, তাহা নয়; তাহা হইলে নরক আসিতেই পারিত না। নরককে চাই না, অথচ চাই—এ কি রহস্য, কি প্রহেলিকা?

আকাশের তারা ভূতলের কাদায় আসিয়া ডুবিল কেন? স্বর্গের যে অধিবাসী সে নরকের মধ্যে দিয়া ছুটিয়া পড়িল কেন? 'কেন' বোধ হয় নাই, এ যে

"একটা নিয়তির অমোঘ বিধান—ইহাতে প্রমাণিত হয় এই শুধু, যে শয়তানে যাহা করে তাহা সে ভাল করিয়াই করে।" (২)

ভাললাগার কারণ, ভাল লাগা, প্রাণের টান, যাহার হৃদয় যেখানে মজে। তুমি ভালবাস পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমি ভালবাসি ঘোর

---

(1) Sur le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant
Dessine un cauchemar multiforme et sans trêve!

(2) Une fortune irrémédiable,
Qui donne à penser que le Diable
Fait toujours bien tout ce qu'il fait!

অমানিশা। তুমি ভালবাস প্রমোদ উদ্যান, আমি ভালবাসি শ্মশান। তুমি ভালবাস কোমল মৃদুল মনোরম যাহা, আমি ভালবাসি কঠিন উগ্র তীব্র বিকট যাহা। ইহা কেবল রুচিভেদের কথা ছাড়া আর কি? পৃথিবীতে আছে দুই রকম সৌন্দর্য্য, দুই রকম সৌরভ—

"এক, এমন যাহা শিশুর দেহের মত তাজা, বাঁশীর সুরের মত মধুর ভরা ক্ষেতের মত সবুজ,

"আর এক রকম যাহা হইতেছে গলিত উগ্র বিশ্ববিজয়ী—যাহার মধ্যে প্রসারিত রহিয়াছে অসীমের বিস্তৃতি।" (১)

কিন্তু আমার কথা যদি ধর তবে -

"অতল গহ্বরের মত গভীর এই প্রাণ চায় তোমাকে, ওগো মাকবেথ-পত্নী, চায় তোমার সেই পাপসমর্থ প্রাণকে, চায় কবি এস অখিলের সেই স্বপ্নকে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে কুজ্‌ঝটিকার ঝড় ঝাপটার আকাশে।

অথবা সে চায় তোমাকে, মাইকেল এঞ্জেলর মানসতনয়া, ওগো ঘোরা রজনী! চায় তুমি যখন তোমার আহার্য্যসম্ভার রাক্ষসের গ্রাসে অতি প্রশান্তচিত্তে চিবাইতে থাকি তখনকার সেই অদ্ভুত ঠাম।" (২)

---

(1) Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme le hautbois, verts comme les prairies,
—— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies—

(2) Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abime,
C'est vous, lady Macbeth, âme puissante en crime,
Rîve d'Eschyle éclos au climat des antans;
Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel Ange,
Qui tors paisiblement dans une pose étrange
Tes appas façonnés aux bouches des titans!

তুমি বলিবে এ সব উৎকট রুচি, বিকৃত স্বভাবের কথা। ইহা আমার পক্ষেও স্বাভাবিক নয়, এ সব জোর করা জিনিষ, অভিনয় মাত্র। কিন্তু না, মোটেই তাহা নয়—বীভৎস বিকট আমার ভাল লাগে সত্যই তাই তাহাকে ভালবাসি; ভালবাসি অর্থ তাহাকে আমি সুন্দর দেখি। আমার অন্তরাত্মা সৌন্দর্য্যকেই খুঁজিতেছে, তাই যেখানে সে সৌন্দর্য্য পাইব সেখান হইতেই তাহাকে কুড়াইয়া লইব। সৌন্দর্য্যের উৎস যেখানেই হউক না কেন—সে যদি এমন সৌন্দর্য্য হয় যে আমার মন প্রাণকে মাতাইয়া চেতাইয়া উধাও করিয়া দেয়—তবেই হইল, আর কিছু চাই না। দেখুন, কুৎসিতের কবি কি রকমে একনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের কবি হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মবোধ নীতিবোধ শালীনতা শোভনতাবোধ কোন বাঁধনের মধ্যেই তিনি ধরা দিতেছেন না। বিল্বমঙ্গল প্রেমের টানে পচা মড়াকে আশ্রয় করিয়া, বিষাক্ত সাপকে ধরিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের কাছে ছুটিয়াছিলেন। আমাদের কবিও বলিতেছেন, আমি তোমার কান্ত কঠোর, পাপ পূণ্য, সুখ দুঃখ, আরাম যন্ত্রণা শ্রেয় প্রেয়; দূষিত পূত—কিছু গণনা করি না। ও সব অবান্তর জিনিষ আমি বুঝিতে চাই না—আমি বুঝি সুন্দর। আমি এই সুন্দরকেই, এই রসময়কেই উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাকেই আমি আহ্বান করিতেছি—

"তুমি স্বর্গ হইতেই আসিয়া থাক আর নরক হইতেই আসিয়া থাক, কি আসে যায়, ওগো সুন্দর! ওগো বিকট ভীষণ সরল! তোমার দৃষ্টি, তোমার হাস্য, তোমার লাস্য আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে একটা অসীমের তোরণ। সেই অসীমেরই প্রেমে আমি পাগল; হায়, তাহার সহিত আমার কোন দিন যে পরিচয় হইল না।

দানবের হউক আর দেবতার হউক, কি আসে যায়? দেবী হও আর মায়াবিনী হও কি আসে যায় যদি তুমি—ওগো পেলব-নয়না পরীটী, ওগো মূর্চ্ছনা, ওগো সৌরভ, ওগো জ্যোতি, ওগো আমার একমাত্র হৃদয়রাণী—যদি তুমি এই বিশ্বের কদর্য্যতা একটু উপশম করিতে পার, যদি তুমি সময়ের গুরুভার কিছু লাঘব করিতে পার!" (১)

আমাদের কবি কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কোথায় চলিয়াছেন মোটা তারের ঝঙ্কারের মধ্য হইতে সরু তারের কি একটা সূক্ষ্ম সুর স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতেছেন কি? বস্তুতন্ত্রতাকে কোথায় আমরা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি, Realistদিগের ন্যায় বোদেলের শুধুই এ জগতের অধিবাসী নহেন। সহজ সুলভ সাধারণ ভাসা ভাসা যাহা, স্থূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই যাহার পরিসমাপ্তি, সেখানে কি রস কি রহস্য আছে—যদি তাহার মধ্যে অসাধারণ অতীন্দ্রিয়কে না পাইলাম? সেখানে যে সবই জানা চেনা সামান্য অল্প সঙ্কীর্ণ। যাহা সুন্দর যাহা রসময় তাহা আমার পক্ষে অজানা অচেনা হওয়া চাই, তাহাকে অসীমের সাথে অনন্তের সাথে মিশিয়া মিলিয়া যাইতে হইবে—

(1) Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe,
O Beauté! monstre énorme, effrayant, ingenu!
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m'ouvre la porte
D'un Iufini que j'aime et n'ai jamais connu?
De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou Sirène,
Qu'importe, si tu rends,—*fée aux yeux de velours*,
Rhythme, parfum, lueur, ô mon unique reine!—
L'univers moins hideux et les instants moins lourds?

"কোন দিন যাহাকে দেখি নাই, সেই অসীমকেই যে আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।"

কবি তাই খুঁজিয়াছেন আর এক জগৎ, তিনি যেন আপনার দেশ ছাড়িয়া এই পরদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন, ঘরের জন্য বুঝি তাই তাঁহার প্রাণ গুমরিয়া গুমরিয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছে, আর একজন আর এক রকমের ঘর-হারা কবির কথায়—

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে! (গীতাঞ্জলি)

কোথায় এই আর এক জগৎ, এই স্বদেশ, এই আপনার ঘর? সে জন্য আমাদের দৃষ্টি সহজেই উপরের দিকে ধায়, কবিরা সব তাহাই করিয়াছেন। বোদেলের কিন্তু তাহা করেন নাই, পারেন নাই। এই জগতের সাথেই তাঁহার নাড়ীর টান—এই জগতের মধ্যে, ধূলা মাটির অন্তরালেই তাঁহার জগৎ তিনি খুঁজিতেছেন। এ জগৎকে ছাড়িয়া ভুলিয়া তিনি যাইতে পারেন নাই—তিনি যে "নিজবাসভূমে পরবাসী"। বোদেলের তাঁহার দৃষ্টি দিয়াছেন উপরের দূরের পানে নয়—কিন্তু নীচের দিকে, অতি কাছে। দূরই কি কেবল দূরে—কাছের মত দূর কি আছে? আমাদের কবি আকাশের দিকে না উঠিয়া, নামিয়াছেন মাটির দিকে, স্বর্গের অভিমুখে না যাইয়া তিনি চলিয়াছেন নরকের অভিমুখে, দেবতার সাহায্য না চাহিয়া তিনি চাহিয়াছেন যক্ষরক্ষ নাগ দানা পিশাচের সাহচর্য্য। আশ্চর্য্যের কথা,

সেখানেই তিনি পাইয়াছেন তাঁহার সেই প্রিয়, সেই অসীম, সেই প্রাণ মন মাতান সৌন্দর্য্য সুষমা সৌরভ—সেই

"সীমাহীনের সুবিস্তৃত আকাশ যেখানে দেহ মন আপনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, মুক্তির গানে মুখরিত হইতেছে।" (১)

বাস্তবিক, কুৎসিত বিকট বীভৎস নারকীয় পদার্থকে বোদেলের কি যাদুমন্ত্রে যে রূপান্তরিত করিয়া ধরিয়াছেন, কি মোহন স্পর্শে এ সকলের মধ্য হইতে একটা পরম সৌন্দর্য্য নিবিড় রস অতীন্দ্রিয় সত্যকেই প্রকটিত করিয়াছেন তাহা দেখিবার জিনিষ। মূত্রপুরীষের মধ্যে শূকরের আনন্দ—বলিবে, ইহা বিস্ময়ের কি? কিন্তু শূকর মূত্রপুরীষকে মূত্রপুরীষ বলিয়া বোধ করে না, ইহার মধ্য হইতে দিব্য গন্ধ দিব্য আস্বাদনও কিছু লাভ করে না—এই রূপান্তর সম্ভব এক যোগীর মধ্যে, আর না হয় কবির মধ্যে। মূত্রপুরীষের মধ্যে নন্দনের হাওয়া কবি কিরূপে বহাইয়া দিয়াছেন, দেখুন তাহার একটি নমুনা—কবিতাটি দীর্ঘ হইলেও, ইহার মধ্যে বোদেলেরের প্রতিভা এমন ফুটিয়া উঠিয়াছে যে পাঠকগণকে জোর করিয়া শুনাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কবি দিতেছেন বালিকা থাকিতেই যাহারা বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের চিত্র—

"অতি পুরাতন নগরীর আঁকাবাঁকা অলিগলিতে সব জিনিষ এমন কি বিভীষিকা পর্য্যন্ত কুহকে মণ্ডিত হইয়া দেখা দেয়; সেই

---

(১) ——L'expansion des choses infinies

*** *** ***

Qui chantent les transports de l'esprit et de sens,

সব জায়গাতেই আমি প্রাণের একটা অদম্য টানে ছুটিয়া যাই আর চুপি চুপি দেখি যত অদ্ভুত শীর্ণ জীর্ণ অথচ কি মনোহর জীব সব!

এই সব ভগ্ন চূর্ণ বিকটাকার প্রাণী এককালে রমণী ছিল— কাহারও নাম হয়ত এপোনীন, কাহারও বা লাইস! কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ, অষ্টাবক্র—বিকট প্রাণী ইহারা, হোক্ না, এস ইহাদিগকে আমরা ভালবাসিব। আহা! শতছিদ্র আবরণের অন্তরালে হিমজড় খোলসের নীচে, তবুও যে একটি জীব এখানে জাগিয়া আছে!

নিষ্ঠুর হাওয়ায় ঘা খাইতে খাইতে, গাড়ির ঘর্ঘরে কাঁপিতে কাঁপিতে, বুকের মধ্যে কি একটা ফুল তোলা অথবা ছাইপাঁশ কিছু দিয়ে গাঁথা থলিয়া স্মৃতি চিহ্নের মত জোরে আঁটিয়া ধরিয়া, ইহারা হামু দিয়া চলিয়াছে!" (১)

"কেহ টিক্ টিক্ করিয়া চলিয়াছে, ঠিক যেন কাঠের পুতুলটি! কেহ বা আহত পশুর মত আপনাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইতেছে! কেহ বা নাচিতে না চাহিয়াও নাচিতেছে—আহা! এ যেন ঘণ্টার

(১) Dans les plis sinueux des vieilles capitales,
Où tout, même horreur, tourne aux enchantements,
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales,
Des êtres singuliers, décrepits et charmants
Ces monstres disloqués furent jadis des femmes,
Eponine ou Laïs! —Monstres brisés, bossus
Ou tordus, aimons les! Ce sont encor des âmes
Sous des jupons troués et sous des froids tissus
Ils rampent, flagellés par les bises iniques,
Frémissant au fracas roulant des omnibus,
Et serrant sur leur flanc, ainsi que des réliques,
Un petit sac brodé des fleurs ou de rébus;

মধ্যে দোলকের মত একটা দৈত্য নির্দ্দয়ভাবে ফাঁসীতে ঝুলিয়া মরিতেছে!

"দেহ যে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে তবুও দেখ, চোখ ইহাদের শূলের মত তীক্ষ্ণ, রাত্রিকালে সুপ্তসলিলপূর্ণ গর্ত্তের মত উজ্জ্বল; আবার আলো দেখিলেই ছোট্ট মেয়েটি যেমন আশ্চর্য্য হইয়া পড়ে, হাসিয়া কুটি কুটি হয়, তেমনি ইহাদের চাহনিতে মাখা আছে কি একটা শিশুসুলভ সরল দিব্য ভাব।

"তোমার নজরে পড়িয়াছে কি, কত কত বৃদ্ধার শবাধার শিশুর শবাধারের মতই ছোট। এই একই ধরণের দুইটি শবাধার তৈয়ারী করিয়া শিল্পী-শ্রেষ্ঠ মরণ কি অদ্ভুত কি মনোহর রুচির পরিচয় দিতেছে, কি একটা কথা ইঙ্গিতে জানাইতেছে। (১)

---

(1) Ils trottent, tout pareils à des marionettes ;
Se trainent, comme font les animaux blessés,
Ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes
Ou se pend un Démon sans pitié ! Tout cassés
Quils sont, ils ont des yeux percant comme une vrille,
Luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit ;
Ils ont des yeux divins de la petite fille
Qui s'ètonne et qui rit ä tout ce qui reluit.
— Avez-vous observé que maints cerceuils de vieilles
Sont presque aussi petits que celui d'un enfant ?
La Mort savante met dans ces bières pareilles
Un symbole d'un goût bizarre et captivant,
Et lorsque j'entrevois un fantôme débile
Traversant de Paris le fourmillant tableau,
Il me semble tonjours que cet être fragile
S'en va tout doucement vers un nouveau berceau

*** *** ***

আমি যখন চাহিয়া দেখি পারী নগরীর গহন জনতা ভেদ করিয়া এই রকম একটি জীর্ণ ছায়ামূর্ত্তি চলিয়াছে, তখনই আমার মনে হয় এই ক্ষীণপ্রাণ জীবটি যেন ধীরে ধীরে চলিয়াছে আর এক মাতৃকোলের দিকে।

"এই সব চক্ষু কোটি অশ্রুবিন্দু দিয়ে গড়া এক একটি কূপ অথবা কোন গলিত ধাতু হইতে ঢালাই করা এক একটি কটাহ…. এই সব চক্ষুতে তবু আছে কি নিবিড় রহস্য কি অজেয় আকর্ষণ তাহা জানে সেই অভাগা যে একটা নির্ম্মম দুষ্টগ্রহের স্তন্যেই কেবল বাড়িয়া উঠিয়াছে।

"ইহারা সকলেই আমার মনকে মাতাল করিরা ফেলে; কিন্তু এই সব ক্ষীণপ্রাণ জীবদের মধ্যেই এমনও আবার কেহ কেহ আছে যাহারা বেদনাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে, যাহারা এক নিষ্ঠার পাখায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছে, 'হে পরাক্রমী দৈত্য, তুমি আমাকে স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দাও'।

"একজন তাহার দেশের জন্য বিপদে বিপদে শানিয়া উঠিয়াছে, ঐ আর একজনকে তাহার পতি যন্ত্রনায় যন্ত্রনায় পিষিয়া দিয়াছে, ঐ আরও একজন তাহার সন্তানের জন্য জীর্ণ বুক লইয়া মুর্ত্তিমান মাতৃস্বরূপে দাঁড়াইয়াছে—আহা! ইহারা প্রত্যেকেই চোখের জলে এক একটা নদী বহাইয়া দিতে পারে।

"আহা, আমি এই রকম কতই না বালবৃদ্ধাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি।

"ঐ একজন এখনও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া—গর্ব্বে ঋজুর উত্তেজনায় সে বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে ঐ রুদ্র দীপক রাগিনী বুভুক্ষিতের

মত আঘ্রাণ করিতেছে; তাহার চক্ষু সময়ে সময়ে বৃদ্ধ ঈগলপাখীর চক্ষুর মত উন্মীলিত হইতেছে। বিজয় মুকুটের উপযুক্ত করিয়াই তাহার কপালটি যেন মর্ম্মর পাথরে গঠিত হইয়াছে। (১)

"এইরূপে তোমরা রূপসী সব, কোন অনুযোগ না করিয়া, সকল সহিয়া সহিয়া, সংক্ষুব্ধ নগরীর ঘূর্ণীপাকের ভিতর দিয়া চলিয়াছ; তোমাদের কাহারও মায়ের বুক ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, কেহ বা তোমাদের রূপের পসারিনী, কেহ বা পরম পূণ্যবতী—আহা, তোমাদের নাম যে এককালে সকলের মুখে মুখে ফিরিত।

"ওগো শুষ্ক ছায়ামূর্ত্তি সব, বাঁচিয়া থাকিতেও তোমাদের লজ্জা হইতেছে, তাই বুঝি ভয়ে ভয়ে হামু দিয়া দেয়ালের পাশ ঘেঁষিয়া

(১) Ces yeux sont des puits faits d'un milli. n de larmes,
Des creusets qu' un metal refroidi pailleta – – –
Ces yeux mystérieux ont d'invincibles charmes
Pour celui que l'austère Infortune allaita !

*** *** ***

Toutes m'enivrent ! mais parmi ces êt resfrê'es
Il en qui, faisant de la douleur un miel
Ont dit au Devouement qui leur prêtait ses ailes :
" Hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel !"
L'une, pour sa patrie au malheur exercée,
L'autre que son époux surchargea de douleurs,
L'autre pour son enfant Madonne transpercée,
Toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs !
Ah ! que j'en ai suivi de ces petites vieilles !—

*** *** ***

Celle-'à droite encor, fière et sentant la règle
Humait avidement ce chant vif et guerrier ;
Son œil parfois s'ouvrait comme l'œil d'un vieil aigle ;
Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier !

চলিয়াছ—হায় রে বিচিত্র ভাগ্য লেখা সব। কেহ তোমাদের অভিবাদন করে না, তোমরা যে মানবজাতির আবর্জ্জনা, তোমরা যে অনন্তের কবলে আসিয়া পড়িতেছ।

"কিন্তু আমি, আমি ত দূর হইতে তোমাদিগকে পরম স্নেহভরে চোখে চোখে রাখিয়াছি; দৃষ্টি আমার আশঙ্কায় ভরা, তোমাদের পতনোন্মুখ পদবিক্ষেপের উপর সর্ব্বদা নিবদ্ধ—আমি যেন ঠিক তোমাদের পিতা। কি আশ্চর্য্য! তোমাদের অজানিতেই কি একটা গোপন তৃপ্তি তোমরা আমায় দিতেছ! (১)

"আমি যেন দেখিতেছি তোমাদের সেই প্রথম প্রণয়-আবেগ সব প্রস্ফুটিত হইতেছে; দুর্দ্দিন হউক আর সুদিন হউক, তোমাদের সেই যত হারান দিনের মধ্য দিয়াই আমি চলিয়াছি। আমার হৃদয় শতগুণ হইয়া তোমাদের সকল পাপের আনন্দ উপভোগ করিতেছে, আমার অন্তরাত্মা তোমাদের সকল পুণ্যের অলোক পাইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!

---

(1) Telles vous cheminez, stoïques et sans plaintes,
A travers le chaos des vivantes cités,
Mère au cœur saignant, courtisanes ou saintes,
Dont autrefois les noms par tous étaient cités.

*** *** ***

Honteuses d'exister ombres ratatinées,
Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs ;
Et nul ne vous salue, é ranges destinées !
Débris d'humanité pour é'ernité mûrs !
Mais moi, moi qui de loin tendrement vous surveille
L'œil inquiet fixé sur vos pas incertains,
Tout comme si j'étais votre père, ô merveille !
Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins !

ওগো ভগ্ন চূর্ণ অবশেষ সব! তোমরাই যে আমার আত্মীয় স্বজন; যে রক্তে তোমাদের জন্ম, সেই রক্তেই আমারও এ দেহ পিণ্ডের জন্ম! প্রতি সন্ধ্যাতেই আমার বিদায় সম্ভাষণ তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি। ওগো অশীতিপর বৃদ্ধা নবীন জননী সব, কাল তোমরা কোথায় থাকিবে—নিয়তির নিদারুণ চক্রনেমী যে তোমাদের উপর আসিয়া পড়িল?" * (১)

কি অদ্ভুত চিত্র! নন্দনে নরকে, দেবতায় পিশাচে এমন কোলাকুলি মিশামিশি করিয়া রহিয়াছে; আঁধারে জ্যোতিতে, পরমপাপে পরমপূণ্যে এমন জড়াইয়া জড়াইয়া মিলাইয়া গিয়াছে—তাহাদের আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। কবির কাব্যজগতের উপকরণ তাঁহার বালবৃদ্ধাদের মতই দেখিতে জীর্ণ দুঃস্থ গলিত কলুষিত কিন্তু ঠিক তাহাদেরি মত

"শত ছিদ্র আবরণের অন্তরালে, হিমজড় খোলসের নীচে, তবুও কি একটা জীবন এখানে জাগিয়া আছে—"

বাহিরে যতই কুৎসিত কদর্য্য হউক না এই অন্তরের এই প্রাণের দিক দিয়া দেখ, দেখিবে

---

(১) Je vois s'épanouir vos passions novices ;
Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus ;
Mon cœur multiplié jouit de tout vos vices !
Mon âme resplendit de toutes vos vertus !
Ruines ! ma famille ! ô cerveaux congénères !
Je vous fais chaque soir un solennel adieu !
Où serez-vous demain, Eves octogénaires,
Sur qui pèse la griffe effroyable de dieu !

"ইহাদেরও চাহনীতে মাখা আছে কি একটা শিশু সুলভ সরল অজানা সৌরভ—
ইহাদেরও আছে কি একটা নিভৃত সৌন্দর্য্য, স্বর্গীয় সুষমা, দিব্য ভাব,"

"এই সব দৃষ্টিতে তবুও আছে কি নিবিড় রহস্য, কি অজ্ঞেয় আকর্ষণ।"

বোদেলের একটা অতিমাত্র স্থূল, উৎকট ইন্দ্রিয়পরতার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাহারই উপর ভর দিয়া কি সূক্ষ্মে ইন্দ্রিয়াতীতে উঠীয়া গিয়াছেন। তাঁহার বালবৃদ্ধাদের মতই তিনি অন্তরাত্মার কোন তীব্র রসায়নে বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়াছেন—

"—বেদনাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছেন"—
পাপকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে পারিয়াছেন, দেবতার কাছে চল,

"হে পরাক্রমী দৈত্য, আমাকে স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দাও।"

বোদেলের নরকের অধিবাসী, পিশাচের—শয়তানের পূজারী; কিন্তু আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি, কে এ শয়তান, কি জন্য তাহার নরকবাস? এ যে স্বর্গেরই অধিবাসী, এ যে সেই দেবতা—এঞ্জেল—পৃথিবীর মানবের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া একদিন যাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠীয়াছিল, মর্ত্তের "তমসা গূঢ়" তমোরাজি দেখিয়া স্বর্গের আলো যাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ত তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়াছে এই ধ্বনি

"ওগো আমার দোসর—ওগো আমার ভাই।" (১)

তাই ত সে ছুটিয়া আসিয়াছিল জগতের বেদনা যন্ত্রনা কলুষতার মধ্যে, যেখানে সে দেখিতে পাইয়াছিল শুধু

(১) -Mon semblable—Mon frère !

"ফাঁসিকাঠের একটা প্রতিমা, আর তাহাতে ঝুলিয়া আছে তাহারই ছায়াটি"—

দেবতার মত এঞ্জেলের মত সে মুখ ফিরাইয়া লইতে চাহে নাই, দূর হইতে মানুষকে জগৎকে—দুঃখীকে পাপীকে পর ভাবিয়া কেবল একটুখানি করুণা দেখাইয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই। সে চাহিয়াছে মানুষের জগতের নরকের সহিত হৃদয় মিলাইয়া দিতে, এক হইয়া যাইতে, সে চাহিয়াছে

"সেই শক্তি সেই সাহস যেন নিজের হৃদয় নিজের দেহের প্রতি নির্ণিমেষ চাহিয়া দেখিতে তাহার কোন ঘৃণা না হয়!"

মানুষের মধ্যে পিশাচকে শয়তানকে দেখিতে পাইতেছ, কিন্তু কে সে?

সে যে

"একটা ভাব, একটা রূপ, একটা সত্তা, সুনীল গগন হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে একটা পঙ্কিল তামসী বৈতরণীর মধ্যে—সেখানে যে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই আর প্রবেশ করিতে পায় না।" (১)

সে যে

"একটি দেবতা, কুৎসিতের প্রেমে ভুলিয়া অতি দুঃসাহসে গহন পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—" (২)

---

(1) Une Idée, une Forme, un être
Parti de l'azur et tombé
Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul œil de cielne pénètre.

(2) Un Ange, impudent voyageur
Qu'a tenté l'amour du difforme—

এই এঞ্জেল স্বর্গ ছাড়িল কেন, আহার সহবাসী আর আর এঞ্জেল সকলকে অস্বীকার করিল কেন? শুনুন তবে তাহার প্রাণের কথা—

"ওগো আনন্দের দেবতা! তুমি চেন কি শোক, লজ্জা, অনুতাপ, রোদন, অবসাদ?

*** *** ***

ওগো প্রীতির দেবতা! তুমি চেন কি বিদ্বেষ, আঁধারে বদ্ধমুষ্ঠি, বিষের অশ্রুধারা?

*** *** ***

ওগো স্বাস্থ্যের দেবতা! তুমি চেন কি ঐ সব ব্যাধি, ঐ যাহারা মলিন আতুরাশ্রমের-বিপুল-দেয়ালের-পাশ দিয়া পাশ দিয়া, নির্ব্বাসিতের মত, টলিতে টলিতে চলিয়াছে?

*** *** ***

ওগো সৌন্দর্য্যের দেবতা! তুমি চেন কি লোলচর্ম্ম, বার্দ্ধক্য-ভীতি, সেই দারুণ মর্ম্মন্তুদ যাতনা সকল?"

*** *** *** " (১)

---

(1) Ange plein de gaîté, connaissez-vous l'angoisse,
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis ...
*** *** ***

Ange plein de bonté, connaissez vous la haine,
Les poings crispés dans l'ombre et des larmes de fiel ...
*** *** ***

Ange plein de santé, connaisez vous les Fièvres,
Qui, le long des grands murs de l'hospice blafard,
Comme des exieés s'en vont d'un pied traînard ...
*** *** ***

Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides,
Et la peur de vieillir et ce hideux tourment.
*** *** ****

সুখের স্বস্তির স্বাস্থ্যের মঙ্গলের—তোমরা যাহাকে সৌন্দর্য্য বল, সে সকলের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই—তাহার চিন্তা তাহার প্রাণ

"কেবল তাহাদেরই দিকে যাহারা হারাইয়াছে এমন বস্তু, হারাইলে যাহা কখন পাওয়া যায় না, কখন পাওয়া যায় না! তাহাদেরই দিকে যাহারা আপন নয়নজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন, যাহারা বেদনা-বাঘিনীকেই স্নেহময়ী জননীরূপে পাইয়াছে, তাহারই স্তন্য পান করিয়াছে! সেই সব পিতৃ মাতৃহীন অস্থিচর্ম্মসার শিশুদিগের প্রতি যাহারা শুষ্ক কুসুমের মত ঝরিয়া পড়িতেছে!" (১)
আহা। শুনুন তাহার প্রাণের ব্যাথা—

"মন যেন আমার কোন অরণ্যে নির্ব্বাসিত! কি একটা পুরাতন স্মৃতি যেখানে বিষাণের মত তারস্বরে ফুকারিয়া উঠিতেছে! আর আমার প্রাণে জাগিতেছে কেবল সেই সব নাবিকদের কথা, যাহাদিগকে একটা অজানা দ্বীপের মধ্যে ভুলিয়া ফেলিয়া আসা হইয়াছে, জাগিতেছে যত বন্দীদের কথা, যত পরাজিতদের কথা!...আরও কত জনার কথা!" (২)

(1) A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve
Jamais! jamais! à ceux qui s'abreuvent des pleurs
Et tettent la Douleur comme une bonne louve!
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs!

(2) Ainsi dans la forêt où mon esprit s'éxile
Un vieux souvenir sonne à plein souffle de cor!
Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus!......à bien d'autres encor!

এই সকল নগণ্য ঘৃণিত বিস্মৃত সত্তাদের প্রতি কি তীব্র সমবেদনা কি গভীর সহানুভূতি কি অকপট সৌহার্দ্দ আমাদের কবির। তিনি ইহাদের অন্তরাত্মার মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছেন, আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে ইহাদেরই স্বরূপখানি অঙ্কিত আছে দেখিতেছেন। আমাদের মনে হয় কবি যেন গীতার সেই মহাশিক্ষা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই মহা সাধনার সিদ্ধি লাভই করিয়াছেন—

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি—
ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা—

কবিকে যে ঋষি বলা হয় তাহা কি অহৈতুক? কবি হইতেছেন স্বভাব যোগী। আর ঠিক এই জন্যই আমাদের কবিও কি একটা অনন্ত চিরন্তন সত্যের, পরম সৌন্দর্য্যের মধ্যেই সব জিনিষ তুলিয়া ধরিয়াছেন; বীভৎসকেও শ্রীসমুন্নই করিয়া তুলিয়াছেন—পশুকে প্রায় দেবতার কাছে, নরককে স্বর্গের দুয়ারে লইয়া গিয়াছেন।

কবির মনে প্রথমে স্বর্গে ও নরকে, দেবতা ও পশুতে, গন্ধর্ব্বে ও পিশাচে একটা দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল—তখন তিনি স্বর্গ দেবতা গন্ধর্ব্বকে ছাড়িয়া নরক পশু পিশাচকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে কবি যত গভীরে যাইতেছেন ততই দুইশ্রেণীর সে দ্বন্দ্ব তাঁহার চক্ষে ঘুচিয়া যাইতেছে। তিনি এখন দেখিতেছেন নরক যে স্বর্গেরই উল্টা দিক। পশুর উপর ভর করিয়াই যে দেবতা দাঁড়াইয়া আছে, পশু হইতেছে দেবতার বাহন। বিষ ও অমৃত একই সামগ্রী হইতে প্রস্তুত, একই জিনিষের দুই রকম রসায়ন। জগৎ তমিস্রপূর্ণ কিন্তু এ তমোরাশী স্বর্গই ঢালিয়া দিতেছে, ইহা স্বর্গেরই ছায়া—

"এই অভাগা অসাড় জগতের উপর রাশি রাশি অন্ধকার ঢালিয়া দিতেছে ঐ আকাশ।" (১)
জীবের যে দুরবস্থা দেখিতেছ, তলাইয়া দেখ ত সেটা কি?

"দূর গগনের পারে যে সব নক্ষত্ররাজি জ্বলিতেছে, তাদেরই করুণা দীপ্তিতে ভস্মীভূত নয়নে আমার জাগিতেছে কত সূর্য্যের কেবল স্মৃতি গুলি।" (২)

মানুষ ছুটিয়াছে ভগবানকে পাইবার জন্য, কিন্তু সে তাঁহাকে ধরিতেছে পিছন হইতে, ধরিতেছে তাঁহার ছায়াদেহ—মানুষ চাহিতেছে আলোক, তাই সে পাইতেছে অন্ধকার—

"দিগন্তের পানে ছুটিয়া চল, সময় বহিয়া গিয়াছে, চল ত্বরা—শেষ দিক দিয়া অন্ততঃ একটা বাঁকা কিরণলেখা ত ধরিতে পাইব! কিন্তু দেবতা যে কেবল সরিয়া সরিয়াই যাইতেছে আর আমি বৃথা তার পশ্চাতে ছুটিতেছি; রাত্রিও ত অদম্য প্রতাপে ঘনাইয়া আসিতেছে।" (৩)
উপর হইতে কে আমায় টানিতেছে, তাই ত আমাকে পৃথিবীর উপর জোর করিয়া পৃথিবীকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে হইতেছে—

---

(1) Et le ciel versait des ténèbres
Sur ce triste monde engourdi—

(2) C'est grace aux astres nonpareils
Qui tout au fond du ciel flamboient
Que mes yeux consumés ne voient
Que des souvenirs des soleils!

(3) Courons vers l' horizon, il est tard, courons vite,
Pour rattraper au moins un oblique rayon!
Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire;
L'irrésistible Nuit établit son émpire!—

"আমার চক্ষু আকাশের দিকে, তাই ত আমি পড়িতেছি খানার মধ্যে।" (১)

চারি দিকে দেখিতেছি প্রকৃতির এই যে দুঃস্থ সাজ, জীবের এই ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ দেহ, দীর্ণ বুক, হে ভগবান, এসব সেই

"যে তীব্র ক্রন্দনরোল যুগের পর যুগ ঠেলিয়া আসিয়া তোমারই অনন্তের বেলাভূমে আছাড়িয়া পড়িতেছে।" (২)

মাটির উপর কে পড়িয়া আছ, কর্দ্দমের মধ্যে কে ডুবিয়া গিয়াছ? আমি শুনিতেছি কে যেন কোথা হইতে তোমাদিগকে ডাকিতেছে—

"এস, ওগো, এস, বাস্তবকে ছাড়াইয়া, পরিচিতকে অতিক্রম করিয়া, স্বপ্নের মধ্যে ভেলা ভাসাইবে চল।" (৩)

উপরের আলোকের অনন্তের একটা নিবিড় স্মৃতি, গোপন উপলব্ধি লইয়া কবি ছুটিয়াছেন নীচের আঁধারের সঙ্কীর্ণের দিকে, তাই এই নীচ এই আঁধার এই সঙ্কীর্ণের মধ্যেই কেমন খেলিতেছে সেই উপর সেই আলোক সেই অনন্ত; স্বর্গ হইতে তিনি নামিয়া পড়িয়াছেন নরকের মধ্যে, নরকেও তাই কেমন স্বর্গের দীপ্তিতে প্রায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; বীভৎসের পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া ধরাইয়া দিতেছে কেমন একটা সৌম্যেরই পথ। কবি সত্যকে সুন্দরকে সম্মুখ হইতে দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন পশ্চাত হইতে, তির্য্যক ভাবে (oblique rayon), কিন্তু তাহা সত্যেরই সুন্দরেরই দৃষ্টি।

(1) Les yeux au ciel, je tombe dans des trous ! ‡

(2) ——ardent sanglot qui roule d'âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité !

(3) ——Viens ! oh ! viens voyager dans les rêves
Au de là du possible, au de là du connu !

কুটিলের, বিকৃতের, বিকটের মহাসাগরে তিনি সাঁতার দিতেছেন, তবুও তাহা মহাসাগরই।

বোদেলের মোটেই বস্তুতন্ত্র নহেন, বরং আমরা তাঁহাকে বলিব মিস্‌টিক (Mystic), আধ্যাত্মিক কবি। তাঁহার সাজাত্য যদি থাকে, তবে তাহা জোলা বা মোপাসাঁ'র সাথে নয়, তাহা ইট্‌স্‌, এ-ই বা রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক বা ভেরলেন'এর সাথে। আধ্যাত্মিক কবি অর্থাৎ সেই কবি যিনি বস্তুর অন্তরাত্মার রহস্যের কথা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, এ জগৎকে প্রত্যক্ষকে ছাড়াইয়া দিয়া স্থূলকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে দিতেছেন আর একটা জগতের আভাস, একটা অনন্তের অনির্দ্দেশ্যের অবাঙমানসগোচরের ইঙ্গিত, তিনি চলিতে পারেন দুইটি পথে এক হইতেছে উপরের ভগবানের স্বর্গের আলোকের তত্ত্বের বা তথ্যের পথ—মিস্‌টিক কবিগণ এই পথই প্রায়শঃ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য, তাহার অন্তরাত্মার কথা, তাহার মধ্যে অনন্তের অনির্দ্দেশ্যের ভাব কেবল উপরের দিকেই উঠিয়া গেলে যে পাই এমন বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও পারে। ফলতঃ উপরের কথা ছাড়িয়া নীচের কথা, পরমাত্মা আত্মা অমৃতত্বের (God Soul, Immortality) তত্ত্ব বা তথ্য ছাড়িয়া সাধারণ জীবনের কথা, স্থূল অনুভূতি, প্রাকৃত আবেগের কথা লইয়াই যদি থাকি এবং উপরের যে সিদ্ধ-মিস্‌টিক কবি একজন যতখানি উঠিয়া গিয়াছেন, নীচের দিকেও আমি ততখানি নামিয়া যাই—তবে দেখিব সেখানেও আমি পাইতেছি সেই একই অধ্যাত্ম জগৎ, রহস্যলোক মিস্‌টিক আবহাওয়া—কবিত্বের সেই সূক্ষ্ম অরূপের রাজ্য। বৈদিক ঋষি যেমন বলিতেছেন উপরে এক মহা সাগর—এক বিপুল অন্ধকার

নীচে আর এক মহাসাগর আর এক বিপুল অন্ধকার, মাঝখানে শুধু সৃষ্টির জাগ্রতের আলোক রশ্মিটি তির্য্যকভাবে নিপতিত। মাঝখানের আয়তনটিই হইতেছে আমাদের পরিচিত ইন্দ্রিয় বুদ্ধির পরিচিত আয়তন—যাহা সহজ সুলভ সাধারণ বস্তুতন্ত্র গদ্যাত্মক—উপরে ও নীচে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া পিছনে এক অনন্তের রহস্যের মহা সৌন্দর্য্যের মিস্‌টিক রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে। ইট্‌স্, এ-ই বা আমাদের রবীন্দ্রনাথ উপরের ওপারের দিকে চলিয়াছেন, বোদেলের এ পারের অনুভূতির মধ্যেই খুঁড়িয়া চলিয়া একটা নীচের ওপারে গিয়া পড়িয়াছেন—উভয়েই পাইয়াছেন একই মিস্‌টিক অধ্যাত্ম রাজ্য।

আমরা যে রূপান্তরের যে যাদুবিদ্যার যে অদ্ভুত রসায়নের কথা বলিয়াছি তাহার রহস্য ঠিক এইখানেই। পাঠক ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট উদাহরণ পাইয়াছেন, তবুও আরও কয়েকটি আমরা আবার দিতেছি, শুনুন অতিমাত্র ইন্দ্রিয়গত যাহা তাহার উপর ধ্যান বলে কবি কি রকম সমাধিস্থ হইয়াই যেন—অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন—

"তাঁহার সুগভীর চক্ষুকোটর রিক্ততা আর অন্ধকার জড় করিয়া গড়া, মাথার খুলিটি তাহার ফুল দিয়া সুচারুরূপে মণ্ডিত—জীর্ণ মেরুদণ্ডের অস্থিশ্রেণীর উপর সেটী কেমন আবার ধীরে ধীরে দুলিতেছে! আহা! একটা মহাশূন্য মিথ্যার আভায় উদ্ভাসিত হইয়া কি কুহকই না ছড়াইতেছে! (১)

---

(1) Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,
Et son crône, de fleurs artistement coiffé
Oscille mollement sur ses frêles vertebres
—O charme d'un néant follement attifé!

অথবা—

"তখন, ওগো রূপসী আমার! যে সব কৃমিকীট চুম্বনে চুম্বনে তোমায় খাইয়া ফেলিতে থাকিবে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও যে আমার পচা গলা প্রেম রাজির দিব্যরূপ যাহা, অন্তঃসার যাহা সেকুটু কিন্তু অক্ষতভাবে আমারই কাছে রাখিয়া দিয়াছি।" (১)

ঊর্দ্ধের আলোকের কবি হয়ত যখন বলিবেন—

"সব সঙ্গীত তাঁহারই হাসির রোল, সব সৌন্দর্য্য তাঁহারই তীব্র আনন্দের দীপ্তি, আমাদের জীবন তরঙ্গ তাঁহারই হৃদয় স্পন্দন; আমাদের উল্লাস রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা, আমাদের ভালবাসাবাসি তাঁহাদেরই প্রেম চুম্বন।" (২)

বোদেলের তখন গাহিয়া উঠিবেন—

"আমিই ছুরিকা, আমিই ক্ষত; আমিই গণ্ড, আমিই চপেটাঘাত; আমিই চক্রনেমী, আমিই নিস্পিষ্ট দেহ; আমিই হত, আমিই হন্তা।" (৩)

---

(1) Alors, ô ma beauté! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours decomposés.

(2) All music is only the sound of His laughter
All beauty the smile of His passionate bliss;
Our lives are His heart-beats, our rapture the bridal
Of Krishna and Radha, our love is their kiss—
(Ahana and other poems)

(3) Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le soufflet et la joue!
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau!

কিন্তু উভয়ে একই বৈদান্তিক সত্য ও সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তবে বিভিন্ন সংজ্ঞায়; পার্থক্য যাহা তাহা পরিভাষায়।

মিস্‌টিক কবিই বল আর আধ্যাত্মিক কবিই বল তিনি হইতেছেন সেই কবি যিনি জগতের আছে যে একটা বাহ্য নামরূপ, একটা স্ফুট অর্থ সে দিকে ততখানি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না যতখানি করিতেছেন তাহার আছে যে একটা স্বভাব ও স্বরূপ, একটা নিগূঢ় অর্থ (esoteric meaning) সেই দিকে। এই গুপ্ত অভিব্যঞ্জনাকে ফুটাইয়া ধরিবার জন্যই জগতের বাহ্য নামরূপ অর্থ যেখানে যতটুকু যে ভাবে প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার চোখে সমস্ত প্রকৃতি ভিতরের একটা অশরীরী সত্তার প্রতীক বা বিগ্রহ মাত্র—এ-ই বলিতেছেন আত্মার পরিচ্ছেদ (vesture of the soul) হইতেছে প্রকৃতি। তিনি দেখেন একটা সূক্ষ্ম বিরাট শক্তির বা চেতনার লীলা, স্থূল বস্তু স্থূল ঘটনা কেবল তাহারই ইঙ্গিত, সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। তাই বোদেলের বলিতেছেন—

"জগৎ যেন একটি বিপুল বনশ্রেণী, আর মানুষ ক্রমাগত তাহার ভিতর দিয়া চলিয়াছে—মানুষের চারিদিকে তরুলতার মত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া এই সব কিসের অফুরন্ত সঙ্কেতরাজী কত পরিচিতের মতই না তাহাকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। (১)

তবে অন্যান্য কবির সহিত আমাদের কবির পার্থক্য এই যে ইনি একটা বিশেষ ধরণের সিম্বল বা সঙ্কেত, সংজ্ঞা বা পরিভাষা ব্যবহার

---

(১) L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des régards familiers.

করিতে ভালবাসেন—এগুলি কেবল কুৎসিত কালো করুণ পীড়াদায়ক, ইহারা শোভন নয় উজ্জ্বল নয় প্রীতিকর নয়—ইহাতে অভাব আলোর হাওয়ার স্বস্তির স্বাচ্ছন্দ্যের মুক্ত খেলা। কিন্তু তাহাতে খুব বেশী আসে যায় নাই, আসল বস্তুটি—সেই অনন্তকে অশরীরীকে অতীন্দ্রিয়কে তিনিও এই সকলের মধ্য দিয়াই ফুটাইয়া ধরিয়াছেন। কবির চোখে পড়িল অন্ধের দল, তিনি তাহাদের চিত্র দিলেন এই ভাবে—

"অপার অন্ধকারের ভিতর দিয়া ইহারা চলিয়াছে—এই সব চিরন্তন নিস্তব্ধতার প্রতিমূর্ত্তি সব।" (১)

গৃহহীন পথসর্ব্বস্বদিগকে (Bohémien) দেখিতেছেন আর বলিতেছেন—

"এই সব যাত্রী কেবল চলেইছে, ইহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত—তাহাদেরই অতি পরিচিত যে গহন অন্ধকার সমস্ত ভবিষ্যতকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।" (২)

আমরা পূর্ব্বে যে Martyre, যে Gibet Symbolique, যে বালবৃদ্ধাদের কথা বলিয়াছি সে সবও এখানে আবার স্মরণ করা যাইতে পারে।

বোদেলের স্বর্গের কবি নহেন, তাঁহার মধ্যে আলোর জ্যোতির স্নিগ্ধতার একান্তই অভাব দেখিতেছি। প্রধানত তিনি নরকের তমিস্রের বীভৎস বিভীষিকার কবি। এ সকলেরও গিয়াছেন তিনি

(1) Ils traversent ainsi le noir illimité
Ces fréres du silence éternel.

(2) ————Ces voyageurs pour lesquels est ouvert
L'empire familier des ténébres futures !

চরমে, তাই বোধ হয় ঘুরিয়া আবার যেন এক রকম স্বর্গেরই দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছেন। তবুও আমরা অনুভব করি বোদেলের যে আলোকের যে জ্যোতির যে সমুচ্চের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাতে মিশিয়া আছে মশালের রক্ত আভা ও উত্তাপ, প্রভাতের সহজ সরলতা সেখানে নাই। দানবের স্বর্গস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সত্য কথা, কিন্তু ফুটিয়া উঠে নাই দেবতার সাক্ষাৎ অসম্বৃত উপলব্ধি। তিনি যখন বলিতেছেন—

"ওগো আলো! ওগো রঙ্। আমার ঘন কৃষ্ণ সাইবেরিয়া দেশের উত্তাপ চূর্ণ!" (১)

অথবা—

"নিশীথের গগন মণ্ডপেরই মত স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া তোমাকে আমি পূজিতেছি, ওগো দুঃখের সাজি! ওগো বিপুল নিরবতা!" (২) তখন আমরা প্রায় স্বর্গেরই দুয়ারে—কিন্তু তবুও দুয়ারে মাত্র।

ইহাই আমাদের কবির প্রধান কথা—কিন্তু ইহাও আবার সব নয়। বোদেলের পাতিত্যের চরমে গিয়াছেন—চরমে চলাই তাঁহার প্রাণের ধর্ম্ম—তিনি চরমে গিয়া নামিয়াছেন, কিন্তু কি রকমে ঠেলিয়া আবার চরমেই উঠিয়াছেন, তাহারও ইঙ্গিত যে তিনি দেন নাই তাহা নয়। মনে হয়, পৃথিবী খুঁড়িতে খুঁড়িতে তিনি ভূগর্ভের অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিত ধাতুস্রাবের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু

(1) Toi, lumiére et couleur!
Explosion de chalenr
Dans ma noire Siberie!

(2) Je t'adore à l'égal de la voute nocturne
O vase de tristesse, ô grande taciturrne!

সেখানেই থামেন নাই, আরও বরাবর খুঁড়িয়া চলিয়াছেন—পৃথিবী ভেদ করিয়া ওপারে আবার আলোকের আকাশের অসীম বিস্তারেই পক্ষ উড্ডীন করিয়া দিয়াছেন। স্বর্গের স্মৃতি শুধু নয়, তিনি পাইয়াছেন স্বর্গ-দৃষ্টিই; বিপরীত সংজ্ঞায় দেবলোকের রূপক নহে, সহজ দেবভাষাতেও দেবলোকের স্ফুটকাহিনী বলিয়াছেন। গভীর অমানিশার পারেই তাঁহার সেই অধ্যাত্ম ঊষা (L'Aube Spirituelle) উদিত হইয়াছে—

"কি একটা অদ্ভুত শক্তির বিপরীত লীলায় তন্দ্রাজড় পশুর মধ্যে হইতেই দেবতা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।" (১)

আরম্ভে পাই বটে—

"এক কর্দ্দমাকীর্ণ ঘনঘটাচ্ছন্ন বৈতরিণী, যেখানে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই প্রবেশের পথ পায় না।"

কিন্তু সর্ব্বশেষে দেখি—

"আর এক মহাসাগর, জ্যোতি যেখানে ফাটিয়া পড়িয়াছে, আর কেমন সে সুনীল, কেমন স্বচ্ছ, কৌমার্য্যের মতনই সুগভীর রহস্যে ভরা।" (২)

কবি যাহাই বলুন না, যে পথেই চলুন না, তাঁহার চরম আদর্শটি—

---

(1) Par l'opération d'un mystère vengeur
Dans la brute assoupie un ânge se réveille

(2) —Un autre océan où la splendeur éclate,
Bleu, clair, profond comme la virginité.

"বিশুদ্ধ আলো দিয়াই গড়া—সে আলো তিনি আহরণ করিয়াছেন আদিম কিরণরাজীর একটা পরম পবিত্র উৎস হইতে।" (১)

বোদেলের অন্যান্য কবিদের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের আরাধনা করেন নাই, তিনি করিয়াছেন ঘোরা প্রকৃতির পূজা। কিন্তু শ্মশান কালীর সাধকের মতই তিনি শেষে পাইয়াছেন সেই মহাদেব শিবের দেখা। বোদেলের হইতেছেন তান্ত্রিক, বামাচারী, অঘোর পন্থী কবি সাধক। গলিত শবের সহায়ে মহাজীবন, গরলের সহায়ে অমৃত বীভৎসের সহায়ে অতি সুন্দর অনাচারের সহায়ে মুক্তধর্ম্ম, ঘোর তমিস্রের সহায়ে দিব্যজ্যোতি, নরকের সহায়ে স্বর্গ' ইন্দ্রিয়ের সহায়ে অতীন্দ্রিয়, সঙ্কীর্ণ সসীমের সহায়ে অনন্ত অসীম লাভ করাই তান্ত্রিক সাধনা—বোদেলেরও তাহাই করিয়াছেন। বেদান্ত সাধনার কবি অনেক পাইয়াছি, তন্ত্রের ভোগসাধনার কবিও যথেষ্ট আছে, শক্তিসাধনার কবিও আছে—কিন্তু তন্ত্রের অঘোরপন্থা কবিত্বে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, কলুষকালিমাময় আধিব্যাধিজীর্ণ হতাশাপ্রপীড়িত অবসাদগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের লীলা ক্ষেত্র এই আমাদের আধুনিক জগতের প্রতিনিধি, দুঃখের পাপের ফুলঝুরি বানাইয়াছেন যিনি, সেই কবি বোদেলের।

আমাদের কবির ইষ্টদেবতা হইতেছেন এক

"ঘোরা তপ্তরক্তা মোহিনী" (২)

তাঁহার চোখে জাগিয়া আছে—

(1) Il ne sera fait que de pure lumière,
Puisée au foyer saint des rayons primitifs——

(2) Nymphe ténébreuse et chaude.

"বন্ধ্যানারীর একটা হিমনিথর গরিমা" (১)

অথবা—

"কুয়াসা ঢাকা কোন দূর সহরের বুকে কি অজানা বিভীষিকায় মণ্ডিত হইয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে যে একটা প্রস্তর স্তুপ।" (২)

কিন্তু সাধকের দিব্য চক্ষে এ সবই হইতেছে যে—

"কত কত অজানা স্বর্গলোকের তোরণ দুয়ার।" (৩)

শক্তিমান সিদ্ধপুরুষ তাঁহারই যোগ্য ইষ্টদেবীকে পাইয়া বলিতেছেন—

"ঘনগর্জ্জিত তুষার প্রপাতের গলিত ধারায় ক্রমোচ্ছুসিত জলস্রোত মত, তোমার মুখের সুধা যখন আমার অধর পর্য্যন্ত বাহিয়া আসে

"তখন আমার মনে হয় কি যেন একটা উচ্ছৃঙ্খল শক্তিতে ভরা তীব্র কটু অজেয় মদ্য পান করিতেছি—"

কিন্তু পরে দেখি—

---

(1) La froide majesté de la femme stérile.

(2) Un granit entouré d'une vague épouvante,
Assoupi dans le fond d'un sahara brumeux.

(3) C'est le portique ouvert sur les cieux inconnus.

"একটা তরল আকাশই যেন গলিয়া আমার প্রাণের ভিতর যাইতেছে, আমার-প্রাণকে শত-জ্যোতিষ্কে খচিত করিয়া দিয়াছে।" (১)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

---

(1) Comme un flot grossi par la fonte
Des glaciers grondants
Quand l'eau de ta bouche remonte
Au bord des mes dents,
Je crois boire un vin de Bohème,
Amer et vainqueur,
Un ciel liquide qui parsème
D'étoiles mon cœur!

বিলাত প্রবাসীর পত্র

——:০:——

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বহুদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। আমার চিঠিটা ছাপ্‌তে দিয়ে ভাল করেছেন কি না জানি না। হয় ত অনেক কথা অবিচারিত ভাবে এমন করে লেখা ছিল যা বন্ধুর ক্ষমার উপর ভর না করে দাঁড়াতে পারে না। আমি নিজে অনেক সময়ে প্রকাশ করবার জন্য কিছু লিখ্‌ব মনে করেছি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার এত দূর থেকে গড়া ধারণা ভূল হতে পারে এই আশঙ্কা করে লিখি নাই, তা ছাড়া আমার হাতে সময় এত কম যে তার থেকে তিলমাত্রও বাঁচান দুঃসাধ্য। যদি আমার চিঠিতে কোনও সময় এমন কিছু পান যা ছাপ্‌লে কোনও ফল হতে পারে বলে মনে করেন ত তা ছাপ্‌তে দিতে পারেন। আমি এমন নাম-করা লোক নই যাতে আমার নামের স্বাক্ষরে লেখার মূল্য বাড়বে এবং ঐ জাতীয় লেখা দ্বারা যে আমার নাম বাড়াব তাও ইচ্ছা করি না।

দেশ থেকে আমার দুই একজন বন্ধু কি মত আমি দেব তাও সূচনা করে দিয়েছিল। অর্থাৎ আমার মত জিজ্ঞাসা করার অবসরে তাঁরা অস্ফুটভাবে এই আশা প্রকাশ করেছেন যে আমি লিখ্‌ব যে আমাদের ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধ্যাত্মিক-পরায়ণ এবং য়ুরোপীয় জাতিবর্গ অত্যন্ত ভোগ-পরায়ণ, ছিন্নকেন্দ্র এবং অধঃপতনোন্মুখ কিম্বা

অধোগামী। আপনার চিঠিতে যে সাহেবটির কথা লিখেছেন, তিনিও দেখ্‌চি সেই রকম কতকটা বলেছেন, এবং আমাদের দেশের দুই একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও সেই রকমই বল্‌ছেন। এবং কেউ কেউ সমস্ত European cultureএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌চেন। যাঁরা এসব বল্‌চেন তাঁরা আমার চেয়ে সকল বিষয়েই মহত্তর ও যোগ্যতর, এবং ব্যক্তি হিসাবে আমার পূজনীয়। কিন্তু তথাপি আমার মন তাঁদের সঙ্গে সায় দিচ্ছে না। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার কাছে যেটা ঠিক্ খাঁটি কথা বলে মনে হয় তাই বলা উচিত, মন-রাখা কথা বা হুজুগে কথা বলা উচিত নয়। কোন্ কথা ঠিক খাঁটি তা নিশ্চয় করে বলা যায় না, তবে কোন্ কথা আমার কাছে খাঁটি বলে মনে হয় তা অনেক সময়ে বলা যায়, এবং যখন তা বলা যায় তখন তা বলাও উচিত। হয় ত তা প্রিয় না হতে পারে, কিন্তু শুধু প্রিয়ই বল্‌ব এটা বাদ্‌শাহের আমীর ওম্‌রাহের কাজ হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেরই সেটা কর্ত্তব্য এ কথা বলা চলেনা যদিও 'ন বদেৎ সত্যমপ্রিয়ম্' এই অনুষ্টুভ্ ছন্দের শাস্ত্র নিশ্চয়ই এতে আমার উপর তর্জ্জন করে উঠ্‌বেন।

এই ইংরেজ জাতির মধ্যে আমি এক বৎসর বাস কর্‌লুম্ এবং এদের উত্তমাধম অনেক রকমের লোকও দেখ্‌লুম্; এদের প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে সবজাতির চেয়ে নিজদের শ্রেষ্ঠ মনে করে, এবং সর্ব্বত্র নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখ্‌তে চায়। এবং সেই জন্য অন্য জাতির সঙ্গে ব্যবহারেও যে ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায় না তা নয়, বিশেষতঃ কালো বা কটা জাতির সঙ্গে ব্যবহারে। এ দোষটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ জাতির

শক্তি কোথায় তার অনুসন্ধান কর্‌তে গেলেত শুধু তার দোষটার দিকে দেখ্‌লে চল্‌বে না। আমরা যদি নিজেরা সত্য সত্য শক্তি অর্জ্জন, ধারণ ও পোষণ করতে চাই তা হলে অন্য অন্য জাতির শক্তিকেন্দ্র তারা কেমন করে শক্তি সঞ্চয় করে তারই খোঁজ করা আবশ্যক, তাদের দোষটি শুধু উল্টে পাল্টে ব্যাখ্যা করে নিজের মাহাত্ম্য বাড়ালে কোনও লাভ নেই বা তারা একদিন নিশ্চয় ধ্বংশ পাবে লোপ পাবে এ কথা মনে করে বিদ্বেষ বহ্নিতে আহুতি দিলেও কি ঐহিক, কি পারমার্থিক কোনও দিকেরই লাভ নাই। আপনি লিখেছেন "যে দিন * * হাজতে পাঠানো হয় সেদিন কাছারী প্রাঙ্গনে এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় জনতা দেখেছি, "যায় যাবে জীবন চলে" প্রভৃতি গান গাইতে গাইতে যখন বন্দীর দল অসংখ্য লোকের অভিনন্দন লইতে লইতে কাছারীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আর মুহুর্মুহুঃ 'বন্দেমাতরম্‌' 'স্বাধীনতাকি জয়' 'গান্ধীকি জয়' ধ্বনিতে গগন নিনাদিত হয়ে উঠ্‌ছিল, তখন এক স্মরণীয় মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে তা উপলব্ধি করা যায় না। সত্যই দেশে নূতন বন্যা এসেছে। আমদের বাঙ্‌লা দেশে হয় অনাবৃষ্টি, নয় বন্যা এই দুইই হতে দেখেছি, কিন্তু কখনও ধীরে ধীরে জল বাড়্‌তে দেখি নাই বা শুনি নাই। এ দেশে বন্যা হয় না, আস্তে আস্তে বাড়ে এবং যা বাড়ে তা আর কমে না। বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধেই আমি বিশেষ করে বল্‌চি এই জন্য ভারতবর্ষ কথাটা বড় মস্ত, আমি তার কিছু জানিও না, এবং গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও এক কথা বল্‌তে হলে অনেক বিবেচনা করে বলা উচিত। বাঙ্‌লা দেশ feelingটা বোঝে ভাল। সেই জন্য কবিতায় বাঙ্‌লা দেশের খ্যাতি পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ধর্ম্মের ইতিহাস খুঁজ্‌লেও দেখি যে খাঁটি জ্ঞানের ধর্ম্ম বাঙ্‌লায় ঠাঁই পায় নি। হয় কোমল প্রেমের ধর্ম্ম নয় উদ্দাম পাঁঠামহিষ-কাটা শাক্ত ধর্ম্ম এই দুইটাই বাঙ্‌লাদেশে প্রাধান্য লাভ করেছিল। Logicটা কি ভাগ্যে নবদ্বীপে মিথিলা থেকে আমদানী হয়েছিল। কিন্তু ভট্টাচার্য্যেরা তাকে এমন কোণঠেসা করে ফেলেছিলেন যে তার আপন জালেই আপনি এমন জড়িত হয়ে পড়েছিল যে সেইখানেই তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাঙালীর উত্তেজনার অনেকখানিই Romantic রকমের। অনেকখানিই উচ্ছ্বাস, বুদ্‌বুদ, কথার ফেনা। খাঁটি fact এতটুকুকে মনের ভাবাবর্ত্তের তাড়নায় এতবড় করে মনের সাম্‌নে ধরা এইটিই হচ্ছে আমাদের সাধারণ বাঙালীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমি এ কথা বল্‌চিনা যে সত্য সত্য শক্তিসঞ্চয় বাঙালী কর্‌তে পারে না, আমি বল্‌চি তার মন সে দিকে তেমন যেতে চায় না যতটা সে চায় একটা romantic scene, একটা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসটাই আমাদের বাঙালীর চোখে একটা মস্ত reality, being an end in itself and having an end in itself উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের বশে বাঙালী অনেক বড় কাজও করে ফেল্‌তে পারে, আবার একেবারে দিশাহারা হয়েও যেতে পারে।

এই দেশের লোকের চরিত্র ঠিক্ এর বিপরীত। মায়ের কোলে যোগ্য ছেলে মরে যেতে দেখেছি কিন্তু চোখে একবিন্দু জল দেখিনি, অথচ "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্রনমুহ্যতি" এ গীতার শ্লোকও এরা আওড়ায় না বা আওড়াবার প্রয়োজন বোধ করে না। A fact with the English people is merely a fact and nothing more

কিন্তু আমাদের চোখে factটা সামান্য তার ideal valueটাই সব চেয়ে বড়। আমাদের দেশ থেকে প্রথম এদেশে এলেই মনে হবে যে এরা কি ভোগবিলাস ভালবাসে। আমি এখানে এক ছুতরমিস্ত্রীর বাড়ীর ২টা ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। কিন্তু আমার বস্‌বার ঘরটি এমন কার্পেটপাতা দেওয়ালে এমন রঙিন্ কাগজ দেওয়া, এমন সুন্দর সুন্দর সোফা ও কুশন চেয়ার যে এরকম একখানি ঘর মহারাজা কাশিমবাজারের বাড়ীতেও অনেকগুলি নাই, আবার আর একদিকে তাকিয়ে দেখুন, ছুতরমিস্ত্রীর স্ত্রী সকাল থেকে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অনবরত খাট্‌ছে, মাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, করা খাট্‌ছেই খাট্‌ছেই খাট্‌ছেই। ভোগের ব্যবস্থা আছে কিন্তু ভোগকে এরা কখনও অবলম্বন করে থাকে না। এই য়ুনিভার্সিটির একটা ছেলেকে বাবুগিরি করতে দেখিনি। কিন্তু আমাদের বাঙ্‌লা দেশে দেখেছি যে অনেক তরুণ বয়স্কদের সাজসজ্জা যেন মেয়েলীঢঙের সস্তায় বাবুগিরির চেষ্টাটা যেন খুবই বেশী। ভোগও এদের আছে কাজও এদের আছে; কিন্তু ভোগের জন্যই এরা কাজ করে এ কথা ঠিক্ মনে হয় না। এরা কাজ করে কাজের জন্য, ভোগ করে ভোগের জন্য।

এদেশের লোকের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বীরোচিত ও মনুষ্যোচিত কতগুলি যে আশ্চর্য্য গুণ দেখেছি তা কখনও অস্বীকার করতে পার্‌ব না। তা না থাক্‌লে ভগবানের নিয়মে তাদের হাতে এত শক্তি কখনও আসতে পার্‌ত না। ভগবানের ব্যবস্থায়, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়্‌ফুকে, ফাঁকিতে কিছু হয় না। যাতে হয় সেটা হচ্ছে পুরুষকার। চরিত্রবল পুরুষকারের

অন্তঃশক্তিস্বরূপ। শুধু জ্ঞান, বিজ্ঞান, এত শক্তিই নয়; কারণ ওগুলোত শক্তির উপাদান মাত্র, ওগুলোকে হজম করে নিজস্ব কর্‌তে হলে চরিত্রবল ছাড়া হওয়ার উপায় নাই। কাযেই আমি যে scheme অবলম্বন কর্‌তে বলি সেটা হচ্ছে scheme of super-co-operation বা Co-operation by transcendence. অর্থাৎ দেশ হিতকর অনুষ্ঠানের এমন বন্দোবস্ত দেশের লোকের তরফ থেকে কর্‌তে চেষ্টা করা, যাতে সরকারের ব্যবস্থাকে সর্ব্বদা ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। Not to spoil Government Institutions by Non-co-operation but to supersede them by establishing better Institutions by private endeavour, wholly unconnected with Government এই ব্যবস্থায় স্বভাবতঃ সমস্ত শক্তি জনসাধারণের হাতে গিয়ে পড়্‌বে এবং জনসাধারণের শক্তি এত বাড়্‌বে যে সেই শক্তিটাই প্রধান হবে। গবর্ণমেণ্টের বিপুলশক্তি সত্ত্বেও, গবর্ণমেণ্টকে ফেউ হয়ে থাক্‌তে হবে যদি না গবর্ণমেণ্ট প্রজাশক্তিকে অনুসরণ করেন। গবর্ণমেণ্টকে বর্জ্জন করে তাকে হীনবল করা চল্‌বে না, গবর্ণমেণ্টের শক্তির চেয়ে দেশের হিত কর্‌বার শক্তি অধিকভাবে সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লে তবেই হবে যথার্থ ভাবে সরকারের পরাজয়। Do not destroy any Institutions but build new and better ones. এই আত্মযোগিতার পন্থা আমার কাছে খুব সম্ভব এবং সুসাধ্য বলে মনে হয়, তবে এ উপায়ে ১বৎসরের মধ্যে স্বরাজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমাদের যে যে দিকে অভাব তার নির্ণয় করে তার মধ্যে যে গুলা সুসাধ্য সেই গুলোকে প্রথম হাতে নিয়ে যথাবিহিতরূপে সুবন্দোবস্তে

কাজ আরম্ভ কর্‌লে আমার মনে হয় এ পন্থায় খুব সুফল হতে পারে। অল্পগণ্ডীর মধ্যে প্রথম experiment আরম্ভ করা চল্‌তে পারে। শুধু দৃষ্টান্ত দেবার জন্য বল্‌ছি, এই যেমন ধরুন চাটিগাঁয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ভার হাতে নিয়ে local voluntary tax systemএ আয় সংগ্রহ করে বেশ সুবন্দোবস্ত করে উৎসাহী যুবকদের ঐ কাজে লাগিয়ে দিয়ে নানা কেন্দ্রে বিদ্যালয় খোলা যেতে পারে। যদি দেশের প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা গবর্ণমেণ্ট থেকে পৃথক ভাবে গবর্ণমেণ্টের চেয়ে ভালভাবে দেশের সেবা কর্‌তে পারি, তবে তার যতটুকু পরিমাণে সফলতা আমরা দেখাতে পার্‌ব ততটুকু পরিমাণেই স্বরাজ সাফল্য লাভ কর্‌বে। মাথা গরম করে হৈ চৈ করে রাসীকৃত বস্ত্রদগ্ধ কর্‌লে বা চাক্‌রি ছেড়ে দিলে কি আরও নূতন রকমের আজগুবি কিছু কর্‌লে যে খুব সুফল হবে একথা আমার কিছুতেই মনে হয় না। গত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে বর্ত্তমান আন্দোলনের এই বিশেষত্ব দেখ্‌ছি যে খলিফৎ অবলম্বন করে মুসলমান এবং হিন্দু গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষে সমভাবে যোগ দিয়েছে নতুবা অন্যগুলো যথা কাপড় পোড়ান, স্কুল কলেজ অল্পদিনের জন্য পরিত্যাগ দুই একজনের চাকরীত্যাগ বেওয়ারিশী রকমের জাতীয় বিদ্যালয় খোলা, নেশনাল ফাণ্ডতোলা (গতবারের সে টাকাগুলোর পরে আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না, এবারের টাকাগুলোর কি পাত্তা হয় দেখ্‌লে বুঝ্‌ব বার ভূতে শুষে না মেরে দেয়!) স্কন্ধে স্বদেশীবস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ইত্যাদি সুললিত সঙ্গীত ছোটখাট ধর্ম্মঘট ইত্যাদি গত বারেও ছিল। আমাদের * * যতদূর মনে পড়ে সেবারেও কলেজ ছেড়ে একটা দৌড়্ দিয়েছিলেন। এই যে খলিফৎ

অবলম্বনে মুসলমানের সহিত একতাসঙ্ঘটনের চেষ্টা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর মনে হয় এর দূর পরিমাণ ঠিক্ উল্টা। মুসলমানের সঙ্গে যে আমাদের স্বভাবতঃ তেমন মিল নেই, তার এক্‌টা প্রধান কারণ এই যে মুসলমান মনে করেন যে তিনি বিরাট মুসলমান জগতের অংশ—first a Mahomedan then an Indian, কাযেই মুসলমানতার কাছে জাতীয়তা বরাবরই তাঁদের কাছে ছোট, এই জন্যই হিন্দুর সঙ্গে বিচ্ছেদটা তাঁদের পক্ষে এত সহজেই ঘটে থাকে, যে হিন্দু মুসলমানকে এক কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে তার প্রধান কাজ হওয়া উচিত এই Pan-Islamic feeling এর বেগ মন্দীভূত করা। যতই এই Pan-Islamic feeling বাড়্‌বে ততই যথার্থভাবে হিন্দুর থেকে মুসলমান দূরে গিয়ে পড়্‌বেন। সেই জন্য আমার মনে হয় যে মহাত্মা গান্ধির ব্যবস্থায় Pan-Islamic বুদ্ধিতে এত ইন্ধন যোগান হয়েছে, যে ভিতরের দিক্ থেকে হিন্দুর কাছে থেকে মুসলমান অনেক দূরে গিয়ে পড়েছেন, যেটুকু বাহিরের ঐক্য প্রকাশ পাচ্ছে সেটুকু শুধু ইংরাজ বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্বেষের উপর ভর করে যে ঐক্য ঘটে সে ঐক্য ঐক্যই নয়। এ আন্দোলনে যতটুকু definite constructive সফল হবে সেই টুকুকেই আমি উন্নতি বল্‌ব বাকীটার অনেক খানিকেই So many calories of heat generated and wasted বলে হিসেবে লিখে রাখ্‌ব।

একথা খুবঠিক যে আমাদের মেজাজ এদের চেয়ে অনেক নরম রকমের, কিন্তু একথাও ঠিক যে য়ুরোপে যে সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা উঠ্‌ছে, আমাদের দেশে তা ওঠে নি। এত বড় যুদ্ধ হয়েছে, তাতে এরা ক্লান্ত হয়েছে, হবারইত কথা, আমরা হলে ধ্বংশ পেতুম।

কিন্তু ক্ষয় যেমন এদের আক্রমণ করচে, ক্ষয়কে সহ্য করা এবং উপচয় আহরণ করা এদের পক্ষে তেম্নি সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ। বর্ত্তমান বাঙালীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কোন্‌খানে তা আমি আজও ভাল করে ঠাহর করতে পারি নি, আপনি যদি পেরে থাকেন ত জানাবেন। প্রাচীন শাস্ত্রপন্থার দিকে চেয়ে দেখি যে প্রথমকার কথা ছিল খাঁটি মানুষ হওয়া, তার পরে যারা আরও উচ্চ অধিকার চাইতেন তাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন কর্‌তেন। অতি স্বল্প লোকেই সে পথ অবলম্বন কর্‌বার অধিকার পেত। এই শেষোক্ত উত্তমাধিকারীর সাম্‌নে যে উন্নত আদর্শ ভারতবর্ষ আপনার কাছে ধরেছিল যাতে সমস্ত মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের সঙ্গে মৈত্রী করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পার্‌ত এইটিই সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতির উপর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু এ পন্থা কোনও দিনই সকল লোকে ধর্‌ত না এখনও ধর্‌বে না। বাকী সর্ব্বসাধারণের কাছে যে আদর্শ ছিল সেটা ত সব দেশেই সমান। সেই Jesus এর ধর্ম্মের চেয়ে দুই এক পর্‌দা নীচে। কিন্তু অন্য জাতির সঙ্গে তুলনা করলে আমরা কি বল্‌তে পারি যে আমাদের জনসাধারণ অর্থাৎ আপনি ও আমি এই নীচের পরদাতে যেটুকু আয়ত্ত করা প্রয়োজন সেটুকু অন্য জাতির লোক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজস্ব করেছি। অন্যজাতির লোক অপেক্ষা আমরা কি বেশী সত্যপ্রিয়, বেশী জিতেন্দ্রিয়, কম পরশ্রীকাতর, কম নীচ। Take facts as facts। ধূয়াগুলো ছেড়ে দিয়ে ভেবে দেখুন দেখি সত্যসত্যই বর্ত্তমান বাঙলা দেশে আপনি আমাদের অধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কিছু monopoly দেখতে পাচ্ছেন কিনা? আপনি

ভগবানে বিশ্বাস করেন কি না জানি না, আমি করি। এ কথা কখনও মনে করবেন না যে ভগবানের ব্যবস্থায় ইংরেজ যে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রভুত্বে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে এটা accident, কখনও নয়, নয়, নয়। আমাদের যে শুধু science এ দেশ থেকে নিতে হবে তা নয়, যে স্বভাবের গুণে এরা এমন শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে, সেই স্বভাব অর্জ্জন করতে হবে। প্রাচীন ঋষি আর তপোবল ও সব মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে আউড়ে সমস্ত দোষত্রুটি ধুলোচাপা দিতে পারেন কিন্তু দূর করতে পারবেন না। শক্তি সঞ্চয় না করতে পারলে আর্য্যঋষিদের মৈত্রীমন্ত্রের দোহাই দিয়ে ঘৃণার বীজের রোপন করলে কখনই দেশ উদ্ধার হবে না, একথা নিশ্চয়।

যে যে দিকে আমাদের ত্রুটি, আমাদের জাতিভেদ আমাদের শিক্ষার অভাব, আমাদের দৃঢ়তার অভাব, একএকটি করে সমস্ত অপরাধ ও ত্রুটি বর্জ্জন করে যদি দেশ সেবার নূতন নূতন বন্দোবস্ত করতে পারি তা হলে হয় আমাদের দেশস্থ ইংরেজকে সেই কাজে আমাদের সহায় হতে হবে নয় সে একেবারে back number হয়ে যাবে, এবং সে থাকুক কি নাই থাকুক আমাদের স্বরাজ হবে। সাময়িক উত্তেজনা মদ্যের স্থান অধিকার করে অনেক অনাসৃষ্টি ব্যাপার ঘটাতে পারে, কিন্তু যথার্থ বল সঞ্চয় করতে হলে ধীরে ধীরে দুগ্ধ পান করে বিন্দু বিন্দু করে রক্ত সঞ্চয় করতে হবে, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। উত্তেজনার পথ পথই নয়। শুধু এইজন্যই অনেক সদিচ্ছা, অনেক ত্যাগ সত্ত্বেও non-co operation পন্থা সিদ্ধিলাভ করবেনা।

শান্তিনিকেতনে পৃথিবীর লোককে পড়ুয়া করে নিতে চাচ্ছেন, বেশ কথা—কি পড়াবেন ?

ভারতবর্ষের তরফ থেকে য়ুরোপের কাছে যদি কিছু ধরতে পারা যায় সে, (আমি যতদূর বুঝি) হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র। তার মধ্যেও অনেক রদ্দি বাজে জিনিষ আছে ; এবং তাকে উদ্ঘাটন করতে হলেও বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দর্শনের সম্যক্‌জ্ঞানও সমস্ত সংস্কৃত দর্শন নখাগ্রে আছে এমন লোকের প্রয়োজন, সে লোক ত চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আর এক যৎকিঞ্চিৎ হতে পারে Indian art. আচার্য্য বসু মহাশয়ের নিজের আবিষ্কার বিষয়ে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা অবশ্য তাঁর কাছে শিখতে যেতে পারেন। আর যে আপনারা কি শিখাবেন তাত আমি ঠাহর করতে পারি না। পরমহংসদেবের গল্প মনে পড়ে "তুমি আগে বোঝ" কবে যে আমাদের লম্বা লম্বা কথাটা কর্ম্মে এসে সেটা কাজে পরিণত হবে তাই কেবল ভাবি।

"যায় যাবে জীবন চলে" এ গান শুনতে বেশ লাগে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে হাঁ তাত যাবেই, মেলেরিয়ায়, কালাজ্বরে, বসন্তে, কলেরায় যায় যাবে জীবন চলে, আর সকলে বোসে বোসে গান কর নয় তাস খেল। কথার বাহুল্য ও ভাবের বাহুল্য কমিয়ে আলস্যকে দূর করে সত্যি সত্যি কাযে কবে লাগব তাই ভাবছি ; পূর্ব্বের চেয়ে একটু উন্নতি যে না দেখচি তা নয়, কিন্তু এত নিরর্থক ধোঁয়া বালির সৃষ্টি হয়ে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হচ্ছে যে কাজ এগিয়েও যেন এগুচ্ছে না। অথচ কথা গুলো যেন পূর্ব্বের চেয়েও লম্বা লম্বা হয়ে চলেছে। "প্রেয়কে পরিত্যাগ করে প্রাচ্যজাতির শ্রেয়কে বরণ" "ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা ও য়ুরোপের ভোগকলুষতা" এ সব শুনে শুনে কান

ঝালাপালা হয়ে গেল। অথচ একটা লোকের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখিনা যে সে কোন্‌খানে তার আধ্যাত্মিক উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনেক কথা বল্‌বার ছিল, কিন্তু চিঠিটা বেজায় রকমের লম্বা হয়েছে, আর অন্য কথায় ঢুকলে সে Penel সাহেবের রায় হয়ে উঠবে। রাতও ঢের হয়েছে, কাযেই এই বারে ইতি দিতে হবে।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আমি বড় খোঁজ রাখি না। তবে Bongléর Essais sur le regime des castes ও Senart এর Les castes dans l'Inde les faits et le système এই দুখানা ত আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন। শুনে সুখী হবেন Mind পত্রিকা আমাকে তাদের দর্শন গ্রন্থের সমালোচকরূপে নিয়োগ করেছেন। এটা একটু বিশেষ খাতির করেছে বলেই ত মনে করি।

ভবদীয়—

বেদুঈন

—— :✱: ——

কণ্ঠে যদি পেতাম আমি
রুদ্রদেবের তানখানিরে
গেতাম তবে এমনিতর গান
ডম্বরুতে তাল লাগায়ে
আঁকড়ে-ধরা কোনখানিরে
ভাসিয়ে দিতাম এমনি ডেকে বান,
সাত সাগরের ঊর্ম্মি এনে
ঘূর্ণিপাকের চক্রতলে
মন্ত্রে যত দিতাম আমন্ত্রন
জন্ম-ব্যাপী অপমানে
ডুক্‌রে-কাঁদা অশ্রুজলে
হৃদয় ছিঁড়ে দিতাম বিসর্জ্জন।

চাই কি আজি? চাই যে ওরে
স্তব্ধ মূকের কণ্ঠ ছিঁড়ি
উঠবে বেজে ক্রুদ্ধ কলরোল

বহ্নি জ্বালি' ফিন্‌কি তারি
হৃদয় তনু চিরি চিরি
তুল্‌বে আজি প্রলয়-কাড়ার বোল ;
ললিত রাগে বন্ধ আঁখি
অন্ধ কোথা থাকুক পড়ে,'
দিকে দিকে রুদ্র সাহানায়
কঠোর আঘাত নিঠুর হ'য়ে
পড়ুক আজি বাইরে ঘরে
পাগল করুক জীবন দুরাশায়।

ওই যে ঘরে একলা পড়ে'
কোন্ বা সুখের স্বপ্ন-দেখা
কোন্ অলীকের প্রলেপ-দেওয়া চোখে
ওই যে কোনে প্রলাপ-ঘেরা
স্বর্গ-সুখের মন্ত্র-শেখা
কর্‌ছে জমা অশ্রু দুখে শোকে,
দম্ভোলিরই এক নিনাদে
করুক সবায় ক্রুদ্ধ আঁখি,
শিষ্ট প্রাণের সকল আরাম-রাগ
দীর্ণ করে' পিষ্ট করে'
বজ্র-বাণী যাক্‌রে আঁকি
"জাগরে অচল জাগরে অলস জাগ !"

বিশ্ব-ব্যাপী মৃত্যু জাগে
সিন্ধু বুকের ঊর্ম্মিরাশি
রক্তে ঘিরি কর্‌লে লালে লাল,
কোনখানে তুই নদীর বাঁকে
বাজাস্‌ আপন খেলার বাঁশী
তুলিস্‌ আপন খেলার নায়ের পাল ;
লাগবে কি তোর পালে হাওয়া
হবে কি তোর সাগর যাওয়া
শেষ হবে কি কোনের আনাগোনা
বেহিসাবীর নৃত্য বুকে
বিশ্বে রে ছাড়ঃপত্র-পাওয়া
মন্ত্র গুণে করবি তামা সোনা।

জাগে জাগে আজ যে জাগে
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে—
আদিম কালের আরব-বেদুঈন,—
অপার মরুভূমির মাঝে
কঠিন সুরের কঠোর রাগে
ভাঙ্‌বে আজি হৃদয়-কারা দীন ;
তপ্ত মরুর বক্ষ-বালি
উড়্‌বে আজি অশ্ব-খুরে
কাল-বোশেখীর ক্রুদ্ধ যেন শ্বাসে

দিগন্তে দিক-চক্রবালে
ফিরবে আঁখি দূরে দূরে
দুর্গমেরে সহজ করার আশে।

জাগে জাগে আজ যে জাগে
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে—
চিরন্তনের আরব-বেদুঈন
উড়্‌ছে ধূলি বর্শা তুলি
যায় কি গাওয়া বেহাগ-রাগে
নির্ব্বাসিত কর্‌রে রবাব বীণ :—
ডাক রে আজি
ভাঙ্‌বে অপমানের পেশা
বিশ্ব-ব্যাপী কণ্ঠ-ছেঁড়া হাঁকে
বক্ষ-শোণিত তালে তালে
লাগবে আজি রুদ্র-ন
জীবন-গানের মৃত্যু ফাঁকে ফাঁকে।

জাগে জাগে আজ যে জাগে—
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে—
মুক্ত পাগল আরব-বেদুঈন

আর না চাহি প্রতিদিনের
সঙ্গোপনের অশ্রু-রাগে
কণ্ঠ যেথা গায় রে মৃদু ক্ষীণ ;

ছিন্ন করে' দীর্ণ করে'
ছোট্ট মনের মায়া-বাঁধন
ঘিরবে অসীম মরুভূমির মায়া

আশার যত ছোট্ট ভাষা
পড়্‌বে লুটে মৃত্যু কাঁদন,
—প্রাণের পাশে দিগন্তরের ছায়া।

জাগে জাগে আজ যে জাগে
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে
জীবন উষার অরব-বেদুঈন

ওই যে আঁধার পড়্‌ছে খসে'
ফুল্ল মনের অরুণ-রাগে
টুট্‌বে আজি যুগান্তরের ঋণ :—

আজ যে সাগর পারে-পারে
প্রাণের ভাষা কল্লোলিত
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত মন

আজ যে দিকে দিগন্তরে
ছোটার হাওয়া হিল্লোলিত
জীবন আজি কর্‌বে মরণ-পণ।

শারদীয়া সপ্তমী
১৩২৮

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উড়ো-চিঠি

—— :০: ——

১লা নভেম্বর, ১৯২১।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সতের বছর বয়েসে এবার আপনার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। আপনি এখন আপনার ছেলের ভবিষ্যত শিক্ষার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন—এবং সে সম্বন্ধে ভাবতে সুরু করেছেন। এ বিষয়টি আপনার কাছে বিশেষ করে উল্লেখ করবার মানে হচ্ছে এই যে বাংলাদেশে ও-একটা সাধারণ ব্যাপার মোটেই নয়। এতকাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের পিতারা তাঁদের ছেলেদের বাঁধা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকা সড়কের একদিক দিয়ে ঢুকিয়ে আর একদিক দিয়ে বের করে' আনবার মধ্যে আর কোন চিন্তার প্রয়োজন দেখতেন না। ও-ব্যাপারটার মধ্যে তাঁদের আশার স্বপ্ন এত বড় হয়ে থাক্‌ত যে আশঙ্কার লেশ-মাত্র তাতে স্পর্শ করতে পেত না। ছেলেকে কলেজে ঢুকিয়ে হয় Law নয় medicine নয় civil service ঘুরিয়ে আনা—এই বাঁধিগৎ যে আজ আপনি মানছেন না এতে করে মনে হচ্ছে দেশের হাওয়া বদ্‌লেছে। বাংলা দেশের সব পিতারাই যদি আপনার মতো আপন আপন ছেলের শিক্ষা-সম্বন্ধে সচেতন হন ও ভাবতে সুরু করেন তবে আমার বিশ্বাস বিশ বছরে বাঙালী-সমাজের চেহারা বদ্‌লে যাবে। বলা বাহুল্য আপন ছেলের শিক্ষা-সম্বন্ধে আপনার এই সজাগ অবস্থা সমাজ-হিতৈষী মাত্রকেই

আনন্দ দেবে। আমি ভেবে চিন্তেই এখানে সমাজ-হিতৈষীর জায়গায় স্বদেশ-হিতৈষী কথাটা ব্যবহার করি নি। কেননা স্বদেশ কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পলিটিক্সের পালে হাওয়া লাগাই। কিন্তু এই কথাটা আজ আমাদের সদা সর্ব্বদা স্পষ্ট করে' মনে রাখতে হবে যে পলিটিক্স শিক্ষার অঙ্গীভূত হলেও শিক্ষা পলিটিক্সের অঙ্গীভূত নয়। কেননা পলিটিক্স মানুষের জীবন-যাত্রার একটা দিক কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপারটা মানুষের মনের সব দিক নিয়ে। কাজেই ওটার চাইতে এটা বড়। বিশেষতঃ শিক্ষাই মানুষ গড়ে—আর ধর্ম্মনীতি বলুন সমাজনীতি বলুন রাজনীতি বলুন, সাহিত্য দর্শন আর্ট বিজ্ঞান বলুন গড়ে তোলে এই মানুষ। জাতির যা কিছু সৃষ্টি তা দু'ভাগে পড়ে। তার একভাগে প্রয়োজনের সৃষ্টি আর এক ভাগে আনন্দের সৃষ্টি। এর দুয়ের পিছনেই দরকার ঐ মানুষ। আর ঐ মানুষ গড়বার যন্ত্র ও মন্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। এই শিক্ষাকে পলিটিক্সের চশমার ভিতর দিয়ে দেখলে তা হয় acute নয় obtuse দেখাবেই। কেননা পলিটিক্সের লোভ নগদ বিদায়ের উপর সুতরাং ওর লাভ সাময়িক। বাঙালী ব্যবসাদারেরা যেমন রাতারাতি বড়-লোক হবার আশায় প্রথম প্রথম প্রচুর লাভ খেয়ে তারপর ফেল মারে, পোলিটিক্যাল বিদ্যাপিঠগুলোরও তেমনি দশা হবারই বেশী সম্ভাবনা। শিক্ষাকে দাঁড় করাতে হবে আত্ম-অনুশীলনীর উপর পলিটিক্স-পরিচর্চ্চার উপরে নয়। এ কথাটা আপনাকে এত করে বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমাদের ১৯০৬ সালের জাতীয়-শিক্ষা পরিষদ কিম্বা ১৯২১ সালের কলিকাতা বিদ্যাপীঠ দুয়েরই জন্ম পলিটিক্সের তাগিদের ভিতর। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ আমরা

সফল করে' ভুলতে পারি নি—আজকার কলিকাতা বিদ্যাপীঠই যে সফল হবে তেমন আমার মনে হয় না। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখবেন যে কলিকাতা বিদ্যাপীঠ সফলও যদি হয় তবেই যে আমাদের শিক্ষা সমস্যাটা নিঃশেষে মুছে যাবে তা নয়। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন যে-সব দেশে গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের হাতে সে সব দেশেও শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের মাথা ঘামান' থামে নি। আসলে গভর্ণমেণ্টকে পদে পদে জব্দ করতে হবে বলেই যে আজ আপনার মনে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এ কথা সত্য নয়—অন্তত সত্য হওয়া উচিত নয়। এ কথা বোধ হয় আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে জোর করে বল্‌তে পারি যে যতদিন না এ প্রশ্ন সত্যিকার করে' জাতির নিগূঢ়তম অন্তর থেকে উঠবে ততদিন এর সমাধানও হবার কোন সম্ভাবনা জন্মাবে না। একমাত্র আমাদের অন্তরের সত্যই বাইরের বাধা বিঘ্নকে জয় করতে পারবে—এবং সেই সত্যই কেবল আমাদের সামর্থ্য দান করতে পারবে।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যে সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত এ-রকম কথা আমি আপনাকে কোন দিনই বলি নি। কিন্তু আমার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে এই যে পরের দোষ বের করার আগে নিজের কোন ত্রুটী আছে কি না সেইটে আবিষ্কার করা। কেননা আমার বিশ্বাস সফলতা অসফলতার প্রধান কারণটা এইখানে। নিজেদের ত্রুটী না ঝেড়ে ফেল্‌লে বাইরের গলদকে আমরা কোনদিনই এড়িয়ে চল্‌তে পারব না।

আপনি বলেছিলেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা ছেলেদের শিক্ষা দেন না, দেন কতকগুলো নোট গিলিয়ে

যাতে করে তারা এগ্‌জামিন পাশ করতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখুন বাঙালী ছেলের অভিভাবকেরা কি ঠিক ঐটেই এতকাল ধরে চেয়ে আসেন নি? তাঁদের দৃষ্টি কি ছেলেদের শিক্ষার চাইতে class promotion এর দিকেই বেশী আবদ্ধ ছিল না? হাজারে ন' শ' নিরানব্বুই জন অভিভাবকের মনের দিকে তাকিয়ে দেখুন দেখতে পাবেন সেখানে ছেলে কটা পাশ দিয়েছে তার হিসেব আর কোন হিসেব নেই। এই যে পাশের হিসেব এ কেন? কেননা আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বিদ্যার আলয় বলে' দেখিনি, দেখেছি সেটাকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলে'। বাংলার কত কত বাপ যে না খেয়ে না পরে' কর্জ্জ করে' ছেলের বি, এ, এম, এ, পড়ার খরচ যুগিয়েছেন সে কি কেবল ছেলেকে সুশিক্ষিত করবার ঐকান্তিক ও অহেতুক ইচ্ছায়? শিক্ষার প্রতি এ-রকম অহেতুক অনুরাগ আমাদের থাকলে আমাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান বহুপূর্ব্বে হ'য়ে যেত। কিন্তু তাত নয়—বি, এ এম, এ পাশ করাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জ্জনের পন্থা বেশী সুগম করা। আমার ভয় হয়, আজ যে আমরা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষালয়ের উপরে বিরূপ হয়েছি সেটা সেখান থেকে শিক্ষা পাচ্ছি না বলে ততটা নয় যতটা সেখান থেকে বি, এ এম, এ পাশ করে' বেরুলেও আর তেমন অর্থোপার্জ্জনের সুসার হয় না বলে'। আমার এ-কথা যে সত্যি তার প্রমান কি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে কি কলিকাতা-বিদ্যাপীঠে গেলেই দেখতে পাবেন। ও-দুই অনুষ্ঠানের Technical Branch ও Medical Line এ যত ছেলে ভর্ত্তি হয়েছে General Line এ তার অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক হয় নি।

একথা আমি কিন্তু বলছি না যে খাওয়া পরা সম্বন্ধে সবাই দৃষ্টিহীন হবে বা হওয়া সম্ভব। কিন্তু সমগ্র সমাজের দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র খাওয়া পরার উপরেই নিবদ্ধ হয় তবে একদিন যেমন আর্য্যেরা ভেড়া তাড়াতে তাড়াতে মধ্য আসিয়া থেকে এ দেশে এসেছিলেন তেম্‌নি আবার একদিন আমাদের ঐ ভেড়া তাড়াতে তাড়াতে খাসিয়া পাহাড়ের দিকে প্রস্থান করতে হবে। আর সেটা নিশ্চয়ই মহা-প্রস্থান বলে' গণ্য করা চল্‌বে না। আদিম মানুষ কি করত জানি নে কিন্তু আজকের মানুষ cannot live by bread alone কথাটা বিলিতি হলেও সত্যি। সত্যাগ্রহের তোড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়া চল্‌বে না।

কিন্তু সে যা হোক্ এই যে আমাদের অভিভাবকমণ্ডলীর চাওয়া যে তাঁদের ছেলেরা যত শীঘ্র সম্ভব ডিপ্লোমা নিয়ে Law হোক্ Medicine হোক প্রফেসরী হোক্ যে কোন পথে অর্থোপার্জ্জনে লেগে যাক্, আপনি কি জোর করে বল্‌তে পারেন যে এই চাওয়া বাংলা দেশের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করে নি? আপনি কি জোর করে বল্‌তে পারেন যে এই চাওয়ার তাগিদ্ তাঁদের শিক্ষকতা ও অধ্যাপনাকে তদনুরূপ একটা বিশেষ ভঙ্গি ও গতি দেবার এতটুকুমাত্র সাহায্য করে নি? আমরা মনে চিন্তা করেছি এক আর আজ মুখে ফল চাচ্ছি আর এক। মনের কথার চাইতে মুখের কথা বড় মানুষের আইন আদালতের কারখানায় হ'তে পারে কিন্তু সৃষ্টির মন্দিরে নয় এবং তা কোনদিন হবারও সম্ভাবনাটুকু পর্য্যন্ত নেই।

আসলে আপনাদের School of Thoughts এর সঙ্গে আমাদের School of Thoughts এর তর্ক ঠিক এইখানটায়। আমরা

বলছি ও চিরকাল বলব যে যা আমরা মনে সত্যি করে’ চাই নি ও ভাবিনি তা বাইরে সফল করে’ তুলবার আশা করা অন্যায়। এবং আশা করলেই তা সফল হবে না। মনে যে কোন চিন্তা উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটার বস্তুবিশ্বে রূপ দেবার শক্তি সংগৃহীত হয়ে যেত যদি তবে সেটা মানুষের পক্ষে বর হত না অভিশাপ হত তা বলা মুস্কিল। কিন্তু বর্ত্তমান সৃষ্টির সত্যটা এই যে সে শক্তি সংগৃহীত হয় না। আপনারা মনকে অস্বীকার না করলেও বাইরের উপরে বেশী ঝোঁক দেন আমরা বাহিরকে লোপ করতে চাইনে কিন্তু মনের চিন্তার মনের ইচ্ছার এমন একটা ভিত্তি গড়ে’ তুলতে চাই যা হিমাদ্রির মতো হবে অটল অচল এবং সিন্ধুর মতো হবে সদা জাগ্রত তবেই তা আপনাকে সফল করে’ তুলতে পারবে সকল বাধা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করে’—তবেই তা বাইরের প্রতিকূল শক্তিকে বিধ্বস্ত করে’ জয়লাভ করতে পারবে।

মানুষের এই যে চিন্তার ও ইচ্ছার শক্তি তা লাভ হতে পারে মনকে বিক্ষিপ্ত করে নয় মনকে সংহত ক’রে। বাঙালীর মন এমনিই তরল অর্থাৎ flexible সে-মন সহসা জমাট বাঁধে না। এটা যেমন একদিকে গুণের তেমনি আর একদিকে দোষের। গুণের এই দিক থেকে যে এমন মনে গোঁড়ামি বলে’ পদার্থটা সহসা কায়েমী হ’তে পারে না। এমন মনের বিশ্ব-মনের সঙ্গে সংযোগ ও সম্বন্ধ সহজে স্থাপিত হ’য়ে যায়। এটা জাতির পক্ষে একটা মহা লাভ। এতে করে’ জাতি তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে’ আপনাকে একটা বৃহত্তর জগতে অনুভব করতে পারে। আর এটা আপনি নিশ্চয়ই মানেন যে সংকীর্ণতারই আর এক নাম মৃত্যু। জাতীয় বৈশিষ্ট্যই বলুন

আর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যই বলুন তা বাঁচিয়ে রাখ্‌বার অর্থাৎ তার জীবনী-শক্তি রক্ষা কর্‌বার সহজ ও একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশ্ব-মনের সঙ্গে তার সংযোগ রক্ষা করে' করে' চলা। বাঙালী মনের ঐ flexibilityর জন্যে বাঙালী পরের মনের জিনিস সহজে গ্রহণ কর্‌তে হজম কর্‌তে পারে। ঐ কারণে পাশ্চাত্যের সাহিত্য আমাদের মনকে যেমন সত্যিকার দোলা দিয়েছে যেমন সত্যিকার করে' অনুপ্রাণিত করেছে ভারতের আর কোন প্রদেশবাসীর তেমন করে নি। অথচ বাঙালী যে সবাই ইয়োরোপীয়ান বনে' যায় নি তা ত চোখেই দেখা যায়। যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমরা অনেকে ফৈরঙ্গ সাহিত্য বলি, আমরা ভুলে যাই যে সেই রবীন্দ্রনাথের গানে গল্পে কবিতায় বাঙালী-মনের রূপ ও ছবি যেমন করে' আছে তেমন কিন্তু আর কোন বাঙালী কবির কাব্যে নেই।

লয়ে রসারসি করি কশাকশি
পোঁটলা পুঁটলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে
গৃহিণী কহিল কাঁদি'
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে লয়ে
কষ্ট অনেক হবে"

কিম্বা—

আমসত্ব আমচুর; সের দুই দুধ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে
মাথা খাও ভুলিও না খেয়ো মনে করে'।

কিম্বা—

কহিলাম ধীরে
"তবে আসি।" অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

এ যে ফারসীও নয় ফরাসীও নয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই দু'মত হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপর—

গ্রামপথ হতে প্রভাত আলোতে
উড়িছে গোখুর ধূলি
উছলিত ঘট বেড়ি কটি তট
চলিয়াছে বধূগুলি
তোমার কাঁকন বাজে ঘন ঘন
দুইদিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে

এ যে বাংলারই ছবি এ সম্বন্ধেও নিশ্চয় কারো ভুল করবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ রকম রাশি রাশি তোলা যায়।

তবে রবীন্দ্রনাথে ওর অতিরিক্ত একটা জিনিস আছে যা আসলে প্রাচ্যেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয়—অথচ যে দখলি-স্বত্ব সাব্যস্ত করতে পারে তারই। এই জিনিসটী হচ্ছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের প্রতিদিন-কার কর্ম্ম চিন্তা আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে' যে একটা চিদাকাশই বলুন বা হৃদাকাশই বলুন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়কেই

আলিঙ্গন করে' আছে সেই আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলা ও কাব্যে সেইখানকার সুর ছবি ও রস জাগিয়ে তোলা। বলা বাহুল্য সে-সুর সে-রস সে-ছবিতে মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কোনই সুবিধা হয় না কিন্তু তাতে মানুষের মধ্যেকার এমন একটা জিনিসের রসদ থাকে যে জিনিসটী শুকিয়ে গেলে মানুষ Eat and Drink and be damn'd অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আপনার স্ত্রীকে সেদিন "যেতে নাহি দিব" কবিতাটী পড়ে শোনাচ্ছিলুম। সামান্য কিন্তু অতি সকরুণ বাঙালী পরিবারের একটী ঘটনা। পিতা বিদেশে চলেছেন। পোঁটলা পুঁটুলি বাক্স তোরঙ্গ সব সাজিয়ে গুছিয়ে বেরুবার সময় তিনি তাঁর চার বছরের মেয়ের কাছে বিদায় নেবেন—মেয়ে হঠাৎ বলে বসূল— "যেতে আমি দিব না তোমায়"।

যেখানে আছিল বসি' রহিল সেথায়
ধরিল না বাহু মোর রুধিল না দ্বার
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিবনা তোমায়।"

কিন্তু—

তবুও সময় হ'ল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

এ অতি সকরুণ! গভীর একটা ব্যথা প্রাণ বিদ্ধ করে' যায়। কিন্তু ঐ ব্যথাই আর কেবল ব্যথা থাকে না যখন দেখি যে কবির দৃষ্টিতে এইটে ধরা পড়েছে যে বাঙালী পরিবারের ঐ ঘটনাটী চার বছর বয়েসের একটী বাঙালী শিশুর ঐ অশ্রু-সজল অধিকার-প্রকাশ

এ বিশ্বে একটা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়। বিশ্ব-সুরের সঙ্গে ওর সুর বাঁধা। বিশ্ব-সুরেরই ও একটা প্রতিধ্বনি একটী বাঙালী শিশু-কণ্ঠে ফুটে উঠেছে।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন, "যেতে নাহি দিব"

কবি দেখ্‌তে পেলেন—

তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব' নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব নারে।"

এ ক্রন্দন-ধ্বনি সারা' বিশ্ব হতে কবি-কর্ণে ধ্বনিত হ'ল

প্রলয় সমুদ্র-বাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্র বাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে' তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।

যেন

উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্ম্ম-ভেদি করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠ স্বরে।

এই যে ব্যথা এ ব্যথা যতক্ষণ একটা বাঙালী পরিবারের পারিবারিক মনে আবদ্ধ ছিল ততক্ষণ তা একান্তভাবে ব্যথারূপেই ছিল। কিন্তু সেই ব্যথা সেই ক্রন্দন যখন বিশ্বপটকে perspective করে দেখলুম শুনলুম তখন এই ব্যথার মধ্যে যে-একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ রয়েছে সেইটের সন্ধান সেইটের অনুভব পেলুম। সংকীর্ণতা যেখানে ব্যথারূপেই আপনাকে সমাপ্ত মনে করেছিল সেখানে নিখিলের স্পর্শ জানিয়ে দিয়ে গেল যে সমাপ্তি ঐ ব্যথায় নয় ব্যথার পিছনে যে আনন্দ আছে সেই আনন্দে। যেখানে স্বার্থদুষ্ট অহঙ্কার গণ্ডী কেবল বেদনাকেই জমা করে' তুল্‌ছিল অখণ্ডের সংবাদ সেখানে পুলক-স্পর্শ ছুঁইয়ে গেল।

এখন কি বলতে হবে এ-কবিতাটার অর্দ্ধেক বঙ্গ আর অর্দ্ধেক ফৈরঙ্গ? এই যে সামান্য থেকে অসামান্যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে বিশেষ থেকে বিশ্বে চলমান কবির দৃষ্টি এ কি বিশেষ করে' পাশ্চাত্য? তা যদি হয় তবে বল্‌ব যে ঐ পাশ্চাত্যকে স্বীকার করে' আমরা বেঁচে গেছি—এবং আমাদের সাহিত্য new lease of life পেয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিশ্বের সঙ্গে কোলাকুলি করাটা প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যেরই হোক্ কারও একচেটে নয়।

কিন্তু বলছিলুম বাঙালী মনের flexibility-র কথা। সে-মনের গুণের কথাই আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ঐ রকম মনের একটা প্রকাণ্ড দোষ আছে। সে দোষটা হচ্ছে এই যে এমন মনকে সহজে জমাট করা যায় না। এমন মনকে সংহত করে' কেন্দ্রীভূত করে' তার সমস্ত শক্তিকে একটা অপ্রতিহত সামর্থ্যের সঙ্গে কোন একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপারের উপরে প্রয়োগ করা যায় না। এইখানেই

বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতা। এই কারণেই বাঙালী চরিত্রে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা অধ্যবসায় প্রভৃতির তেমন সদ্ভাব নেই। যার জোরে মানুষ বলে—যা ধর্‌ব্‌ তা কর্‌ব—একটা doggedness একটা tenacity of purpose বাঙালী চরিত্রে এর বাহুল্য নিয়ে অভিযোগ করা চলে না। কিন্তু ঐটী না হ'লে মনোজগতে যাই হোক্ কর্ম্মজগতে জীবন-যাত্রার যুদ্ধে বিশ্বের সংগ্রাম-পথে বাঙালীকে পিছিয়ে পড়ে' থাক্‌তেই হবে। বাঙলার সহরে সহরে মাড়োয়ারী গুজরাটীর হর্ম্ম্যাবলী উঠবেই—বাঙালীর পল্লীতে পল্লীতে ভোজপুরী গাজীপুরী জুটবেই। আপনি হয়ত বলবেন যে আমি provincial patriotism প্রচার করছি। কিন্তু আপনাদের কাছেই ত শুনি যে National না হ'লে International চল্‌বে না। সুতরাং ঐ সূত্র অনুসারেই Provincial না হ'লে Interprovincial চল্‌বে না। আমরা বাঙালীরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে অবাঙালীদের কাছে mortgage কর্‌তে চাই নে।

সুতরাং বাঙালীর এই তরল মনকে মৃত্যুর মতো rigid না করে' একটা stability দান করতে হবে। তার উপায় কি? তার উপায় যাই হোক্ সেটা নিশ্চয়ই কেবল political agitation নয়। কেননা agitation মাত্রেই মনকে কেবল সংহত করে না তাই নয় তা মনকে সংক্ষুব্ধ করে। আর মন সংক্ষুব্ধ হবার অর্থ মন কেন্দ্রচ্যুত হওয়া। মনকে কেন্দ্রচ্যুত করে' তাকে কেন্দ্রীভূত করা নিশ্চয়ই লজিকের বাইরে।

আসলে আমাদের political agitation এ দেশের political constitution এর যে রদ-বদল হয় হোক্ কিন্তু মানুষের মন গঠন

চরিত্র গঠনের জন্য একটা অন্তরের সাধনা চাই। আর এ সাধনা সমষ্টিগত হতে পারে না, এ সাধনা হচ্ছে ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত এই সাধনায় সিদ্ধ না হ'লে আমাদের জাতীয় সব কিছুই লব্ধ হলেও অসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে।

যাক্ সে সব কথা। আপনি যখন আপনার ছেলের শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবছেন তখন সেই সম্বন্ধে আমার মতামত দু' এক কথা বল্‌ছি।

আমার একটা আদর্শ শিক্ষার আদর্শ আছে। সেটা বল্‌ছি।

আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিশ্চয় আপনি টের পেয়েছেন যে আমি একজন ঘোরতর individualist। এতে মনে করবেন না যে আমি সমাজ মানি নে। সমাজ আমি নিশ্চয় মানি কিন্তু আমি বল্‌তে চাই এই কথা যে সমাজও যে সম্ভব হয়েছে তা ব্যক্তিরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মের গুণে—সমাজের অস্তিত্ব সমাজের প্রতিষ্ঠা ব্যষ্টিরই fulfilment এর উপর। যে সমাজ ব্যষ্টির সার্থক হবার পথে বাধাই সৃষ্টি করে' করে' চলে সে-সমাজের বন্ধন-গ্রন্থি ছিঁড়বেই। আগে ব্যষ্টি তারপর সমষ্টি—আগে unit তারপর unity-ব্যষ্টি যে সামাজিক আইন-কানুনে ধরা দেয় সেই আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে ব্যষ্টিরই সত্য-সমষ্টির সার্থকতা হয় বলে'। তাই দেখতে পাই ব্যষ্টির অন্তর-সত্যের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যের তাগিদে সামাজিক গ্রন্থিগুলিও কখনও ডানে কখনও বাঁয়ে সরছে—কোনটা একটু আল্‌গা হচ্ছে—কোন্‌টা আরও কসে' যাচ্ছে—আবার কোন কোনটা হয়ত একেবারেই খুলে পড়ছে।

আমার মনে যে আদর্শ শিক্ষার আদর্শ আছে সেটাও একেবারে individualistic। একটী শিক্ষকের কাছে পঞ্চাশটী ছেলে পড়ুক—

যদি শিক্ষকের পড়াবার যোগ্যতা থাকে—কিন্তু তা একই সুরে এক সূত্র নয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সার্থক করে' তোলা। আপনি নিশ্চয় বলবেন যে কথাটা শুন্‌তে বেশ কিন্তু ওর কোন মানে হয় না—কেননা ওর বিশেষ একটা অর্থ নেই—অর্থাৎ কথাটা vague। কথাটা ঠিক সুতরাং ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

আমি এই কথাটা বিশ্বাস করি যে সুস্থ সবল ও প্রাণবান মানুষের মধ্যে কোন না কোন একটা গুণ আছে, কোন না কোন বিষয়ে তার একটা সহজ প্রেরণা একটা সহজ কুশলতা আছে। প্রত্যেক মানুষটাই এক একটী genius। বুঝতেই পারছেন genius কথাটা আমি এখানে ব্যবহার করছি in its broadest sense possible. এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের তার ঐ সহজ প্রেরণা সহজ কুশলতার দিকে সচেতন হয়ে ওটা—অর্থাৎ দু' কথায়—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে আত্ম-জ্ঞান এই আত্ম-জ্ঞানের ফলে আত্মার স্বধর্ম্মের পরিচয় পেয়ে মানুষ সেই অনুসারে আপনার জীবন নিয়ন্ত্রিত করবে আপনার জীবনে তেম্‌নি কর্ম্ম তেম্‌নি ধর্ম্ম বরণ করে' নেবে। একেই আমি আদর্শ শিক্ষা বলি কেননা এতেই মানুষের জীবন সত্যিকার করে' সার্থক হবে সুতরাং আনন্দময় হবে।

এইখানে যে প্রশ্নটী উঠ্‌বে তা জানি। প্রশ্নটী উঠ্‌বে এই যে মানুষের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে সে যা তাকেই ফুটিয়ে ধরা তাকেই সার্থক করে' তোলা তবে Human progress, World's Evolution কথাগুলো কোথায় যায়? শিক্ষার উদ্দেশ্য আসলে আপনাকে অতিক্রম করা নয় কি?

কিন্তু Human progress, World's Evolution কি মানুষের যুগে যুগে নিজেকে অতিক্রম করার ফল ? এ অতিক্রম করার মানে কি ? এর মানে যদি এই হয় যে মানুষ এক অবস্থা থেকে আজগুবি ভাবে আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে ম্যাজিকের দ্বারা তবে আমি বল্‌ব যে মানুষ কোন কালেই আপনাকে অতিক্রম করেনি এবং কোনকালে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বেও না। আর অতিক্রম করার অর্থ যদি এই হয় যে মানুষ তার আপনার মধ্যেই যে সম্ভাবনার বীজ রয়েছে সেই সম্ভাবনারই চরম অভিব্যক্তির দিকে আপনাকে টেনে টেনে চলেছে তাহলে বল্‌ব যে মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাকে অতিক্রম কর্‌ছে। আসলে মানুষ তার সভ্যতার প্রসার করেছে আপনাকে অতিক্রম করে' নয়, আপনাকে পরিক্রমণ করে'। বানর আপনাকে অতিক্রম করে' মানুষ হয়েছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে সুতরাং আমার বিশ্বাস ও missing link কোন দিনই পাওয়া যাবে না। আর মানুষ যদি কোন দিন দেবতা হয় তবে তার মানেই হবে এই যে মানুষের মধ্যেই দেবতা হবার সম্ভাবনার বীজ গুপ্ত ছিল।

সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছেন Human progress এর অর্থ মানুষের গুণ সমষ্টির বিকাশ ও প্রসার এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় লম্ফ প্রদান নয়। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের আপন আপন গুণ ও ধর্ম্মের স্ফুরণ ও প্রসার। কেননা আমি আগেই বলেছি আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক সুস্থ ও সবল ও প্রাণবান মানুষের মধ্যে কোন না কোন একটা গুণ আছে যা তার সহজ ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষের এই গুণের স্বাতন্ত্র্য এমনি, প্রত্যেকের চিন্তাশক্তি

মননশক্তি ধারণশক্তি এম্‌নি আলাদা যে তাদের কি বহির্জ্জগতে কি অন্তর্জ্জগতে চল্‌বার তাল আলাদা হতে বাধ্য। এই কারণেই আমার আদর্শ-শিক্ষার আদর্শটী একেবারে individualistic.

কিন্তু আমার এ আদর্শ আজ প্রকাশ করা বা প্রচার করা অনর্থক। কেননা আজ সভ্যজগতের সকল অনুষ্ঠান এমনি যন্ত্রের মতো হয়ে উঠেছে সমাজ নিজেকে এমনি mechanise করে' ফেলেছে যে এমন কি শিক্ষায়ও আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাব্‌তে পারিনে। আমার আশঙ্কা হয় কিছুদিন পরে আমাদের শিক্ষালয়গুলোর ক্লাশে ক্লাশে শিক্ষকের পরিবর্ত্তে গ্রামোফনের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়া সুরু হবে—আর তাই থেকে ছেলেরা নোট নেবে।

এইখানেই চিঠি শেষ কর্‌তে হল। এই বার পৃষ্ঠা চিঠি পড়ে দেখ্‌তে পাবেন যে আপনি যে-কথাটী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অর্থাৎ আপনার ছেলের ভবিষ্যত শিক্ষার সম্বন্ধে পরামর্শ সেই কথারই উত্তর দেওয়া হয় নি। কেননা সেরকম পরামর্শ দেবার আমি উপযুক্ত এ কথা মনে কর্‌তেই আমার মন সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ইতি—

আপনাদের কয়েকদিনের—

অতিথি।

নৃত্য-শিক্ষক

—:*:—

(Maupassantর ফরাসী হইতে।)

বুড়ো জিন ব্রিডেল, যাকে আমরা সংসার-বিরাগী বলে ঠাট্টা করতেম, বলে উঠল দেখ, সংসারের বড় বড় দুঃখগুলো আমার তেমন লাগে না। আগেকার কালে আমি ডুয়েল লড়েছি নির্ম্মম হ'য়ে আমার প্রতিদ্বন্দীর বুকে চড়েছি প্রকৃতির রুদ্রসংহার লীলা দেখেছি, মানুষের উৎকট জিঘাংসা প্রবৃত্তির পরিণামও দেখেছি। ঐগুলো চোখে পড়লে আমরা ভয়ে বা রাগে চীৎকার করে উঠি, এই পর্য্যন্ত। ওসব দৃশ্য আমাদের বুকে যেয়ে কামড়ে ধরে না, ঝড়ের বেগে ভেতর বা'র কাঁপিয়ে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায় না, যেমন কতকগুলো ছোট খাটো সাধারণ করুণ দৃশ্য করে থাকে। সংসারের সব চেয়ে কঠোর আঘাত লাগে যখন মা ছেলে-হারা হন, ছেলে মা হারা-হয়। মানুষের হৃদয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়—এত কঠিন, দুর্জ্জয় এ শোক। কিন্তু মানুষ এমনতর শোকও কাটিয়ে উঠে, যেমন করে দেহের অতি বড়, সাংঘাতিক, সদ্য আঘাত সারতে দেখা যায়। কিন্তু সংসারে এমন বহু ব্যাপার আছে যা চোখের সুমুখে স্পষ্ট হ'য়ে না উঠেও ভেতরে তাদের বাস্তবিকতা টের পাইয়ে দেয়, গোপন মর্ম্ম-ব্যথা, ভাগ্যের অলক্ষ্য আঘাত, আরও বহু এমনতর আছে যেগুলো

আমাদের অন্তর শাসিত, বিষাদময় চিন্তাসমুদ্র আলোড়িত করে তুলে, বহির্জগৎ ডিঙ্গিয়ে মনোজগতের শোক-মন্দিরের বন্ধ, রহস্যময় দোর পলক মধ্যে একেবারে খুলে দিয়ে যায়,—কি সে বেদনা!—উপরে দেখবে যত নির্ব্বিকার তত সে ভেতরে শিকড় গেড়েছে, তার লক্ষণ যত অস্পষ্ট তত সে বিকৃত হয়ে উঠেছে, যত তাকে নেই বলে উড়িয়ে দেবে তত সে বিস্তার লাভ করেছে এমনি করে মনটাকে দুঃখে মুষড়ে দিয়ে, জীবনকে বিস্বাদ করে দিয়ে, পৃথিবীর উজ্জ্বল বর্ণকে মলিন করে দিয়ে যে তারই জের বহুকাল ধরে তোমাকে টান্‌তে হবে।

আমার চোখের সুমুখে দুই তিনটী এমনি ব্যাপার ফুটে উঠেছে, বাঁকিগুলো অবশ্য ভাল করে না দেখাতেই ভুলে গেছি। ঐ কয়টি যেন লম্বা, সরু, তেলা-যায়-না-এমনি কাঁটার মত হয়ে আমার মনে বিঁধে রয়েছে।

ওগুলো আমার মন যে ভাবে ভরে দিয়েছে হয়তো তোমরা তা বুঝতে পারছ না। একটার কথা তোমদের বলতে চাই। ঘটনাটা খুব পুরানো, কিন্তু এত স্পষ্ট, যে মনে হয় কালকের। হতে পারে আমার মনের টানেই কল্পনায় সেটাকে এত তাজা রেখেছে।

আমার বয়স এখন পঞ্চাশ বছর। তখন আমি তরুণ যুবক, আইন পড়ছি। আমার প্রকৃতি ছিল কিছু গম্ভীর ও চিন্তাশীল; এবং দর্শন শাস্ত্র থেকে দুঃখ-বাদটাকেই আমি নিজের জন্য বেছে নিয়ে ছিলেম। এজন্য, কাফের হট্টগোল, কোলাহল প্রমুখ বন্ধু বান্ধব বা নির্ব্বুদ্ধি রূপের ব্যবসায়ী যুবতী নারীর প্রাচুর্য্য কোনটাই আমাকে টানতে পারে নি। খুব সকালেই আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেম; আর

আমার অতি আকর্ষণের বস্তু ছিল ভোর আটটায় লাক্সেমবার্গের উদ্যানে একা একা বেড়ানো।

তোমরা কেউ কখন লাক্সেমবার্গের সেই নার্শারী দেখেছ? সেটা ছিল যেন অতীত যুগের একটা ভুলে যাওয়া উদ্যান, বৃদ্ধার মুখে মধুর হাসি যেমন শোভার হয়, তেমনি ছিল তার শোভা। সরল অপরিসর, নিস্তব্ধ বেড়াবার ছোট ছোট পথগুলি দুই ধারে ঝাঁপড়া হেজরো দিয়ে বেড়া দেওয়া; মালির লম্বা কাঁচি সমান রেখায় তাদের ডালগুলো ছেঁটে দিয়ে শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় পুষ্পবাটিকা, লাণ্ঠন-বাঁধা ছোট ছোট গাছ, সার বেঁধে ছেলেরা যেমন করে বেড়ায় তারই অনুকরণে রোপিত, বড় বড় গোলাপের ঝাড় আর ফলবান বৃক্ষের শ্রেণী।

সুন্দর এই উদ্যানের এক পাশে মৌমাছির বাস। কাঠের তক্তার উপর খড় বিছিয়ে কৌশলে তৈয়েরি তাদের বাড়ী, দরজাগুলো সূর্য্যের আলোতে শেলাইয়ের সূচের ফুটোর মত চিক চিক করছে। লম্বা রাস্তার সবটা নিয়ে কেবল চক চকে মাছি গুণ গুণ করছে— দেখে মনে হয় ওরাই যেন এই নিঃশব্দ স্থানটির মালেক আর এর শব্দহীন শান্তিপূর্ণ বেড়াবার পথগুলিতে কেবল মাত্র ওদেরই বেড়াবার অধিকার আছে।

প্রায় রোজ সকালেই আমি সেখানে যেতাম। একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে পড়া সুরু করতেম। মাঝে মাঝে বইখানা কোলের উপর ফেলে রেখে স্বপ্ন দেখতেম, চুপ করে বসে আমার চার দিকে পারীর প্রাণ-স্পন্দন কান পেতে শুনতেম, এবং পুরানো এই উদ্যানের ছায়ায় বসে তার অগাধ অনাবিল শান্তি দেহ মন দিয়ে ভোগ করে নিতেম।

কিন্তু শীগ্‌গীরই আমার নজরে পড়ল যে অত সকালেও বাগানে আমি এক মাত্র ভ্রমণকারী ছিলেম না। প্রায়ই ঝোপের আড়ালে বেঁটে, অদ্ভুত দর্শন এক বুড়োর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হত।

রূপোর বকলস্‌ওয়ালা জুতো তার পায়ে, পরণে 'ক্যুলাত্‌' গায়ে স্প্যানিস্‌ রাইডিং কোট, মাথায় কিম্ভূতকিমাকার শাদা এক টুপী, যেমন প্রকাণ্ড তেমনি খস্‌খসে; জন্ম তার মান্ধাতার আমলে।

দেখতে সে খিটখিটে, হাড়গোড় সার,—বঙ্কিম, আর মুখখানি নানা ভঙ্গিতে এবং হাস্যচেষ্টায় সদাই বিকৃত। চোখ দুটি চঞ্চল চোখের পাতা কেবল অস্থির ভাবে নড়ছে। রোজই তার হাতে থাকত সোনাবাঁধান একখানা চমৎকার ছড়ি, হয়ত কোন বড় লোকের স্মৃতি-উপহার হবে।

অদ্ভুত এই মানুষটিকে দেখে প্রথমে আমার মনে যে ভাবের উদয় হল সেটি হচ্ছে বিস্ময়; তার পরেরটি অসীম কৌতূহল।

গাছের ডাল পাতার আড়াল থেকে তার উপর নজর রাখতেম; হঠাৎ ধরা না পড়ে যাই এজন্য প্রতি মোড়ে থেমে থেমে একটু ফাঁকে থেকে তাকে অনুসরণ করতেম।

ব্যাপার যখন এইরূপ তখন একদিন সকালে আপনাকে একা ভেবে সে খামকা নানা ভঙ্গীতে হাত পা নাড়া সুরু করে দিল। প্রথমে কয়েকটি লাফ মেরে, মাথা নুইয়ে কাকে যেন অভিবাদন করা হল; তারপর তার সেই সরু সরু ঠ্যাং দুলিয়ে আরও লম্বা লম্বা ধাপে লাফ দিতে লাগল; তারপর দ্রুত লাফ, লম্ফ ঝম্ফ, দুলুনী— সে কি চমৎকার ভঙ্গিতেই যে সুরু হল! কোন অদৃশ্য দর্শক মণ্ডলীর সুমুখে যেন এই কাণ্ড হচ্ছে—তাঁদের দিকে চেয়েই যেন

সে হাসছে, মাথা নুইছে, হাত ছুঁড়ছে, পুতুলের মত তার শুটকো দেহ এঁকে বেঁকে ঘুরছে আর অতি মিঠে চালে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে! এই হল তার নাচ!

দেখে শুনে অতি বিস্ময়ে আমি কিছুক্ষণ 'থ' মেরে গেলাম; ভাবতে লাগলেম আমাদের দুইজনের মধ্যে কে উন্মাদ, সে না আমি। কিন্তু হঠাৎ থেমে যেয়ে আস্তে আস্তে সে এগোতে লাগল, যেমন করে রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেতারা করে থাকে; তারপর মাথা নুইয়ে, কমেডিয়েনদের ষ্টাইলে অতি মধুর হাস্য করে, ঠোঁট দুখানা চুমো খাবার ভঙ্গিকরে এগোতে এগোতে দুসার গাছের দিকে তার কম্পিত হাত দুখানা বাড়িয়ে দিল!

এই ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে সে ফের গম্ভীর ভাবে বেড়াতে আরম্ভ করল।

সে দিন বেড়িয়ে যাবার সময়টীতে আমি তার উপর নজর রাখলেম। রোজ সকালেই সে একবার করে তার এই অপূর্ব্ব নাচ নেচে নিত।

কেন জানিনে তার সাথে আলাপ করতে আমার ভারি ইচ্ছা হল। সাহসে ভর করে, তাকে অভিবাদন করে বলে ফেললেম, 'আজকের দিনটি কি সুন্দর ম্যসোঁ!' সে নমস্কার করল,—'হাঁ ম্যসোঁ ঠিক আগেকার মতই'!

ঠিক আধঘণ্টা পরে আমি তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ালেম, তার ইতিবৃত্ত সবই জানলেম। সে ছিল পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে অপেরার নৃত্য শিক্ষক। তার ছড়ি খানা কাউণ্ট ফ্লেরমণ্টির উপহার। নৃত্য সম্বন্ধে তার সাথে কথা কইতে আরম্ভ কইলে সে আর থামতে জানতো না।

একদিন আমাকে সে বললে,—'ম্যসোঁ, আমি লা কাসট্রিসকে যে করেছি আপনার ইচ্ছে হলে তার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। সে এদিকে প্রায়ই আসে। এই যে উদ্যান আপনি দেখছেন এ আমাদের জীবন-স্বরূপ, সংসারের শেষ বন্ধন! আমাদের আমলের এইটি কেবল অবশিষ্ট আছে। মনে হয় এটি না থাকলে আমাদের বাঁচাই মুস্কিল হত। এটি প্রাচীন ও প্রাচীন স্মৃতিতে গৌরবময়—কেমন নয় কি? ওর ভেতরের বাতাসে যখন নিশ্বাস ফেলি, মনে হয় আমি যখন যুবা ছিলেম তখন সে বাতাস যেমন ছিল আজও তেমনি আছে—কিছু বদলে নি। আমরা দুইজন, আমার স্ত্রী ও আমি বৈকেল বেলাটা প্রায় এখানেই কাটাই। সকালে আমি একাই আসি কারণ এখনও আমি খুব ভোরে উঠে থাকি।'

সকালের আহার শেষ করেই আমি লাক্সেমবার্গ মুখে চলে এলেম, একটু পরেই দেখি আমার বন্ধু সসম্মানে এক কৃষ্ণপরিচ্ছদাবৃত অতি বৃদ্ধার হাত ধরে আসছেন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিই ইচ্ছেন সেই বিখ্যাত নর্ত্তকী লাকাসট্রিস যার প্রেমে রাজা এবং সমস্ত অভিজাত বংশের যুবকেরা হাবুডুবু খেতেন, এবং প্রেমিক সেই যুগ যে যুগে পৃথিবীতে প্রেমের স্মৃতি ছড়িয়ে গেছে, সেই যুগের প্রতি যুবক জীবনে একবার করে এই কাষ্ট্রিসকে ভালবেসে ধন্য হয়েছিলেন।

আমরা সবাই পাথরের একটা বেঞ্চির উপর বসলেম। তখন মে মাস। ফুলের সুবাস উদ্যানের প্রতিকোণ গন্ধময় করেছে। সূর্য্যের মোলায়েম কিরণ পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। লাকাষ্ট্রিসের কাল পোষাক আলোয় যেন সেঁতিয়ে উঠেছে।

উদ্যান তখন জনমানব শূন্য। দূর থেকে ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ কানে আসছে।

বুড়ো সেই নৃত্য শিক্ষককে আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "ম'্যসো 'মেন্যুয়েট' কাকে বলে; আমায় বুঝিয়ে দেবেন কি ?"

সে কেঁপে উঠল। 'ম'্যসো, মেন্যুয়েট হচ্ছে নাচের রাণী, মেন্যুয়েট রাণীদের নাচ বুঝলেন ? যেকালে রাজা গিয়েছে, সেকালে মেন্যুয়েট-ও গিয়েছে ?' তারপর সে প্রচুর পরিমাণে বিশেষণ লাগিয়ে মেন্যুয়েটের এক স্তোত্র আওড়াল যার মাথা মুণ্ড কিছুই আমার বোধগম্য হল না। আমি তাকে তাল, ধাপ, ভঙ্গী সব বুঝাতে বললেম। নিজের অক্ষমতা দেখে সে আরও চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল। হঠাৎ তার নির্বাক গম্ভীর, অতি প্রাচীন সঙ্গীনীটির দিকে ফিরে বলে উঠল—এলিস, এই ভদ্রলোকটি—উনি যা বলছেন—ইচ্ছে হলে—তোমার বেশ হবে—আমাদের একবারটি দেখিয়ে দেবে ?

সে চঞ্চল দৃষ্টিতে চার দিক একবার চেয়ে দেখল। তারপর বিনাবাক্যে উঠে তার সম্মুখে দাঁড়াল।

এরপর এক অপূর্ব্ব ব্যাপার আরম্ভ হল যা জীবনে কখন ভুলব না।

তারা দুইজনেই নাচা সুরু করলে,—অতি ছেলেমানষী মুখের ভঙ্গী করে, হেসে, ঘাড় কাৎকরে, লাফিয়ে ঠিক যেন দুটো পুরানো পুতুল, পাকা খেলোওয়ারের হাতে নাচছে; ব্যবহারে যেন কিছু নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তৈয়েরী পুরানো ফ্যাসানে, অতি পাকা মিস্ত্রীর হাতের।

আমি হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে রইলেম, মনে উদয় হতে লাগল যত অদ্ভুত, এলোমেলো ভাব। সব মনটা কেমন অব্যক্ত বিষাদে ভরে গেল।

মনে হল চোখের সুমুখে এক শোকার্ত্ত হাস্যকর ভূত দেখছি—অতীত যুগের কোন বিস্মৃত প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনে হল হাসি, রুদ্ধ কণ্ঠ ঠেলে আসতে চাইল কান্না।

তারপর তারা দুইজন থেমে গেল, নৃত্যের সমস্ত অঙ্গ শেষ করে দিয়ে। কিছুক্ষণ ধরে মুখোমুখি চেয়ে অতি অদ্ভুত ধরণে হাসতে লাগল। শেষে কান্নার চাপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হল।

তিন দিন পরে আমি আপনার জেলায় চলে এলাম। তাদের সাথে আর দেখা হয় নি।

দুই বছর পরে ফের যখন পারীতে এলেম তখন তারা উদ্যানটি ভেঙ্গে ফেলেছে। হায়,—কোথায় গেল সেই প্রিয় বাগানটি, তার আঁকা বাঁকা পথগুলি, তার অতীত যুগের হাওয়া, তার সুন্দর আড়াল করা ঝোপ আর ঝাড়!

আমার বন্ধুরাও কি আর নেই? না এই সব আধুনিক পথ বেয়েই হতাশ নির্ব্বাসিতের মত তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে? এখন কি তারা আলেয়ার মত গোরস্থানের সাইপ্রেস গাছের আড়ালে, যে পথের দুইধারে দেহান্ত মানুষকে চিরদিনের মত শুইয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব পথের উপর চাঁদের আলোতে তাদের অদ্ভুত 'মেনুয়েট' নৃত্য দেখিয়ে বেড়ায়?

তাদের চিন্তা সব সময়েই আমার মনে হয়,—আর সকল চিন্তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, খুঁচিয়ে, সব মনটা দখল করে আজও ব্যথার মত তা জেগে আছে।

কেন?—আমি তা বলতে পারি না।

নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা তোমাদের কাছে খুব হাস্যকর মনে হচ্ছে—নয় কি?

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পৌষ, ১৩২৮।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ*

১০ম পরিচ্ছেদ।

অতএব আমাদের জাতীয় শিক্ষা-নিকেতনগুলিকে বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়-শাসিত স্কুল কলেজ থেকে স্বতন্ত্র এবং অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান রূপেই গঠন কর্‌তে হবে। আদালত, জেল, পুলিস, পাগলা গারদ ইত্যাদি সভ্যতার আগড়ম্ বাগড়ম্ যে সব অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান আছে এই স্কুল কলেজগুলি তাদেরই সামিল হয়ে যেমন আছে তেম্‌নি থাক।

যদি আমাদের দেশের ফল এবং ছায়ার আকাঙ্খা থাকে তাহলে তাকে ইট সুরকির প্রাসাদ থেকে নেমে ধুলিতে আস্‌তেই হবে। বৈদিক যুগের তপোবনে ঋষি আচার্য্যদের চারদিকে যে বিদ্যার্থিরা সমবেত হত আমরা তাদেরই মত আমাদের জীবনী-শক্তিকে একান্ত সরলতার মধ্যে পোষণ কর্‌ব একথা আমাদের সাহসের সঙ্গে বল্‌তেই হবে।

ইহার নামকরণের সম্বন্ধেও আমাদের সাবধান হতে হবে; কেননা "বিশ্ব-বিদ্যালয়" এই নামের উল্লেখ মাত্রেই আমাদের মনে অন্যান্য দেশের বিশ্ব-বিদ্যালযের অনুকরণ কর্‌বার ইচ্ছা স্বতঃই জাগ্রত হয়ে উঠে।

*রবীন্দ্রনাথের The centre of Indian culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

আমার মতে আমাদের দেশের কোনও একস্থানে এমন একটী কেন্দ্রাভিমুখ শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কাল এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আমাদের শিক্ষার উপকরণ সম্ভার স্বতঃই আকর্ষিত ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে ভারত সভ্যতার একটী সজীব মণ্ডল সৃষ্টি করে তুলবে।

১১শ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এলাহাবাদের একটী ইংরাজি বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে একবার নদীর কি লক্ষণ তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে তার ঠিক উত্তর দিয়েছিল; কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল সে কখনও নদী দেখেছে কি না তখন গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের উপকণ্ঠস্থিত প্রয়াগের অধিবাসী হয়েও সে বালক উত্তর করল "না।" সেই বালকের মনে নিশ্চয় এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মে ছিল যে তার এই পরিচিত জগৎ কখনই তার ভূগোলের জগৎ হতে পারে না। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ খবর সে নিশ্চয় পেয়েছিল যে ভূগোলের মধ্যে তার দেশেরও স্থান আছে এবং তার দেশেও নদী আছে। কিন্তু মনে করুন এ খবর অনেক দিন পর্য্যন্ত সে পেলে না—তারপর হঠাৎ একদিন একজন বিদেশী পরিব্রাজক এসে যদি তাকে বলে যে তার দেশ খুব বড়—হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত এবং গঙ্গা, যমুনা এবং সিন্ধু পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী

তখন এই অভিজ্ঞতার আঘাতে তার মনের ওজন বিপর্য্যস্ত না হয়ে থাক্‌তে পারে না এবং সে এতদিন যে আত্মগ্লানি বহন করে আসছিল ছিল তারই প্রতিক্রিয়া বশে সে তখন তীব্র স্বরে একথাই ঘোষণা করতে থাকে যে অপর সকল দেশই তুচ্ছ; একমাত্র তার দেশই স্বর্গ, জগতের সম্বন্ধে তার পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা অজ্ঞতাবশতঃই ভ্রান্ত কিন্তু তার এই অভিনব ধারণা তার চেয়েও হেয়—এ যেমনি মিথ্যা তেমনি হাস্যকর।

ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের আচরণও ঠিক এইরূপ দাঁড়িয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এর কোনও আসন না থাকায় আমরা স্বীকার করে নিই ভারতের শিক্ষা বলে কিছু ছিল না এবং যা ছিল তা নাম মাত্র। তারপর যখনই কোনও বিদেশী পণ্ডিতের মুখ থেকে এর প্রশংসার প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পাই তখনই আমরা আর আত্মসম্বরণ করতে পারি না চিৎকারে গগন বিদীর্ণ করে তার স্বরে এই কথাই প্রচার করতে থাকি যে আর সমস্ত সভ্যতাই মর্ত্ত্যের কেবল আমাদের সভ্যতাই দিব্য এবং ব্রহ্মার বিশেষ সৃষ্টি। এই থেকে আমাদের মনে আত্ম-শ্লাঘার পিপাসা উৎকট হয়ে পড়ে—তখন কাজ করতে গেলেই বাহবার প্রয়োজন হয়।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বিধাতার বিশেষ সৃষ্টির ধারণার যুগ অতীত হয়েছে—কেহ বা কিছু যে বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র এ-মত বর্ব্বরযুগেরই উপযোগী। আমরা বর্ত্তমান যুগে একথা বুঝেছি যে যে-সত্য বিশেষত্বের মধ্যে আবদ্ধ তা' বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন বলে কোনও মতেই সত্য হতে পারে না। যে বন্দী নির্জ্জন অবরোধে বদ্ধ সেই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যারা

বলেন যে বিধাতা ভারতবর্ষকে জ্ঞানরাজ্যে এইরূপ নির্জন অবরোধে রুদ্ধ করে রেখেছেন তারা এর অগৌরবই করে থাকেন।

যাই হৌক যদি আমাদের ভারতে শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থল সৃষ্টি করাই সংকল্প হয় তাহলে এই বিশ্বাস মনে রেখেই আমাদের সে কাজ আরম্ভ করতে হবে যে ভারতের সভ্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্বের সভায় উপস্থিত করবার যোগ্য।

আমি বেশ বুঝতে পারছি এইখানে আমাদের দেশের কেহ কেহ বলবেন "এত শীঘ্র না।" ভারত-সভ্যতা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কিনা এবং তাকে আমাদের শিক্ষার মধ্যে সম্মানের আসন দেওয়া বিধেয় হতে পারে কিনা সেটা প্রথমে ভাল করে বুঝে দেখবার তাঁরা পরামর্শ দেবেন।

সৌভাগ্যবশতঃ বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠতমের একাধিপত্যের উৎপীড়ন কেহই সইতে পারে না। এখানে ভালর সংখ্যা নাই এবং তাদের প্রকার ভেদেরও অন্ত নাই। এই বিচিত্র ভাল পরস্পরের সঙ্গে এখানে পরস্পরে মিলিত হয়েই আছে। অতএব কোনটা শ্রেষ্ঠতম এ নিয়ে বিবাদ করায় কোনও লাভ নাই।

আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে অনেক অন্ধ সংস্কার এবং অনেক ত্রুটি আছে এ অতি সহজেই দেখান যেতে পারে। আমাদের সভ্যতা আজ গতিহীন হয়েছে বলেই তার এই সব ত্রুটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সভ্যতাতেও এই অন্ধ সংস্কার আছে। এর রাষ্ট্রনীতি এবং বিজ্ঞান অন্ধ সংস্কারে পরিপূর্ণ; তবে ইউরোপীয় সভ্যতা গতিশীল এবং সফল বলেই এই সব সংস্কারের প্রায়ই পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন হয়। তার ফলে এই সব সংস্কার তত

ক্ষতিকর হতে পারে না। ইউরোপীয় জাতিভেদ পরিবর্ত্তনশীল এবং প্রথার মধ্যে বদ্ধ নয় বলেই সে যেমন তত পীড়াদায়ক নয় তার সভ্যতার অন্তর্গত সংস্কারগুলিও ঠিক সেইরূপ।

মাত্র কয়েক বৎসর হল ইউরোপ "জীবনার্থ বিরোধ" এই ছুটী মাত্র বৈজ্ঞানিক শব্দের কোয়াশার মধ্য দিয়েই সমস্ত বিশ্বকে দেখতে আরম্ভ করেছিল। এরই রক্তে তার দৃষ্টি রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল এবং এরই প্রেরণা অনুযায়ী সে তার গতিপথ স্থির করেছিল। আমরাও সুবোধ ছাত্রের মত তাদের কাছ থেকে এই শব্দযুগল গ্রহণ করেছি—এদের অবিশ্বাস করা কিম্বা না জানাকে আমরা শিক্ষা-হীনতার চিহ্ন বলে বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু ইউরোপে এখন এই মতের পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মিলিবার শক্তি এবং সহানুভূতিই যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আদি একথা ক্রমশঃ ইউরোপ উপলব্ধি করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে উচ্ছৃঙ্খল প্রতি-যোগিতাই অর্থশাস্ত্রের একমাত্র বিধান ছিল। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে এই প্রতিযোগিতা সহযোগিতায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এই থেকে ইহাই প্রমাণ হচ্ছে যে যা' কিছু গতিকে প্রতিহত করে তাহাই অমঙ্গল এবং ক্ষতিকর।

এমন একটা সময় ছিল যখন আমরাও জীবন-সমস্যার আলোচনা করতাম। তখন আমরা স্বাধীন ভাবেই পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করতাম। তখন আমরা আমাদের সেই সব পরীক্ষা থেকে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র বলে তাদের উপেক্ষা করলে চলবে না। বিশ্বের হাটে এখন তাদের চালাতেই হবে। বিশ্বমানবের আবিষ্কারের শোভাযাত্রায় তাদের

যোগ দিতেই হবে। তাদের পিছু পড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। তারা যদি আত্মম্ভরিতার অচলায়তনের মধ্যে অপরকে বিস্মৃত হয়ে নিজের ঔদ্ধত্যের মধ্যে বসে থাকে তাহলে তারাও বিশ্বমানবের অবজ্ঞার বিষয় হয়ে শেষে বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যাবে। বিশ্বের যাত্রাপথে জীবনের ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে তাদের অবতীর্ণ হতেই হবে।

---

১২ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

দীর্ঘকাল ধরে আমরা আমাদের সভ্যতাকে দেশীয় সংস্কৃত পাঠশালের মধ্যে এক ঘরে করে রেখেছি। অথবা অবজ্ঞা থেকে যেমন অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয় অথবা ভক্তিও তেম্‌নি ভক্তির পাত্রকে অস্পৃশ্য করে তুলে। জাপানে এমন একটা সময় ছিল যখন মর্য্যাদাব আতিশয্যে মিকাদো তার প্রাসাদের মধ্যেই বন্দী হয়ে বাস করত। তার ফলে তখন স্থগনই (Shogun) রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যখন প্রকৃত পক্ষে শাসন করা মিকাদোর দরকার হল তখন তাকে তার অবরোধ থেকে সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে বের হতে হয়েছিল। আমাদের সংস্কৃত পাঠশালার সভ্যতাও ঠিক এই ভাবে আপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে বিশ্বের আর সব সভ্যতাকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে করে একান্তই কুণো হয়ে পড়েছিল। ব্রহ্মার মুখ, শিবের জটা কিম্বা এমনি কোনও একটা অলৌকিক যোনি থেকে এই সভ্যতার উদ্ভব

হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। কাজেই এ সভ্যতা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার না হয়ে থাকতে পারে না এবং পাছে সাধারণের সংস্পর্শে শুচিতা নষ্ট হয় এই ভয়ে নিষেধের প্রাচীর তুলে একে একান্ত স্বতন্ত্র করে রাখতে হয়েছে। এইভাবে এ আমাদের দেশে ঠিক মিকাদোর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে; আর বিদেশী সভ্যতার এই মর্য্যাদার বালাই না থাকায় অবারিত চলাচলের দ্বারা মানুষের সঙ্গে সামান্য ভাবে মেলামেশা করে আজ সে shogun এর মতই আমাদের দেশে একাধিপত্য বিস্তার করেছে। আমরা দেশীয় সভ্যতাকে ভক্তি করি বটে; কিন্তু এই বিদেশী সভ্যতা আমাদের কান মোলে রাজস্ব আদায় করে। আমরা গোপনে গোপনে এই বিদেশী সভ্যতার অপবাদ করি এর কাছে দাসখত লিখতে হয় বলে আমরা আক্ষেপ করি - পীড়িত হই; কিন্তু যখন এর দরবারে আমাদের ছেলেদের প্রেরণ করি তখন এর শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত মিটিয়ে দিতে আমরা আমাদের স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করতে এবং পৈতৃক সম্পত্তিকে বাঁধা দিতে কুণ্ঠিত হই না।

আমাদের দেশীয় সভ্যতাকে এই অতিভক্তির সোনার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে রাখলে চলবে না। এমন যুগ এসেছে যখন সব কৃত্রিম বেড়া ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে। বিশ্বের সহিত যার সামঞ্জস্য আজ এ যুগে তাহাই থাকবে—বিশ্ব-ব্যপিকতাই এ যুগের ধর্ম্ম; আর যা' কিছু বিশ্বের বাহিরে বিশেষত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে তাকে বিধ্বস্ত হতেই হবে। শিশুকে স্বতন্ত্র লালন প্রকোষ্ঠে নিরাপদ দোলায় রাখাই বিধেয়; কিন্তু সে বয়োপ্রাপ্ত হলেও তাকে যদি সেই নির্জ্জন স্থানে রাখা হয় তাহলে তার দেহ ও মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

এমন একটা সময় ছিল যখন চীন, পারস্য, মিশর, গ্রীস্ এবং রোম তাদের নিজ নিজ সভ্যতাকে নিজেদের বিশেষত্বের মধ্যে স্বতন্ত্র করে পালন করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কম্ বেশী পরিমাণে ভূমার যে অংশ ছিল তা' তাদের এই বিশেষত্বের রক্ষা-কবচের মধ্যে থেকে কালক্রমে প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন সহকারীতা এবং সহযোগিতার যুগ এসেছে। তাদের বিশেষত্বের বেষ্টনের মধ্যে যে বীজ ফেলা হয়েছিল এখন তাকে বিশ্বের মুক্ত ক্ষেত্রে তুলে বসাতে হবে। সর্ব্বোচ্চ দাম পাবার তরে তাদের বিশ্বের হাটের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে।

অতএব যেখানে বিশ্বের যাবতীয় সভ্যতা সমভাবে সম্মিলিত হতে পারে এমন একটী সম্মিলন-ক্ষেত্র আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেককে দিবে। সেখানে পরস্পরের ইতিহাসগত অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে বুঝতে হবে এইরূপ তুলনামূলক বিচারের দ্বারা জ্ঞানের সমাধান এবং বুদ্ধির এই সহযোগিতাই আগামী যুগের জীবন-সঙ্গীতের প্রধান স্থর হবে। আমরা আমাদের ঘরের কাল্প-নিক নিরাপদ কোণ থেকে—এই শুচিবাইকে সোহাগ করে আলিঙ্গন করে থাকতে পারি; কিন্তু ভূমা আমাদের ঘরের কোণের চেয়ে ঢের বড়—সে যেদিন একে আক্রমণ করবে সে-দিন একে হার মানতেই হবে এবং ক্রমে পিছু হটে হটে নিজের প্রাচীরকে নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে।

বিশ্বের সভ্যতার তুলনার ক্ষেত্রে দাঁড়াবার যোগ্য হতে হলে প্রথমে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাধনার ফলকে সমবেত করে

আমাদের নিজেদের ঘরকে গড়ে তুলতে হবে; তা না হলে আমরা বিশ্ব সভ্যতার সঙ্গে বাস্তবিক ভাবে যোগ দিতে পার্‌ব না। যখন আমরা আমাদের এই মিলিত শক্তির কেন্দ্র থেকে পশ্চিমের দিকে তাকাব তখন পশ্চিমের অতিশয় আলোক আমাদের দৃষ্টিকে আর অভীভূত কর্‌বে না—তখন আমাদের দৃষ্টির ভীরুতা ঘুচে যাবে—তখন আমাদের মাথা উন্নত থাকবে—তাকে আর অপমান স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। তখন আমরা আমাদের নিজেদের আলোকেই সত্যকে গ্রহণ কর্‌ব—আমাদের যেখানে সুবিধা সেইখান থেকেই তাকে দেখ্‌ব—এই ভাবে বিশ্বে জ্ঞানের যে বীথিকা সৃষ্ট হবে তাকে সবাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বরণ করে নেবে।

১৩শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সকল সভ্য দেশেই তাদের মানসিক জীবনের এক একটী সজীব কেন্দ্র আছে। সেখানে শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হয় সেখানের মানুষের মন আনন্দের আকর্ষণে আপনি আকৃষ্ট হয়—সেখানেই তাদের মূল্য নিরূপিত হয় এবং সেখানেই তারা দেশের সভ্যতার ভাণ্ডারে নিজ নিজ অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়। এই ভাবে দেশের একটী সাধারণ বেদীতে তারা জ্ঞানের যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে তারই পবিত্র শিখা চারদিকে বিকীর্ণ হয়ে, দেশকে আলোকিত করে তুলে।

গ্রীসের ছিল এথেন্স, ইটালীর ছিল রোম্ এবং বর্ত্তমান ফরাসী দেশের এইরূপ কেন্দ্র হচ্ছে প্যারিস্। কাশী আমাদের সংস্কৃত বৈদগ্ধ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের সভ্যতার যা' উপাদান তা' একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে নাই।

অনেকে বলে থাকেন এবং আমারও যদি স্বীকার করে নিই যে ইউরোপীয় সভ্যতাই বর্ত্তমান যুগের পক্ষে একমাত্র উপযোগী সভ্যতা তাহলে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে যে ভারতে কি এই সভ্যতার কোনও কেন্দ্রস্থল আছে? ভারতের জীবনের সঙ্গে কি এর কোনও চিরন্তন সজীব যোগ আছে? তার উত্তর এই যে শুধু যে এ নাই তা' নয় এ কখনও হতে পারে না। ইউরোপীয় সভ্যতার নিত্যকার কেন্দ্র ইউরোপ ব্যতীত অপর কোথাও হতে পারে না। অতএব আমাদের চিত্তকে যদি এই ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে আলোক গ্রহণ করতেই হবে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে আমাদিগকে প্রভাতের তরে এমন কোনও নক্ষত্রের উপর নির্ভর করতে হবে যা দূরবর্ত্তী কোনও এক অজ্ঞাত পৃথিবীর পক্ষে সূর্য্য। এই নক্ষত্র থেকে আমরা আলোক পেতে পারি—কিন্তু এ থেকে কখনও দিনের উদ্ভব হবে না। এ থেকে আমরা আবিষ্কারের পথরেখা নির্ণয় করতে পারি কিন্তু এ কখনই সম্পূর্ণ সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবে না। প্রকৃত পক্ষে এই নক্ষত্রের আলোকে আমাদের অন্তরতম প্রদেশের মধ্যে সেই অমৃতরসের সঞ্চার করতে পারে না যা থেকে আমাদের জীবন বর্ণে, গন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠ্‌বে।

এই কারণেই ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের পক্ষে পুঁথিগত হয়ে আছে—তা থেকে বৈদগ্ধ্যের উদ্ভব হয় নি। এ ঠিক দেশলাই

পেটিকার মত—এতে অনেক কাজ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ সেই প্রভাতের আলোক নয় যাতে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য্য এবং জীবনের বিচিত্র রসধারা সংহত হয়ে থাকে।

এই কারণেই ভারতের অন্তরতম আত্মা এখানে একটী শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগে আজ আমাদের ডাক দিয়েছেন—সেইখানে তার ভারতীয় মানসিক শক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমবেত হবে—সেইখানে তার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ভাবের সঞ্চয় এক পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যে মিলিত হবে। জনকের সময়ে মিথিলা যেমন ছিল—বিক্রমাদিত্যের সময় উজ্জয়িনী যেমন সে আজ সেইরূপ একটী ব্রহ্মবর্ত্তের তরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে আজ তার নিজের চিত্তকে বিশ্বমানবের কাছে নিবেদন করে বিশ্বের অগ্রসরগতির সহায়তা করবার সুযোগ সন্ধান করছে। তার বিক্ষিপ্ত শক্তির বিসৃঙ্খলা এবং তার ধার করা সঞ্চয়ের জড়তার হাত থেকে কবে সে মুক্ত হবে সে আজ সেই দিনের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে।

১৪শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শুধু বিদেশী বলে কোনও সভ্যতার উপরই যে আমার অশ্রদ্ধা নাই—একথা এখানে উল্লেখ করা দরকার বিবেচনা করি। বরঞ্চ চিত্তকে সজীব রাখবার তরে এরূপ শক্তির সংঘর্ষের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই আমার বিশ্বাস। একথা স্বীকার করতেই হবে যে

খৃষ্টান ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার বিরোধী শুধু তাই নয় তারা এমন কি ইউরোপের প্রকৃতির সঙ্গেও খাপ খায় না। তথাপি এই বিরোধী ভাবের আন্দোলন ইউরোপের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রবাহের সংঘর্ষে এসে তার গতিকে যে ক্রমশঃ অগ্রসর করেছে এবং তাকে যে অনেক নূতন নূতন সম্পদ দান করেছে এ কথাও স্বীকার করতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে বিদেশী ভাবের সংঘাত থেকেই ইউরোপের সাহিত্য সজীব এবং সফল হয়ে উঠেছে। ভারতেও ঠিক সেই একই ব্যাপার ঘটছে। ইউরোপের সভ্যতা শুধু যে তার জ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে তা' নয়—সে তার গতিশীলতাকেও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করছে। যদিও একে এখনও আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার করে উঠতে পারি নাই—তার ফলে যদিও আমাদের পদে পদে স্খলন হচ্ছে—তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে এ আমাদের মানসিক রীতি নীতির প্রতিবাদ করে আমাদের চিত্তকে প্রথাগত অভ্যাসের জড়তা থেকে মুক্ত করছে।

যে কৃত্রিম ব্যবস্থার ফলে আজ এই বিদেশী সভ্যতার হাতে আমাদের সমগ্র চিত্ত বিকিয়ে গেছে যে ব্যবস্থা নব নব সত্যের সমবায়ে আমাদের দেশে নব ভাব শক্তির সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু তারই বিরুদ্ধে আমার আপত্তি। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের নিজেদের সভ্যতার সমুদায় উপাদানগুলিকে প্রবল করে তুলবার জন্য আমার আগ্রহ—আমাদের সভ্যতা যখন প্রবল হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবকে ঠেকাতে পারবে তখনই আমরা তাকে যথাযথরূপে গ্রহণ করতে পারব—তখন আমরা তাকে সম্পদরূপেই

লাভ করব—সে আর ভার হয়ে আমাদের পীড়িত করবে না। তখন আমরা তাকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ব করতে পারব তখন আর তার বাহির মহলে শুধু পাঠ্য পুস্তকের কাঠ কেটে এবং পুঁথিগত বিদ্যার জল বয়ে জীবন ক্ষোয়াব না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক।

যুগল-পত্র

—— :o: ——

Wilmersdorfer Strasse 79.
Bei Reichard,
Berlin.
23rd October, 1921.

প্রীতি নমস্কার — * * *

* * * *

আপনাকে এই সমস্ত ভূমিকা শোনাবার উদ্দেশ্য আপনাকে স্থবিধে পেয়ে একচোট লেক্চার দিয়ে নেওয়া নয়, এর উদ্দেশ্য আপনাকে এই কথাটি জানান যে (আপনি ও আমি খুব সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অসম পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও) আপনার লেখার মধ্যে যে মূল স্থরটা বাজে তার সঙ্গে আমার খুব বেশী মেলে বলে আমি স্বতঃই তাতে একটু খুসি হয়ে থাকি। আপনার লেখার মধ্যে যে জীবনীশক্তির স্পন্দন আছে সেটার স্পর্শটা আমার বড্ড ভাল লাগে, তবে দুই একটা বিষয়ে আপনাকে আমি একটু সমালোচনা কর্ব্ব। সেটা পরে। ধরুন আপনি আপনার "শূদ্র আত্মা" প্রবন্ধে যে সব কথা লিখেছেন তার মধ্যে একটা refreshing চিন্তার ধারার পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি! আপনি যে ভাবে জীবনে বিশ্বাস করেন আমি ঠিক সেভাবে জীবনে বিশ্বাস না কর্লেও সব চেয়ে

বড় কথা—অর্থাৎ আমার viewpoint থেকে—হচ্ছে এই যে আপনি জীবনে বিশ্বাস করেন। আপনার মধ্যে যে optimism আছে সেটা দুঃখকে অস্বীকার করে গায়ের জোরে optimism প্রচার করা নয়, কারণ আপনি আমাদের বর্ত্তমান জীবনের স্রোতহীনতাটা অনুভব করে ব্যথা বোধ করেন। এই ব্যথা বোধ করাটা অনেক সময়ে যে কোনও ধারেই বলুন সৃষ্টির কাজে বাধা দেয়, আংশিক নিরাশা আনে কিন্তু সেই সৃষ্টি কর্ত্তে হবে বলে সত্য দুঃখকে অস্বীকার করা চলে না। এ সব কথা আপনি বোঝেন এবং এ সব বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার খুব মেলে। নইলে যদি আপনি বল্‌তেন জগতে দুঃখ কষ্ট সবই আমাদের সৃষ্ট সবেরই ঔষধ আমাদের হাতে, নিছক্ optimismই একমাত্র সত্য তাহলে সেটা ঠিক্ optimism হত না, কারণ সত্যের ঊর্ম্মির পুনঃপুনঃ আঘাতে তা দুদিনেই চুরমার হয়ে যেত। কোথায় পড়েছিলাম এরকম optimism নরকঙ্কালের মুখে হাসির মতন। উপমাটী আমার ভাল লেগেছিল। Hardy জিনিষটি খুব মনে প্রাণে অনুভব করেছেন কিন্তু তিনি জীবনে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু জীবনে বিশ্বাস না কর্লে জীবন নিয়ে অগ্রসর হওয়ারই বা দরকার কি, আর নানারকম চিন্তাকে মূর্ত্ত করে তোলারই বা সার্থকতা কি? যাঁরাই জগতের অসংখ্য দৈনিক ছোট বড় tragedy অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন তাঁরাই কমবেশী দুঃখবাদী হয়ে পড়েন কারণ না হয়েই পারেন না, কিন্তু কেবল এই দুঃখকেই বড় করে দেখাটায় মন perspective হারিয়ে বসে। তাই দুঃখকে স্বীকার করেও জীবনে বিশ্বাস করাটা শুধু যে ভাল তাই নয়, তা ভিন্ন গতিই নেই। এ সব বিষয়ে আপনার মনোভাব আপনি

আপনার প্রবন্ধাদিতে বেশ সুন্দর ফুটিয়ে উঠিয়েছেন। কিন্তু যে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার একটু গরমিল হয় সেটা হচ্ছে আপনি বাস্তব সুখকে বোধহয় একটু বেশী বড় বলে মনে কচ্ছেন। আমার বোধহয় আপনি যদি একবার য়ুরোপটা স্বচক্ষে দেখে যেতেন তাহলে বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্যকে এত বড় করে দেখ্‌তেন না। আমিও এক সময়ে মনে কর্ত্তাম যে মানুষের মনে বিলাসের যে স্পৃহাটা নানাদিক দিয়ে চরিতার্থ হবার চেষ্টায় ব্যস্ত সেটা মানুষের সভ্যতারই ফল এবং মনের উত্তরোত্তর রঙীন হয়ে ওঠারই পরিণাম। কিন্তু নিরতিশয় স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাবের সম্পূর্ণ অভাবটাও যে stagnancy আনে এটা আমার আজকাল খুবই মনে হয়। তাই আমার মনে হয় যে আপনি যদি স্বচক্ষে য়ুরোপটা দেখে যেতেন তাহলে এ সিদ্ধান্তটা আপনার সত্যান্বেষী মনটা কোনও মতেই এড়াতে পার্ত্ত না। আমি কাউকেই যোগী হতে বলি না, কিন্তু য়ুরোপ যে ত্যাগ জিনিষটাকে Sentimentalism বলে উড়িয়ে দিতে চায় সেটাও আমি মস্ত ভুল মনে করি। এজন্য Bertrand Russel মহাশয়ও তাঁর Principles of Social Reconstructionএ Property বলে প্রবন্ধটিতে দুঃখ করেছেন দেখ্‌তে পাবেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন যে মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে সৃষ্টিতে, অর্জ্জনে নয়, এবং ধন বা ক্ষমতার্জ্জন স্পৃহাটা বড় জিনিষ নয়। আপনি "শুভ্র-আত্মায়" যে বৃহতের পিছনে ছোটাকে বড় বলেছেন তার সঙ্গে আমি খুবই একমত কিন্তু য়ুরোপে আজকাল বৃহত বল্‌তে অনেকটা ধন ও ক্ষমতার সুরা মনে করে ভুল করে বসে। আপনি যখন বলেছেন যে "একটা নেশা চাইই" তখন যেন মনে হয় যে বৃহত যে কোনও নেশাতেই আপনি সম্মতি দেবেন।

আমাদের বর্ত্তমান নির্জ্জীব অবস্থাতে কোনও বৃহতের পিছনে ছোটার জন্য একটা নাড়া পাবার বিশেষ দরকার একথা আমি খুব মানি কিন্তু তাই বলে যে কোনও বৃহতের পিছনে ছুটলেই আমরা মোক্ষলাভ কর্ব্ব না। য়ুরোপকে আমি আমার সাধ্যমত দেখ্‌লাম। এরা যূথবদ্ধ হয়ে কাজ করাটাকে এতই বড় মনে করে যে তার চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের রস সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নিষ্পিষ্ট ও বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকে। এটা কেবল আমার ব্যক্তিগত মত নয় Bertrand Russel মহোদয় এ সত্যটি তাঁর Principle of Growth বলে চমৎকার প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন। এটা একটা বৃহত কিছু তা অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু এর অপকার যে উপকারের চেয়ে বেশী তা আজকাল—বিশেষতঃ বিগত হিংস্র যুদ্ধের পরে—প্রায় সকলেই স্বীকার কচ্ছেন। আমার মনে হয় আমাদের বর্ত্তমান জীবনের স্রোতোহীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে আপনি এমন একটা নীতির সমর্থন কচ্ছেন হয়ত তা আপনার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু আপনার প্রবণতাটা একটু সেই দিকে গড়িয়ে চলেছে যেটা মানুষের জীবনে না বাড়ায় সৌন্দর্য্য, না আনে পরিতৃপ্তি। এইখানে আপনার সঙ্গে আমার একটু মতভেদ হয়, তবে হয়ত আমি আপনাকে একটু ভুল বুঝে থাক্‌তে পারি। সেটা কোথায় তা যদি জানান তবে সুখী হব। আপনার লেখায় আমি যে চিন্তাপ্রবণতা ও openness of mind দেখেছি সেটা ভাল লাগে বলেই আপনার এ ভুল ধারণা (আমি dogmatic ভাবে আপনার এ ধারণাকে ভুল বল্‌ছি না, কারণ আমি open to conviction) দেখিয়ে দিতে অগ্রসর হলাম।

ভারতবর্ষ থেকে য়ুরোপকে বোঝা ও এখানে এসে য়ুরোপকে বুঝ্‌তে চেষ্টা করা এ দুটি যে কত তফাৎ তা হয়ত আপনি দেশ থেকে ঠিক্ উপলব্ধি কর্বেন না, কিন্তু এখানে যদি নিজে আস্‌তেন তবে দেখ্‌তেন যে একটা ভুলকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে এঁরা যে অবস্থায়—অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও অবিশ্বাসের—এসে পড়েছে সেটার দরুণ এদের চিন্তাশীলসম্প্রদায় রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে। এটা আমাদের কাছে একটা object lesson হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। Dean Inge এর Outspoken Essays এ Our Present Discontents বলে প্রবন্ধে একস্থলে তিনি লিখ্‌ছেন "It is of course impossible that the worker should not resent having to devote his life to making what is useless and mischievous and to ministering to the irrational wastefulness of luxury." আমি একবার Yorkshireএ খনিতে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে বল্লেই হয় দিন সাতেক ছিলাম। তাদের যে কি অবস্থায় থাক্‌তে হয় তা চোখে না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্বেন না। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কথা যখন দেশ থেকে শুনি তখন শুধু চাক্‌চিক্যটাই দেখি আমরা দেখি

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া আমরা ভুলে যাই যে

বাহিরে শিশির অশ্রু নয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।

আমি য়ুরোপীয় সভ্যতাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই না। যে প্রাণস্পন্দনের আবেগে এরা একটা মিথ্যাকেই সবলে এতদিন

আঁকড়ে ধরে এসে আজ বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছে যে সেটা সত্য নয় সে প্রাণস্পন্দনটা একটা মস্ত জিনিষ কারণ এ স্পন্দনটা থাক্‌লে মিথ্যা শীঘ্রই ধরা পড়ে যায়; যে সত্যান্বেষণে এদের বৈজ্ঞানিকরা দিনের পর দিন নিজের ক্ষুদ্র কক্ষে কাজ করে চলেছে সেটা একটা মহৎ বস্তু এবং কোনও mystic কিছুর উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও এদের চিন্তাশীলসম্প্রদায় যে idealism কে কেমন করে বড় মনে কর্ত্তে পারে (যেজন্য Maeterlinck Our anxious morality প্রবন্ধে বলেছেন "The good faith of mankind knows no defect" না এমনই কি একটা কথা) তাতে আমি প্রশংসাবিস্মিত নয়নে চেয়ে না থেকেই পারি না,—কিন্তু আমি শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে আমাদের বর্ত্তমান স্রোতোহীনতার অবস্থায় যা কিছু মূর্ত্ত ও বোধ্য তাকেই সবচেয়ে বড় মনে কর্লে মস্ত ভুল কর্ব্ব। আমার মনে হয় আপনি ত্যাগ জিনিষটাকে সর্ব্বদাই আমাদের other worldlinessএরই একটা অভিব্যক্তি বলে মনে করে তাকে একটু ভুল বুঝ্‌ছেন। আমাদের ত্যাগের আদর্শটা খুবই বড় কেবল ত্যাগের philosophyটা বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে একটু খাপ খাইয়ে দিতে হয়। মহাপ্রাণ Bertrand Russel মহোদয় তাঁর পূর্ব্বোক্ত property নামক প্রবন্ধে উল্টোদিক্ থেকে ভেবে অনেকটা আমাদের ত্যাগের আদর্শেই এসে পৌঁচেছেন। তিনি বর্ত্তমান জগতে একজন towering intellect এবং বর্ত্তমান সমস্যা নিয়ে যে কত ভেবেছেন তা তাঁর পূর্ব্বোক্ত বইখানি ও Theory and Practice of Bolshevism বইখানিতে বড় সুন্দর ভাবে ব্যাখাত দেখ্‌তে পাবেন। আপনি যদি এই বইখানি পড়ে না থাকেন তবে একবার পড়লে খুব

তৃপ্তি পাবেন। এ থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে এখানেও লোকে বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছে যে ত্যাগের আইডিয়াটা বর্ত্তমান সমস্যা সমূহের সমাধানের পরিপন্থী নয়। তবে আমরা ভুল করি তখন—(যেটা আপনিও বেশ লিখেছেন)—যখনি জীবনের আনন্দে আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের অনেক choice spirits ঐ ভাবে জীবনটাকে নিয়েছেন বলে বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে অভিনব চিন্তার ধারা বড় বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু একদিন এখানে একটি জার্ম্মাণ চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে বলেছিলেন "We have neglected this world for a long time and so now this world is neglecting us" সে জার্ম্মাণ ভদ্রলোক এই মহা যুদ্ধের পরে তাঁকে বলেছিলেন "I don't think they committed a mistake" এটা অবশ্য অনেক ঘা খেয়েই তিনি বলেছিলেন। আমি একথা বল্‌ছি না যে আমরা সকলেই আধ্যাত্মিকতাকে জীবনে মেনে চলি—বাস্তবতা আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে, প্রভেদ এই যে সেটা এদের চেয়ে কম refined অবস্থায়—কিন্তু একথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে আমাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী ও হৃদয়বান লোক জীবনটাতে বিশ্বাস না করে বিরাগী হওয়ার দরুণ আমাদের এ জীবনটা হীন হয়ে পড়েছে। Sincere souls জগতে কমই থাকে এবং তারাই জগতকে প্রাণ, উৎসাহ দেয় ও নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম সব মহৎলোক সংসারকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাকে একরকম ত্যাগ করে এসেছেন বলে যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিরাট্‌ প্রাণের অস্তিত্ব কমই পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায় ফলে হয়েছে এই যে আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষ

সম্পূর্ণ না হোক অনেকটা depleted হয়ে পড়েছে। আমাদের ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে এ জীবনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। কেবল এইটুকু আমাদের বুঝে রাখা দরকার যে বর্ত্তমানই একমাত্র বোধগম্য এবং যা কিছু mystic তা অলীক এইটে স্থির করে বস্‌লে চল্‌বে না। কারণ তাহলে শুধু যে আমরা জগতকে কিছু দিতে পার্ব্ব না তাই নয় তাতে আমাদের নিজেদেরও যে লোকসান হবে সেটা মস্ত বড়। এখানে আমি দেখ্‌লাম যে যা কিছু ধরা-ছোঁওয়া যায় না তাই অলীক এরকম একটা ধারণা জনসাধারণের মধ্যে গেঁথে গেছে। অথচ জীবন নিয়ে একটু গম্ভীরভাবে ভাব্‌তে গেলেই mysticism কে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের ভারতীয় চিন্তার ধারা এই mysticism এর দিকে তার অনেকটা শক্তি ব্যয় করেছে, তাই একে নিতান্ত ছেঁটে দেওয়াও চলে না, কারণ আমার মনে হয় এটা আমাদের একটা সম্পদ্। আপনি খুব সম্ভবতঃ এসব কথা বোঝেন, তবে আশাকরি আমার এ সব কথা আমি কি উদ্দেশ্যে বল্‌ছি সেটা বুঝেই গ্রহণ কর্ব্বেন। যদি কোথাও আমি আপনাকে ভুল বুঝে থাকি তবে জানালে সুখী হব।

আপনার খবর যদি পাই তবে সেটা "স্বাগত" হবে। আমি এখানে (জার্ম্মাণিতে) আরও বছর খানেক সঙ্গীতরূপ ললিতকলার চর্চ্চা করব অভিপ্রায়ে আছি। কাজ কর্ম্মও হচ্ছে বেশ ভালই তবে প্রথম আলাপে আপনাকে সে সব ধারে আমার মতামত জানিয়ে অতিষ্ঠ করে না তোলাই ভাল। আপনাকে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে আমি আজ বিদায় গ্রহণ কর্লাম। ইতি—

শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

55/1, Old Ballygung First Lane,
Ballygung, Calcutta.

প্রীতি নমস্কার—

আপনার চিঠি খানা কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি তার উত্তর দিতে কিছু দিন দেরী হ'য়ে গেল। তার কারণ আমার চিঠি পাওয়ার অভ্যাসটাই কম এবং তার চাইতেও কম অভ্যাস চিঠি লিখ্‌বার। তবুও আপনার চিঠিখানির উত্তর যে এত তাড়াতাড়ি (আমার পক্ষে) দিচ্ছি তার কারণ আপনার নাম প্রমথ বাবুর কাছে শুনেছি এবং দ্বিতীয়ত এখানি বিলিতি চিঠি। বিলিতি কথাটা এখানে আমি বিদেশী অর্থে ব্যবহার কর্‌ছি। দেশের প্রতি ভক্তি সমাজহিতৈষী সবারই আছে কিন্তু আবার বিদেশের সম্বন্ধে কৌতূহল সজাগ মানুষ মাত্রেই অনুভব করে। দেশের প্রতি ভক্তির মূলে আছে মানুষের স্বার্থ আর বিদেশের সম্বন্ধে কৌতূহলের মূলে আছে মানুষের রঙিন্ কল্পনা। সুতরাং এর প্রথম বস্তুটী হচ্ছে "তেল নুন লকড়ি"র আর দ্বিতীয়টী হচ্ছে সৌখিন। সুতরাং ওর একটার সঙ্গে আছে কর্ম্মের ভার আর একটীর স্পর্শে আছে অবকাশের আরাম। কাজেই আমাদের মন স্বতঃই স্বদেশের মাটী ছেড়ে বিদেশের আকাশে উড়্‌তে চায়—তা সে জার্ম্মাণীরই হোক্ বা জাপানেরই হোক্—চীনেই হোক্ বা চিলিতেই হোক্। যা নিয়ে নিত্য ঘর কন্না কর্‌তে হয় সে সব জিনিসে মনে রঙ্ ধরে না—অথচ এই রঙের অভাব জীবনকে নেহাৎই নীরস করে' তোলে। সুতরাং আমরা সুযোগ পেলেই দূরের আকাশে আমাদের দৃষ্টি ফেল্‌বার চেষ্টা করি তা সে ইয়োরোপীয়ই হোক্ বা তুরীয়ই হোক্। সুতরাং আমি যে আপনার

বিলিতি চিঠির উত্তর দিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে আলস্যের আরাম জাল ছিন্ন করব সেটা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যের কথা নয়।

আপনি লিখেছেন যে আমাকে চিঠি লিখ্‌বার উদ্দেশ্য যে আপনার সাধু সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য যদি অসাধুও হয় তা হলেও আপনার ভয় পাবার কোন দরকার নেই। কারণ আমার সব লেখার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাক্‌লে আপনি দেখ্‌তে পেতেন যে সাধারণতঃ আমাদের দেশের "সাধুর" চাইতে অসাধুদের আমি কম অবিশ্বাসের চোখে দেখি। কেননা অসাধুদের একটা সত্য স্বয়ম্প্রকাশ হ'য়ে থাকে আর "সাধুদের" মধ্যে থাকে একটা অসত্যের সাবয়ব প্রকাশ। ঐ কারণে সাধুর চাইতে অসাধুকে আমার ভয় কম।

সে যা হোক্‌ এই ভূমিকা করে' এখন কাজের কথায় আসা যাক্‌। অবশ্য এ জ্ঞান আমার আছে যে চিঠিপত্রে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা বেশী কাজের। কিন্তু কেবল মাত্র নাম-শোনা মানুষের সঙ্গে বাজে কথা চলে না। তা করতে হলে চাই মুখ-চেনা। কেবল মুখ-চেনাতেও হয় না—রীতিমত জানা-শোনা চাই। সুতরাং কাজের কথারই অবতারণা করা যাক্‌।

এই চিঠির দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পাত ভরাতে আমার কোনই কষ্ট হত না যদি আপনার মতামত আমার মতামতের একেবারে উল্টো হত। কেননা তবে সহজেই একটা বাক্‌যুদ্ধের অবতারণা করা যেত। হয়ত সে বাক্‌-যুদ্ধে লজিকের চাইতে ম্যাজিক আলোচনার চাইতে আস্ফালন থাকৃত বেশী—হয়ত দিব্যদৃষ্টির চাইতে নব্য আশার শিষ্ট চিন্তার চাইতে অশিষ্ট প্রাণের রঙ্‌ থাক্‌ত বেশী

কিন্তু তাতে চিঠির পৃষ্ঠা পুরত। আমার মতামতের সঙ্গে আপনার মতামতের ভেদ ও মিল এম্‌নি জড়াজড়ি করে আছে যে ওর ভেদটাকে টান্‌তে গেলেই মিলটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসে। একটা স্পষ্ট attacking point কোনখানেই পাচ্ছি নে। কাজেই পড়েছি মুস্কিলে।

একটা উদাহরণ দি। আমি ত্যাগের কথা নিয়ে অনেক ঘাঁটা ঘাঁটি করেছি। সুতরাং ঐ ত্যাগের কথাটাই নেওয়া যাক্। আপনি লিখ্‌ছেন—"আপনি ত্যাগ জিনিষটাকে সর্ব্বদাই আমাদের other worldliness এরই একটা অভিব্যক্তি বলে' মনে করে' তাকে একটু ভুল বুঝ্‌ছেন।" এইটুকু বলেই যদি আপনি থাম্‌তেন তবে এইখান থেকেই আমি একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা সুরু করে' দিতে পারতুম। এবং সে-বক্তৃতার মূল্য মণ-দরে নেহাৎ বেশী না হলেও গজ-দরে নিতান্ত কম হত না। কিন্তু এ বক্তৃতার আর অবসর থাকে না যখন আপনার চিঠির পরের পৃষ্ঠায় আবার পড়ি—"কিন্তু এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে আমাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী ও হৃদয়বান লোক জীবনটাতে বিশ্বাস না করে' বিবাগী হওয়ার দরুণ আমাদের এ জীবনটা হীন হ'য়ে পড়েছে। Sincere souls জগতে কমই থাকে এবং তারাই জগতকে প্রাণ উৎসাহ দেয় ও নিয়ন্ত্রিত করে'। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম সব মহৎ লোক সংসারকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাকে এক রকম ত্যাগ করে' এসেছেন বলে' যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিরাট প্রাণের অস্তিত্ব কমই পাওয়া যায়।" এর পরে ত্যাগের বিরুদ্ধে আপনার কাছে তর্কের সুরে বক্তৃতা জুড়ে দেওয়া মায়ের কাছে মামার বাড়ীর খবর দেবার সামিলই হবে।

কিন্তু আসলে ত্যাগ জিনিষটাকে আমি আমাদের other worldiness এরই অভিব্যক্তি বলে' মনে করি নি। তা যদি করতুম তবে বোধ হয় ওর বিরুদ্ধে কথা বল্‌তে কম জোর পেতুম। কেননা তখন এই কথাটা না মনে করে' উপায় থাকৃত না যে ঐ ত্যাগে সমাজের যে অপকারই হোক্‌ না কেন ওতে ব্যক্তিগত মানুষের একটা সার্থকতা রয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার ত তা নয়। আমাদের ষড় রিপু কিছু কম নয় আমাদের অহংজ্ঞানের কিছু কমতি নেই—যে জিনিসটী কম সেটী হচ্ছে আমাদের সামর্থ্য। এই সামর্থ্যের অভাবকেই আমরা একটা ফিলজফির ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে নিজেদের বড় ভেবে আত্মপ্রসাদ পাবার প্রয়াস পেয়েছি। এই আত্মপ্রতারণার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতেই হবে। কলমেও বটে কর্ম্মেও বটে।

আসলে other worldiness এমন একটা সত্য নয় যা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানা চল্‌বে। একটা সুস্থ সবল প্রাণবান মানুষের পক্ষে যার ধমনীতে ধমনীতে জোর রক্ত চলে প্রাণে প্রাণে দূর্ব্বার কর্ম্ম-প্রেরণার তাগিদ রয়েছে তার পক্ষে ইহ জগত অসত্যও নও অসুখেরও নয়। মানুষের ধর্ম্ম ত কেবল মাত্র পারলৌকিক নয় ইহলৌকিকও বটে। এই ইহলৌকিক ও পারলৌকিকের মিলন হলেই মানুষ অলৌকিক হয়ে ওঠে তা নইলে তার যে অবস্থা হয় তা নিয়ে যে গৌরব করে করুক আমি আপনি নিশ্চয়ই করব না। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু পঁচিশের নীচেই কারো চোখে এ জগতের রঙ ফ্যাকৃশা হ'য়ে গেছে দেখলে আমার সন্দেহ হয় লোকটা এগজামিনের নোট মুখস্ত করতে করতে

ডিসপেপ্‌টিক হয়েছে। ত্রিশ পেরুবার আগেই পৃথিবীর দিকে চেয়ে যাদের মন আর খুসী হ'য়ে ওঠে না তাদের আমি অসুস্থ বলে মনে করি। ষাট বছরের গলিত-নখ-দন্ত বৃদ্ধের বরবেশ যেমন বিশদৃশ কুড়ি বছরের কিশোরের মুণ্ডিত মস্তক ও কৌপীন ধারণও আমার চোখে তার চাইতে কম নয়। যে বয়েসে সুন্দরী তরুণীর কালো চোখের আলোর ধ্যান করতে করতে স্বতসিদ্ধ আনন্দ লব্ধ হবে সে-বয়েসে তুরীয় আলোকের সন্ধান কেবল মানুষের বিধিদত্ত দান ও অধিকারকে অস্বীকার করা তাই-ই নয় ও একটা মানুষের জীবনের বেহিসাবী বোকামী। আপনি এখানে বল্‌তে পারেন যে সুন্দরী তরুণীর চোখের আলো ম্লান হয়ে যায় কিন্তু তুরীয় আলো একবার লব্ধ হ'লে আর তার মার নেই। কিন্তু জীবনের ধর্ম্ম জীবনের রহস্যই ত ঐখানে যে তা নানা রসের নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আনন্দ কুড়ুতে কুড়ুতে চলে। শুকদেব হ'য়ে জন্ম-গ্রহণ করার অর্থ আমি খুঁজে পাই নে। অমন অবস্থায় এ-জগতে আসবার দরকারটা কি? জীবনের সুর একটা melody নয় একটা harmony নানা সুরের ঝঙ্কারে তা ঝঙ্কৃত নানা রসের ধারায় তা স্নাত নানা রূপের সমবায়ে তা মূর্ত্ত। এই বৈচিত্র্যকে যে অনাধ্যাত্মিক বলে তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। জীবনটাই আধ্যাত্মিক তার সমস্ত রূপ সমস্ত ধর্ম্ম নিয়ে—positive প্রকাশ যেখানেই কিছু দেখব সেখানেই বুঝব, তার পিছনে spirit এর force একটা আছেই আছে। নইলে জড়বাদকেই স্বীকার করে' নিতে হয়।

আপনি লিখেছেন "আমাদের ত্যাগের আদর্শটা খুবই বড়।" আমায় মাপ করবেন কিন্তু আপনার ঐ কথাটায় আমাদের

conventional patriotic effusion এর একটা গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কোন্ ত্যাগের কোন্ আদর্শটা বলতে পারেন? যা খুবই বড়? সেই সব ত্যাগী পুরুষের ত্যাগ কি যাঁরা বিবাহ ক'রে পুত্র কন্যার জন্ম দিয়ে তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব ত্যাগ করে' মঠে গিয়ে আনন্দ-যুক্ত হ'য়ে বসেন? এ-কথাটা আমি আপনাকে বানিয়ে বলছি নে—আমি অমন দু'চারজনকে জানি বলেই আপনাকে তা লিখছি।

আপনি assume করে' নিয়েছেন যে মানুষের জীবনে ত্যাগ বলে' একটা বস্তু আছে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? আমাদের ত্যাগ কথাটার একটা technical মানে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু Life এর Philosophy র দিক থেকে তার deeper truth এর দিক থেকে ভিতরের সত্যের দিক থেকে দেখলে দেখতে পাবেন যে ত্যাগ বলে' কোন জিনিসই মানুষের নেই। যা আছে সেটা হচ্ছে একটা কিছুকে বর্জ্জন করে' আর একটা কিছুকে অর্জ্জন করবার জন্যে সাধনা করা প্রস্তুত হওয়া। এই কথাটা যদি মানি ও মনে রাখি তবে দেখতে পাব যে ইয়োরোপের জীবনেও ত্যাগ আছে, এবং তা আছে বলেই ইয়োরোপ বড় হয়েছে। একটা মানুষ বা জাতি কিছুই দেয় নি কেবল গ্রহণই করেছে এমন অবিচার সৃষ্টিতে নিশ্চয়ই নেই সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ ঐ stock phrase গুলো কিছু দিন শিকেয় তুলে রাখলে ভাল বই মন্দ হবে না। আর কিছু না হোক্ তবে আমরা সত্যিকার করে' ভাবতে চেষ্টা করব।

আপনার চিঠি পড়ে মনে হল যে এই মহাকুরুক্ষেত্রের পর ইয়োরোপে গিয়ে ইয়োরোপের বাহিরের চেহারা দেখে আপনি একটা

shock পেয়েছেন। সেই shock পেয়ে আপনার অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়েছে সেই ভাব আপনার চিন্তার গায়ে রঙ লাগিয়েছে। কিন্তু বাইরের ক্ষত চিহ্নকেই কি বড় করে দেখতে হবে? এ-কথা কি আপনার মনে পড়ে' নি যে এই মহাকুরুক্ষেত্রের পর এম্নি দুঃখ বেদনা অশ্রুকে বহন করে' ওই ইয়োরোপের মানুষই Mount Everest Expedition এ ছুটেছে মেরু অভিযানে বেরিয়েছে? এম্নি একটা বিভীষণ calamity র পর ইয়োরোপ ত দু'হাতে মাথা ধরে' বসে' পড়ে' হা হুতাশ সুরু করে' নি বা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়ছে না। অথচ আমাদের পাড়া প্রতিবেসীর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত শিউরে গেল। তবুও বল্‌ব ইয়োরোপ মিথ্যা ইয়োরোপের মানুষ মিথ্যা ইয়োরোপীয় সভ্যতার ধ্বংশ হয়ে চুকে গেল? আসলে বাইরের দুঃখের চিহ্নকেই আমরা দেখছি সে-দুঃখকে বহন কর্‌ছে যে একটা বিরাট প্রাণ শক্তি সেটাকে আমরা দেখছি নে, সেদুঃখকে কাটিয়ে উঠবার জন্যে সে-প্রাণে যে একটা সাড়া পড়েছে সেটা আমরা দেখছি নে। এ-দেখা ত সত্যিকার দেখা নয়। হাজার হাজার বছর আমরা এ-দেশে আছি Mount Everest এ পদার্পণ করা দূরের কথা সে-কথাও কারো মনে ওঠে নি। অথচ এই মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের লোকের মাথায় ঐ খেয়াল ঢুক্‌ল। এতে বিস্ময়ের কি কিছুই নেই? অনাধ্যাত্মিক ইয়োরোপ এ শক্তি কোথা থেকে লাভ করছে? কোথা থেকে সংগ্রহ কর্‌ছে? জড় বস্তু সমষ্টির কাছ থেকে? তা যদি বলেন তবে আপনি নিশ্চয়ই একজন ঘোরতর জড়বাদী অর্থাৎ Materialist.

বাস্তব সুখ বল্‌তে বোধ হয় আপনি material comfort বুঝোতে চেয়েছেন। Material comfort যে বড় এ অপবাদ আমি স্বীকার করতে পারব না। কিন্তু বাস্তব সুখ যে একেবারে অবাস্তব নয় এ কথা আজ আমাদের বুঝতেই হবে। আপনি Bertrand Russel এর কথা তুলেছেন। তিনি একজন towering intellect কিন্তু সে towering intellect যদি আমাদের পক্ষে lowering intellect এর কাজ করে তবে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হবে। মানুষের অন্তরের ভাব তার চিন্তাকে অবিরাম অনুরঞ্জিত করছে। আর মানুষের ভাব উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধাক্কায়। সুতরাং Bertrand Russel আজ যে অবস্থার মধ্যে থেকে যে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন সে চিন্তার ফলাফল দিয়ে আমাদের অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করতে চাইলে অত্যন্ত অন্যায় ও ভুল করা হবে। কেননা ইয়োরোপ ও আমাদের অবস্থা সম নয়। সুতরাং Bertrand Russel এর কথা আমাদের সম্বন্ধে কিছু প্রযোজ্য হতে পারে, সব হবে না। ইয়োরোপের অতিরিক্ত আহারের চিকিৎসা আমাদের সংবাৎসরিক অনসনব্যাধি দূর করতে পারবে না। সুতরাং towering intellect মাথায় থাক। আমাদের খাওয়া পরা অর্থাৎ বাস্তব সুখের জোগাড় করতেই হবে। আর ও দুটো জিনিসই material comfort এর ক্যাটিগরিতে পড়ে।

আমি যা কিছু লিখেছি সব ইয়োরোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে এ কথা যদি মনে করেন তবে দুঃখিত হব—কেননা তার চাইতে সত্যি কথা যে তা লিখেছি আমাদের দেশের লোকের প্রতি দৃষ্টি রেখে। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন যে আপনি ও আমি সম্পূর্ণ অসম

পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে মানুষ হয়েছি এবং সেই কারণেই আমাদের দেশকে আমি যেমন জানি আপনি তেমন জানবার সুযোগ পান নি। এই যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নর নারী—জীবনের ভার-ক্লান্ত—পৃথিবীর স্পর্শ যাদের ত্যাগ করেনি—শুধু লাভের মধ্যে সে স্পর্শের আনন্দটুকু থেকে তারা বঞ্চিত—এদের কাছে বাস্তব সুখের নশ্বরতা প্রচার করলে সেটা শুনতে কি রকম হবে জানেন? সেটা হবে যেন To preach the sin of flesh to a skeleton এটা কি একটা হৃদয়হীন বিদ্রূপ হবে না?

"মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে সৃষ্টিতে" খুব সত্যি কথা কিন্তু দুঃখের বিষয় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সকলের থাকে না সুতরাং বাধ্য হয়েই তাদের অর্জ্জনে মনোনিবেশ করতে হয়। কেননা The most difficult thing is to remain idle. "ধন ও ক্ষমতার্জ্জন স্পৃহাটা বড় জিনিষ নয়" ঐ স্পৃহাটা বড় জিনিষ নয় বটে কিন্তু ঐ বিষয়টা বাজে জিনিষও নয়। ধনকে কেবল মাত্র ধন বলে দেখেই আমরা ভূল করি। কিন্তু ধন মানে ত কেবলমাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য চাকতি নয়—ধন মানে অন্ন, ধন মানে বস্ত্র, ধন মানে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অভাবহীনতা—এক কথায় tyranny of flesh থেকে মুক্তি। এবং ঐ অবস্থাতেই ত মানুষ সৃষ্টিতে মন দিতে পারে—ঐ অবস্থাই মানুষের সৃষ্টি করবার পক্ষে সবার চাইতে অনুকূল। গরীব দেশ কোথায় কবে কি সৃষ্টি করেছে? তবে নিরতিশয় স্বাচ্ছন্দ্য Stagnancy আনে—আনতে পারে। কিন্তু অভাবের অতিরিক্ত সদ্ভাবটাও আবার demoralisation আনে। Unmixed

good কোথায়ও নেই উপায় কি? এক উপায় মধ্য পন্থা। কিন্তু সে মধ্য পন্থা চিরকাল রক্ষা করে' চলা দুরূহ বলে মনে হয়। কেননা জগতের ইতিহাসে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে ত্যাগ কর্‌তে কর্‌তে ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে মানুষ মনে প্রাণে হীন দীন অক্ষম হয়ে যায় আবার ভোগ কর্‌তে কর্‌তে তার তাল সাম্‌লাতে না পেরে মানুষ দানব ও arrogant হ'য়ে ওঠে—তারপর crash—তারপর again to begin from the beginning. এই লীলাই ত চল্‌ছে জগতে আবহমানকাল। কুরু পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র আর ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে প্রভেদটা কি খুবই বেশী? চোখ কান বুঁজে কি এই কথাটা বল্‌তে হবে যে মহাভারতের যুদ্ধটা ছিল আধ্যাত্মিক আর ইয়োরোপের যুদ্ধটা হচ্ছে আধিভৌতিক? বরং এই ইয়োরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণজাতির Right of Superior Culture এর একটা ধূয়ো ছিল সেটা নিতান্ত material plane এর কথা নয়। আর মহাভারতের যুদ্ধের ছিল "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" মনোভাব। স্ত্রীকে বাজি রেখে যারা পাশা খেলে তারা যে খুব আধ্যাত্মিক সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই—কেননা আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু যাক্ সে কথা আমার শুধু এইটুকু বল্‌বার উদ্দেশ্য যে বৃথা গৌরবে অহঙ্কৃত না হ'য়ে বিশ্ববিধাতার নিয়মের কাছে একটু বিনীত হ'লে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। বিধাতা যে আমাদের দিকে কিছুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করেন নি এ জ্ঞান মনে মনে থাক্‌লে আমরা এ রকম superior air নিতে পারতুম না। তখন চাই কি আসল কাজের দিকে মন যেত। আমাদের এক একটা রাজার শত শত মহিষী তবুও তাঁরা আধ্যাত্মিক

আর ইয়োরোপের রাজাদের এক একটী করে' রাণী তবুও বেটারা ভোগে জ্বলে' পুড়ে' মোলো। প্ল্যাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে এ কথা বল্‌লে হাততালি পাওয়া যাবে যথেষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু ঐ হাততালিটাই জাতীয় জীবনের উন্নতির মঙ্গল শঙ্খ কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে চিঠিটা প্রকাণ্ড হ'য়ে গেল। এইবার ইতি দেব একটা শেষ কথা বলে'। আপনি লিখেছেন—"য়ুরোপকে আমি আমার সাধ্যমত দেখ্‌লাম। এরা যূথবদ্ধ হ'য়ে কাজ করাটাকে এতই বড় মনে করে' যে তার চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের রস সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নিষ্পিষ্ট ও বিবর্ণ হ'য়ে যেতে থাকে।" এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হওয়া ছাড়া উপায় নেই in spite of Bertrand Russel. আপনি এখন জার্ম্মাণীতে। জার্ম্মাণীতে state idea ও Military discipline সে দেশের লোকদের ব্যক্তিত্ব অনেকটা নিষ্পিষ্ট করে' এনেছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু ইংলণ্ড বা ফ্রান্স সম্বন্ধেও কি ঐ কথাটা খাটে? অবশ্য এই কথাটা মনে রাখ্‌তে হবে যে লক্ষ করা নিরানব্বুই হাজার ন'শ নিরানব্বুই কি তার চাইতেও বেশী জনের কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বই নেই। তারা সামাজিক স্রোতে ভেসে চলে। ঐ বাদ দিয়ে ইউরোপীয় নেশানের শীর্ষস্থানীয় লোকেরাও যে সব ভেড়ার পাল বনে' গেছে এ কথা গলাধঃকরণ করা কঠিন। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্তও ইয়োরোপে আর্ট সায়েন্স সাহিত্য এ তিনই আপন আপন জয়ধ্বজা তুলে রেখেছিল। আর ঐ তিনটিই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ জিনিস। মানুষের ব্যক্তিত্ব মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে ও তিন বস্তু অন্তর্ধ্যান কর্‌বে।

আজও ইয়োরোপে যে ব্যক্তিত্ব নিষ্পিষ্ট হয়ে মুছে যায় নি Bertrand Russellই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর ইয়োরোপের জীবনের রস যদি বিবর্ণ হয়ে গিয়েই থাকে তবে আমার মতে সে ভালই হয়েছে। কেননা সে রস এতটা অতিরিক্ত লাল হ'য়ে উঠেছিল যে তা একটু বিবর্ণ হ'য়ে গোলাপী আভা ধারণ করলে নেহাৎ মন্দ হবে বলে' আমার মনে হয় না। ইতি—

৬ই জানুয়ারী,
১৯২২।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পুঃ—এ চিঠি লেখা সুরু করেছিলুম অনেক আগে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তোড়ে বরাবর হাতে কলম রাখ্‌তে পারি নি। সুতরাং চিঠি শেষ করতে করতে পুরাতন বছর গিয়ে নতুন বর্ষ এসে পড়্‌ল।

জার্ম্মাণী সম্বন্ধে দুই চারিটি সাধারণ কথা

—:•:—

কোনও জাতির সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোনও কথা বলা বড় কঠিন, অথচ আমাদের মন এরূপ ভাবে গঠিত যে সে মাত্র কতিপয় fact (দৈনিক সত্য) এর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাক্‌তে চায় না। দৈনিক সত্য থেকে সাধারণ নীতি গড়ে তুল্‌তে না পার্লে আমরা অনেক সময়েই এই ভেবে ভুল করে বসি যে জ্ঞানের মূল শিকড় গজায়নি। কারণ দু চারটি বিরাট্‌ চিরন্তন নীতি ছাড়া সাধারণতঃ আমরা সাধারণ নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে মোটেই জীবনের বিকাশ সাধন করি না, যেমন ভাবে ঘটনাচক্রের সাম্‌নে পড়ি তেম্‌নি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সামঞ্জস্য করে চলি। বর্ত্তমান দার্শনিকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বল্‌ছেন যে একটা ইচ্ছাসৃষ্ট উদ্দেশ্য (Conscious purpose) আমাদের জীবনকে চালায় না, চালায় অসম্বন্ধ অভিলাষ (impulse) একথা আমার সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না, কিন্তু আমরা যে সাধারণ নীতির প্রণোদনায় জীবনকে মঞ্জরিত করে তুলি না লিখেছি এটা তারই একটা extreme অভিব্যক্তি। কিন্তু কোনও নীতির extreme অভিব্যক্তি সত্য না হলে তাতে মূল নীতির বিশেষ সম্ভ্রমহানি হয় না বলে বোধ হয় একথা বলা যেতে পারে যে "দৈনিক সত্য" থেকে সাধারণ নীতি গড়ে তুল্‌তে না পারাটা মনের বিকাশের অভাব সূচিত করে না। কিন্তু when all is said and done ব্যক্তি

থেকে সাধারণ নীতিতে পৌঁছবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এতই বেশী যে তা না কর্লে যেন আমাদের কাছে "জীবনটা ঠেকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা।" আমরা যখন নিশ্চিন্ত উৎসাহে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পাদি করি তার মধ্যে আমরা এই সাধারণ মতামত যে কত বেশী প্রচার করে থাকি—অর্থাৎ ইংরাজীভাষায় যাকে বলে sweeping generalisation—সেটা একটু লক্ষ্য করে দেখ্‌লেই উপরোক্ত সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু সত্যে নিষ্ঠা যতই বাড়ে এই সাধারণ সত্য প্রচারের উৎসাহে ততই ভাঁটা পড়ে আসে। কারণ সৃষ্টি বিচিত্র ও গতিশীল ও তার সম্বন্ধে সাধারণ মতামত প্রচার করা বিপজ্জনক।

কিন্তু একটা জাতির বাইরের গুণাগুণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা ততটা বিপজ্জনক নয়। অবশ্য যে কোনও জাতির মনোজগতের গভীরতম সুরের কোনও সন্ধান পেতে হলে তার জন্য যথেষ্ট সত্যানুসন্ধিৎসা, যোগ্যতা ও অপক্ষপাতিত্ব দরকার। কিন্তু বাইরের গুণাগুণ বুঝ্‌তে তত সময় লাগে না এই ভেবে আমি জার্ম্মাণ জাতির বহির্গুণাগুণ সম্বন্ধে দু চারটি কথা সাধারণ ভাবে বল্‌বার ধৃষ্টতা প্রকাশ কর্ব্ব। এ বিষয়ে অবশ্য আমার ঠিক্ যা মনে হয় তা বল্‌বার অধিকার আমার আছে মনে করে লেখনী ধরা গেছে।

জার্ম্মাণ মধ্যবিত্তদের একটু কাছ থেকে জান্‌বার সুযোগ এখানে পাওয়া যায় আমার এমতামত অন্যত্র প্রকাশ করেছি বলে সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বল্‌ব না। তবে আমার সে উক্তিটিকে নিছক্ সত্য বলে ধরে নিলে একটু ভুল হতেও পারে। কারণ এবিষয়ে দুএকজনের অভিজ্ঞতার উপর এতবড় সাধারণ সত্য [illegible] করা

চলে না। একে একটা বড় সাধারণ সত্য বল্‌ছি এই জন্য যে একে জাতি, তার উপর বর্ণগত ভেদজ্ঞানের, হাত হতে মুক্তি পাওয়া যে কোনও জাতির কাছেই কঠিন। এ ভেদজ্ঞানের হাত হতে সমগ্র মানবের একযোগে নিষ্কৃতি লাভ করা রূপ milleniumএর দিন এখনও আসেনি। তবে আমি শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে এখানে ব্যক্তিগত ভাবে এমন অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের সঙ্গে আসা যায়—যেটা বিলাতে যায় না—যাঁরা এই কুসংস্কারের হাত হতে কমবেশী উদার নীতির বশবর্ত্তী হয়ে মুক্তি লাভ করেছেন। এরকম লোকের সংখ্যা যত বেশী হয় মনুষ্যত্বের খাতায় জমার দিকে তত বেশী লাভ। এই সাধারণ সত্যতে অবশ্য আমি নিজের ও দুই চারজন বন্ধুর অভিজ্ঞতা থেকেই পৌঁছেছি—এবং সেটার অধিকাংশ "দৈনিক সত্য" থেকে তা বলাই বাহুল্য, অর্থাৎ অনেকগুলি পরিবারে নিমন্ত্রণ ও আপ্যায়ন ব্যক্তিগত ভাবে পাওয়া যায় এই দৈনিক সত্য থেকে। কিন্তু এ বিষয়ে অপরের অভিজ্ঞতা যে ঠিক্ আমার বা আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরূপ হবেই এমন কথাও জোর করে বলা চলে না। তবে অতটা না ভেবেও এ আদর আপ্যায়নটা হৃদয়ের গভীরতম স্তরের অভিব্যক্তি নয় বলে এ সম্বন্ধে generalise করা তত বিপজ্জনক নয়। যদিও আমি একথা বল্‌তে চাই না যে এর দাম খুব কম। মানুষকে কাছ থেকে দেখ্‌তে পাওয়ার সুযোগ জীবনের পরিণতির পক্ষে যত বড় সহায়, বইপড়া বা উপদেশ তত বড় সহায় নয় বলে আমি বিশ্বাস করি, এবং মানুষকে যতই ঘনিষ্ঠ ভাবে জান্‌তে পারা যায় মনের সম্পদ্ ততই রস সঞ্চয় করে। তাই আমি কবির কথায় সা[illegible]। "Friendship is a gift of life which one

bestows standing and which one must receive on bended knees"* অবশ্য এতবড় কথাটা প্রযোজ্য কেবল সবচেয়ে বড় বন্ধুত্বের উপর যেটা জীবনে বড় বেশী পাওয়া যায় না এবং যেটা বিদেশে "পাব" আশা করে না আসাই ভাল। তবে আমি কাছ থেকে জানতে পারা যায় বলতে এ কথা জ্ঞাপন কর্ত্তে চাই না যে এরকম বন্ধুত্বলাভের সুযোগ এখানে "লঙ্কায় সোনার" মত সস্তা, আমি কেবল এই সরল সত্যটুকু জানাতে চাই যে এদের সঙ্গে যে সরল ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ এখানে পাওয়া যায় তা থেকে যথেষ্ট লাভ কর্ব্বার আছে।

আমার মনে হয় জার্ম্মাণ ভদ্রপরিবারকে যে নিকট থেকে জান্‌বার সুযোগ বিদেশী এখানে পায়—সেকথা একদিন একজন এদেশবাসিনী মহিলাও আমাকে বলেছিলেন—সেটা এদের মনে একটা স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা ও নিরপেক্ষ spirit of appreciation এর অন্যতম অভিব্যক্তি মাত্র। আমি যতদূর দেখ্‌লাম—এইখানে একটা মস্ত বিপজ্জনক generalisation কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছি—তাতে বোধহয় এক রুশিয়ান জাতি ছাড়া অন্য কোনও জাতির মধ্যেই উপর্য্যুক্ত গুণদুটি এত বেশী পথেঘাটে চোখে পড়ে না (এখানে বিস্তর রাশিয়ান ভদ্রলোক refugee হয়ে আছেন ও তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলেই এ কথা লিখ্‌লাম।) এর জন্য দুচারটে ছোটখাট দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার মনে করি কারণ এইসব ছোটখাট সত্য অনেক সময়ে একটা জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পক্ষে—পথপ্রদর্শক না হলেও—যথেষ্ট সহায়তা করে।

*D'Annunzio—"Honeysuckle"

প্রথমতঃ ইংলণ্ডে ফরাসীদেশে ও সুইট্‌জরল্যাণ্ডে পুস্তাকাগারে ঢুকলে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ বই এখানকার মত এত বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে সব চেয়ে বেশী মজুত থাকে সাময়িক সাহিত্যের বই—যাকে trash রূপ সাধারণ আখ্যা দিতে আমি ইতস্ততঃ কচ্ছি—এবং সে সবের অধিকাংশই দেশীয় লোকের লেখা। পক্ষান্তরে এখানে যে কোনো পুস্তকাগারে (এবং এত বেশী পুস্তকাগারও আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না) প্রবেশ কল্লেই দেখতে পাই রাজ্যের serious বই, এবং তার মধ্যে এত বেশী বই বিদেশী ভাষা থেকে অনূদিত যে তার ইয়ত্তা হয় না। এথেকে কেউ যদি মনে করেন যে জার্ম্মান সাহিত্যে সার কম বলেই তারা বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে এত বেশী আগ্রহশীল তবে তিনি কেবল বিশ্ব-সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতাই ঘোষণা করে বস্‌বেন। কারণ এখানে জাতীয় সাহিত্যিকের গ্রন্থেরও অভাব নেই—কিন্তু তা বলে এরা বিদেশী ভাষা থেকে সার সঙ্কলন কর্ত্তে মোটেই অনিচ্ছুক নয়। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইংরাজী বা ফরাসী ভাষায় যে বিদেশী সাহিত্য অনূদিত হয় না একথা বলা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমি কেবল বল্‌তে চাই এই কথা যে সেক্ষেত্রে বিদেশী পুস্তক ফর্ম্মাশ না দিলে পাওয়া যায় না, আর এখানে যে কোনও সামান্য পুস্তকাগারেও Shakespeare, Wilde, Shaw, Flaubert, Hamsun, Dostoevsky, Dante, Tolstoy, Turgenev Rabindranath, Romain Rolland আর কত নাম কর্ব্ব?—ঢুক্‌লেই চোখে পড়ে। এতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও খুসি হয়েছি বলেই একথা বেশী করে লিখলাম। কারণ

সামান্য সাধারণ পুস্তকাগারেও যে এ সব নিতান্ত serious বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ সাজান থাকে তাতে এটা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ হয় যে এসব বই এখানে খুব কাটে। অন্যত্র দেখা যায় যে Paul be Cock, William le Queux, Rider Haggard Elynor Glyn, Charles Garvice প্রমুখ তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের পুস্তকেই দোকান ভর্ত্তি। তাতে একথা অবশ্য প্রমাণ হয় না যে অন্যত্র লোকে serious সাহিত্য পড়ে না, তাতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে এখানে সাধারণে তা যত পড়ে ও বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে যতটা বস পেয়ে থাকে অন্যত্র ততটা নয়। আমার মনে হয় যে যেখানে পুস্তকাগারেব এত প্রাদুর্ভাব সেখানে বিদেশী উচ্চ সাহিত্যের পুস্তকের এত ছড়াছড়ি ব্যাপারটি থেকে এরূপ সাধারণ সত্য প্রচার করা নিতান্ত অন্যায় নয়।

এখানে এলেই রবীন্দ্রনাথের পুস্তক প্রত্যেক show-window তে যেরকম ভাবে চোখে পড়ে অন্যত্র কোথাও সেরকম পড়ে না এবং শুধু "ঘরে বাইরে" (Das Heim und die Welt) চোখে পড়ে তাই নয়, তাঁর Nationalism ও Sadhana-র মত দার্শনিক বইও সাজান দেখা যায়। এর মধ্যে অনেকটা উৎসাহ যে অন্য সব বিষয়ের মত সাময়িকতার বা ফ্যাসানের অনুবর্ত্তিতার দরুণ তা স্বীকার করে নিলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ সমজদার দৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গতঃ কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা আসে যিনি ভারতকে জগতের গোচরে আন্‌বার পক্ষে এতটা সহায়তা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয় যে তাঁর যথার্থ গুণগ্রাহী এখানে যত বেশী পাওয়া যায় অন্যত্র বোধ হয় তত

দুই একটা "দৈনিক সত্য" সূচক উদাহরণ দেওয়া দরকার মনে করি। একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁর কন্যার কাছ থেকে একটি চিঠি পড়ে আমাকে একদিন শোনালেন। তাতে কন্যা লিখছেন যে তিনি Das Heim und die Welt বইখানি দুবার পড়েও তৃপ্তিলাভ করেন নি শীঘ্রই মাতাপুত্রীতে আর একবার একত্রে পড়বেন। যেহেতু একত্রে পাঠে রসোপভোগ বেশী হয়। আর একটি পরিবারে আর একদিন সন্ধ্যানিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। তরুণী নব বিবাহিতা বধূ আমাকে সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের অনেক গুলি বই দেখালেন এবং বল্লেন যে তাঁরা বই গুলি আভিজাত্যের মত আল্মারীতে সাজিয়ে রাখার জন্য কেনেন নি, সত্য সত্যই পড়ে শেষ করেছেন। গার্হস্থ্য জীবনে সাংসারিক নানাবিধ উদ্বেগ ও এদের বর্ত্তমান দুঃখময় জীবনের মধ্যেও এরা বিদেশী সাহিত্য থেকে যে এরকম ভাবে রস গ্রহণ করে সে জন্য এদের প্রতি শ্রদ্ধা না এসেই পারে না।

জার্ম্মাণ জাতি জগতের খবর এত রাখে যে সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের এক অধ্যাপকের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য হবার দরুণ আমি এদের মধ্যে প্রাচ্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব যে শিক্ষিত-সমাজে কতটা চারিয়ে পড়েছে—তার অনেক ছোটখাট "দৈনিক সত্য" রূপ প্রমাণ পেলাম। তা থেকে এদের বিদেশীর প্রতি—বিশেষতঃ ভারতীয়দের প্রতি—ভাল ভাবের কারণ অনেকটা বোঝা গেল। এখানে অনেক শিক্ষিতা মহিলাই দেখতে পাই আমাদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু পড়েছেন এবং এত লোককে আমাদের দেশকে

"পরীরাজ্য" (Märchenland) বল্‌তে শুনেছি যে তাতে আমাদের জাতীয় দৈন্য সত্বেও সে জন্য মনের অনেকটা কষ্টের উপশান্তি হয়। পক্ষান্তরে মনে পড়ে ইংলণ্ড দেশে আমাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের অজ্ঞতা যদিও সেখানকার লোকের আমাদের সম্বন্ধে বেশী খবর রাখার কথা। আমার এক ভারতীয় ডাক্তার বন্ধু—যিনি ইংলণ্ড দেশে কুড়িবৎসর বাস কচ্ছেন আমাকে এ সম্বন্ধে একটি গল্প কল্লেন। একটি ইংরাজ মহিলার পুত্র কার্য্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে যাত্রা করে। স্নেহোদ্বিগ্না মাতা আমার ডাক্তার বন্ধুকে নিরতিশয় উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করেন "Tell me Doctor, they are not all cannibals up there, are they ?" ইনি অশিক্ষিতা নন্ এবং ভারতের প্রতি যে বিশেষ কোনও অবজ্ঞা বশতঃ এ প্রশ্ন করেছিলেন তা নয়, ইনি, আন্তরিক অজ্ঞতা বশতঃই করেছিলেন। জার্ম্মাণীতে কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখি লোকে জানে যে "We are fallen on evil times" হলেও আমাদের সভ্যতা একদিন মহিমময় ছিল। এটা মনের উদারতার ও সত্যপ্রিয়তার প্রমাণ-সূচক একটি অন্যতম "দৈনিক সত্য" (fact) যার বলে আমি উপরি লিখিত গুণ দুটি সম্বন্ধে সাধারণ মত প্রচার করবার একটু প্রণোদনা পেয়েছি।

বিদেশী গুণের মূল্য যে এরা খুব বেশী দেয় তার আর একটি "দৈনিক সত্য" রূপ প্রমাণ এদের থিয়েটারে বিদেশী নিতান্ত serious নাটকের অভিনয়। আমি এখানে এসে এই আশ্চর্য্য সত্যটি লক্ষ্য কল্লাম যে শেক্ষপীয়র এখানে যত পঠিত ও অভিনীত ইংলণ্ডে তার সিকিও নয়—অন্ততঃ অভিনয় ত নয়ই। উদাহরণতঃ আজকাল ইংলণ্ডে শেক্ষপীয়রের কোনও নাটক একাদিক্রমে তিন মাসও

অভিনীত হয় না যখন হয় বৎসরে একবার কি দুবার কতিপয় দিনের জন্য হয়ে থাকে যেস্থলে chu chin chow এর মত trash ও চারবৎসর ধরে প্রত্যহ অভিনীত হয়। অবশ্য শেক্ষপীয়র—অনুরাগীর সংখ্যা যে তরল নৃত্যগীত যুক্ত নাটিকা অনুরাগীর চেয়ে কম হবে এতে আমি দুঃখ প্রকাশ কর্চ্ছি না, কারণ মানুষের মনোজগতের সৌন্দর্য্য চিত্রণের অনুরাগীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" রূপ মহানীতির তপস্বীদের তুলনায় কম হবেই হবে, আমি বল্‌তে চাই কেবল এই কথা যে লণ্ডনের ৬০।৭০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ এতগুলি দর্শক আশা করা অসঙ্গত নয় যাদের দ্বারা শেক্ষপীয়রের বা ইব্‌সেনের কোনও নাটক তিন মাসের বেশী পরিপুষ্ট হতে পারে। পক্ষান্তরে এখানে দু তিনটি থিয়েটারে শেক্ষপীয়র প্রায়ই অভিনীত হয়। তাহারা Ibsen এর Peer Gynt ও অন্য নাটক, Strindberg এর Todestanz (Dance of death) ও অন্যান্য নাটক, Hamsum এর নাটক প্রভৃতির অভিনয়ে রীতিমত ভীড় হয়ে থাকে। কাজে কাজেই এ সব "দৈনিক সত্য" থেকে এ সাধারণ সত্যে পৌঁছান বোধহয় অসমীচীন নয় যে এখানে জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত গম্ভীরচিত্ত, যদিও চার্ব্বাকানুবর্ত্তিদের দল যে এখানে বিরল তা বলা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়।

সঙ্গীতানুরাগে এদের অভ্রভেদিত্ব অবিসংবাদিত বলে সে সম্বন্ধে আর বেশী করে লেখার দরকার নেই। কেবল একটি ছোট "দৈনিক সত্য" জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হব। এক একজন উদ্যোক্তা (Kappelmeister = conductor) এখানে পর পর প্রতি সপ্তাহে একটি করে concert দিয়ে থাকেন। অত্যন্ত গম্ভীর সঙ্গীত, যার নাম

classical music. তার জন্য একত্রে সব কন্‌সার্টগুলির জন্য টিকিট কিনতে হয়। প্রথম কন্‌সার্টের আরম্ভের সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ হওয়া মাত্র সাত আটদিনের মধ্যে সমস্ত reserved স্থানগুলির season টিকিট নিঃশেষ। তা আবার প্রথম কন্‌সার্ট আরম্ভের দুমাস আগে, আমি এত আগে থেকে গিয়েও unreserved টিকিট ছাড়া অন্য টিকিট পেলাম না। এ থেকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের জন্য এজাতির উৎসাহ সহজেই অনুমেয়। এ একটি নিতান্ত সাধারণ "দৈনিক সত্য" মাত্র, সকলেই এরকম ব্যাপারটাকে স্বতঃ সিদ্ধবৎ ধরে নেয়।

এই সব দৈনিক সত্য থেকে একথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে এদের মধ্যে serious-mindedness বস্তুটির প্রাদুর্ভাব অন্যত্রের চেয়ে একটু বেশী। তবে সময়ে সময়ে সেটা একটু বেশীদূর গড়িয়েছে বলে মনে হয়। কারণ এরা খেলায় তত আনন্দ পায় না। আমি যেমন একদিকে স্বীকার করি যে খেলায় আনন্দ নিম্নস্তরের আনন্দ, তেম্‌নি একথাও বল্‌তে বাধ্য যে জাতীয় জীবনে এর প্রয়োজন আছে। মানুষের জীবনকে সবল, ও স্বাস্থ্যকর করার পক্ষে খেলাটা বড় ভাল জিনিষ। তা ছাড়া যারা খেল্‌তে ভালবাসে তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঋজুতা ও ঈর্ষার প্রতি অবজ্ঞা জন্মায় এটা আমি ইংলণ্ডে থাক্‌তে লক্ষ্য করেছি। উদাহরণতঃ, যারা খেলায় ভাল তারা সচরাচর একটু সোজা পথে চল্‌তে ভালবাসে দেখা যায়—অবশ্য ব্যতিক্রম আছেই। সেইজন্য আমি খেলাকে আনন্দানুভূতির দিক্ দিয়ে উচ্চস্থান না দিলেও—যেহেতু intellectual ও artistic আনন্দের স্থান তার অনেক উপরে পরসেবার আনন্দের ত কথাই

নাই—পরোক্ষভাবে তার দাম দিতে বাধ্য। তাই ইংরাজের জাতীয় জীবনে এইটি তাদের একটি বড় গুণ বলে মনে করি এবং আমাদের মধ্যে এ গুণের আদর হওয়া দরকার বলে বিশ্বাস করি। কেবল এই কথা বল্‌তে চাই যে এক্ষেত্রেও খেলাকে আকাশে তুলে ধরে perspeotive হারিয়ে ফেল্‌লে চল্‌বে না, যেমন ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেক সময়ে দেখেছি। উদাহরণতঃ বাৎসরিক অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজের নৌকাচালন প্রতিযোগে টেম্‌স নদীতে জনসংখ্যা এত অধিক হয় যে তা নাকি না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা কঠিন। এদের মধ্যে যদি সকলে নৌকাচালন ভাল করে দেখ্‌তেও পেত তাহলেও বা বুঝ্‌তাম। কিন্তু যখন এই বিরাট্‌ জনসঙ্ঘে তা অসম্ভব তখন যে এদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশজন হুজুগের জন্যই ঠেলাঠেলি করে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং এরূপ হুড়াহুড়িকে গুণের আদর নাম না দিয়ে হুজুগের আদর আখ্যায় অভিহিত করাই বোধ হয় শ্রেয়স্কর। তা ছাড়া কেম্ব্রিজে ও অক্‌স্‌ফোর্ডে অনেক সময়ে দেখেছি যে যে ছাত্র খেলায় ভাল সে পাঠাদি মুখ্য কাজে অবহেলা কর্লেও কি অন্য ছাত্রেরা কি কর্ত্তৃপক্ষ কেউই সেটাকে কিছু দূষ্য মনে করে না। তাছাড়া সেখানে অনেকে বলেন যে খেলায় বন্ধুত্ববন্ধন বড় চমৎকার দৃঢ় হয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে এরূপ ধারণা আমাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতারই পরিচায়ক। খেলায় যে প্রীতির ভাব আসে তা কোনও স্থলেই বন্ধুত্ব হতে পারে না যদি না সেই সঙ্গে উচ্চতর ভিত্তির উপর তার প্রতিষ্ঠা করার উপায় থাকে। অর্থাৎ বন্ধুত্ব জিনিষটি এতই সুলভ নয় যে একসঙ্গে একটু হৈ হৈ কর্লেই তার মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে পারে। এজন্য প্রথম ও শেষ বন্ধন

সহানুভূতির গ্রন্থি ও জীবনের উচ্চতম সমস্যাতে মনের মিল; ছোট-খাট বিষয়ে যতই মতদ্বৈধ থাকুক না কেন আসে যায় না। মাত্র খেলায় যে প্রীতির প্রতিষ্ঠা তাকে বন্ধুত্ব নাম দেওয়া অনুচিত সেটাকে সাহচর্য্য বলাই ভাল (এর ঠিক সংজ্ঞা হচ্ছে Camaraderie)। এর দাম নেই এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় আমি কেবল তুলনায় এর স্থান যে যথার্থ বন্ধুত্বের ঢের নীচে এই কথাই বল্‌তে চাই।

জার্ম্মাণীতে কিন্তু পথেঘাটে বা হোটেলাদিতে এরা অপরের সঙ্গে ব্যবহারে ফরাসী বা ইংরাজজাতির মত শিষ্ট polite নয়। সব তাতেই এরা একটু যাকে বলে rough without being conscious of it. এমন কি এদের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এরা শিষ্টতাকে মোটেই আমল দেয় না। এ পক্ষে বহুল "দৈনিক সত্যের" অন্যতম হচ্ছে এই যে এরা ট্রাম বা ট্রেনে স্ত্রীলোকের জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই আসন ছেড়ে দেয়। এ শিষ্টতা ইংলণ্ডে সব চেয়ে বেশী। ফরাসীরাও এবিষয়ে ইংরাজের পিছনে। এরা কেন স্ত্রীলোকের প্রতি এই সুন্দর ভদ্রতা প্রকাশ করে না জিজ্ঞাসা কর্লে নানা মত প্রকাশ করে কিন্তু সে সব কারণ আমার কাছে সত্য মনে হয় না। আমার মনে হয় আসল কারণ এই যে এদের অন্তর্জ্জগতের নিভৃতপ্রদেশে এই ধারণা জাগে "There's no nonsense about us." আমি স্ত্রীলোকের প্রতি এই নিতান্ত সভ্য শীলতা প্রকাশকে স্ত্রীজাতির-প্রতি-শ্রদ্ধা-আখ্যায় অভিহিত কর্ত্তে কুণ্ঠিত—কারণ সেটা ঢের বড় ও শক্ত জিনিষ—আমি শুধু এই কথা বলি যে এটা মানুষের মনে refinement বাড়ানর একটা অন্যতম শিক্ষা। তাই এ আচারটী প্রচলন সর্ব্বত্রই হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে না করেই

পারি না। তবে সন্ধ্যাপার্টি প্রভৃতিতে লৌকিক ভদ্রতার আড়ম্বরে মিথ্যা complement এর আতিশয্যে এবং দারুভূতের মত হাস্যকর bow করা রূপ গুণে এরা যে জগতের কোনও সভ্যজাতির পিছনে নয় আমার এ গভীর আবিষ্কারের কথাটি না লিখে এ প্রবন্ধের শেষ কর্লে তাদের প্রতি মহান্ অবিচার করা হবে।

জার্ম্মাণজাতির জনসাধারণের ভাবভঙ্গীতে একটা জিনিষ আমার বড় বেশী করে চোখে ঠেকে। সেটা হচ্ছে এদের বাইরের অত্যন্ত বেশী হাত মুখ নাড়া। আমি ইংরাজজাতির কাষ্ঠবৎ আদব-কায়দার অনুরাগী নই, "ঐ কে শুনে ফেল্‌ল" ইত্যাকার লোমহর্ষক আশঙ্কায় সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা অর্দ্ধস্ফুটভাবে কওয়া উচিত এমন কথাও মনে করি না, কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও বল্‌তে চাই যে ইংরাজ জাতির ভাবে ভঙ্গীতে একটা আড়ষ্টভাব থাক্‌লেও একটা আত্মসম্ভ্রমবোধের অস্তিত্ব বিদ্যমান। জার্ম্মাণজাতির এদিকে ততটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি নেই। ফরাসীজাতিও খুব হাত মুখ নেড়ে কথা কওয়াতে বিশ্বাস করে যদিও ইংরাজেরা তাতে হাসে। একথা একদিন একটি ফরাসী মহিলাকে বলায় তিনি আমাকে বলেছিলেন "আমরা ইংরাজ-জাতির মত কাঠের পুতুল নই, আমরা মানুষ এবং ভাবে ভঙ্গীতে সেটা দেখাই এই মাত্র"। সে যাই হোক্ জার্ম্মাণজাতির হাত মুখ নাড়ার মধ্যে সে মাধুর্য্য নেই যেটা ফরাসীজাতের অনুরূপ ভঙ্গীমার মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—বিশেষতঃ ফরাসীরমণীর মধ্যে। আমি নিজে ফরাসী ভাষার লালিত্যে হয়ত একটু বেশী মুগ্ধ বলে ফরাসী-রমণীকে অজানিতভাবে এই লালিত্যে ভূষিত করে থাক্‌তে পারি—কারণ সকলেই জানেন ভাষার লালিত্য সব চেয়ে বেশী মূর্ত্ত হয়ে

ওঠে স্ত্রীলোকের ও শিশুর মুখে—কিন্তু যখন আমার মনে হয় যে রুশরমণীর চালচলনেও মাধুর্য্য জার্ম্মানদের চেয়ে বেশী তখন বোধ হয় যে জার্ম্মাণ ভাষার লালিত্যের অভাবই জার্ম্মাণ মহিলার "chic" (পারিপাট্য) এর অভাবের কারণ নয়, মনে করাতে তাদের প্রতি অবিচার করে বসার দোষ আমাকে স্পর্শ কর্ব্বে না, যেহেতু রুশ ভাষাও তেমন কিছু সুললিত নয়।

অবশ্য এ সম্পর্কে আমি খুব জোর করে এমন কথা বল্‌তে চাই না যে জার্ম্মাণজাতির চাল চলনের অপেক্ষাকৃত মাধুর্য্যের অভাব বিশ্বজনীন, কারণ আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি এমন দুই একটি জার্ম্মাণ পরিবারের সঙ্গে একটু নিকট সংস্পর্শ লাভ করেছি যেখানে জার্ম্মাণতরুণী বাইরের চরিত্রের কমনীয়তায় ফরাসী বা ভারতীয় রমণীর চেয়ে কোনও অংশে হীন নন। তবে একটা কথা আমি বোধ হয় নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে জার্ম্মাণরমণী পোষাক কেমন করে পরিধান কর্ত্তে হয় সে বিষয়ে ফরাসীরমণীর কাছে এখনও অনেককাল শিখ্‌তে পারেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি ইংরাজ, রুষ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, বুল্‌গেরিয়ান ও সুইসজাতির সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু বোধহয় নানাবিধ "দৈনিক সত্য"থেকে পোষাক পরা বিষয়ে এই সাধারণ সত্য প্রচার করা যেতে পারে যে চমৎকার সরল অথচ সুন্দর ভাবে বেশ ভূষা করার কলায় ফরাসীজাতির সমকক্ষ জাতি জগতে নেই।

জার্ম্মাণজাতির সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বল্‌বার নেই। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অন্যান্য দেশের মত সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব এখানেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য দেশের মত

এখানকার রমণীর মধ্যেও দুই রকম সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় এক, যা নয়নের প্রীতিপ্রদ ও piquant অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের গঠন বশে দেখ্‌লেই পেতে ইচ্ছে হয় এবং অন্যটি স্থির, স্নিগ্ধ ও পবিত্র যাকে দেখ্‌লেই হৃদয় আনন্দে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু স্পর্শ কর্ত্তে সাহস করে না।

শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

দিল-মহলের গল্প।

—:*:—

অতি মোলায়েম অতি মিষ্টি যেন সোহাগ-মাখান' একটা সারেঙ্গীর সুর জুলেখার কানে এসে বাজ্‌ল। জুলেখা দূরাগত বেণুরব-শোনা হরিণীর মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল—ডালিমের রসে রাঙান ছোট্ট পাদুখানি হিঙ্গুলের মতো লাল মখমলের চটিতে ত্রস্তে ঢুকিয়ে দ্বারের কাছে এসে নৈরাশ্য-ব্যাকুলতা মিশ্রিত কণ্ঠে ডাক্‌ল—"বাঁদী বাঁদী!"

বাঁদী তার আঠার বছরের দেহভঙ্গী নিয়ে চোখের কোনের হাসির নেশা নিয়ে ঠোঁট দুখানিতে রঙিন্ অবসরের তৃপ্তির অবলেপ নিয়ে এসে জুলেখাকে কুর্নিশ করে' দাঁড়াল। জুলেখা বল্‌লে—"বাঁদী সারেঙ্গীর সুর শুনেছিস্? কোথা থেকে আস্‌ছে জানিস্?"

"বিবি সাহেবা নীচে যমুনায় কার নৌকো যায়, সেই নৌকোয় কে সারেঙ্গী বাজাচ্ছে—এ তারি সুর।"

জুলেখা বল্‌লে—"বাঁদী যমুনার দিকের জানালা খুলে দে—আমি দেখ্‌ব।"

"ওদিকের জানালা যে খুলবার হুকুম নেই বাদশার, বিবি-সাহেবা!"

"বাদশার হুকুম যাতে পাস্ তাই করিস্"—জুলেখা তার আঙুল থেকে কলিজার রক্তের মতো লাল চুনি বসান' একটা আংটী খুলে বাঁদীর হাতে দিল—বল্‌লে—"এতেও কি বাদশার হুকুম পাবিনে?"

বাঁদী পাতলা ঠোঁটে রঙিন্ হাসি এনে চোখের কোণে একটা নিরর্থক কটাক্ষ টেনে বল্‌লে—"বাদশার হুকুমের জন্ম ভাবনা কি

বিবি-সাহেবা—আপনার রূপের গুণে যে জানালা বন্ধ হয়েছে আপনার রূপেয়ার টানে আবার তা খুল্‌বে—বাতায়ন আমি খুলে দিচ্ছি।"

বাদশার হাজার-দুয়ারী বিলাস-ভবনের হাজার চাবীর গোছা থেকে একটা চাবী বেছে বাঁদী বাতায়নের কপাট খুলে দিল।

নীচে নৃত্যরতা কিশোরী যমুনা। গোধূলির সোনালি সোহাগে বুক তার রাঙা হ'য়ে উঠেছে। দেহে তার রূপের জোয়ার, প্রাণে তার নেশার জোয়ার—দু'কূল ছুঁয়ে তার যৌবনের টান মুক্তির বান।

সেই রূপের জোয়ারে প্রাণের জোয়ারে নেশার জোয়ারে যৌবনের জোয়ারে মুক্তির জোয়ারে একখানি ছোট্ট নৌকো ভেসে চলেছে যেন আপন মনে। সেই নৌকোর ছইয়ে বসে এক কিশোর যুবক, হাতে সারেঙ্গী কণ্ঠে গজল।

গজল বল্‌ছিল—ওরে দরদী তোরে ধরে' রাখ্‌লে আমি ব্যথা পাই—তোরে ধরে' রাখ্‌তে গেলে তোর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় তোর চোখের কোণে অশ্রু জাগে—তোর অভিমানের সুর এমনি করুণ হ'য়ে বাজে—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর............

ওরে দরদী তোরে ছেড়ে দিয়ে আমি স্বস্তি পাইনে—তোরে ধরে' রাখ্‌লে তুই শুকিয়ে উঠিস্ তোকে ছেড়ে দিলে তুই মৃত্যু পানেই ছুটিস—তবুও তোর চলার নেশা থামে না—ওই চলাই যে তোর মৃত্যু আবার জীবন—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর............

পতঙ্গকে যে আগুণে পুড়তেই হবে—তবু ও-রঙিন্ নেশার সুখ সে কেমন করে' ছাড়্‌বে? থামার মাঝে অমৃত নেই, চলার মাঝে মৃত্যু আছে—এ তোর কি কৌতুক,—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর.........

সারেঙ্গীর সুর গজলের কথা আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই তিনে মিলে জুলেখার অন্তরে কতদিনের-সুপ্ত বনের হরিণটার মাথা তুল্‌ল—ওরে

"সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধ্‌ল অকারণে"

ওই যে যমুনার ওপারে সবুজ-বনানীর গাঢ় ছায়া সে আজ কি নিবিড় মায়া জুলেখার মনে মনে বিছিয়ে দিল—বাদশার এই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত প্রমোদ-ভবন এ যেন রাশি রাশি কঙ্কালের একটা বোঝা এর ঐশ্বর্য্য এর সুখ এর স্বাচ্ছন্দ্য কি অর্থহীন—এর চাইতে ঐ সবুজ বনের কালো ছায়া, স্তব্ধ দুপহরের মৌমাছিগুঞ্জন বাতাসে ভাসা বনফুলের গন্ধ সে কি সুখের কি তৃপ্তির কি সার্থকতার—এ সুখ এ তৃপ্তি এ সার্থকতার পাশে ধীরে ধীরে জুলেখার অন্তরে ভেসে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত মুখ............

সারেঙ্গীর সুর গজলের কথা আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই তিনে মিলে জুলেখার অন্তরের কতদিনের সুপ্ত বিহঙ্গমকে জাগ্রত কর্‌ল—

"আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী"

ওই যে আকাশ ছাওয়া রক্ত সন্ধ্যা ঐ যে নিবিড় নীল, সে কি সুন্দর কি মহান্—বাদশার এই যে মুক্তি-কুণ্ঠিত বিলাস-ভবন এ যেন রোগক্লিষ্ট একটা বিভীষিকা এর পুষ্পবীথি এর হাস্য-মুখর ঝরণার ধারা এর ফুলের গন্ধ, কি একটা বিরাট দৈন্য-ঘেরা প্রাণ-হীনতা—ঐ যে আকাশের নিবিড় নীলিমা, ঐ যে দিগন্তের নিমন্ত্রণ, ঐ যে অশেষ পথের আভাস মুক্তির সঙ্গীতে সে কি সম্পদশালী, হৃদয়ের

সঙ্গীতে সে কি ভরপুর নৃত্যে নৃত্যে সে কি উল্লাসময়—এ সুখ এ সঙ্গীত এ উল্লাসের পাশে ধীরে ধীরে জুলেখার অন্তরে ভেসে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত মুখ............

সারেঙ্গীর সুর আর গজলের কথা আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই তিনে মিলে আজ জুলেখার অন্তরে সুখের কার্পণ্যের চাইতে ব্যথার আনন্দকে গরীয়ান্ করে' তুল্‌ল—এই বিরাট বিলাস-ভবন, হৃদয়-ছেঁচা মানিক ত এর কোনখানেই নেই—কক্ষে কক্ষে এর পুরু গালিচা দেয়ালে দেয়ালে বহুমূল্য দেয়ালগিরি দিকে দিকে আরশি এ যে কেবল আশরফিরই ভারে ভারাক্রান্ত—এর চাইতে বনের ছায়া কাননের মায়া আকাশের নীলিমা দিগন্তের ডাক্ কি মর্ম্মস্পর্শী কি ব্যথা-ভরা সুখের—এ সুখের পাশে জুলেখার মনে জেগে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত মুখ-মণ্ডল, তার প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত কেশ-কলাপ সুবঙ্কিম ভ্রূ গভীর-দৃষ্টি আঁখি।

নৌকা যমুনার বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল—বাঁকের মুখে একটা অপেক্ষার আভাস রেখে—একটা আমন্ত্রণের ইঙ্গিত রেখে।

জুলেখা বল্‌লে—"বাঁদী এই যুবক কে জানিস্ ?"

হাসির রঙে রঙিন্ করে' জুলেখা উত্তর দিলে—"তা আর জানিনে বিবি-সাহেবা—তা না জান্‌লে কি আমাদের চলে !"

"তোর বক্তৃতা শোনবার আমার অবসর নেই বাঁদি—জানিস্ ত বল।"

ঠোঁট দুখানিতে সিরাজির নেশা ঢেলে বাঁদী বল্‌লে—"বাদশার দরবারে যে তাসকান্দের নূতন রাজদূত এসেছে এ তারি ভাগ্‌নে নাম সৈয়দ মহম্মদ আফজল ওসমান্ আলি।"

"এঁকে একবার এখানে আন্‌তে পারিস্‌ ?"

"সে কি বিবি-সাহেবা! এখানে ত বাইরের কোন পুরুষকে নিমন্ত্রণ করবার হুকুম নেই বাদশার!"

"এই হুকুমটা কি আর বাদশার কাছ থেকে আদায় কর্‌তে পার্‌বি নে"—জুলেখা তার হৃদয়ের উপরকার মণিহার খুলে বাঁদীর হাতে দিল—রং তার জুলেখার চোখের তারার মতোই গভীর নীল—তা জুলেখার চোখের তারার মতোই বিদ্যুৎ ক্ষরণ করে—বল্‌লে—"এতেও কি তোর হুকুম মিল্‌বে না ?"

"খুব মিল্‌বে বিবি-সাহেবা—আপনার রূপের জ্বালায় যে-হুকুম রদ হয়েছে আপনার এই কণ্ঠমালায় আবার সে-হুকুম মিল্‌বে। ওস্‌মান আলিকে কবে আন্‌তে হবে ?"

"বাদশা পরশু আস্‌বেন না। ওঁকে পরশু আনিস্‌।"

"বহুৎ খুব বিবি-সাহেবা।" বাঁদীর পাতলা ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মতো একটু হাসি খেলে গেল। সে হাসিতে প্রচ্ছন্ন ছিল সমরকন্দে তৈরী তর্‌তরে ধারওয়ালা গুপ্ত ছুরির সূক্ষ্মাগ্রভাগের শিহরণ-হানা একটুকু চিকিমিকি।

(২)

দুই হাঁটুর মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারী রেখে হাব্‌শী ঢুল্‌ছিল—ঘাঘরার খস্‌ খস্‌ শব্দ পেয়ে হাব্‌শী চোখ মেল্‌ল—বাঁদীকে দেখে তার জোঁকের মতো ঠোঁটদুটোর মাঝে মুক্তোর মতো দু'সার দাঁত জেগে উঠ্‌ল। জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কে তুই ? বাদশার খাস কামরায় তোর কি দরকার ?"

রেশমী আঙ্গরাখায় ঢাকা বুক দুটোকে আরও ফুটিয়ে তুলে মুষ্টিবদ্ধ

দু'হাত কটির দু'দিকে ন্যস্ত করে' পাতলা ঠোঁটে গাম্ভীর্য্য এনে বাঁদী বল্‌ল—"নাম আমার পিয়ারী বেগম, পেশা বাদশার বিলাস-ভবনের খাস্ বাঁদী, জন্মস্থান ইরাক্, বিক্রীতস্থান সিরাজের বাজার, হাল সাকিন দিলমহল, ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী—দরকার বাদশার সঙ্গে রাজকার্য্য আলোচনা।"

হাব্‌শী তার বিকট মুখ হাসিতে আরো বিকট করে' তুলে বল্‌ল—"ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী! আমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবি না ত?"

"খাওয়াব না! তোকে আর জহর বেগমকে এক সঙ্গে সবার আগে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"

"কেন আমার আর জহর বেগমের উপর তোর কি রাগ?"

"তুই আবলুশের মতো একটা হাব্‌শী আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিস্ তাই তোর উপরে রাগ—আর জহর বেগম ধুত্‌রোফুলের মতো সাদা একটা ইহুদি আমার সঙ্গে ইয়ারকি দেয় না তাই তার উপর রাগ। সর্ পথ ছাড় বাদশা আমায় ডেকেছেন।"

হাব্‌শী উঠে দরজার পরদা সরিয়ে ধর্‌ল—পিয়ারী বাদশার খাস্ কামরায় প্রবেশ কর্‌ল।

বাদশা একটা প্রকাণ্ড সাদা ইরাণী বিড়ালকে কোলে নিয়ে তার গলায় একটা মুক্তোর মালা পরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন—আর বিড়ালটা সে মালার কোন অর্থ না পেয়ে ঘোরতর আপত্তি করছিল।

তাঁর বিলাস-ভবম দিলমহলের খাস্ বাঁদীকে দেখে বাদশা বিড়ালের সঙ্গে খেলা থেকে বিরত হলেন—জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কিরে বাঁদী খবর কি?"

বাঁদী বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আভূমি-প্রণত একটা কুর্নিশ করে' বল্‌ল—"জনাব—জাঁহাপনা—খোদাবন্দ—খবর খারাপ।"

"তোদের দেশে খারাপ খবর জন্মে নাকিরে বাঁদী ?"

"তা আর জন্মে না জাঁহাপনা! যেখানে শিরীন্ প্রাণ জরীন্ রূপ যেখানে যৌবনের ছন্দ সিরাজীর গন্ধ যেখানে দিবসের অবসর নিশীথের স্বপ্ন খারাপ খবর জন্ম নেবার স্থানই ত সেখানে।"

"বাঁদী তুই যে কেন গজল লেখা সুর করিস্‌নি বুঝিনে—কর্‌লে চাই কি তুই একটা দিলমহলের বাঁদী না হ'য়ে দুনিয়ার দিলের যাদুকর হ'য়ে উঠ্‌তি—হাফেজ ফারদৌসির মতোই অমর হ'য়ে যেতি।"

"অমরত্বের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র টান নেই জাঁহাপনা! আমার সমস্ত আকর্ষণ মর্ত্ত্যের প্রতি। যা থাক্‌বে না যা লয় হবে যা দু'দিনের তার যে বেদনা সে বেদনার যে-সুখ আমার জীবনের সমস্ত লোভ সেই বেদনা সেই সুখের জন্য। যে ফুলের পাঁপড়ি ঝরে' যায়, যে সিরাজীর নেশা উবে যায়, যে যৌবনে ভাঁটা পড়ে, যে বসন্ত নিদাঘ-ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে তাই-ই আমার চোখে রঙিন্। অমর হবার ইচ্ছা দুনিয়াতে স্থায়ী ডেরা বাঁধার ইচ্ছা—জনাব আপনার দিল-মহলের বাঁদীর সে ইচ্ছা নেই। যে ঠোঁটে হাসি অবিরাম লেগে আছে চিরদিন লেগে থাক্‌বে সে ঠোঁট ত অমূল্য নয় সে ঠোঁট আমার কাছে মূল্যহীন।"

"বাঁদী তোকে দরবার করে' আমি কবির খেতাব ও খেলাৎ দেব। এ সব কথা তোকে কে শিখিয়েছে ?"

বাঁদীর ধনুকের মতো ভ্রূর নীচে টানা দু চোখের কাল-বোশেখের মেঘের মতো নিবিড় কালো তারা রোদ-পড়া ইস্পাতের ছুরীর

মতো ঝক্ ঝক্ করে' উঠ্‌ল—বল্‌লে—"শিখিয়েছে আমার জীবনের নেশা—আমার ভোগের নেশা—জাঁহাপনা আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে শোণিত রিরি কর্‌তে থাকে যখন দেখি আপনার খাসমহলে আপনার দিলমহলে———— " বাঁদী হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে' হাল্‌কা হাসির সুর মিশিয়ে বল্‌লে—"জাঁহাপনা আপনার দিলমহলের চিঁড়িয়া উড়ু উড়ু।"

"বলিস্ কি বাঁদী। এই ঘন বাদলে ?"

"পিঁজরার চিঁড়িয়ার কি আর বসন্ত বাদল দেখবার অবসর থাকে জাঁহাপনা ?"

"তবু বাদলেই চিঁড়িয়া উড়্‌বে ?"

"পিঁজরার সুখ কবে বাদলের দুঃখের চাইতে সুখের বাদশা ?"

"চিঁড়িয়ার নাম ?"

"নাম জুলেখাবানু, বাদশার দিলবাহার বেগম।"

জুলেখাবানুর নাম শুনে বাদশা কোলের বিড়ালটাকে গালিচার উপর ছুঁড়ে ফেললেন—বিড়ালটা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মাথা উল্‌টিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পিঠ চাট্‌তে লাগ্‌ল। বাদশা সোজা হ'য়ে বসে ক্রোধের স্বরে বল্‌লেন—"বাঁদী তুই ঝুঁটবাত শিখেছিস্।"

"তাসুকান্দের নতুন রাজদূত মিরজা আলির ভাগ্‌নে খাপ্‌সুরত নবীন যুবক ওসমান আলি দিলমহলে আমন্ত্রিত জাঁহাপনা।"

"তোর গর্দ্দান যাবে বাঁদী জানিস্ ?"

"দিলমহলের দিলবাহার বেগমের দিল ওস্‌মান আলির রূপ-সাগরে ভেসেছে জাঁহাপনা—ওসমান আলি সে নৌকোয় পাল তুল্‌বে পরশু সন্ধ্যেকালের মিঠে বাতাসে।"

"তুই নেশা করেছিস্ বাঁদী ?"

হঠাৎ বাঁদী হাসির একটা মিঠে গিট্‌কিরিতে সমস্ত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে' মেঝে পর্য্যন্ত নত হ'য়ে একটা কুর্নিশ করে' বল্‌লে—"জাঁহাপনা বাঁদীর গোস্তাফি মাপ করুন—আমি ঠাট্টা করছিলেম।"

বাদশা যেন ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতিস্থ হলেন কিন্তু পরক্ষণেই একটা দারুণ সন্দেহ তাঁর চোখের পাতে ঘনিয়ে এলো—ছোট্ট চোখের তীব্র দৃষ্টি পিয়ারীর মুখের উপর নিবদ্ধ করে' বল্‌লেন—"বাঁদী আবার মিথ্যে কথা সুরু করেছিস্—এ ঠাট্টা নয়—এ সত্যি।"

"জাঁহাপনা এ ঠাট্টাও নয় এ সাচ্চাও নয়—এ ঝুঁটা—ওসমান আলির সঙ্গে জুলেখাবানুর সাক্ষাৎ কেমন করে' হবে ?"

"তোর গর্দ্দান যাবে জানিস্ বাঁদী—এ মিথ্যা নয়—এ সত্যি।"

"এ যদি সত্যি হয় জাঁহাপনা তবে আপনার দিলমহলের বাঁদী হাস্‌তে হাস্‌তে গর্দ্দান দেবে—না জাঁহাপনা এ সত্যি নয় এ মিথ্যা।"

"ঠিক বল্‌চিস্ ?"

"আল্লার কসম জাঁহাপনা।"

বাদশা স্মিত হাস্যে মার্জ্জার-পরিত্যক্ত মুক্তোর মালাটা বাঁদীর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"বাঁদী তোর বখ্‌শিশ—কিন্তু খবরদার এমন ঠাট্টা আর করিসনে—কর্‌লে হাবশীর সঙ্গে তোর সাদী দেব।"

"জাঁহাপনার দিলকে রঙিন্ রাখবার জন্যেই এমন ঠাট্টা মাঝে মাঝে করি জনাব।"

বাদশা ব্যথাভরা কণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"বাঁদী তুই জানিস্ নে বয়স যত বাড়ে দিল তত পাকে—বাঁদী এখন তোর কাজে যা।"

বাঁদী নিষ্ক্রান্ত হল। যাবার সময় হাব্‌শীকে একটা মিঠে নজর বখ্‌শিশ দিতে ভুলল না।

বাঁদীর ঠোঁটের কোনে গোপন মৃদু হাসি আর চোখের কোনে রুদ্র প্রলয়ের বহ্নি-লেখা।

বাদশা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৌচে হেলে পড়লেন। কিন্তু সে স্বস্তির ভাব তাঁর বেশীক্ষণ রইল না, ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে একটা অসোয়াস্তি জেগে উঠল—ধীরে ধীরে তাঁর ললাটে চিন্তা রেখা অঙ্কিত হয়ে গেল—ঠোঁটদুটো কঠিন হ'য়ে উঠল—চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল—বাদশা সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লেন—তাঁর চোখ দুটো স্পষ্ট যেন ঘোষণা করতে লাগল—খুন—খুন—খুন। বাদশা কঠোর কণ্ঠে ডাকলেন—"বান্দা!"

পরদা সরিয়ে তৎক্ষণাৎ হাবশী এসে কুর্ণিশ করে' দাঁড়াল। বাদশা বললেন—"উজির।"

উজির এসে দাঁড়াতেই বাদশা বললেন—"উজির পরশু সন্ধ্যে-বেলা বাদশার কি মর্জ্জি?"

উজির বললেন—"জাঁহাপনা পরশু সন্ধ্যেবেলা তাস্‌কান্দের রাজদূতকে দাবাখেলার আমন্ত্রণ করেছেন বাদশা।"

বাদশা বললেন—"সে আমন্ত্রণ নাকচ উজির। আমার আর কোন হুকুম নেই।"

"জাঁহাপনার মর্জ্জিই আইন।"

উজির নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাদসা শূন্য কক্ষে পায়চারী করে' বেড়াতে লাগলেন—উদ্বিগ্ন, উন্মনা, উত্তেজিত।

(৩)

দুইজনে নির্ব্বাক নিস্পন্দ—কৌচে উপবিষ্ট জুলেখা আর কক্ষে প্রবেশ-দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান ওসমান। বিরাট বিস্ময় ওসমানের চোখে—একটা পরম আনন্দ কম্পন দুজনার বক্ষে—দুজনার মুখে একটী কথা নেই—কেবল পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ যেন পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রাস কর্‌তে চাচ্ছে।

দিল-মহলের ঝাউবীথি থেকে ময়ূর ডেকে উঠল—দুজনার চমক ভাঙল। জুলেখা যেন একটা পরম আকাঙ্ক্ষা কণ্ঠে নিয়ে বললে—"ওসমান!"

ওসমান ছুটে গিয়ে জুলেখার পায়ের কাছে গালিচার ওপরে বসে' পড়ল—যেন তার সমস্ত হৃদয়টা—সমস্ত আত্মাটা সেইখানে লুটিয়ে দিল। যেন তার সমস্ত অহঙ্কারকে জুলেখার পায়ের কাছে নত করে গদগদ কণ্ঠে বললে—"রুবেয়া—তুমি—তুমি—আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি। সেই বাগদাদে দেখা—তারপর আর এক-বার ইস্পাহানে তোমায় দেখি—তারপর তুমি কোথায় অদৃশ্য হ'লে। তারপর শুন্‌লেম তুমি কাইরোতে। কাইরোতে গিয়ে আমি তোমাকে তন্ন তন্ন করে' তিন বছর খুঁজেছি—তারপর হঠাৎ শুনি যে তুমি হিন্দুস্থানে, তাই আমিও হিন্দুস্থানে এসেছি। কিন্তু বাঁদী যখন জুলেখা-বানুর নাম করলে তখন ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নি এই আমার রুবেয়া।"

একটা পরম বেদনা কণ্ঠে নিয়ে রুবেয়া বল্‌লে—"হাঁ ওসমান আমি—আমি—রুবেয়া—আজ জুলেখাবানুর নামে। কিন্তু জুলেখা-বানুর ছদ্মনাম ছদ্মবেশ যে আজ আমার কাছে বিষ হ'য়ে উঠেছে—এ

ছদ্মবেশ ছদ্মনাম থেকে যে আমি মুক্তি চাই—ওসমান আমাকে উদ্ধার কর।”

ওসমান চকিত দৃষ্টিতে একবার কক্ষের চারিদিকে দেখে নিল, তারপর পরম আগ্রহ পরম ব্যাকুলতার স্বরে বল্‌লে—“এই ঐশ্বর্য্য,—এই সম্পদ—এই সুখ—”

“সুখ!” তীব্রকণ্ঠে রুবেয়া বলে’ উঠল—“সুখ কোথায় ওসমান? এই বন্দীশালে? আরবের মরুভূমিতে যার জন্ম—দিগন্তপ্রসারি আকাশ থেকে যে জন্ম হ’তে প্রাণবায়ু সংগ্রহ করেছে—যাবজ্জীবন যে মুক্ত মরুর বক্ষের উপরে ঘোড়া ছুটিয়ে খেলা করেছে তার সুখ এইখানে? তার উপর একটা হৃদয়হীন লম্পট বাদশার মুখের প্রণয়-সম্ভাষণ—না, না ওসমান আমার দেহ মন প্রাণ বিষে বিষে জর্জ্জরিত হয়েছে। এখানে হয় আমার মৃত্যু নয় এখান থেকে আমার মুক্তি চাই-ই চাই।”

আনন্দের আলোকে ওসমানের চোখদুটো উদ্ভাসিত হ’য়ে উঠল—ওসমান অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে যেন তাতে হৃদয়ের সমস্তখানি সোহাগ ঢেলে দিয়ে রুবেয়ার একখানি হাত আপন হাতে তুলে নিল—বল্‌লে—“রুবেয়া——

কাল-সর্পের প্রলয়-নিশ্বাসের মতো একটা নিশ্বাস সমস্ত কক্ষটাকে যেন একটা তড়িতের ধাক্কা দিয়ে সন্ত্রস্ত করে’ তুল্‌ল। চকিতে দু’জনে তাকিয়ে দেখলে—দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে বাদশা স্বয়ং।

বাদশার বদ্ধমুষ্ঠি কোষবদ্ধ ছুরিকার বাঁটে—চোখ দুটীতে তাঁর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র দৃষ্টি—বাদশার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ থর্ থর্ করে’ কাঁপছে—ক্রোধে সর্ব্ব মুখমণ্ডল তাঁর লাল হ’য়ে গেছে।

চকিতে ওসমান উঠে দাঁড়াল—কোষবদ্ধ ছুরিকা কোষমুক্ত করে' বাদশার দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—ঠোঁটের কোনে তার দারুণ ঘৃণার অবলেপ—চক্ষে তার স্থিত প্রতিজ্ঞের ঐকান্তিক দৃঢ়তা।

প্রাণপণ কষ্টে আপনাকে সংযত করে' কণ্ঠস্বরে যেন প্রলয় বিষ উদ্গারিত করে' বাদশা বললেন—"ওসমান-আলি জাহান্নামে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।"

ওসমান স্থির কণ্ঠে বললে—"হুশেন তোগলক আমি প্রস্তুত—তবে জাহান্নমে যাবার জন্যে নয়, সেখানে অন্যকে পাঠাবার পথ করে' দেবার জন্যে।"

"তবে আত্মরক্ষা কর্ বেইমান।"

বাদশা ছুরিকা নিষ্কাষিত করে' ওসমানকে আক্রমণ করলেন। চক্ষের পলকে ছুরিকা-যুদ্ধ-কুশল হুশেন শা তাঁর ছুরিকা আমূল ওসমানের বক্ষে বসিয়ে দিলেন—ওসমান কক্ষতলে লুটিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু—কণ্ঠ দিয়ে তার একটা শব্দ উচ্চারিত হবার অবসর পেলে না!

ওসমানের বক্ষ হতে ছুরিকা খসিয়ে নিয়ে বাদশা কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন—কক্ষ শূন্য। ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো শোণিত-সিক্ত ছুরিকা হাতে বাদশা কক্ষ থেকে বেরুলেন। পিয়ারী যেন সেইখানে অপেক্ষা করছিল—বাদশা বললেন—"বাঁদী শয়তানী বেইমানী জুলেখা কোথায়?"

নিঃশব্দে পিয়ারী একটা কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে বাদশা বেগে সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন—এক পদাঘাতে

দ্বার উন্মুক্ত করে' কক্ষে প্রবেশ কর্‌লেন—প্রবেশ করেই তাঁর চমক্ লাগল।

কে বল্‌লে আজ দিল-মহলে জীবন-মৃত্যুর খেলা চলছে—কে বললে আজ সেখানে হিংসা প্রতিহিংসার অভিনয় হচ্ছে—তবে এ রোসনাই কেন! এ উৎসব-সজ্জা কেন! এখানে কি প্রবেশ কর্‌বে ছুরিকা-হস্তে প্রতারিত প্রণয়-বঞ্চিত—না পারিজাত মালা হাতে আনন্দ-বিহ্বল প্রেমিক?

সহস্র আলোকে কক্ষ আলোকিত। বেলোয়ারী ঝাড়ের আতসী কাঁচে লক্ষ লক্ষ রশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে বহুলক্ষ হ'য়ে তা চারিদিকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে। রক্তের রঙের চুনি আশমানী রঙের নীলা কত রঙ বেরঙের হীরে জহরত পান্না মোতি কক্ষময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—তাতে আলো পড়ে হাজার রঙের হাজার রশ্মির তীর ছুটছে। যেন আলোর দেয়ালী লেগেছে—আলোর হাসি আলোর গান আলোর নাচ—আলোর সুর আলোর স্বপ্ন, আলোর কল্পনা—আলোকে আলোকে চতুর্দ্দিক আলোময়।

সেই আলোর মাঝে যেন চতুর্দ্দিক আরোও উজ্জ্বল করে' দণ্ডায়-মানা জুলেখা-বানু—সর্ব্বাঙ্গ একটা কাশ্মিরী শালে আবৃত—গর্ব্বোন্নত তার শির তড়িৎ-শিখা তার দৃষ্টি।

মুহূর্ত্তে যেন বাদশা আত্মবিস্মৃত হলেন। সম্মুখে পরম রমনীয় পরম কমনীয় পরম কাম্য রমণী—চতুর্দ্দিকে হাজার আলোকের রোসনাই—এ যে স্বর্গ সৃষ্টি করে বসে আছে। কিন্তু পরক্ষণে আপনাকে সংযত করে' বজ্র-কঠোর কণ্ঠে বললেন—"বেইমানী মরবার জন্যে প্রস্তুত হ'।"

কণ্ঠস্বরে সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে যেন জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে জুলেখা জিজ্ঞেস করল—"ওসমান কোথায় ?"

"জাহান্নামে—জাহান্নামে—এইবার তোর পালা।"

জুলেখার গর্ব্বোন্নত শির আরও উন্নত হ'ল—দৃপ্ত গ্রীবায় কি এক ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললে—"বাদশা! ওসমান আলির সঙ্গে জাহান্নামে বাস করা হুসেন তোগ্‌লকের সঙ্গে বেহেস্তে বাস করার চাইতে সুখের।"

জুলেখার কথায় ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল যেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—বজ্র-মুষ্টিতে ছুরিকা উত্তোলিত করে' দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করে' হুসেন শা বললেন—"তবে বেইমানী জাহান্নামেই যা।"

জুলেখার শরীর থেকে কাশ্মিরী শাল খসে পড়ল—সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত দেহে আপনার দুই বক্ষের মাঝখানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বললে—"হুশেন শা তোমার ছুরি এইখানে পড়ুক—এইখানে যেখানে জীবনে আমি প্রথম প্রণয়-চুম্বন পেয়েছি।"

বাদশার হাতের উত্তোলিত ছুরিকা আর নাম্‌ল না—যেন বাহুর মাংসপেশী সমূহ কাজ করতে অস্বীকার করল—বাদশার দুই চক্ষু নিবদ্ধ হ'ল সেই অসংখ্য দীপাবলী আলোকিত কক্ষে পরিপূর্ণ-যৌবনা বস্ত্র-লেশ-শূণ্যা মহিমাময়ী রমণীর প্রতি—বাদশা যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

বাদশার সমস্ত শরীর থর থর থর থর করে' কাঁপতে লাগল—বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'য়ে গেল—ছুরিকা হস্তচ্যুত হয়ে খসে পড়ল—হুশেন শা সেইখানে জুলেখা-বান্থর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন—অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে যেন জীবন ভিক্ষার মিনতি কণ্ঠে নিয়ে বললেন—"জুলেখা জুলেখা—হৃদয় তোমার যাকে খুসী তাকে দাও—কিন্তু আমাকে—

আমাকে—" বাদশার অর্দ্ধরুদ্ধ স্বর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল, আর কোন কথা ফুটল না।

সহস্র দীপালোক যেন ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে উঠল—জুলেখার গর্ব্বদৃপ্ত শির ধীরে ধীরে কাঁধের উপর নুয়ে পড়ল—লুণ্ঠিত বাদশার প্রতি চেয়ে যেন তার চোখ দুটো গভীর একটা বিষাদে ভ'রে উঠল................

যেন বুঝলে পশু পশুকে জয় করেছে।

১৩ই অক্টোবর
১৯২১ সাল

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গেল মাঘ।

—:*:—

গেল মাঘ, শীত হ'ল শেষ,
গাছপালা সবে খুসী, আমরা বিশেষ,
ছিল তারা উদাসীন, পরণ পিরাণহীন,
আমরা বস্ত্রের বোঝা বয়ে', সয়ে' ক্লেশ!
আজ তারা উড়াইবে ফুলের চাদর,
আবার ফিরিয়া পাবে পাতার আদর,
ছিল তারা মূক হ'য়ে কতকাল দুখ সয়ে',
এবার ঝাড়িবে বুলি কাঁপাইয়া দেশ!

গেলমাঘ পালাইল শীত,
মানসের তীর ছাড়ে মরাল অতিথ
মোদের মানসতীরে পুন গান আসে ফিরে,
স্মৃতির বেদনা যায়, বিরহ বিস্মৃত!
চড়া পঞ্চমেতে বাঁধা সে গানের সুর,
দয়েল, পাপিয়া, পিক যাহে ভরপূর!
সে গানের সহবৎ সাহানার নহবৎ,
কালপর, আজ প্রেমে পরাণ বিস্মিত!

শীত শেষ, মাঘ গেল চলে',
বলে গেল ভুলে রাখ সিন্দুকের তলে,
যত শাল জামিয়ার লোই পট্টু-ধুষা আর,
ঘিরে নাও তনুখানি মলয় আঁচলে,
চন্দন সুগন্ধে তারি আসিবে পরাণে,
যে দরদী গান কভু পশে নাই কানে!
ফুলে ফুলে যাবে ছেয়ে, বুঝিবে বারেক চেয়ে
গেরুয়া আগুণ, রাঙা অশোকের দলে!

গেল শীত, ফুরাইল মাঘ,
এইবারে ফুলদোল এইবারে ফাগ!
নিছক নিরাশা শাদা রং মেখে গাদা গাদা,
শিমুলের মত হবে পূরো রক্ত-রাগ!
ফল যার ফেটে যায় আপন আবেগে,
একেবারে ভরে উঠে, ওঠে যবে জেগে!
যার অতীতের ভয়, আশার আসান হয়,
ফুলের রঙীন নেশা, বীজের সোহাগ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ফাগুনের সাড়া।

—:•:—

বাতাসে এসেছে ফাগুনের সাড়া,
গাছে গাছে যত পাতা কথা কয়,
বনে প্রান্তরে তাই এত তাড়া,
কার বুকে আগে কত ফুল হয়।

রোদের হাসিটি মধুর মধুর!
হাসে যেন শিশু মার মুখ চেয়ে,
কানে গেছে তার কি গানের সুর,
দুধ গলে' পড়ে রাঙা ঠোঁট বেয়ে।

দুটি কচি দাঁত ভোলা মুখে তার,
কুঁড়ি যেন দুটি পাঁপড়ি খুলেছে,
কি অমিয়া ধারা হিয়ার মাঝার,
সুধা খেতে আজ তাই সে ভুলেছে।

নেবুফুল আর আমের মুকুল,
আগুন-লাগান অশোক পলাশ,
রঙীন নিশান ওড়ায় শিমুল,
হাসে তিতো নিমে ফুলের বিলাস

চুপি চুপি অই প্রবাসী মলয়,
পিছু হতে এসে জড়াইয়া ধরে,
সহসা কুসুমে সুরভি সঞ্চয়!
মাধবী-মধুতে বুক ওঠে ভরে'!

কোথা ছিল পিক এল কার ডাকে?
নাম ধরে কার ডাকিছে পাপিয়া?
ঘরের আগল আর কেবা রাখে?
পাগল পরাণ চলে বাহিরিয়া!

খুলে গেল কুঁড়ি, হাসে কিশলয়,
মরা-পাতা সব পড়িয়াছে ঝরে,
বন উতরোল এসেছে মলয়,
অতীত উতলা সে আশার ঝড়ে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৮।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ*

১৫শ পরিচ্ছেদ।

-:০:-

ভারত-সভ্যতার প্রধান নদীটী চারটী ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে—এক বৈদিক, দ্বিতীয় পৌরাণিক, তৃতীয় বৌদ্ধ এবং চতুর্থ জৈন। ভারতীয় চৈতন্যের উচ্চ শিখরেই ইহার গোমুখী অবস্থিত।

কোনও দেশের নদী যে শুধু সেই দেশের জন্যেই পুষ্ট হয় এমন নয়। তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র ভারতের ভাগীরথীরই উপনদী। সেইরূপ ভারতের সভ্যতার মধ্যেও অপর দেশের সভ্যতার দান আছে। মুসলমানরা বাহির থেকে বার বার ভারতে এসেছে। তাদের এই যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের দেশের অনেক ভাব ও চিন্তা এ দেশে এসেছে তার অনেক চিহ্নই আজও পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায়—স্থাপত্যবিদ্যায়—চিত্রবিদ্যায় এবং সাহিত্যের মধ্যে মুসলমানদের দানের বহুল পরিচয় আছে। যাঁরা মধ্যযুগের সাধু সন্ন্যাসীদের রচনা এবং জীবন চরিত পাঠ করেছেন—এবং মুসলমানদের শাসনকালে এ দেশে যে সব ধর্ম্মান্দোলন উত্থিত হয়েছিল যাঁরা তার খবর রাখেন তারা নিশ্চয় জানেন এই বিদেশী মুসলমানদের কাছে আমরা কি পরিমাণে ঋণী।

---

*রবীন্দ্রনাথের The centre of Indian culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

তারপর আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে মহাপ্লাবন এসেছে তা তীর ভেঙ্গে সীমা অতিক্রম করবার উপক্রম করছে—তার এই প্রচণ্ড গতি ও উচ্ছাসের মুখে বুঝি সব একাকার হয়। আজ যদি আমরা তাকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত করতে পারি তবেই নিষ্কৃতি—তা না হলে এ থেকে আমরা যা' পাব তার কোনই মূল্য থাকবে না।

অতএব আমাদের এই শিক্ষাকেন্দ্রে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, ইসলাম, জৈন, শিখ, ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্য—শিক্ষার ব্যবস্থা করে তারই এক পাশে ইউরোপীয় সভ্যতাকে স্থান দিতে হবে; কেবল মাত্র এই ভাবেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতাকে আয়ত্ত করতে পারব। নদী যখন তীরের অন্তর্গত হয়ে প্রবাহিত হয় তখন সে আমাদের বশে থাকে এবং কল্যাণসাধন করে; কিন্তু বন্যা যখন তীর অতিক্রম করে তখন তা আমাদের সর্ব্বনাশেরই হেতু হয়।

সে সব সাহিত্যে আমাদের পূর্ব্বপিতামহদের জ্ঞানের সম্পদ সঞ্চিত হয়ে আছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে আমাদের প্রচলিত ভাষাকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে স্থান দিতে হবে। এই প্রচলিত ভাষাতেই বর্ত্তমান ভারতের চিত্তের সজীব পরিচয় লাভ করব। এই প্রচলিত ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের লোক-সাহিত্যেরও আলোচনা করতে হবে—এই লোকসাহিত্য থেকেই আমরা দেশের মর্ম্ম বুঝতে পারব—দেশের অন্তরনিহিত জীবন প্রবাহ কোন দিকে চলেছে তাও এই থেকে বুঝব।

এমন অনেক মানুষ আছে যাদের আধুনিক কালের দ্বৈপায়ন বললে অত্যুক্তি হয় না। তাদের মতে অতীত একেবারে নাস্তোয়ান—তার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে আমরা কেবল

ঋণের দায় পেয়েছি—আর কোনও সংস্থানই সে আমাদের তরে রেখে যায় নি। যে সেনাদল সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে পশ্চাৎ থেকে যে তাদের রসদ যোগাতে পারা যায় একথা তারা অস্বীকার করে। একথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিলে ভাল হয় যে যখন মানুষ অতীতের খামারের মধ্যে সহসা ভাবের বীজ আবিষ্কার করে তখনই ইতিহাসে নব জীবনের অভ্যুত্থান হয়।

যে হতভাগ্য জাতি অতীতের ফসল থেকে বঞ্চিত হয়েছে বর্ত্তমানকেও তাদের হারাতে হয়। আমাদের বীজ পর্য্যন্ত ফুঁকে দিয়ে তারা শেষে দ্বারে দ্বারে জীবিকার তরে ভিক্ষা করে ফিরে। আমরা যে বিশ্বে এইরূপ পরিত্যক্ত জাত একথা যেন আমাদের কল্পনাতেও না স্থান পায়। এখন সেই সময় এসেছে যখন আমাদের পূর্ব্বপিতামহদের গুপ্তধনাগারের দুয়ার ভাঙতেই হবে এবং সেই ধন আমাদের জীবনের ব্যাপারে লাগাতেই হবে। এরই সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যতকে আয়ত্ত করতে পারব—তাহলে আর আমাদের পরের আস্তাকুঁড়ে ন্যাকড়া সংগ্রহ করে ফিরতে হবে না।

১৬শ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি শিক্ষার মানসিক দিকটারই আলোচনা করেছি। এই দিকটাই আমাদের কাছে পরিচিত। আমরা চন্দ্রের মত বিশ্ব-বৈদগ্ধ্য-সবিতার অভিমুখে আমাদের এই মানসিক দিক-

টাকেই উপস্থিত করি। আমাদের অন্যান্য দিকেও আলোকের প্রয়োজন আছে একথা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা ইউরোপের সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সহিতই পরিচিত। সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও তার ব্যাকরণ এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালার চতুঃসীমার মধ্যেই বদ্ধ। মানুষের জীবনে যে একটা রসের দিক আছে তাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করি, সে দিকটা পতিত থেকে যায় বলে সেখানে কেবল আগাছাই জন্মায়।

সঙ্গীত এবং ললিত কলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় একথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাত এ দুটী বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।

আমাদের চৈতন্য আমাদের জীবনের উপরিতলকেই অধিকার করে থাকে—এ ছাড়া আমাদের চিত্তের আর একটী চৈতন্যাতীত অবস্থা আছে—তা যেমনি অন্তরতম তেমনি গভীর। আমাদের অগোচরে সেইখানে অনন্তকালের জ্ঞান আপনিই সঞ্চিত হয়। আমাদের চৈতন্য কর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে—তার লীলা আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়; কিন্তু আমাদের সেই অন্তরতম আত্মা জ্ঞানের মধ্যে ব্যক্ত হয় না—তাকে ব্যক্ত করতে হলে কাব্য সঙ্গীত ইত্যাদি ললিত কলার আশ্রয় নিতে হয়—এদের মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তর্গত সম্পূর্ণ পুরুষটী অভিব্যক্ত হয়ে উঠে।

আমাদের খবরের কাগজগুলি রোজই বাচ্ছা পাড়ছে—আমাদের ঘরে ঘরে বক্তার আবির্ভাব হচ্ছে। আমরা আমাদের ইংরাজ গুরুমহাশয়ের কাছ থেকে যা' কিছু ধার করে পেয়েছি তা' এই সংবাদ পত্র চালিয়ে এবং বক্তৃতা করেই ফুঁকে দিই এবং আবেদনের

অশ্রুজলে আকাশ বাতাসকে নিরানন্দ ও আর্দ্র করে তুলি। কিন্তু আমাদের সেই শিল্পকলা কই, যা বসন্তের পুষ্পবিকাশের মত আমাদের অন্তর প্রকৃতি থেকে আপনিই ফুটে তার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যকে বিশ্বের মধ্যে ব্যক্ত করে তুল্‌বে? তবে কি আমরা এমনি অভিশপ্ত যে চিরকাল আমাদের হৃদয়ের বেদনাকে এমনি মৌনভাবে বহন করে যেতে হবে? এই বিশ্ব-সভ্যতার উৎসবের মধ্যে কি আমাদের এতটুকুও স্থান হবে না? আমরা কি ভিক্ষুকের মত এর বাহির মহলেই অপেক্ষা কর্‌ব—শেষ এক মুষ্টি অন্ন পেয়েই ফিরে যাব? এর খাসমহলে যেখানে বর্ণগন্ধগীত অজস্রতার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে কি আমরা প্রবেশাধিকার পাব না? আমরা চিরদিনই কি এই শিক্ষার কয়েদ খানায় থাক্‌ব—কেবলি কঠোর পরিশ্রম কর্‌ব—অথচ ত্নবেলা ত্নটি ভাব এবং লজ্জা নিবারণের তরে একখণ্ড কৌপীন ব্যতীত অপর কিছুই পাব না? আমরা কি জানি না যে জীবনের আনন্দ জীবনের শক্তিরই অন্যতম অংশ—বর্ণ—রেখা এবং ভাব জীবন্ত মানুষের হাতেই আত্ম প্রকাশ করে?

কাঠের ব্যবসায়ী মনে কর্‌তে পারেন যে বৃক্ষের পত্রপুষ্প অনর্থক অলঙ্কার মাত্র; কিন্তু এই মনে করে সে যদি পত্রপুষ্পের ধ্বংসের উদ্যোগ করে তাহলে একদিন সে দেখ্‌বে তার ব্যবসার সামগ্রী কাঠও অন্তর্হিত হয়েছে।

এ দেশের সঙ্গীত এবং ললিতকলা মোগল সম্রাটদের হাতে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করেছিল; তার কারণ তারা শুধু তাদের কার্য্যকালটুকু নয় সমগ্র জীবনটাই এখানে অতিবাহিত কর্‌তেন। মানুষের এই সমগ্রতা থেকেই কলার উৎপত্তি। যে সব পাখী ঋতুতে

ঋতুতে বাসা পরিবর্ত্তন করে আমাদের ইংরাজ শিক্ষকরা তাদেরই মত—এরা এখানে কিচ্‌মিচ্‌ করে মাত্র—এরা গান গাইতে পারে না এদের হৃদয়ই এখানে নেই—এযে তাদের নির্ব্বাসনের দেশ। ইউরোপই তাদের সঙ্গীত এবং শিল্পকলার স্বাভাবিক লীলানিকেতন। তারা সেখানে এতই বদ্ধমূল এবং গভীর যে তাদের সেখান থেকে হঠাতে হলে সেই দেশের মাটিটাকে পর্য্যন্ত হটিয়ে আন্‌তে হয়।

ইউরোপবাসিরা যেখানে শিক্ষিত, যেখানে প্রভু, যেখানে তারা রাষ্ট্রতন্ত্র এবং বানিজ্য সৃষ্টি করে আমরা কেবল তাদের সেখানেই দেখি; তারা যেখানে শিল্পকলার সৃজন করে—যেখানে তারা রসময় আমরা সেখানে তাদের সাক্ষাৎ পাই না। এই কারণেই ইউরোপের পূর্ণস্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় না; আমরা কেবল তার মানসিক শক্তি এবং সাধারণ হিতসাধনার প্রচেষ্টাকেই দেখি। অতএব সে কেবল আমাদের বুদ্ধি এবং সাধারণ হিতসাধনা-বৃত্তিকেই স্পর্শ করে ক্ষান্ত হয়।

শিক্ষার এইরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়্‌ছে। অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়া কোনও মতেই আর উচিত হবে না। আমরা এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনার প্রস্তাব কর্‌ছি সেখানে সঙ্গীত এবং ললিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সঙ্গীত এবং ললিত-কলার যে সব ভিন্ন ভিন্ন রীতি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাকে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে উদ্ধার করে এই খানে সংহত কর্‌তে হবে।

এইরূপে আমাদের রসবোধ এবং রুচির আদর্শ যথার্থরূপে গঠিত হয়ে উঠ্‌বে। তাহলেই আমাদের সঙ্গীত এবং শিল্পকলা সৌন্দর্য্যে

এবং সম্পদে বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে। তখন আমরা বিদেশীয় কলাকে সত্য ও সংযত ভাবে বিচার কর্‌বার ক্ষমতা লাভ কর্‌ব এবং তখন তা থেকে ভাব এবং রূপ গ্রহণ কর্‌লেও আমরা পরস্বাপহরণের অপবাদ ভাজন হব না।

১৭শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

এই প্রবন্ধের সূচনা থেকেই আমার মনে একটা গোপন উৎকণ্ঠা জেগে আছে। সেটী এই যে আমার এই প্রস্তাবকে যে কাজের লোকের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। যাঁরা কাজের লোক তাঁরা সম্পূর্ণতার চিত্রমাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন—তাঁরা নিশ্চয়ই একান্ত নির্ম্মম গাম্ভীর্য্যের সহিত এখনি বল্‌বেন "তুমি যা আলোচনা কর্‌ছ—তুমি যা' বল্‌ছ তা' সত্য এবং সুন্দর হতে পারে—কিন্তু ও সব কি কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব হবে?

আমি কাজের লোক নই; সুতরাং আমার উত্তর এই যে সত্য মাত্রেই সম্ভব। ছবির সহিত ক্যাম্বিসের যা সম্বন্ধ সত্যের সহিত সম্ভবপরতারও সেই সম্বন্ধ। সত্যের পশ্চাতে একে থাক্‌তেই হবে। যদি ভারত-শিক্ষার সম্বন্ধে আমার এই কল্পনায় এতটুকুও সত্য থাকে তবে তাকে একদিন না একদিন সার্থক হতেই হবে।

এইবার আর সব রেখে অর্থের কথাটা ভাব্‌তে হবে। এখন দেখ্‌তে হবে এমন কি ব্যবস্থা কর্‌লে এই শিক্ষালয়গুলি কালে

স্বাবলম্বনশীল হবে—কি করলে এরা ধনীর অনুগ্রহ এবং পৃষ্ঠ-পোষকতার উপর একান্তভাবে নির্ভর না করে নিজের নিজের সঞ্চিত ধনের কুসীদের উপর ব্যয়-নির্ব্বাহ করতে পারবে। ধনই হোক আর মানই হোক যখন আমরা তাদের চিরকালের তরে একবারে পাই—যখন তাদের অর্জ্জন অথবা উৎপাদন করবার তরে আমাদের আর পরিশ্রম করতে হয় না—আমরা যোগ্যই হই আর অযোগ্যই হই যখন তারা আমাদের হাত-ছাড়া হয় না তখন সেই সব অনায়াসলব্ধ সম্মান অথবা ধনের ভার আমাদের জীবনকে ক্রমান্বয়ে পঙ্গু করে ফেলে এবং আত্মার গতিরোধ করে দেয়—তখন আমরা উদ্ধত এবং বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ি। নদী তার গতিপথ পরিবর্ত্তিত করলেও তার ঘাটে ঘাটে মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী যেমন অবশিষ্ট থেকে যায় এই সব সঞ্চয়ও ঠিক সেই ভাবে পড়ে থাকে। সুতরাং আমাদের এই সব জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন ভাবে ব্যবস্থিত করতে হবে যাতে তারা চিরকালই নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন সকল মেটাবার যোগ্যতা লাভ করে—তাহলেই তারা ভবিষ্য যুগের সহিত সত্যকার যোগরক্ষা করতে পারবে—তখন তারা পরগাছার মত অতীতের বদান্যতার উপর নির্ভর করে থাকবে না।

অতএব এখন আমাদের দুটী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে প্রথম আমাদের চিত্তের দারিদ্র্য—দ্বিতীয় বস্তুর অভাব।

এই প্রথমটীর সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে যদি আমাদের মানসিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করতে হয় তাহলে আমাদের বৈদগ্ধ্যের সমূহ সম্বলকে একত্র করতেই হবে। আমরা ইংরাজি শিক্ষা হতে যা

পাই তা আমাদের চিত্তের খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়—তাতে খাদ্যের কয়েকটা উপকরণ আছে মাত্র—তাও তাজা নয়—বাসি এবং টীনে ভরা। যে খাদ্যে সকল উপকরণ বর্ত্তমান তাহাই প্রকৃত খাদ্য।

আমাদের ব্যক্তিগত শক্তি সমূহকে যখন সহযোগিতার মধ্য দিয়া আমরা সমবেত করতে পারব—তখন আমাদের বস্তুর সম্বলও একই সমবায়ে মিলিত হয়ে আমাদের বস্তুর অভাব ঘুচিয়ে দেবে। এইরূপ আর্থিক সহযোগিতার উপরেই আমাদের এই সব প্রতিষ্ঠান-গুলির ভিত্তিস্থাপনা করতে হবে। ইহা যে শুধু আমাদের শিক্ষা দান করবে তা' নয়—এ আমাদের মধ্যে সজীব হয়ে থাকবে—এযে শুধু চিন্তা করবে তা নয়—এ সৃষ্টি করবে। আমাদের তপোবন আমাদের দেশের স্বাভাবিক বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল সেই তপোবন, জীবন বর্জ্জিত ছিল না। সেখানে গুরু ও শিষ্য উভয়েই সম্পূর্ণভাবে বাস করত—তারা ফল এবং ইন্ধন আহরণ করত—তারা গোচারণে যেত—তাদের চারিদিকে যে একটা আধ্যাত্মিক সত্তা বিরাজ করত তাই থেকেই তারা তাঁদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করত। আমা-দের এই কেন্দ্রগুলি শুধু যে মানসিক অনুশীলনের কেন্দ্র হবে তা নয়—তারা আমাদের ব্যবহারিক জীবনেরও কেন্দ্র হবে। নিজেদের ভরণ পোষণের তরে এখানের অধিবাসীরা ভূমি কর্ষণ করবে, গো পালন করবে। এরা বিজ্ঞানের সাহায্যে নব নব যন্ত্র তন্ত্রের আবিষ্কার করে নিজেদের যাবতীয় অভাব মোচনের ব্যবস্থা করবে। এইরূপ যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত শিল্প-প্রচেষ্টার সফলতার উপরেই ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করবে। এইরূপে গুরু শিষ্যের মধ্যে একটা দায়িত্বের যোগ সূত্র গঠিত হয়ে উঠবে। এ

থেকে আমরা যে শিল্প শিক্ষা লাভ করব তার মধ্যে লাভের লালসার কলঙ্ক থাক্‌বে না।

এই বিদ্যালয় গুলি তাদের সন্নিহিত গ্রাম সকলকে একত্রিত করে নানারূপ ব্যবহারিক অনুষ্ঠানের সজীব যোগসূত্রে আপনাদিগের সহিত যুক্ত করে নেবে। গ্রামবাসিদের বাসস্থান নির্ম্মাণ, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা তাদের নৈতিক এবং মানসিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারেও তারা লিপ্ত হবে। এক কথায় এদের ধরিত্রীর মত সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন—আত্মপোষণ ক্ষম এবং স্বাধীন হতে হবে উল্কার মত গ্রহ বিশেষের বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশের মত হলে চল্‌বে না। চির নূতন জীবনের দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে এরা এদের প্রতিভার জ্যোতিকে দেশে দেশে কালে কালে ব্যাপ্ত করতে থাক্‌বে—এরা নিজেদের চতুর্দিক থেকে শক্তি এবং উপাদান আহরণ করে এমন একটি গ্রহমণ্ডলের সৃষ্টি করবে যার অন্তরে মানুষ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং মানসিক ব্যবহারিক এবং সামাজিক উন্নতির মধ্য দিয়ে অবশেষে আধ্যাত্মিক মুক্তির মধ্যে উত্তীর্ণ হবে।

১৮শ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

আমি আমাদের এই শিক্ষা কেন্দ্রকে বিশ্বভারতী নামে অভিহিত করতে চাই। এখনও একটা বিষয়ের আলোচনা করতে বাকি আছে। সেই আলোচ্য বিষয়টা এই যে এই বিশ্বভারতীতে

কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হবে। যাকে আমরা সাধারণতঃ জাতীয় শিক্ষা বলি তার আলোচনায় আমরা এই বিষয়টাকে এড়িয়ে চলে থাকি। আমরা জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়কে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই নামান্তর বলে বুঝি। অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করতে গেলেই হিন্দু ধর্ম্ম আমাদের মনে উদিত হয়। আমরা অখণ্ড ভারতের ধারণা করতে পারি না বলেই ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়েও আমরা তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখি।

সে যাই হোক একথা স্বীকার করতেই হবে যে জগতে বিচিত্র ধর্ম্মমত আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকবে। এ নিয়ে আক্ষেপ অথবা বিবাদ করলে চলবে না। আমার ঘরের কোণে আমার ছোট টেবেলটীতে যে সব কালী-কলম, কাগজ পত্র আছে তা আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যই—সেখানে আমি যা' ইচ্ছা করতে পারি। এখানে আমার বন্ধু বান্ধবদের স্থান দিতে না পারলেও আমার লজ্জিত হবার কারণ নাই। এই কোণটী খুব সঙ্কীর্ণ হতে পারে—এ' বদ্ধ এবং অপরিষ্কার হতে পারে—এর তরে আমার ডাক্তার বন্ধু আমাকে তিরস্কার করতে পারেন—আমার আত্মীয় স্বজন আপত্তি করতে পারেন এবং শত্রুপক্ষ উপহাস করতে পারেন—কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের আদৌ সাদৃশ্য নাই। আমার কথা হচ্ছে এই যে যদি আমার বাড়ীর মধ্যে সকল ঘরই আমার বিশেষ সুবিধার তরেই তৈয়ারী করা হয় যদি সেখানে বন্ধু বান্ধবদের অভ্যর্থনা করবার এবং অতিথিদের আসন দেবার যোগ্য স্থান না থাকে তাহলে আমি যে অপরাধী এবং এরূপ অবস্থা যে বড়ই লজ্জার বিষয় এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সেখানে

এই ক্ষুদ্র আমি টুকুর সংকুলান হতে পারে কিন্তু সেখানে বন্ধু সম্মিলনের মত বৃহৎ ব্যাপারের স্থান নাই।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে সকল দেশেই এবং সকল কালেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। পুরুষ পরম্পরাগত অভ্যাস-বশে এবং ব্যক্তিগত মেজাজ অনুযায়ী মানুষ বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক সত্যের অনুসরণ করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করে। যতক্ষণ তা ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তত ক্ষতিকর হয় না। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বিবাহ বিসম্বাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় না হলেও অনিবার্য্য। এখন আমাদের দেখ্‌তে হবে আমরা এমন কোনও মিলনক্ষেত্র তৈয়ারী কর্‌তে পারি কিনা যেখানে এই সব অনিবার্য্য সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ অতিক্রম করে ভেদাভেদ বিস্মৃত হয়ে পরিপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে সহজ ও সরল সম্বন্ধে মিলিত হতে পারে। ভারতের ধর্ম্মব্যবহার মধ্যে কি এমন কোনও ঠাঁই নাই যেখানে বিশ্বমানব সবাই দিনের আলো এবং মুক্ত বাতাস লাভ কর্‌তে পারে? সাম্প্রদায়িক গোঁড়ারা যে ভাবে শিরসঞ্চালন করে তা দেখ্‌লে হতাশ না হয়ে থাক্‌তে পারা যায় না—এবং সাম্প্রদায়িক মতামত নিয়ে ধর্ম্মের নামে দুনিয়ায় যে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে থাকে তা দেখ্‌লেও এইরূপ মিলনক্ষেত্রের সম্ভাবনার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও যখন আমি ভারতের সেই বিশুদ্ধ বৈদগ্ধ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি—যে যুগের ভারত সত্যের মধ্যে উন্নত হয়েছিল তখন সেখানে সেই বৈদগ্ধ্যের মধ্যেই যে এই মিলনক্ষেত্রের সম্ভাবনা নিহিত আছে এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌তে আমার সাহস হয়। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ তাদের সভ্যতার মধ্যে এমন একটা

উদার আসন বিছিয়েছিলেন যেখানে সমস্ত বিশ্বমানব এক মিত্রতার আসন গ্রহণ করত। সেখানে কলহ ছিল না। কেননা যিনি সকল বিরোধের মধ্যে শান্তিরক্ষা করে আছেন সেই শান্ত—যিনি সকল বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন সেই অদ্বিতীয় পুরুষের নামেই তারা বিশ্বের কাছে তাদের আহ্বানবাণী প্রেরণ করেছিলেন। এবং তারই নামে প্রাচীন ভারতে এই চিরন্তন সত্য-বাণীটী ঘোষিত হয়েছিল যথা:—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি সঃ পশ্যতি অর্থাৎ সকল ভূতকেই যিনি আত্মবৎ দেখেন তারই দেখা সত্য দেখা।

শ্রীঅমূল্যরতন প্রামানিক।

সমাপ্ত।

স্বর্ণ বনাম লৌহ

আমরা সাধারণতঃ আবশ্যক ও অনাবশ্যকের মধ্যে যে পার্থক্যের কসি টানি, সেটা প্রায় ঠিক জায়গায় পড়ে না। আমাদের মনের কোন বিশেষ ঝোঁকে এই কসিটা অনেক সময় বেঁকে চুরে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাই অনাবশ্যকের হিসাবে এমন সব জিনিষ বাতিল হয় যে গুলোকে ফেলে আবশ্যকের হিসাবটা সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়ার মত ঠিক না হোক, তবু যা' বেঁধে রাখি তা' লোহার চেয়ে বড় বেশী মূল্যবান নয়।

বাজারের ভাষায় মূল্য শব্দটা ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ শব্দটার যেন একটু অসুবিধা আছে। কারণ এই মূল্যের মানদণ্ড নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক উঠতে পারে। স্বর্ণকারের নিকষে লোহা অপেক্ষা সোনার দর যে ঢের বেশী, এ ত সকলেই জানে ও মানে। অতি বড় বোকা ব্যবসাদার বা বরকর্ত্তাও বিশ ভরি সোনার বদলে বিশ সের কেন, সময় বিশেষে বিশ মণ লোহা নিতেও গররাজি হবেন। কিন্তু তা হলেও ছেলেদের নীতি কবিতায় যখন আমরা স্বর্ণ ও লোহের বিবাদের বিষয় পড়ি, তখন কাকে যে উচ্চ আসনে দেব, এ নিয়ে সহসা যেন একটা মন্তব্য ঠিক করে উঠতে পারি নে।

যাই হোক, বর্ত্তমানে আমরা কিন্তু লোহাকেই বড় বেশী মাথায় তুলেছি। প্রতীচ্য যুগ নির্ণয়ে এটা নাকি হচ্ছে Iron age. সেই

জন্যেই কি লোহার কদর এত বেড়ে যাচ্ছে? আমাদের প্রাচ্য যুগাবতারের বর্ণনাতেও বলা হয়েছে—'কলয়সি করবালং'। এখানেও লৌহেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। অবতার হলেও কল্কিদেবের হাতে জয়দেব অবশ্য সোনার খাঁড়া দেন নি। তা যদি দিয়ে থাকেন, তবে এটাও তাঁর বর্ণনান্তরে কমলের দ্বারা ভৃঙ্গ দলনের মত একটু বেখাপ্পা হয়েই দাঁড়ায়। ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কল্কিদেব যদি লোহা ফেলে সোনার অসি ধারণ করেন, তবে জগতের লোক মৃদুহাস্যে আমাদেরই কবিতার ভাষায় বলতে পারে—'হেমময় কাটারি, কামে নাহি আওয়ল, উপরহি ঝকমকি সার'।

এই সব যুগ-লক্ষণের সঙ্গে লৌহের প্রভাবের সম্পর্ক বুঝি আর না বুঝি, অয়সের আধুনিক আদর বুঝতে আমাদের আর বড় বেশী আয়াস পেতে হয় না। কালা আদমির উপর পৃথিবীর নেক নজর না পড়ুক, কিন্তু এই কালো ধাতুটির প্রতি দেখছি, কম বেশী সকল জাতিরই মন আকৃষ্ট হয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে সাদার সঙ্গে কালোর গরমিল থাকলেও, এ ক্ষেত্রে সাদায় কালোয় একেবারে যেন হরিহর-আত্মা। ধরতে গেলে শ্বেতের দেশই এই ধাতুগত কৃষ্ণ পূজার প্রতিষ্ঠা ভূমি। লৌহ এখানে ছোট বড় নানা বিগ্রহ ধারণ করে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রায় সবটাই অধিকার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার চিন্তা ক্ষেত্র, এমন কি ধর্ম্ম ক্ষেত্রের উপরও চড়াও হতে ছাড়ে নি। জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে এটি বিভিন্ন রকমে দেখা দিলেও আসল কাঠামর বেলা এর সঙ্গে অন্য খাদ বড় কিছু মেশে না।

এখন পাশ্চাত্য সমাজ যন্ত্রের চালক ত Industrialism। এর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সবই যে লোহা দিয়েই গড়া। এ বিরাট কল

কারখানার রূপ ধরে প্রতি নিয়তই বিদ্যুৎগতিতে সমাজকে ঘোরাচ্ছে ও ছোটাচ্ছে। এর প্রবল তাড়নায় মানুষ যে দু-দণ্ড একটু সুস্থির হবে, তার জোটি নেই। সুস্থির হবে কি, এর ঘুর্ণায়মান চক্রে একটু শৈথিল্য ঘটলেই, চারিদিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে যে অমনি সমাজের কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়। উর্দ্ধশ্বাসে ছোটো, নয় পেছনের ধাক্কায় পথের ধুলায় লোটো, এই হল হাল সভ্যতার সার কথা বা motto।

সমাজের নীতি যেখানে এমন দুর্দ্দান্ত, সেখানে রাষ্ট্রের বেলা যে সেটি শান্ত হবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। বরং এই রাষ্ট্রনীতির লৌহময় দেহযন্ত্র যে আরও ভীষণ তাণ্ডবে মেতে উঠবে, এইটিই ত স্বাভাবিক। তাই এই নীতির বর্ত্তমান আত্মা Militarism এর সংস্পর্শে এর স্থূল শরীর—কামানের ধ্বংসলীলা—এমন প্রচণ্ড ভাব ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য এই নবীন militarism ও সেই প্রাচীন মহম্মদীয় খড়্গনীতি—অবশ্য এক জাতীয় নয়। কারণ সে প্রাচীন নীতির মন্ত্র ছিল "লা এলাহি এল্লেলা।" তার ভিতরকার তাড়না ছিল ধর্ম্মের উন্মাদনা। কিন্তু আধুনিক নীতির হুঙ্কার হচ্ছে "ময় ভুখা হুঁ।" লেলিহান রসনা মেলে এ নিয়তই শীকার খুঁজে ফিরছে, এর করাল গ্রাসের কাছে কারও নিস্তার নেই। হাজার খেলেও এর পেট ভরবার নয়, হাজার পেলেও এর আশা পুরিবার নয়। এর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার কিছুতেই তৃপ্তি নেই—হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের কেবলই বেড়ে উঠছে।

কলকারখানার প্রতিযোগিতার সংঘর্ষে ভিন্ন জাতির মধ্যে যে ত্রাসের ফুলকি ঠিকরে ওঠে, সেটিকে অবশ্য আর মৈত্রী বলা

চলে না। হাজার মোলায়েম বার্ণিস লাগালেও, এর আসল রূপ হিংসা ও বিদ্বেষ ছাড়া আর বড় কিছু নয়। তা হলেও, কেবল রূপকের ভাষাতেই এই সংঘর্ষজাত ভাবটিকে অগ্নির সহিত তুলনা করা যেতে পারে। অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বললেও, এটি বাহিরে প্রকাশ পেতে একটু লজ্জা বোধ করে। কিন্তু militarismএর আগুণ নকল রূপক ছেড়ে আসল রূপের মধ্যেই স্বপ্রকাশ। এর নিজের যেমন প্রকাশে কোন কুণ্ঠা নেই, এর স্পর্শেও তেমনই হাতে হাতেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। হিংসা অনল হলেও নিজেই পোড়ে, অপরকে পোড়াতে পারে না। কিন্তু কামানের গোলা নিজেও পোড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও ভস্মসাৎ করে।

পাশ্চাত্য মঙ্গলবাদীরা এই সব কঠোর নীতিকে একটু নাকি সংযত করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই সব লৌহ-ভীম চূর্ণ করবার মত কোন ধৃতরাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে কি? অনেকে মনে করেন এরা কারও শক্তিতে দমিত হবার নয়! এরা সময়ে নিজেরাই নিজের আগুণে পুড়ে তবে নিঃশেষ হবে। সুরোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল যদুবংশ যেরূপে ধ্বংশ হয়েছিল, militarismএর বংশও একদিন সেইরূপ লুপ্ত হবে। অবশ্য যদুবংশের তুলনায় এ বংশ হয়ত সহস্রগুণে বিপুল ও বলশালী, কিন্তু তেমনই এর উচ্ছৃঙ্খলতা আর মত্ততাও যে লক্ষগুণ প্রবল। বিগত যুদ্ধে এর এই আত্মবিনাশের নাকি নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু এই রক্তবীজের ঝাড় অবশ্য এখনও উজাড় হয় নি।

এই পথ ও পাথেয়ের সুবিধার দিনে কোন জিনিষই আর তার নিজের দেশেই আবদ্ধ থাকে না। জড় রাজ্যেরই হোক, আর

ভাবরাজ্যেরই হোক, প্রায় সব জিনিষই এখন আমদানি, রপ্তানির মুখে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছাড়িয়ে পড়ে। তাই যে সব নীতির বিষয় উল্লেখ করছিলাম, তাদের উদ্ভব শ্বেতের দেশে হলেও বাকি রংয়ের দেশগুলোকেও তারা তাদের রঙ্গভূমি করে তোলবার চেষ্টায় আছে। অনেক পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে পীতের দেশে নাকি এদের সকলেরই আদর খুব বেড়ে উঠেছে। তবে আবার অনেক খাঁটি পীতাঙ্গ এটা বড় স্বীকার করেন না। এঁরা বলেন য়ুরোপ যে জাপানকে militarism এর আড্ডা বলে প্রচার করে, সেটা নিতান্ত গাজুরি দোষারোপ। জাপানে বাস্তবিক militarismএর নাম গন্ধ নেই, যা আছে, সেটা হচ্ছে military preparedness আত্মরক্ষার জন্য পীতাঙ্গ এই প্রস্তুতির ভাবটিকে অক্ষুন্ন রাখতে বাধ্য।

যাই হোক, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের—বিশেষতঃ মানোয়ারী জাহাজের—খবর রাখবার আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই। Militarismই বল, আর military preparednessই বল, এ সব ঝঞ্ঝাট থেকে বিধাতা আমাদের বহুদিন ধরে মুক্ত রেখে দিয়েছেন। এ সব দুশ্চিন্তার ভার অপরের ঘাড়ে পড়ায় আমাদের নিবিড় নিদ্রাভোগের কোনই ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা নেই। তবে কামানরূপী militarismএর দোহাই পাড়বার মতিভ্রম আমাদের স্পর্শ করতে না পারলেও, মেসিনরূপী Industrialism এর হাত থেকে রেহাই পাবার মত আত্মসম্ভ্রম দেখাব, এতটা আশা আজকার দিনে করা যে যায় না। স্বীকার করি আমাদের কাছে সোনার সম্মান বিশেষরূপেই আছে। এ সম্মান কমা দূরে থাক্ আগের চেয়ে আরও যে বেশ চড়েছে, এমন কথাও নির্ব্বিরোধে বলতে পারা যায়।

নরনারীর যে সম্বন্ধটা সমাজের পত্তন ভূমি, সেটা এখন নির্ণীত হয় সুবর্ণের চুক্তিতে। এখন আমাদের কলেজি যুবার একগণ্ডে বিদ্যার ছাপ আর অপরগণ্ডে তার সুবর্ণ মূল্য কষে পারিনয়িক বাজারে লটকে দেওয়া হয়। শুনেছি আগে দুষ্কৃতকারীদের মুখেই এমনই করে চূণ-কালি মাখিয়ে প্রকাশ্য স্থানে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। উপমাটা তেমন বুঝি প্রীতিকর হল না। প্রীতিকর না হলেও একথা অসত্য বা অসঙ্গত নয়। বিদ্যার ছাপটা যখন সরস্বতীর হাতের মার্কা, তখন সেটা whitewash এর চেয়ে বড় বেশী অন্তর্মুখী না হলেও সাদা ত বটেই, কিন্তু তার পাশে ঐ অসুর তেজে শ্বশুরদলনের প্রবৃত্তিটাকে আলকাতরার পোঁচ বল্‌লে কি বেজায় কিছু বলা হয়? ফলকথা, আমাদের কুলমর্য্যাদা, গুরু পুরোহিত তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে যতই আমরা আধ্যাত্মিক গৌরবে ফুলে উঠি না কেন, এ ক্ষেত্রে স্বর্ণই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা নিয়ন্তা।

কিন্তু আমরা এই প্রসঙ্গে যে লোহার কথা তুলেছি, তার সঙ্গে ত এ সোনার কোন বিরোধ নেই। বরং এই সোনাকে লাভ করবার জন্যই যে লোহার এই প্রাণপণ উদ্যম। বিরাট মেসিনগুলি ঘুরে ঘুরে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'র নির্ব্বেদের মন্ত্র আওড়াচ্ছে কি? তারা বিপুল শক্তিতে জগতের স্বর্ণরাশি নিজের অধিকারে কেন্দ্রীভূত করবারই চেষ্টা করছে। কামানের গোলার মানুষের আত্মাকে পুরাতন জীর্ণ বাস ছাড়াচ্ছে বটে, কিন্তু তার নিজের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই অনেককেলে পুরাতন barbaric pearls and gold। তাই বলেছি এ দিক দিয়ে লোহার সঙ্গে সোনার কোন বিবাদ ত নেইই, বরং সোনাই হচ্ছে এখানে লোহার অভীপ্সিত লক্ষ্য।

তবে এ ছাড়া সোনার যে আর একটা দিক আছে। বাজারের হিসাবে সে দিক দিয়ে সোনার কিছুই গৌরব নেই। সেটা হচ্ছে অবশ্য সোনার মূল্যের দিক নয়, সৌন্দর্য্যের দিক। শুধু এ হিসাবে সোনা অনাবশ্যক অকেজো, সুতরাং অনেকের মতে হয়ত বস্তু-তন্ত্রতাহীন। সোনা যখন কোন কম্বুগ্রীবায় লম্বিত হয়, তখন সেটাতে দুই হিসাব জড়িয়ে থাকে বলেই তার এতটা কদর। এক হিসাবে সেটা সৌন্দর্য্যের পরিবর্দ্ধক ত বটেই কিন্তু অন্য হিসাবে সেটিকে বন্ধক রেখে ফুটো গেরস্থালিতে একটু তালি দেওয়াও চলে। এখানে সোনা হচ্ছে চাঁপা নয়, সজ্‌নের ফুল। ইচ্ছা করলে মালা করে পরা যায়, আবার ইচ্ছা করলে দিব্যি ভেজেও খাওয়া যায়। বিধাতা এই ফুলটির ভিতর দুইটি হিসাব রেখেছেন বলে বোধ হয় এর কোন দিকটাই তেমন খোলেনি, মালার হিসাবে এ নগণ্য, তরকারির হিসাবেও উচ্চ দরের নয়।

বলা বাহুল্য সোনার এই অকেজো দিকটাই হ'ল তার নিজস্ব, তার কেজো দিকটার প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষ। সৌন্দর্য্যই তার আসল ঐশ্বর্য্য, অন্য ঐশ্বর্য্য সে যা লাভ করেছে সেটা নির্ণীত হয়েছে বাজারের নিক্তিতে। পৃথিবীর কাজের লোকেরা তার এই নিক্তির কাঁটার পানেই এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অন্য দিকে এরা ভ্রূক্ষেপই করে না। তবু পৃথিবীতে এখন অকেজো লোকও অনেক রকমার, যারা এই অকেজো দিকটার মহিমা কীর্ত্তন করে থাকে। সোনা বোধ হয় জড়রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বলে, ভাব রাজ্যের সৌন্দর্য্যেরও প্রতীকরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই পরিগণিত। এই প্রতীকের ভাষায় সুন্দরের ব্যাখ্যান সব দেশের ধর্ম্ম, সাহিত্য দর্শনে দেখতে

পাওয়া যায়। তবে এখন অবশ্য নিদারুণ কেজো লৌহনীতির তাড়নায় সুন্দর অনেক জায়গায় খুবই যেন কোণঠাসা হয়ে পড়্‌ছে।

আমাদের দেশে এই অকেজো সৌন্দর্য্যের মহিমা বিশেষ ভাবেই কীর্ত্তিত হয়েছে। ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন কোন ক্ষেত্রেই ইহা অনাদৃত হয় নি। এই বর্ত্তমান খাঁটি লৌহযুগেও এখানে ঐ সোনার গৌরবের কথা এখনও শুনতে পাওয়া যায়, এখানকার শ্রেষ্ঠ কবি সৌন্দর্য্যের গান গেয়ে শুধু এ দেশকেই নয়, যে দেশের লৌহচক্রের আরাবে আর সব সুর ডুবে যাবার উপক্রম, সেখানকারই ভাবুক বিবুধমণ্ডলীকে এতটা মুগ্ধ করেছেন যে, তাঁরা কবিকে বিজয়টীকা না পরিয়ে থাক্‌তে পারেন নি। তাঁর স্থূল শরীরটা লোহার জাহাজে সমুদ্র যাত্রা করলেও তাঁর অন্তর রাজ্যে সোনার তরী সোনার ধানে পূর্ণ হয়ে চিরদিনই রইবে। আর তাঁর ক্ষেপাও যেখানে আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্রগলিত স্বর্ণ, পশ্চিম দিগ্‌বধূ দেখে সোনার স্বপন,' সেখানে যার গুণে সব জিনিষ সোনা হয়ে যায়, তারই সন্ধানে চিরদিনই ফিরবে। এমন অদ্বিতীয় কবির কথা ছেড়ে দিলেও এখানকার সাধারণ লোকের মধ্যেও এই স্বর্ণের সম্মান এখনও কিছু আছে বলেই মনে হয়। ভাবুক যাত্রাওয়ালাও তার যাত্রার সুরে সেদিনও গেয়েছিল—কবে পরশমণি করিয়ে স্পর্শন, এই লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন।

তা বলে লৌহযন্ত্রের গর্জ্জন এখানেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই গর্জ্জন যে দিন দিন বাড়্‌তে থাক্‌বে এও অবশ্যম্ভাবী। ভারতমাতার অজস্র স্নেহরসে অভিষিক্ত হয়ে পূর্ব্বে আমাদের সোনার স্বপন দেখবার খুবই সুযোগ ছিল। কিন্তু পুরাকালে হিমালয়কে বৎস পরিকল্পনা করে ধরিত্রীকে যেমন দোহন করা হয়েছিল, তার চেয়েও

প্রচণ্ড দোহন এখন এই ভারতভূমিকে সহ্য করতে হচ্ছে। রপ্তানির মোহানা দিয়ে এর সঞ্চিত রস চারিদিকে হুহু করে বেয়ে চলেছে। তার ফলে আমাদের অন্নচিন্তা যতই চমৎকার হয়ে উঠ্‌ছে, আমাদের অন্নচিন্তার বহরও সেই সঙ্গে কমে আসছে কি ?

আমাদের চিন্তাশীল দেশ হিতৈষীরা এই অন্ন সমস্যার সমাধান করতে দেশের মনকে পাশ্চাত্য লোহালক্কড়ের দিকে টানছেন। তাঁদের এ ব্যবস্থা দেশকে গ্রহণ করতেই হবে। বিদেশী হলেও কল কারখানাকে বরণ করে ঘরে না তুল্‌লে চল্‌বে না। এই লৌহ-যুগে কলকে বর্জ্জন করা অসম্ভব। শুধু মাটি কামড়ে পড়ে থাক্‌লে আর উদর পোরে কৈ ? পৃথিবীর বণ্টননামায় এই মাটির রস আমাদের ভাগ্যে যে ক্রমেই 'চটকস্য মাংসং' হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা ছাড়া আমাদের রুচিও ত আর আগের মত সাদাসিধে রকমের নেই আধুনিক বৈচিত্র নইলে আর যে মন ওঠে না। এইরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা কারণে আমরা হাজার রক্ষণশীল হলেও, বিদেশী লোহাকে আসন দিতে বাধ্য।

কিন্তু এই বাধ্যতা আসক্তিতে পরিণত হওয়া কি বাঞ্ছনীয় ? যদি আমরা লোহাকেই সর্ব্বস্ব করে তুলি, আমাদের ধ্যানে জ্ঞানে কেবল লোহাই যদি জেগে থাকে, তবে আমাদের মনোজগৎ খাঁটি রকমে লৌহাত্মকই হয়ে পড়বে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এতধরা কথা। কোন বিষয়ে তন্ময়তার গুণে যে আমরা সেই বিষয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাই, এ Psychology এ দেশের দর্শনে অবিদিত নেই। "অনুক্ষণ মাধব মাধব সোঁয়রিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই" শুধু দর্শনের কঠোর যুক্তিতে নয়, কবিত্বের এই মধুর

ভাষাতেও এ সত্য সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুন্দরী যদি মাধবের শ্যামরূপ ভাবতে ভাবতে নিজেই মাধব হয়ে থাকেন, তবে আমাদের মনটাও লৌহের একান্ত—ধ্যান ধারণায় কেনই বা লৌহশ্যাম হয়ে পড়বে না?

এখন যদি লৌহের এই সাযুয্য ও সারূপ্য আমাদের অভীপ্সিত না হয়, তবে আমাদের মনের মধ্যে অন্য বিষয়ের ইপ্সার ও স্থান রাখতে হবে। দেশের মধ্যে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ উন্নতি—অবশ্য এখন নিতান্তই প্রয়োজন, কিন্তু তা বলে কোন বৈজ্ঞানিক দেশ-হিতৈষীও বোধ হয় কোন বৈজ্ঞনিক প্রক্রিয়ায় এই সমগ্র দেশের চিত্তকে magnet বা অয়স্কান্তে পরি॰ত করতে চাইবেন না। আর লোহা ছাড়া অন্য বিয়য়ের চিন্তাও আশা করি বৈজ্ঞানিকের কাছে আমাদের মস্তিষ্কের অপব্যবহার বলে পরিগণিত হবে না।

চিন্তার অপব্যবহার এখানে খুবই ঘটেছে। ভাবের চর্চ্চা অনেক ক্ষেত্রে শেষে Sentimentalism এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যের স্থাপনা হয়ত শেষে ন্যায়ের কচকাচিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সে জন্য ত ভাব ও ন্যায় মনুষ্যত্বের উপাদান থেকে বাতিল পড়তে পারে না। অপব্যবহার কোন্ জিনিষেরই বা ঘটতে না পারে? অতি বার্দ্ধক্যে ভীমরতি বা চিত্ত বিকৃতি জন্মায়। আমাদের অনেক জিনিষ আদিকালের বুড়ো বলে হয়ত একটু বিকৃত হবারই কথা। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের বিকার এরই মধ্যে যে বেজায় বেড়ে গেল। মানুষের স্বাস্থ ও সুবিধার বিধানই ছিল রসায়ণের বৈজ্ঞানিক না হোক পার্থিব উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই রসায়ন এই তরুণ

বয়সে বিকারের ঘোরে সম্প্রতি কি ভয়ঙ্কর রকমই না বিষ ও বিস্ফোরক উদ্গীরণ করলে!

প্রবীণেরই হোক, আর নবীনেরই হোক, কারও বিকার অবশ্যই মঙ্গলপ্রদ নয়। প্রবীণের বিকার যদি ঘটে থাকে তবে তার সংশোধনের পথ দেখাই দরকার। বয়োবৃদ্ধ বলে তার দেহে Hypodermic syrynge বসাতে ইতস্ততঃ না করাই উচিত। কিন্তু সুস্থ অথচ বিকারপ্রবণ নবীনের বেলা অবশ্যই Prevention is better than cure। আমাদের সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দরের যুগে সৌন্দর্য্য বুদ্ধির যে বিকৃতি ঘটেছিল, বর্ত্তমানে সেটা সংশোধিত হয়েছে। যোগের তুরীয় ভাব যদি সাধু সন্ন্যাসীর তড়িতানন্দে পর্য্যবসিত হয়ে থাকে তবে সেটার নিরসন অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে বিপুল কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করতে আমরা কোমর বাঁধছি, তার ফলে আমাদের দেশের মনোজগৎকে কেবল নিভাজ ও নিরেট তড়িতানন্দেই যেন না পেয়ে বসে, সে বিষয়েও সাবধান হওয়া চাই নাকি? অবশ্য তড়িতের প্রবাহে আমাদের সুস্থ মনে নূতন উত্তেজনায় সৃষ্টি করবে আমাদের অচল বাহু নতুন বলে বলীয়ান্ হবে, আমাদের সংকীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। আমাদের জড়ভরত মৈনাক আবার হয়ত পাখা মেলে অনন্ত আকাশ চিরে ছুটবে। আমাদের প্রণত বিন্ধ্যগিরি আবার হয় ত দুর্দ্ধর্ষ বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। দেশের নদী নালা খাল বিল নানা আকারের পণ্য পোতে ঝঞ্ঝাতরঙ্গের মত চঞ্চল হয়ে পড়বে। দেশের দিকে আকাশ মেসিন ও কামানের ধোঁয়ায় একদিন হয়ত গাঢ় মসীময় মূর্ত্তি ধারণ করবে। চাকার গোঙানি, হুইসেলের কোঁপানি,

তার সঙ্গে হয়ত বারুদেরও গজরানি মিশে দেশের বাতাসটাকে তোলপাড় করে তুলবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও খিতোন জীবনটা বিচিত্র কর্ম্মের মন্থন দণ্ডে ঘোরালো হতে থাকবে।

তা হলে আবার সাবধানতার কথা কেন? যে বস্তুর স্পর্শে এমন সঞ্জীবনী শক্তি নিহিত, তার অভ্যর্থনায় আবার কোন রকম দ্বিধার অবসর কোথায়? অন্য যা কিছু সব সরিয়ে ফেলে কেবল এই বস্তুটিকেই আমাদের দেশে এখন প্রতিষ্ঠিত করা বিধেয়। কিন্তু গোলযোগ এইখানেই। এই নতুন আমদানিটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অবশ্যই কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এই সরিয়ে ফেলার কাজটা নিয়ে একটু কথা আছে বৈ কি। এটিকে স্থান দেবার জন্যে আমাদের সরিয়ে ফেলার মত কিছুই নেই, এমনটা বললে বড়ই গাজুরী দেখান হয়। তা হলেও এটির আসলের আয়তন এতটা বাড়তে দেওয়া কখনই উচিত নয়, যাতে আমরা আমাদের আর যা কিছু সবই বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হব। আমরা তড়িতের বাণে স্বস্তিতানন্দের তুরীয়তা নিশ্চয়ই নির্ব্বিরোধেও ঝাড়াতে ও তাড়াতে পাখি, কিন্তু সেই সঙ্গে চিরতাপস হিমালয়েরও যদি যোগ ভঙ্গ করতে চাই, তবে সেই বান ঠিকরে পড়ে আমাদের গৌরবময় স্বরূপও নিশ্চয়ই ধ্বংস করবে। চিরদিন মাথা হেঁট করে থেকে বিন্ধ্যাচলের যদি অবনতি ঘটে থাকে, সেটা নিরাকৃত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার প্রণতির ভিতর যে ভক্তির ভাবটুক বিদ্যমান আছে, সেটির নিরসন তড়িতের চঞ্চল ঔদ্ধত্যে নিশ্চয়ই পূর্ণ হবার নয়।

মোট কথা মানুষের জীবন শুধু লোহা দিয়ে গড়লে চলবে না, আবার শুধু সোনা দিয়ে মুড়লেও খাটবে না। স্থূলতঃ দেখতে

গেলে আমরা শুধু লোহার সাহায্যেই প্রাণ ধারণ করতে পারি। কিন্তু কেবল প্রাণ ধারণ করা অন্য জীবের লক্ষ্য হলেও, মানুষের ত তা নয়। মানুষ যদি এই লক্ষ্য ধরে থাকত, তবে সে অন্য জীব থেকে এমন একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারত না। অপর প্রাণীর উপযোগী সাধারণ প্রবৃত্তি ছাড়া মানুষের ভিতর অসাধারণ প্রকৃতি আছে বলেই, তার অনুশীলনে মানুষ তার এই বর্ত্তমান মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এই মনুষ্যত্বকে যদি তাকে রক্ষা ও বর্দ্ধন করতে হয়, তবে শুধু তাকে তার এই অন্নময় জীবনটার শোভা সম্পদের দিকে নজর দিলেই চলবে না, এর সঙ্গে তার অনন্দময় জীবনেরও ঔৎকর্য সাধন করতেই হবে। ফলে জীবনটাকে শুধু বিশ্বকর্ম্মার কামারশাল করে তুল্লে চলবে না, সেখানে সারস্বত-আশ্রমও চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই।

অবশ্য নৈমিষারণ্য বা উজ্জয়িনীর যুগ একেবারেই চলে গেছে। তাকে আবার টেনে আনা গঙ্গাকে গোমুখীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতই অসম্ভব। আমরা এই মোহ নয় লৌহমুদ্গর মুখর যুগের মধ্যে অতীতের শান্ত রসটিকে যদি পূর্ণরূপে স্থাপন করতে চাই, তবে সেটি শীঘ্রই হাপরের আগুনে ফুটে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু তা হলেও আমাদের অন্তরের নিভৃত কন্দরে সেই রসটির জন্য যথেষ্ট স্থান রাখতে হবে, নইলে মুগুর ও হাপরের পাল্লায় পড়ে আমাদের শ্রান্ত ও শুষ্ক হৃদয়ে পিপাসার যে অবধি থাকবে না। দেশটাকে নৈমিষারণ্য করা অসম্ভব বলে সেটাকে বার্লিন বা বারমিংহাম করে তুলতে হবে, এমন কি কথা আছে? এমনটা করলে যদি চতুর্ব্বর্গ ফল পাওয়া যেত, তা হলেও বা সেই চেষ্টার একটা সার্থকতা থাকত।

কিন্তু ঐ ফলের চারটে দূরে থাক, এই দারুণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তার নিকৃষ্ট—আর্দ্ধকটাও পাওয়া যখন দুষ্কর, তখন এই দেশটাকে সাত সমুদ্র তের নদী পারের মুল্লুকে রূপান্তরিত করতে যাওয়ায় ত কোনই ফয়দা নেই। তবে হয়ত অনেক কেজো অর্থ কামবাদী লোক ধর্ম্ম মোক্ষকে অকেজো বলে বাতিল করতে চাইবেন।

এঁদের মতে শুধু এ দুটো কেন, যে-সব জিনিষ মানুষের খাওয়া পরা ও সুখ সুবিধার কাজে লাগে না সে সবই অনাবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে এখন অনেক নামজাদা Realist আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা Moses বা Christ, Shakespeare বা Milton, Kant বা Hegel-এর কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান না। এঁরা সকলেই যে স্থূলবুদ্ধি ও সংকীর্ণচেতা তা অবশ্য নয়। এঁদের অনেকের হৃদয়ে প্রগাঢ় জন-হিতৈষণাও আছে। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়, এই যে দেশ ও জন নেতার প্রবৃত্তি এঁরা লাভ করেছেন কোথা হতে? যদি সৃষ্টির আদি থেকে শুধু কেজো জড়তত্ত্বেরই চর্চ্চা হতে থাকত, তবে মানুষের প্রতি মানুষের এই প্রীতি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি এমন করে উন্মেষিত ও উদ্বোধিত হত কি? প্রীতি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি আত্মতত্ত্বের অনুশীলন ছাড়া, (তা আত্মা জিনিষটা গোড়ায় যাই হোক না কেন,) জন্মাতে পারে বলে ত মনে হয় না। বিজ্ঞান যেমন জড়তত্ত্বের, ধর্ম্ম, সাহিত্য দর্শন তেমনই আত্মতত্ত্বের অনুশীলনেরই ফল। এ ফলটি বাদ দিলে মানুষের জীবন যে কতটা নিষ্ফল হয়ে পড়ত, সেটা এখন আমরা হয়ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নে। আমরা মুখে এই আত্মতত্ত্বের আবশ্যকতা মানি আর না মানি, এর অনুশীলনের ফলগুলি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে জড়িয়ে আছে

বলেই মানুষ প্রকৃত মানুষ। এই কলগুলির অভাবে মানুষের বর্ত্তমান মনুষ্যত্ব যে কত পরিমাণে খর্ব্ব হত তার ইয়ত্তাই হয় না। এখন এগুলিকে অকেজো বলে অনাদর করলে, মানুষ যে সিঁড়ি দিয়ে এতটা উঁচুতে উঠেছে, সেটাকে পায়ে ঠেলে দূরে ফেলা হয়।

অবশ্য আমরা এখানে কোন জাতি বিশেষের কথা বলছি না। সকল জাতির পক্ষেই এই লৌহ ও স্বর্ণের সামঞ্জস্য রক্ষা করা চাই। তবে এ সামঞ্জস্য অবশ্য সকলের পক্ষেই এক রকমের হবে না—সেরূপ সার্ব্বভৌমিক সামঞ্জস্য সময় এখনও ত আসে নি। এখন প্রত্যেক জাতি তার বিশেষত্বের দ্বারাই এই সামঞ্জস্য ঠিক করে নেবে।

অন্য দেশে এই সামঞ্জস্যের হানি ঘট্‌লেও, আমাদের মধ্যে কি এর সেরূপ কোন আধুনিক ব্যত্যয় দেখা দিয়েছে, যার জন্যে এত কথা পাড়্‌বার বিশেষ আবশ্যকতা আছে? সত্যই আমাদের শিক্ষা দিক্ষা সংস্কার কি লৌহময় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে? না হলেও হবার যে খুবই সম্ভাবনা। আর এর একটু আধটু নিদর্শনও যে দেখা যাচ্ছে না, তাও নয়। আমাদের দেহটা আমাদের দেশের রসে পুষ্ট হলেও আমাদের মানস-তরু শিকড় দিয়ে ততটা নয়, যতটা পাতা দিয়ে বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে। আর এই বাতাসটা যে বেশীর ভাগই পশ্চিমে এ বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। এখন এই পশ্চিমের বাতাসের সঙ্গে ভূমির নানা উপাদান উড়ে এসে এ দেশে জুড়ে বসেছে। সেখানকার ফুলের পরাগের সঙ্গে অনেক ধূলো মাটিও এসে জমছে, আর আমাদের দেশ এই আমদানির ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষেই বুক পেতে নিচ্ছে। বিদেশী হলেও ঐ পরাগের আদর

যদি এ দেশ করে থাকে, এমন কি দেশের চিন্তার কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের হাতে যদি এরূপ পরাগের সাহায্যে একটা hybridised রকমের সুন্দর ফলের উদ্ভব হয়ে থাকে, তার জন্যে কোন আক্ষেপ নেই। কারণ এ দেশের মস্তিষ্ক যে আধুনিক সভ্য দেশের মস্তিষ্কের তুলনায় কিছুতেই নিকৃষ্ট নয়, এইটিই প্রকাশ পেয়েছে। বিজ্ঞান আত্মসাৎ করবার এ দেশের যথেষ্ট শক্তি আছে বলেই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখানে আদৃত হয়েছে। সাহিত্য শিল্পকলায় এ দেশের বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই দেশের বিশেষজ্ঞেরা এমন ভাবে স্বদেশী ও বিদেশী মশলার মিশ্রণে দেশের বর্ত্তমান সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করতে পেরেছেন।

কিন্তু ধূলা ও ধোঁয়ার বেলা ? এর মধ্যে পড়ে যে অনেকেরই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে। কেউ ঐ পশ্চিমের ধূলোটাকে বোধ হয় শোভন পাউডার ভেবে আমাদের সমাজের মুখে লাগিয়ে তাকে সাদা করে তুলতে চাচ্ছেন। কেউ ঐ ধোঁয়ার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আভা দেখে সেইটাকেই আমাদের উদ্ধারের আলো বলে ঠিক করে বসছেন। কবিত্বের রিনিঝিনি, দর্শনের ঘটত্ব-পটত্ব, ধর্ম্মের নাকে কাঁদুনি এ সব অপ্রাকৃত ও অপদার্থ সখের জিনিষ শিকেয় তুলে রেখে সেরেফ প্রকৃত-পদার্থ-সাগরে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই, জোর গলার এমন মন্তব্যও বেশ শুনতে পাচ্ছি। এই সাগর মন্থন করেই আমরা অমৃত ও লক্ষ্মী লাভ করব, এই এঁদের ধারণা। যদি পৈতৃক প্রাণটাকে রক্ষা করতে চাও তবে আর সব ফেলে শুধু এই পদার্থামৃত পান করে, পদার্থলক্ষ্মীর ভজনা কর। জান ত Survival of the fittest, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, এই হল জগতের নীতি।

এখন fittest কে? না যে মেরে-ধরে কেড়ে-কুড়ে নিজের কোলের দিকে অপরের চেয়ে বেশী ঝোল সংগ্রহ করতে সমর্থ। কিন্তু স্বষ্টির আদিতে যদি এ নীতি চলে থাকে, মানুষ কি বরাবরই এ নাগাদ এই নীতির অনুসরণ করছে? পশুজগতে বাঘ-ভাল্লুক যে হিসাবে যোগ্যতম, মানুষের মধ্যে মানুষ চিরদিনই কি সেই হিসাবে যোগ্যতম? আঁচড়া আঁচড়ি, কামড়া কামড়ির দক্ষতাই কি মানুষেরও যোগ্যতমতার একমাত্র নিদর্শন? এর ভিতর কিছু সত্য থাকলেও, এটিকে কি মানুষের ষোলআনা সত্য বলা যায়? মানুষের ভিতর পশু যে আছে, একথা মানতেই হবে, কিন্তু পশুত্ব বর্দ্ধনের নয় দমনের আদর্শই, মানুষ যুগে যুগে প্রচার করে আসছে। আর এই প্রচারের সঙ্গে তার আচারকেও নিয়মিত করতে মানুষ কি কঠোর সাধনা করেনি? না সে সাধনায় মানুষ একেবারেই সিদ্ধ হয় নি?

লৌহ নীতির একান্ত প্রবর্ত্তনে মানুষের এই সাধনা ও সিদ্ধি ক্রমে যে একেবারেই বিলুপ্ত হবে, এ আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। যতদিন এই নীতির উপর মানুষের অভ্যস্ত সাধনার প্রভাব থাকবে, ততদিন মনুষ্যত্ব চার পা হঠেও এক পা এগোবে, কিন্তু যখন অনুশীলনের অভাবে ঐ প্রভাব একেবারে উঠে যাবে, তখনই হবে তার কামড়া কামড়ির পূর্ণ আদর্শের স্থাপনা। অর্থাৎ তখন মনুষ্যত্ব ও ব্যাঘ্রত্ব এ দুটো প্রায় Synonymous বা সমানার্থক হয়ে দাঁড়াবে। শিবিরাজা যে কপোতটির জন্য নিজের দেহ দান করেছিলেন, সেটা হবে নিছক বেহদ্দ 'বোকামি।' কিন্তু যে ব্যাঘ্রবাহাদুর ছলে বলে অপরের প্রাপ্যটা ষোলআনা নিজে দখল করে বসলেন, তাঁরই

প্রশংসার তুমুল হাততালিতে চারিদিক আমূল আলোকিত হয়ে উঠ্‌বে।

ভাল লৌহের প্রভাবকে সংযত রাখবার জন্যে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় কি স্বর্ণের উপাদান একেবারেই বাদ পড়েছে? বিদেশী হলেও এ শিক্ষায় কি আত্মতত্ত্বের চর্চ্চার কোনই ব্যবস্থা করা হয় নি? দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা বৈদশিক, সুতরাং তাতে আত্মার অশনের একান্তই অভাব এতটা বল্‌লে হয়ত সত্য প্রিয়তার অপেক্ষা স্বাদেশীকতার বেশী পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু খাদ্য থাকলেও আমাদের অন্তরের মধ্যে যে সেটা যথাযথ রকমে assimilated হচ্ছে না, এ কথা ত না মেনে থাকা যায় না। এই শিক্ষার প্রবর্ত্তনে আমরা যে দু দশজন মানুষের মত মানুষ পাচ্ছিনা, অবশ্য তা নয়। তবে এই দু দশজনকে দেখে শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হতে পারে না। কারণ এই দু দশজনের ভিতর এমন অসাধারণ প্রতিভা থাকতে পারে, যাতে তাঁদের আত্মা সমস্ত প্রতিকূল ব্যবস্থা ও অবস্থা অতিক্রম করে বিকশিত ও বিবর্দ্ধিত হতে সমর্থ। বিদেশী বলে দেশের রস ও মাটির সঙ্গে এর তেমন যোগ না থাকাতে এ শিক্ষার ফসল বড় সামান্য হয়ে দাড়াচ্ছে। তা ছাড়া অনেকে এর পদ্ধতিরও অনেক দোষত্রুটি বার করছেন। ফলে শত করা বিরানব্বই কি নিরানব্বই জন শিক্ষার্থীর বেলা এই নূতন বিদ্যাটা আত্মার পুষ্টিকর রসে পরিণত না হয়ে, কবির ভাষায় কাগজের পিণ্ডির মতই খস্‌খস্ গজ্ গজ্ করছে।

তাই বর্ত্তমান শিক্ষায় সোনার উপাদান থাকলেও, তাতে শিক্ষার্থীর অন্তরাত্মা একটুও স্বর্ণঘটিত হচ্ছে না, তার উপরে পড়ছে মাত্র একটা গিল্টির ছাপ। সুতরাং স্বর্ণ ও লৌহের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে

এখানে লোহের প্রাবল্য ঘটবার খুবই সম্ভাবনা, কারণ ও গিল্টির ছাপ একটু আগুণ ও জলের সংস্পর্শেই যে বিশীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে পড়্‌বে। আবার এর মধ্যে আরও একটু কথা আছে। যেটুকু সোনা এই গিল্টির কোটিংয়ে পাওয়া যায়, তারও যে গৌরব সৌন্দর্য্যের হিসাবে বড় একটা দেখা হয় না, চাকরির বাজার দরেই যে তার মূল্য নির্নীত হয়। কি উপায়ে শিক্ষাকে সুব্যবস্থিত করা যায়, কেমন করে এর দোষত্রুটির সংশোধন হয়, কোন্ আদর্শের অনুসরণে আমাদের শিক্ষার্থীদের চিত্তে এই শিক্ষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ জন্মাতে পারে, এ সব গভীর বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে হয়ত ছোট মুখে বড় কথা বলা হবে। তবে ছোট মুখে বড় কথা বলার অধিকার যখন এ যুগে বেশ প্রবল, এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন এ সম্বন্ধে দু দশটা মন্তব্য পেশ করাও না হয় যেত। কিন্তু শিক্ষার আদর্শের ব্যাখ্যান ত এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। যে লৌহঘটিত শিক্ষা দিন দিন আমাদের দেশে পসার জমাচ্ছে, চারিদিকের আবেষ্টনের পরিবর্ত্তনে ও প্রভাবে যেটির পসার আরও বিশেষরূপে জমা অবশ্যম্ভাবী, সেটি স্বর্ণঘটিত শিক্ষাকে একেবারে অভিভূত না করে ফেলে, এই টুকুই বল্‌তে চাইছি। আর এমন কথা পাড়াটাও বোধ হয় কল্পিত প্রতিপক্ষ ভেবে Quoxotic রকমে শূন্যের উপর লাটি মারাও নয়। কারণ আমরা বড়ই যে এক ঝোঁকে চলি। বিদেশের দিকে যখন ঝুঁকি, তখন স্বদেশে যে ভাল কিছু আছে, এটা আমাদের মনেই আসে না। আবার স্বদেশের দিকে যখন ঝুঁকি, তখন একেবারে ধ্রুব সিদ্ধান্ত করে ফেলি, যা নেই ভারতে তা নেই জগতে। প্রথম ঝোঁকের বশে আমাদের চোখে এ দেশের

অতীত ঠেকে একেবারে ধূ ধূ সাহারার মতই ফাঁকা, পাল্টা ঝোঁকে সেই অতীতকে সমগ্র জগতে ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমানের যা কিছু ছিল, আছে বা হতে পারে সমস্ত দিয়ে যেন নস্থান তিল ধারণের মত ভরাট করে তুলি। তাই মনে হয় লোহা যখন আমাদের শিক্ষার ঘাড়ে এসে চেপেছে এবং আরও চাপতে থাকবেই, তখন এই চাপুনির ঝোঁকে সোনাটিকে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে বড় অসম্ভব নয়।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাব অন্তর্মুখী না হয়ে বড় বেশী যে বহির্মুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর আর একটা নিদর্শন খুব বিশেষরূপই যেন আমাদের মধ্যে প্রকট। আসল বস্তুটি অপেক্ষা তার নামের উপর এই যে একটা বিকারগ্রস্ত বিদ্‌ঘুটে টান, এটাকে অবশ্যই শিক্ষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ বা পূর্ব্বরাগ কিছুই বলা যায় না। এ যেন মাথা ছেড়ে টেরি বা টিকিকেই সর্ব্বস্ব করে তোলা। টেরি বা টিকির উপর কারও অসঙ্গত বিরাগ থাকা অবশ্যই ঠিক নয়, বরং ওদের সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করতেও সকলেই পারেন। তবে কি না ওদের নীচে একটা সম্মান ও সম্বর্দ্ধনার যোগ্য মাথা ত থাকা চাই। পাঁকের উপর থাকলেও পদ্মের আদর কমে না বটে, কিন্তু পদ্মের এ আদর পাঁকের Symbol-এর হিসাবে ত নয়। মূল্য নিরূপণে Symbol-এর হিসাব ছাড়া আর কোন কথাই থাকতে পারে না, সেগুলি যদি Substance-এর প্রাপ্য সম্মান দাবি করে, তবে Substance ও Symbol দুইটাই যে খোলা হয়ে পড়ে। মাথার ঝুঁটি প্রাচ্যভাবে পেছন দিকেই ঝুলুক, প্রতীচ্যভাবে সমুখ দিকেই হেলুক, তার নিজের যা কিছু মূল্য সেটা ত মাথার মূল্যের দ্বারাই নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা না হয়ে ঐ ঝুঁটিটাই যদি বড়

বেশী কাম্য ও মূল্যবান হয়ে ওঠে, তাতে মাথার সম্মানের হানি ত ঘটেই, ঝুঁটিরও সম্মান, আসলে হয়ে দাঁড়ায় নিতান্তই ঝুটা। বর্ত্তমানে এই যে বস্তুর চেয়ে নামের, কায়ার চেয়ে ছায়ার, মাথার চেয়ে ঝুঁটির সম্বর্দ্ধনার মত আমাদের একান্ত উপাধিগত বাতিক, এটা নিশ্চয়ই শিক্ষার স্বাস্থ্যের নয়, ব্যাধিরই লক্ষণ।

সম্প্রতি এই বেয়াড়া বাতিকটা আমরা বুঝি একটু কমাতে শিখছি, কিন্তু এ শিক্ষাটা ঠিক একটা সুসঙ্গত মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ শেখাটা যেন কতক ঠেকে শেখা। ব্যবসা বানিজ্য বা ঐরূপ কোন ব্যাপারে ঠেকে শেখা অবশ্য মন্দ নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঠেকে শেখা কিংবা দেখে শেখা দুটোর কোন টাকেই তেমন উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না। কারণ এ দুটো অনেক সময় বেশ খাটলেও, Culture-এর বেলা এদের খাটানো কখনই সঙ্গত নয়। শেষোক্তর বেলা নিজের অনুভূতির দ্বারা বুঝে শেখাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ঝুঁটির দর কমেছে বলেই আমরা তার উপর কতকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। মাথা বা আসল Substance-এর প্রতি আমাদের সম্মানবুদ্ধি বর্দ্ধনের ফলে ঝুঁটি বা Symbolটির পসারের এই হ্রাসটুকু ত ঘটেনি। তবে কি আমরা যথার্থ Culture সম্বন্ধে কিছুই জানি না, না বলি না? জানি না এ কথা অবশ্য ঠিক নয়, তবে কি না, জেনেও মানি না। আর এর সম্বন্ধে আমরা বলেও থাকি অনেক, কিন্তু সেটাও অনেকটা আওড়ানো বুলির মত। কারণ এই বুলির সঙ্গে আমাদের কাজের মিল খুবই কম থাকে। Symbol এর সম্মান কমলেও Substance সম্বন্ধে মুখে যাই বলিনা কেন, কাজে Symbol-কেই মাথায় করে রাখি। মোট কথা এ দিক

দিয়ে, আমরা যে স্বর্ণঘটিত শিক্ষার কথা বলছিলাম, তার প্রতি আমাদের যথার্থ অনুরাগ ত প্রকাশ পায়ই না, বরং ঔদাসীন্যই লক্ষিত হয়।

যাই হোক, মানব সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ রাখতে হলে, এই স্বর্ণ ও লৌহ—দুইয়েরই দাবি আমাদের গ্রাহ্য করা চাই। শুধু মতে বা আদর্শে নয়, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে। জাতীয় জীবনে এই দুই রকম শিক্ষা ওতপ্রোত ভাবেই মিশে থাকা দরকার। প্রত্যেক ব্যক্তিও যাতে ঐ দুইরূপ শিক্ষা কিছু না কিছু লাভ করে, এইটিই সামাজিক সুব্যবস্থা। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঐ দুইরূপ শিক্ষার মধ্যে সমান ভাবে গড়ে উঠবে, এমন আশা করা প্রায় বিড়ম্বনা। একাধারে সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মার বরপুত্র কেউ হতে পারে না। মস্তিষ্ক ও মুগুরের চালনায় সমান দক্ষতা লাভ করা, শুধু অনেকেরই নয়, সকলের পক্ষেই অসম্ভব। এমন সাধক বোধহয় কোথাও মিলবে না, যিনি সাধনার বলে ব্রাহ্মণত্ব ও বৈশ্যত্ব দুইই পুরোদস্তুর লাভ করতে সমর্থ।

সমগ্র পৃথিবীটাকে জাতি হিসাবে ভাগ করে অনেকেই ভারত-বর্ষকে ব্রাহ্মণের কোটায় ফেলে থাকেন। স্বদেশী কি বিদেশী কোন অভিজ্ঞ লোকই তার এই গৌরবের দাবি অস্বীকার করবেন না। কিন্তু এই পুরানো গৌরবের জের বজায় রাখতে হলে, বর্ত্তমানেও তার সেই ব্রাহ্মণত্ব কিছু বজায় রাখা চাই নাকি? জানি তার পক্ষে সেই অনায়াস বা অল্প আয়াস লভ্য অসন বসনে দৈনিক—ব্যাপার সম্পন্ন করে এখন আর আগের মত একান্ত অসম্ভব। এখন তপোবনের যজ্ঞাগ্নির চেয়ে গৃহের জঠরাগ্নির আহুতি জোগাতেই

যেন দেশটা বিষম বিব্রত। এখন হোমের ধোঁয়ায় ব্যোমের দেবতার তৃপ্তি সাধন রেখে নিজের উদর তৃপ্তির জন্য উনুনের ধোঁয়া জাগায়ে রাখাই হয়েছে দেশের একটা জটিল সমস্যা। কিন্তু তবুও তার এই সসীম দেহ ও উনুনের ভাবনার মধ্যেও ঐ অসীম মন ও ব্যোমের দিকেও তাকে নজর দিতে হবে, নইলে তার ব্রাহ্মণত্ব শুধু অতীতের বড়াইয়ের কড়াইভাজা চিবিয়ে কখনই বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ঠ থাক্‌বে না।

জাতীয়ত্বের সংরক্ষণেই হোক, আর ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণেই হোক, ব্রাহ্মণ-স্বর্ণ-শিক্ষা ও বৈশ্য-লৌহশিক্ষার মিলন দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষেই একান্ত প্রয়োজন। এই দুই শিক্ষার মিলন ও সামঞ্জস্যের উপরেই যে মনুষত্ব নির্ভর করে, এটা খুব একটা তর্ক বা সন্দেহের বিষয় বলেই মনে হয় না। কি ধ্যানস্থ দার্শনিক, কি একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, উভয়েই এটা বেশ স্বচ্ছন্দেই মেনে নিতে পারেন। এই দুইটা শিক্ষার মধ্যে কোনটা বেশী দরকারী, সে তুলনার কোন দরকার নেই। তবে এ দুটির মধ্যে যেটির সঙ্গে আমাদের উদরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেটিতে অবশ্য কর্ম্মেরই প্রাধান্য। বলা বাহুল্য কর্ম্ম শব্দটা এখানে দার্শনিক নয়, সাধারণ সামাজিক অর্থেই ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজ যখন সুশৃঙ্খল থাকে, তখন অবশ্য সকলকেই এই কর্ম্মগত শিক্ষার জন্যে চেষ্টা পেতে হয় না, অনেকে শুধু জ্ঞানগত শিক্ষা লাভ করবার একান্ত ভাবেই অবসর পায়। তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলায় যখন জীবিকা-বিভ্রাট ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে, তখন শেষোক্ত শ্রেণীর লোকগুলিকে খানিকটা পাততাড়ি গুটিয়ে অন্ন সমস্যার সমাধানেও লাগতে হয়। তখন

সমাজের ব্রাহ্মণত্ব কমে গিয়ে বৈশ্যত্ব বাড়তে থাকে। কিন্তু কি অনুকূল কি প্রতিকূল অবস্থায়, সমাজে স্বর্ণঘটিত ব্রাহ্মণ-শিক্ষার একটা বিশিষ্ট স্থান রাখতেই হবে, নইলে কর্ম্মের চাপে জ্ঞান বেচারী চিড়ে চেপটা হয়ে অসাড় ভাবেই পড়ে থাকবে।

দুইটি শিক্ষার শ্রেষ্ঠতাগত তুলনা না করেও এটা বেশ বলতে পারা যায় যে, সমাজের কোন অবস্থায় vocational training বা কর্ম্মগত শিক্ষা অনেকের পক্ষে তেমন প্রয়োজনীয় না হলেও, সব সময়ে সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই cultural training বা জ্ঞানার্জ্জনী শিক্ষার একটা সুব্যবস্থা থাকাই উচিত। কারণ প্রবৃত্তি বা অবস্থার তাড়নায় সমাজে কর্ম্মের চাঞ্চল্য অতিরিক্ত রকম বাড়লেও, ভাব ও জ্ঞান সেটিকে সঙ্গত ভাবে চালিত করে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে। তখন এই চাঞ্চল্য উদ্দাম উন্মাদনায়, ন্যায় ও ধর্ম্ম দলিত করে, দিক বিদিকে ছোটে না। ব্যক্তিগত জীবনে, ধর্ম্মের প্রভাব সে ত আরও উঁচু কথা, শুধু এই culture-ই অনেকেরই অনেক মঙ্গল সাধন করতে সমর্থ। নিজের কর্ম্মগত গণ্ডীর অবরোধের মধ্যে যে একটা আবদ্ধ সংকীর্ণতা জন্মায়, culture-এর খোলা হাওয়ায় সেটা অনেকাংশে অপসারিত হয়ে থাকে। সাফল্যের গর্ব্বকে সংযত, ব্যর্থতার অবসাদকে লঘু, অবসরের আমোদকে অনাবিল, উত্তেজনার আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে এর প্রভাব ত নিতান্ত কম নয়। সম্পদে ও বিপদে সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতগুলো Culture যে বেশ শোভন ও সঙ্কটময় ভুলতে পারে, এ কে না স্বীকার করবে? আমাদের

এমন বন্ধুটিকে কি কর্ম্মী কি ধর্ম্মী, কি জ্ঞানী

কি গুণী সকলেরই যে বিশেষ আদর করা কর্ত্তব্য, এতে আর সন্দেহ কি।

তাই যাঁরা জ্ঞানপ্রধান স্বর্ণ শিক্ষার অনুসরণ করছেন, শুধু তাঁদেরই এটি দরকার তা ত নয়, যাঁরা কর্ম্ম-প্রধান লৌহ শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করেছেন, তাঁদেরও এর কিছু না কিছু চর্চ্চা রাখা চাই কিন্তু এই শেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পক্ষে Culture-এর যৎকিঞ্চিৎ চর্চ্চটুকু যদি নিতান্ত অনুগ্রহের ভাবেই ব্যবস্থিত হয়, তবে সে অনুগ্রহটা বেনামি নিগ্রহ থেকে বড় বেশী বিভিন্ন হবে না। অর্থাৎ মুগুর ও বাটালিতে হাত জোড়া আছে বলে যদি Culture এর দুই একখানা পাতা অবহেলায় পায়ে চেপে তার দিকে কখন একটু কৃপাকটাক্ষ মাত্র ফেলা হয়, তবে সেরূপ চর্চ্চার প্রবর্ত্তন অপেক্ষা নিবর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। শুধু এটি কেন, সব রকম চর্চ্চাই প্রকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া কেবল যে বাঞ্ছনীয়তা নয়, একান্তই প্রয়োজনীয়। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং—এ সারবান বচনটি কখন obsolete বা রদ্দীবাতীল হবার নয়।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

সিদ্ধি

—:*:—

১

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না এই তার পণ। তাই কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েচে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরণার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখীতে এসে ঠুকরে খেয়ে যায়।

আরো কিছু দিন গেল। তখন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কি? আমার সেবা যে বৃথা হতে চল্‌ল।"

তারপর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে' যায়, তপস্বী জান্‌তেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে' ধরে' ছায়া করে' দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোন ভয়ের কারণ নেই তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হ'লে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ?"

কাঠকুড়নি বল্‌ত, "আমার ভালই কি আর মন্দই কি? কিন্তু তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই? তোমার মা? তোমার বোন?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কি? তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার্‌বে?"

কাঠকুড়নি বল্‌ত, "প্রাণ থাকে না বলেই ত প্রাণের জন্যে এত দরদ।"

তাপস বল্‌ত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর কর্‌ব।"

এই বলে' সে কত কি বলে যেত, তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে?

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নব মেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরো কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্তার লক্ষযোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাইবা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে, মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তাহলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এদিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্ত্যকে লঙ্ঘন করে স্বর্গ পেতে চায়—এত বড় স্পর্দ্ধা!

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বল্‌লেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল, মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে?"

মেনকাকে মহেন্দ্র বল্‌লেন, "যাও তপস্যা ভঙ্গ করগে।"

মেনকা বল্‌লেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্ত্ত্যের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতেও স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই?"

ইন্দ্র বল্‌লেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হওয়ার দোলা লাগ্‌তেই মর্ম্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দন বনের হাওয়া এসে লাগ্‌ল। আর তার দেহ মন একটা কোন্

উৎসুক মাধুর্য্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। তার মনের ভাবনাগুলি চাক-ছাড়া মৌমাছির মত উড়তে লাগ্‌ল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েচে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হ'ল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জ্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভ ফুলে রং-করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়চে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা-কেবল রেখায় টানা ছিল—চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রং লাগিয়েচে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বল্‌লে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন প্রভু?"

তপস্বী বল্‌লে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্য।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বল্‌লে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে?"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেকক্ষণ ভাবল, আর কিছু বল্‌ল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের একধার থেকে আর একধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল।

সে ভাব্‌লে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘট্‌বে?"

সে রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠ্‌ল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষ গাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কি ভাব্‌লে কি জানি!

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বল্‌লে, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

মেয়েটি বল্‌লে, "আমি বহুদূর দেশে যাব।"

তপস্বী বল্‌লে, যাও, "তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বল্‌লেন "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেচ।"

তপস্বী বল্‌লে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?"

তপস্বী বল্‌লে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বসন্তের বাণী।

—:*:—

শ্রীমান্ চিরকিশোর,

কল্যাণীয়েষু—

তুমি আমাকে বসন্তঋতুর উপর এমন একটি প্রবন্ধ রচনা কর্‌তে অনুরোধ করেছ, যার ভিতর পলিটিক্‌সের নামগন্ধও থাক্‌বে না।

ফরমায়েসটি শুনে আমি সেকেণ্ড খানেকের জন্য অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম। ঋতু বিশেষের সঙ্গে রাজনীতির যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বা থাক্‌তে পারে এ ধারণা আমার ইতিপূর্ব্বে ছিল না। তার পর হুঁস হল যে তুমি ভেবে চিন্তেই আমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছ। এ বিশ্ব যেমন কবির কাছে নারীময়, বৈদান্তিকের কাছে ব্রহ্মময়, আজকাল আমাদের কাছেও তেম্‌নি পলিটিক্‌স-ময় হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে আমাদের পলিটিকাল আত্মা এতটা উত্তেজিত, উদ্বেজিত, উদ্বেলিত ও উদ্ভ্রান্ত হয়েছে যে, এ বিশ্বে যা কিছু আছে বা হচ্চে, তার মধ্যে পলিটিক্‌সের বিশ্বরূপ দেখা আমাদের পক্ষে মোটেই বিচিত্র নয়।

প্রকৃতির সাক্ষাৎকার-মাত্র লাভ করেই আমরা সন্তুষ্ট হই নে; উপরন্তু তার কথাও শুন্‌তে চাই। দার্শনিক প্রকৃতির মুখে শুন্‌তে পান তত্ত্বকথা, আর্টিষ্ট্ রূপের বারতা, কবি প্রেমের সঙ্গীত। প্রকৃতি যখন দার্শনিকের কাছে একখানি বিরাট ন্যায়সূত্র, কবির

কাছে মহাকাব্য, তখন পলিটিসিয়ানদের কাছে তা' যে হবে একখানি স্বরাট সংবাদপত্র তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তবে আমি যত বেয়াড়া পলিটিসিয়ানই হই নে কেন, প্রকৃতিকে ভগবানের লেখা সংবাদপত্র বলে স্বপ্নেও ভুল করি নি। ও রকম পর্ব্বত-প্রমাণ ভুল করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ এ বিশ্বাস আমার চিরকালই আছে—যে প্রকৃতির ভালমন্দ সকল কথাই সত্য* আর সংবাদপত্রের ছোট বড় প্রায় সকল কথাই মিথ্যে। অতএব তুমি সতর্ক করে না দিলেও ফাল্গুনের বুকের ভিতর থেকে সিডিসান্ কিম্বা রাজভক্তি, এ দুয়ের কোনটিই সম্ভবত আমি টেনে বার কর্‌তে পার্‌তুম না।

(২)

আমি বলেছি যে প্রকৃতির ভাল মন্দ সকল কথাই সত্য; উপরন্তু ঋতুমাত্রেরই একটি বিশেষ বাণী আছে, অতএব বসন্তেরও কিছু বল্‌বার আছে। তবে সভ্য মানব নিজের কথা বল্‌তেই এত ব্যস্ত যে প্রকৃতির কথা শোন্‌বার তার আর অবসর নেই। আর যার অবসর আছে তার সে প্রবৃত্তি নেই; কেন না, আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের আর কিছু শোন্‌বার কিম্বা শেখবার নেই। যার দিকে আমরা চেয়েই দেখি নে তার আবার কথা শুনব! প্রকৃতির দিকে যে আমরা দৃক্‌পাত করিনে, তার প্রমাণ বসন্তের বর্ণনা এ যুগে আমরা কর্‌তে পারিনে। আমাদের হাতের বর্ণনা হয় পূর্ব্বকবিদের বর্ণনার অনুকরণ, নয় অনুরণন। কলম হাতে কর্‌তেই আমরা ভুলে যাই, বাঙ্‌লা-বসন্ত সংস্কৃত-বসন্তের অনুবাদও নয় অপভ্রংশও নয়। বাঙ্‌লার আর পাঁচটি নিজস্ব জিনিষের মত

বাঙলার বসন্ত ঋতুও যুগপৎ মৃদু ও ক্ষীণপ্রাণ। এ ভূভাগে বসন্ত কবে যে শীতের কাছ থেকে পৃথক হয়, আর কবে যে তা গ্রীষ্মের সঙ্গে মিলিত হয় সে দুই তারিখ কেউ বল্‌তে পার্‌বেন না। সে তারিখ যাঁরা নির্ণয় করেন তাঁরা, অর্থাৎ জ্যোতিষীরা আকাশের বিষয় সব জান্‌তে পারেন কিন্তু পৃথিবীর বিষয় কিছুই জানেন না। আকাশের তারা পঞ্জিকার শাসন মান্‌তে পারে কিন্তু মাটীর ফুল তা মানে না। এর কারণ জড় পদার্থ বাইরের নিয়মের অধীন, জীব কিন্তু একমাত্র স্বভাবের অধীন। তারপর, বাঙ্‌লা-বসন্তের পরমায়ুও অতি স্বল্প। একবার দেখা দিতে না দিতেই তা অন্তর্ধান হয়। বাঙ্‌লার বসন্ত, শীত ও গ্রীষ্মের ভিতর রঙিন কালির একটা 'হাইফেন' মাত্র। অপর পক্ষে সংস্কৃত যুগে বসন্ত ঋতু আর্য্যাবর্ত্তের বুকের ভিতর দিয়ে মন্দাকিনীর মত বয়ে যেত, তার এক কূল থাক্‌ত বরফের শ্বেত পাথর দিয়ে মোড়া আর এক কূল থাক্‌তো আকাশের অগ্নিবৃষ্টি দিয়ে পোড়া। আর সেই সুরসরিতে অবগাহন করে সে যুগের লোকে নবজীবন লাভ কর্‌ত। বসন্তের স্বরূপ তখন লোকের কাছে এতই প্রত্যক্ষ ছিল যে তারা অনায়াসে তার রূপবর্ণনা কর্‌তে পার্‌ত। এ যুগে বসন্ত, অন্ততঃ এ দেশে, প্রকৃতিবাদ অভিধানে আছে, প্রকৃতিতে নেই। এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য যে বাঙ্‌লা বসন্তের বর্ণনা করা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব যাঁর চোখে যা অতি সূক্ষ্ম তা'ও ধরা পড়ে আর যাঁর অন্তরে প্রবেশ লাভ করে' ক্ষণপ্রভাও চিরপ্রভা হয়। বলা বাহুল্য ইন্দ্রিয় মনের এতাদৃশ শক্তি কৌটিকের গোণ্ডকের দেহে কালে ভদ্রে ভর করে। অতএব আমি যদি বসন্তের বর্ণনা কর্‌তে বসি, তাহলে সে বর্ণনা প্রথমত বই থেকে চুরি করতে হবে, তারপর

নানারূপ ধারকরা সাধুভাষার অত্যুক্তি দিয়ে সে চোরাই মালের গায়ে রঙ্ ফলাতে হবে।

বসন্তের দর্শন যে আমি পাইনে শুধু তাই নয়, তার স্পর্শনও আমার তেমন মেলে না। আজকের দিনের উত্তাপ কত, তা বল্‌তে হলে আমাকে খবরের কাগজের কাছে সন্ধান নিতে হয়। থার্ম্মমিটারের কৃপায় প্রকৃতির গায়ে হাত দিয়ে তার তরুণ জ্বরের মাত্রা আমাদের আর জান্‌তে হয় না; ফলে, তা জানবার শক্তিও আমরা হারিয়েছি। বিজ্ঞানের হাতে পড়ে যন্ত্র যেমন মানুষ হয়ে উঠেছে, মানুষও তেম্‌নি যন্ত্র হয়ে পড়্‌ছে। এমন কি অনেকের মতে প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে জড়যন্ত্র হওয়াটাই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বসন্তের দর্শন হচ্চে এ বিজ্ঞানের খণ্ডন।

(৩)

বসন্ত ঋতুর বর্ণনা যখন আমি কর্‌তে পারি নে, তখন তার ব্যাখ্যা কর্‌বার চেষ্টা করা যাক্। শীতের সমালোচনা কর্‌লেই বসন্তের আত্মার আমরা সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌ব।

শীতের সর্ব্বাঙ্গে মৃত্যুর সকল লক্ষণই পাওয়া যায়। রক্ত তার জল, নাড়ী তার দড়ী, দেহ তার কাঠ। শিশির-ঋতু কিছুই অর্জ্জন কর্‌তে পারে না, তাই শুধু বর্জ্জনই করে। এ ঋতুতে গাছ যে মাথায় ফুল পরে না, কিন্তু তার গায়ের পাতা খসিয়ে ফেলে, তার কারণ, শীত-গ্রস্থ গাছ তার শিকড়ের নল দিয়ে পেট ভরে পৃথিবীর রস পান কর্‌তে পারে না, আর তার পাতার জিভ্ দিয়ে সানন্দে আকাশের আলো লেহন কর্‌তে পারে না। আর কায়ঃক্লেশে যেটুকু রস ও তেজ সে শোষণ ও চোষণ কর্‌তে পারে, সে টুকুও সে হয় যোটেই

জীর্ণ কর্‌তে পারে না, নয় একদম্ হজম করে বসে; ফলে উক্ত রস সে রক্তে, উক্ত তেজ সে বর্ণে রূপান্তরিত কর্‌তে পারে না।

শীতের চেহারায় একটা শান্ত ও সমাহিত ভাব আছে—কিন্তু সে শুধু স্থূলদর্শীর কাছে। সে-শান্তি তার নির্জ্জীবতার বাহ্যলক্ষণ, আর সে আত্মগত, ভাষান্তরে জড়-সড় ভাব, তার জড়তার নিদর্শন। আত্মগত হওয়ার অর্থ যদি হয় বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া, তা হ'লে ও অবস্থার যথার্থ নাম হচ্চে মৃত্যু। বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকার নামই জীবন আর তা থেকে মুক্ত হবার নামই মৃত্যু।

বসন্তের ধর্ম্ম কিন্তু ঠিক্ এর বিপরীত। শীতের ধর্ম্ম হচ্ছে প্রাণকে জড়তার দিকে টেনে নামানো, আর বসন্তের ধর্ম্ম হচ্ছে জড়ের ভিতর থেকে প্রাণকে ফুটিয়ে তোলা। বসন্ত যে নবজীবনের যুগ, এ সত্য সকল দেশ সকল মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ ছিল। এই ঋতু তাই উৎসবের ঋতু, উপবাসের নয়। নবজীবনের একটা লক্ষণ হচ্চে তার বাইরের সঙ্গে, বহুর সঙ্গে মিলিত হবার কামনা। বসন্তে তাই আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর, আলোর সঙ্গে বাতাসের, বর্ণের সঙ্গে গন্ধের, সলিলের সঙ্গে শব্দের এমন বিচিত্র, এমন অপূর্ব্ব মিলন ঘটে। বসন্তের উৎসব হচ্চে প্রকৃতির বিবাহ-উৎসব, কেননা, নবজীবনের সৃষ্টি করাই তার আসল কাজ। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বসন্তের চরিত্রের নিন্দা সেই কর্‌তে পারে, যে একান্ত জড়বুদ্ধি। বসন্ত হচ্চে পত্র-পুষ্পে মণ্ডিত বহুবর্ণে বিচিত্র, মধুগন্ধে ভরপূর; তাই লোকে বলে—সে বিলাসী। অপর পক্ষে শীত হচ্ছে মুণ্ডিত-মস্তক নিরাভরণ বল্কলধারী ঋতু, তাই লোকে বলে সে উদাসী। কিন্তু এ বিলাস হচ্ছে প্রাণের বিলাস, আর ও ঔদাস্য

অ-প্রাণের অসাড়তা। এতক্ষণে তবে বলি বসন্তের কথার অর্থ আমি এই বুঝি, যে মানুষ অখিলের সঙ্গে সম্বন্ধ যত ত্যাগ করবে, তত সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হবে, অপরপক্ষে সে অখিলের সঙ্গে যত বেশী সম্বন্ধ পাতাবে, আর সে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট করে তুলবে—তত সে প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌বে। তবে যিনি প্রাণের তোয়াক্কা রাখেন না, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। আত্মহত্যা করবার অধিকারও ভগবান মানুষকে দিয়েছেন।

এতক্ষণ যা লিখ্‌লুম তার হয়ত কোনও মানে মোদ্দা নেই। যদি তা না থাকে'ত তার জন্যে দোষী লেখক নন। আজকের দিনে পলিটিক্‌স বাদ দিয়ে, যাই লেখা যাক্ না কেন, তার ভিতর অধিকাংশ পাঠক কোনও অর্থ খুঁজে পাবেন না। যে যুগে পলিটিক্‌স হচ্চে একমাত্র কাজের কথা, সে যুগে তদতিরিক্ত সকল কথাই অবশ্য বাজে কথা। কিন্তু কেউ যেন ভুলে না যান যে একমাত্র আমাদের পেটের হিসেব থেকে দেখলে, এ বিশ্বের বেশীর ভাগই বাজের কোঠায় পড়ে যায়। বসন্তে যে এত বেশী ফুল ফোটে, তা আমাদের কোন্ কাজে লাগে, এক শিমুলের ফুল ছাড়া? আর শিমুলের গাছেই বা ফুল ফোটার সার্থকতা কি? তার লাল ঘেরাটোপ বাদ দিয়ে একেবারে সাদা তুলো ফোটালেই ত অবিলম্বে আমরা তা চরকাস্থ করতে পারতুম। সকল গাছই যদি ডুমুরের গাছ হত, অর্থাৎ তারা যদি ফুল না ফুটিয়ে একেবারেই ফল ফলাত তা'হলে আমরা যে হাতে হাতে ফল লাভ করতুম তার আর সন্দেহ কি? ফুল ডিঙিয়ে ফল খাবার অদম্য প্রবৃত্তি যিনি আমাদের মনে দিয়েছেন, ফুল এড়িয়ে ফল গড়বার শক্তি তিনি প্রকৃতিকে দেন নি। এ অবশ্য নিতান্ত দুঃখের

বিষয়। কিন্তু এ অবিচারের জন্য দোষী স্বয়ং ভগবান। আর জানই ত এ অবিচারের কোন প্রতিকার নেই। ভগবানের বিরুদ্ধে আপিল চলে এক মানুষের কাছে। আর আমাদের মধ্যে যিনি যত বড় জজই হোন্ না কেন, তিনি সৃষ্টির বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি তা execute কর্‌বে না। সৃষ্টির বিরুদ্ধে আমরা অবশ্য হয় বিদ্রোহ করতে পারি, নয় তার সঙ্গে non-co-operation করতে পারি; কিন্তু তাতেও কোন সুসার নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে বিদ্রোহের ফল মৃত্যু আর non-co-operation এর ফল জরা।

অতএব দাঁড়াল এই যে বসন্তের বাণী শিরোধার্য্য করাতেই আমাদের পুরুষার্থ। ফুলের ভাষা যাঁরা বোঝেন, তাঁরা বসন্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ জ্ঞান অনায়াসে অর্জ্জন করতে পারেন যে প্রাণের সুরে মন বাঁধাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আর সে সুর হচ্চে আনন্দের সুর। এ আনন্দ-ধ্বনি শুধু তাঁরই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে না—যিনি তাঁর অন্তর ভরে রেখেছেন শুধু অভাবের বেদনা দিয়ে। অথচ এ কথাটা সকলেরই মনে রাখা শ্রেয়ঃ, যে এ বিশ্বকে মানুষ যখন তার অভাবের দিক্ দিয়ে দেখে, তখন সে হয়ে পড়ে তার দাস,—আর যখন মানুষ এ বিশ্বকে তার স্বভাবের দিক্ দিয়ে দেখে, তখন সে হয়ে ওঠে তার রাজা।

আর একটি কথা বলে এ চিঠি শেষ কর্‌ব। তুমি যখন আমাকে পলিটিক্‌স বাদ দিয়ে বসন্ত ব্যাখ্যান করতে বলো, তখন তুমি ঘুরিয়ে এই কথাটাই বলো, যে পলিটিক্‌সের আধ্যাত্মিকতা আমি বুঝি নে, অতএব আমার পক্ষে বসন্তের ঋতুর মত একটা পার্থিব ব্যাপারের আধিভৌতিক আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য আমি পালন

নারী বল্‌লে—আমার কামনা থেকে—আমার মৃত্যু থেকে।

নারীর পাশে এসে উদয় হল এক ক্ষুদ্র শিশু।

শিশুর কৌতুহল-বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে—হ্যাঁ এইবার পেয়েছি, এইবার বুঝেছি।

কিন্তু ক্ষ্যাপা কিছুই পায় নি, কিছুই বোঝে নি—যেমনকার রহস্য তেম্‌নি রয়ে গেছে। ধীরে ধীরে শিশু বালক হল, কিশোর হল, যুবক হল, যৌবন কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পড়্‌ল। ক্ষ্যাপা দেখ্‌লে রহস্য কিছুমাত্র স্পষ্ট হয় নি।

ক্ষ্যাপা মৃত্যু-শয্যায়। বিধাতা পুরুষ এসে বল্‌লেন—অনুসন্ধানী রহস্যের কিনারা পেলে?

ক্ষ্যাপা কষ্টে শেষ নিশ্বাস টেনে বল্‌লে—রহস্যের কিনারা কে চায়? আমি আজ মর্‌ছি কারণ রহস্যের নেশা আমার চোখ থেকে কে অপসারিত করে নিয়েছে। আর আমার চল্‌বার পথ নেই, চল্‌বার প্রয়োজন নেই।

২২শে মার্চ্চ
১৯২২।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"গীতাঞ্জলি ও সত্য-কবিতা"

(আলোচনা)

—:০:—

উপরোক্ত প্রবন্ধ লেখকের সঙ্গে আমার যে অমিল সেটা কেবল মতামতের পার্থক্যে নয়, সাহিত্য জিনিষটাকে উনি যে ভাবে দেখেন আমি মোটেই সে ভাবে দেখি না,—এ বিষয়ে প্রকৃতিগত রুচিভেদ রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তর্কবিতর্কে কোনো বিশেষ ফল হবে বলে আশা করি না। আমি সাহিত্যকে নিজের অনুভূতি, নিজের আনন্দের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকি। এই অনুভূতি এই আনন্দই আমার কাছে সত্য, পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকদের মতামত, তাদের রুচিবিচারের নিয়মাবলী, কাব্যকে রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করা সম্বন্ধে তাদের বিচিত্র বিধিবিধান······ এ সমস্তই আমার কাছে পরের কথা, এবং অনেকটা কম মূল্যবান। মুখে যা-ই বলুন না কেন, আমার বিশ্বাস আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞ বিচক্ষণ সমালোচক সম্প্রদায়ের মত এই প্রবন্ধ রচয়িতার মনও পুঁথিগত বিদ্যার সারে ও ভারে ভরাট হয়ে উঠেছে, নিজের স্বতন্ত্র ভাল লাগার বা মন্দ লাগার হাওয়া যে সহজে বয়ে যাবে সে পথ উনি খোলা রাখতে সাহস পান নি—দরকারও বোধ করেন নি। পশ্চিম দেশের লোকের বিচার শক্তির উপর এঁদের এতটা অন্ধ বিশ্বাস যে অজ্ঞাতকুলশীল যে কোনো বিদেশীয় লেখকের রচনা থেকে

খানিকটা উদ্ধৃত করে দিতে পারলেই এঁদের মন কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করে; প্রবন্ধের গোড়াতেই লেখক আড়ম্বর সহকারে এবং নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে Miss Sturgeon নামে কোনো এক ইংরেজ লেখিকার যে কয়েকটি অতিগম্ভীর পাণ্ডিত্য পূর্ণ মন্তব্য তুলে দিয়েছেন তাতেই এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে; তা ছাড়া, প্রবন্ধটা আগাগোড়াই নানা পাশ্চাত্যদেশীয় সমালোচকের, অতি পুরাতন যুক্তিতর্কের ছায়াচিত্রে এবং নিঃশব্দ পদ সঞ্চারণে পরিপূর্ণ। "New Ways in Literature" বইটা আমি পড়ি নি, কিন্তু উদ্ধৃত বাক্যগুলি পড়ে যে সেটা পড়বার জন্যে অধীর হয়ে একেবারে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছি তাও নয়, কারণ অপাঠ্য ভাষায় সাহিত্যের অতি প্রচলিত কয়েকটা সাধারণ বাঁধি-গৎ পুনর্ব্বার আওড়াতে হলে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যে অচেতন মনোভাব এবং আত্মবিস্মৃত ঔদাসীন্য প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন হয় তা দুর্লভ হলেও আধুনিক মাসিকপত্রের প্রসাদে সে-বিষয়ে আমাদের আর আক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই, তা ছাড়া, বিলিতী বইয়ের নাম যতই হোক তার দামও যে অনেক বেশী। আসল কথা, যতদিন না আমরা বিদেশী সমালোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারব, ওদের দেশের সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের অনুকরণে কাব্যকে অংশ প্রত্যংশে বিচ্ছিন্ন করে চুল-চেরা সমালোচনার দাঁড়ি-পাল্লায় চাপিয়ে তার রস ও বস্তুর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার লোভ না কাটিয়ে উঠতে পারব, নিজের স্বতন্ত্র রুচির উপর ভরসা করে নির্ভয়ে দাঁড়াতে না শিখব, ততদিন আমাদের দেশের সমালোচনা কেবল আবর্জ্জনাই সৃষ্টি করবে, প্রাণ-সামগ্রী নয়।

কিন্তু এ গেল বাহিরের কথা। প্রবন্ধ-লেখকের দুএকটি মন্তব্য নিয়েও অল্প কিছু বল্‌বার ইচ্ছে আছে। যদি গোলাপ ফুল দেখে কেউ বলে আমার এ ভাল লাগেনা, খানিকটা রং আর গন্ধের অর্থহীন সংমিশ্রন দেখে খুসি হয়ে ওঠা আমার কাছে নিতান্ত মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় বলেই মনে হয়——তাহলে অবশ্য তার উপর আর কথা বলতে যাওয়া নিষ্ফল, কারণ যেখানে প্রভেদের হেতু এত গভীর-প্রতিষ্ঠিত সেখানে তর্কবিতর্ক করা কেবল শক্তির অপব্যয় মাত্র, এবং তা ছাড়া ভাল লাগা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করবার অধিকার সকলেরই আছে। পৃথিবীতে ত কত রকম লোকই জন্মগ্রহণ করে, কেউ রং-কানা, কেউ সঙ্গীত সম্বন্ধে উদাসীন, কারুর বা বই পড়বার চেয়ে ঘোড়ায় চড়বার সখ বেশী……তা নিয়ে অনর্থক বিব্রত হয়ে লাভ কি? কথা কয়ে কি তাদের বদলানো যায়? বেশী বাড়াবাড়ি করলে মনে মনে হাসা চলে এই পর্য্যন্ত! কিন্তু ছাপার অক্ষরে দশ জনের সমুখে যদি কেবলি বলা যায় যে ঐ ফুলটা আমার ভাল লাগে না, এবং কেন লাগেনা তাও বুঝিয়ে বলছি, তা হলে অন্য কথা হল, কারণ এ জায়গায় "আমার ভাল লাগে না" বলার মধ্যে এই কথা বলার চেষ্টা রয়েছে, ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যে শুধু যে আমার লাগছে না তা নয়, আর কারুরও ভাল লাগা উচিত নয়। এখানে অন্যের মতামতের বিরুদ্ধে একটা স্পর্দ্ধাপূর্ণ আহ্বান করা হচ্ছে, এবং সেই জন্যে অন্যের পক্ষেও উত্তর দেওয়া সম্ভব। গত সংখ্যার "অলকায়" যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছে তারও ভাব এই, লেখক যে শুধু "গীতাঞ্জলি" পড়তে ভালবাসেন নি তা নয়, অন্যে পড়ে যে আনন্দ পাচ্ছে এ দেখেও তাঁর মনে বিরুদ্ধ-

ভাব জেগে উঠেছে। নইলে ঐ প্রবন্ধটা লেখার কোনো মানে থাকত না। উক্ত রচনার বিস্তৃত সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যে দুটি একটি কথা আমার মনে রয়ে গেছে তার উত্তরে কিছু বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করব।

১। আমার প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে, প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যেই "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে লেখকের একটা প্রকাণ্ড অবিচার ব্যক্ত হয়েছে। এ কথা সকলেই জানেন যে "গীতাঞ্জলি" তে যা আছে তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে গান। গান মাত্রেই সুরের অপেক্ষা রাখে, তা না হলে তার অন্তরতম ভাবরূপের পূর্ণ বিকাশ হতে পায় না। গানের কথার মধ্যে কবি ইচ্ছে করেই সুরের জন্যে খানিকটা করে ফাঁক রেখে যান, সঙ্গীতে সেই ফাঁকগুলি ভরে দেয়। সুতরাং গানকে "সত্য-কবিতার" মাপকাঠিতে পরীক্ষা করতে যাওয়া বিশেষ রসজ্ঞতার পরিচায়ক বলে মনে হয় না। "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" এই গানটির উপরই দেখছি প্রবন্ধ লেখকের রাগ সব চেয়ে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে, তিনি বলেছেন এই গানের মধ্যে কোনো কবিত্ব প্রকাশ, মাধুর্য্য, কোনো সৌন্দর্য্যই নেই, এটা কেবল একটা ছন্দোবদ্ধ নীতি-উপদেশ মাত্র। কথাটা যে কতদূর হাস্যকর তা সরল সহজ মনে যিনি ঐ গানটা পড়েছেন, বা যাঁর ঐ গানটা সুর-সংযোগে শোনবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য ঘটেছে তিনিই বুঝবেন। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলবার আছে বলে মনে করি না।

২। গীতাঞ্জলির গানগুলিকে খামকা তিন চার ভাগে বিভক্ত করার কোনো তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পারিনি, এবং কোন আদর্শের দিক

থেকে, কোন principle হিসাবে যে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করা হয়েছে তা আমার কাছে এবং খুবই সম্ভব অন্য পাঠকের কাছেও স্পষ্ট হয় নি। প্রত্যেক কবিতা পুস্তকেই নানাজাতীয় লেখা থাকে, কোনটা হয়ত আমাদের মন অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতায় চঞ্চল করে তোলে, কোনোটা হৃদয়ে গভীর পুলকের সঞ্চার করে, কোনোটা বা নিবিড় বেদনায় মীড় টেনে টেনে চলে; কিন্তু এর মধ্যে কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর রচনা হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছে বলে শুধু তারই খানিকটা প্রশংসা করে অন্যান্য লেখার মধ্যে যে কবির কবিত্বশক্তির অবনতির পরিচয় দেখাবার চেষ্টা করতে হবে এমন অদ্ভুত কথা ত কখন শুনিনি! যদি কেউ বলেন সেই ধরণের লেখাই আমার ভাল লাগে যা তেমন গভীর ভাব-সম্পদে পূর্ণ নয় অথচ মনকে বেশ একটু দোলা দিয়ে যায়, চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে তোলা যার উদ্দেশ্য নয়, মনকে হিল্লোলিত করে তোলাতেই যার সার্থকতা,—তাহলে কিছু বলবার থাকে না; কিন্তু এইখানেই বিরত না হয়ে যদি তিনি আরো বলে বসেন যে ভাব-মূলক কবিতা মাত্রেই কবিতা হিসাবে অচল, এবং সেই সব রচনার মধ্যে যদি কবির প্রতিভার অবসান এবং অস্তগমনের চিহ্ন দেখাবার অক্লান্ত চেষ্টা চলতে থাকে তাহলে আর চুপ করে বসে থাকা উচিত বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের যে-গানগুলি লেখক মহাশয়ের অত ক্রোধের কারণ হয়েছে সেগুলি দেখছি সবই ভাবের গভীরতায়-পূর্ণ রচনা; কিন্তু এ ধরণের লেখা ত কবির শৈশব-সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক কবিতা পুস্তকেই কিছু না কিছু আছে, এ পাপ ত উনি নতুন করে করছেন না? ঐ যুক্তি অবলম্বন করে কবির আধুনিক রচনার উপর অতটা বিরুদ্ধ-

ভাবাপন্ন হয়ে ওঠবার কি কোনো প্রকৃত হেতু আছে? আসল কথা, নতুন কোনো জিনিষকে উদার মনে আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার শক্তি খুব কম লোকেরই থাকে, বরাবরই সাহিত্যে সমাজে ও লোকালয়ে এই ধরণের লোকই বেশী দেখা যায় যারা নূতনত্বের নাম শুনলেই মার-মূর্ত্তি হয়ে ওঠে এবং প্রাণপণে তাকে অপমান করবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। এই অকারণ বিরোধই কিন্তু সেই নব-আগন্তুকের প্রকৃত প্রয়োজনের একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বোঝা যায় ওষুধের ফল এরই মধ্যে ফল্‌তে সুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন সাহিত্য জগতে নব নব পন্থা উদঘাটন করতে করতে চলে এসেছেন, এবং যখনই তিনি কোনো পুরাতনের জীর্ণ সংস্কারকে আঘাত করে নূতন-আলোর বাণী প্রচার করেছেন তখনই একদল পুরাতনের অন্ধ-উপাসক সমস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠেছে, এবং সাধ্যমত তাঁর কাজে বাধা দিতে ক্রটি করে নি। কোনো প্রকার স্বাধীনতা, ঔদার্য্য, বা নূতনত্বের বিরুদ্ধে এদের যে আন্তরিক বিতৃষ্ণা তা কিছুতেই দূর হয় না, কারণ লক্ষ্য করে দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় যে যে-সকল লোক রবীন্দ্রনাথের কোনো নূতন রচনা পড়ে এককালে বিষম ক্ষিপ্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সেই লেখাটা যখন কতক সয়ে গেল এবং তার বাণী যখন মনে কিছু কিছু সঞ্চারিত হল তখন সেই সব লোকই ফের তাঁর সেই লেখারই দোহাই দিয়ে কবির অন্য রচনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হল। "কড়ি ও কোমল" "সোনার তরী" প্রভৃতি কবির প্রায় কবিতা পুস্তককেই এই নিন্দা, অপমান, ও ঈর্ষার ঝড় কাটিয়ে আসতে হয়েছে, এখন দেখছি "গীতাঞ্জলি" বা অন্যান্য আরো শেষের দিকের লেখার

বিরুদ্ধে লোকের নিদারুণ মনঃক্ষোভ ঘূর্ণিবায়ুর মত আবর্ত্তিত হয়ে উঠেছে। যাঁরা এক সময় কবির আগেকার কবিতার প্রতি যথাশক্তি কটুবচন প্রয়োগ করতে ছাড়েন নি এখন দেখছি তাঁরাই সেই সব পুরাতন লেখার দিকে তাকিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে উঠেছেন এবং অশ্রুবাষ্পাকুল কণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন—"হায়, আমাদের সেই রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রাণোন্মাদিনী বীণার ঝঙ্কারে বাঙালীর কোমল প্রাণে কত না মধুর ভাবের মদিরতা এনেছিল, কত না ব্যথা জেগে ছিল, তিনি কি না শেষে এই "গীতাঞ্জলির" মরুপথে একলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বল ভাই এও কি সওয়া যায়, এও কি চোখে দেখে চুপ করে থাকা চলে, এও কি......ইত্যাদি ইত্যাদি"। এই সব অসংযত বিলাপবাক্য কৌতুক ও কৌতূহলের খাতিরে খানিকক্ষণ শোনা চলে, কিন্তু অতিমাত্রায় হলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে, ঘুম পায়!

৩। লেখক বলেছেন রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা আর "নূতনত্বে প্রাণ চমকিত করে না," "পুরাতন বন্ধুর মত আনন্দ দান করে।" নিন্দাচ্ছলেই অবশ্য কথাগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু শুধু এইটুকু শুনলে বোঝা শক্ত কবির বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে, না তাঁর প্রশংসা করা হচ্ছে! কেন তা বলছি।

"নূতনত্বে প্রাণ চমকিত" করার মানে কি? লেখক কি মনে করেন যে যাদুকর যেমন রুমালের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা মস্ত পাখী উড়িয়ে দিয়ে সকলকে চমকিত করে দেয়, সেই রকম ভাষা ও ছন্দের মধ্য থেকে অকস্মাৎ কোনো একটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাব প্রকাশ করে পাঠকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়াই কবিতার

চরম উদ্দেশ্য ? দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত কিছু অন্য রকম। মোটের উপর ধরতে গেলে জন্ম, মৃত্যু, ভালবাসা এই রকম দুচারটে বড় বড় ব্যাপার অবলম্বন করেই আজ পর্য্যন্ত জগতের যা কিছু সব চেয়ে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিত হয়েছে; এবং প্রকৃত-পক্ষে, এই সকল চিরন্তন সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে নূতন করে দেখার শক্তিতেই কবির সঙ্গে সাধারণ লোকের প্রভেদ। অভ্যাস এবং নিত্য পরিচয়ের মোহাবরণ কিছুতেই তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না, তিনি সদ্যোজাত শিশুর মত বিশ্বকে বিস্মিত পুলকে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন, আর তাঁর এই অপূর্ব্ব আনন্দ আমাদের প্রাণও উদ্দীপিত করে তোলে। লেখক নিজেই বলছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা পরিচিত ভাবের ভিতর দিয়ে মনকে আনন্দিত করছে। তা যদি হয় তাহলে ত কোনো কথাই নেই, এর চেয়ে বড় প্রশংসা কবির পক্ষে আর কি হতে পারে ?

৪। সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে জন সাধারণের মনে কি বিচিত্র অদ্ভুৎ সব ধারণা থাকে ! কবিতায় "বিশুদ্ধ অনুভূতি" বা "অনুভূতির স্মৃতি" কোন্‌টা থাকলে কবিতা সাহিত্য হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে এ নিয়ে লেখক-মহাশয় বহুক্ষণ ধরে বাক্যজাল বিস্তার করে নিজের শক্তির অপব্যয় করেছেন। তিনি বল্‌তে চান কবিতায় "অনুভূতির স্মৃতি" থাকলে সে কবিতা হেয় হয়ে পড়ে, সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য চলে যায়। তিনি কবিতার মধ্যে সত্য ভাবের তপ্ত কায়া, না তপ্ত ভাবের সত্য ছায়া এমনি কি একটা কিছু অনুভব করতে চান, এবং যে কবিতা তাঁর মনের এই সুখসাধ পূর্ণ করতে পারে তাকেই তিনি বলেন "সত্য কবিতা" "বিশুদ্ধ অনুভূতির

কবিতা।” তাঁর বিশ্বাস মনে ভাব আসামাত্র তৎক্ষণাৎ একটা নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে বসে গেলে তবেই যথার্থ কবিতার স্মৃষ্টি হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে তাজমহল দেখার অনেক পরে এলাহাবাদে এসে সে বিষয়ে কবিতা লেখেন, তাঁর মনের অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশি যে বিশ্ব সাহিত্যের এই একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতায় ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এর জন্যে সমালোচক মহাশয়ের কাছে ঐ কবিতায় “বিশুদ্ধ অনুভূতির” নিদারুণ অভাব ঘটেছে। লেখক নিজে হলে বোধ করি তাজমহল দেখামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই বিনাবাক্য-ব্যয়ে পাথরের উপর বসে পড়তেন এবং পকেট থেকে সযত্নরক্ষিত খাতাটি বার করে—

“ওরে তাজ
তোরে আজ
কী যে ভালবাসি।...ইত্যাদি বলে

মন ও পেন্সিলের একেবারে পঞ্জাব মেল ছুটিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই এক সময়ে একেবারে শেষ কথাটি বলে দিয়েছেন, কথাগুলো এই—

“* * * কোন সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন যে, লেখা ভাল হইবে এমন কোনো কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না, তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্য রচনার পক্ষে তা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিতার রং ফোটে ভাল। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায়

করেছি এই ভরসায় যে আমার এই বাজে কথারও কিছু মূল্য থাকতে পারে। গত দু'বৎসর ধরে দিনের পর দিন শত শত সংবাদপত্র শত সহস্র মুখে যে সব পলিটিক্যাল কাজের কথা কয়েছে তার মধ্যে আমার এ বে-পলিটিক্যাল বাজে কথা অবশ্য সমুদ্রে শিশির বিন্দুমাত্র। কিন্তু আমার ও বাজে কথার অন্তরে যদি কিছু সত্য ও তার দেহে যদি কিঞ্চিৎ রূপ থাকে তাহলে আমার এই কথাবিন্দু পূর্ব্বোক্ত শব্দার্ণবে মুক্তার মত ডুবে যেতে পারে কিন্তু তার তরল অঙ্গে মিলিয়ে যাবে না।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২২। বীরবল।

চিরন্তনী।

—:*:—

চোদ্দ বছর বয়েসের সময় হঠাৎ সে একদিন যেন কেমন হ'য়ে গেল—তার দেহের অস্থিরতা মনের চাঞ্চল্য সব যেন কোথায় লুকিয়ে গেল—তার খেলা ধুলোয় প্রবৃত্তি, গাল গল্পের সুখ, সমবয়স্ক সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হুড়োহুড়ি কর্‌বার প্রলোভন সব যেন কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ছেলেরা ডাক দিয়ে যায় সে-ডাক তার কানেই পৌঁছে না। বন্ধুরা এসে খোসামোদ করে তাতে সে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। চারিদিকের কর্ম্ম ও খেলার চাঞ্চল্যের মাঝে সে নির্ব্বাক ও উদাসীন দেখে শুনে পাড়াপর্শিরা তার নাম রাখ্‌ল ক্ষ্যাপা।

ক্ষ্যাপা আপনার ছোট্ট ঘরটীর মধ্যে একা বসে' বসে' থাকে আর ভাবে কোথায় যেন একটা কি রহস্য আছে যেটা ভেদ কর্‌তে পার্‌লেই————————

ভেদ কর্‌তে পার্‌লেই—কি হবে? তা শত চেষ্টাতেও ক্ষ্যাপার মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না—কেবল রহস্যের নিবিড়তাই আরও নিবিড় হ'তে থাকে—তার উদাসী মন আরও উদাসী হ'য়ে যায়।

ক্ষ্যাপার অবসরেরও বিরাম হয় না, আকুলতারও শান্তি হয় না।

ফাগুন মাসে আমের গাছ সব মুকুলে মুকুলে ভরে যায়, তার মিষ্টি মৃদুগন্ধে আকাশ বাতাস মেতে ওঠে, মৌমাছিদের গুঞ্জন-প্রলাপে চারিদিকের নীরবতা অস্থির হ'য়ে ওঠে। ক্ষ্যাপা চোখের দৃষ্টি নিবিড় করে চেয়ে থাকে আর অস্পষ্ট হ'য়ে কেমন যেন তার মনে লাগে

রহস্যের বুঝি কিনারা হয় হয়—সহজ কথাটার সন্ধান বুঝি সে পায় পায়। তারপর ফাগুনের খেলা ভেঙে যায়—আমের মুকুল কুড়ি বেঁধে সবুজ হ'য়ে ওঠে, মৌমাছিরা আপনার বন-ভবনে ফিরে যায়—রহস্যের আর কিনারা হয় না—ক্ষ্যাপার কৌতুহলই কেবল বেড়ে ওঠে।

বৈশাখী সন্ধ্যায় কাল-বোশেখীর কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়—সাদা বকের সার কাল মেঘের বুকদিয়ে উড়ে যায়—ঘুর্ণী বাতাস শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে আকাশে ওঠে—শন্ শন্ শব্দে বৃষ্টি নেমে আসে—কচুপাতার উপর দিয়ে স্ফটিকের মতো জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে—ক্ষ্যাপা এক মনে চেয়ে থাকে আর ভাবে ঐ বুঝি গোপন কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে আসে আসে—কিন্তু মেঘ কেটে যায়, বৃষ্টি থেমে যায়, রাত্রি শেষে দিনের আলোয় চারিদিক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—রহস্যের আর কোন কিনারা হয় না—গোপন কথাটা গোপনই থেকে যায়।

এম্‌নি করে' বছরের পর বছর কাটে—রহস্যেরও আর কিনারা মেলে না—ক্ষ্যাপারও আর সোয়াস্তি হয় না। ক্ষ্যাপা ভাবে রহস্যের অনুসন্ধান বৃথা।

সেদিন সিউলি তলার সিউলি ফুলের রাশ ক্ষ্যাপার মনকে বিশেষ ক'রে উদাসী করে' দিল—রাজার বাগান থেকে বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসে—স্তব্ধ নিঝুম দুপুর বেলা রাখালের বাঁশীর সুর একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার ব্যথা নিয়ে নিয়ে ফেরে।

ক্ষ্যাপার সেদিন হঠাৎ চোখে পড়্‌ল এক বালিকা। তন্বী তার তনুলতা—কালো তার চোখ নিবিড়, তার কেশ—সারা দেহে তার থম্‌কে থাকা প্রাণের চাঞ্চল্য।

ক্ষ্যাপা চম্‌কে উঠ্‌ল—বালিকার চোখের দিকে তাকাতেই ক্ষ্যাপার হৃদয়টা স্ফীত সিন্ধুর মতো স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল—ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে—এইবার রহস্যের সন্ধান পেয়েছি।

কিন্তু রহস্যের কিনারা আর হয় না। বালিকা বকুলফুলের মালা গেঁথে গলায় পরে, কাঁচ্‌পোকার টিপ্‌ লাগায়, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী দিয়ে কানের দুল তৈরী করে—তাতে রহস্য কেবলই নিবিড় থেকে নিবিড়তর হ'তে থাকে—বালিকা তার সারা দেহের বর্ণ রেখা ও সুর দিয়ে কি যেন একটা কথা বল্‌তে চায়—কি যেন একটা সন্ধান জানাতে চায়—সেটা আধ স্পষ্ট আধ অস্পষ্ট থেকে ক্ষ্যাপার অসোয়াস্তিই আরও বাড়িয়ে তোলে—রহস্যের আর কূল-কিনারা হয় না।

ক্ষ্যাপা ভাব্‌লে বালিকার সঙ্গে মিলন হ'লে রহস্যের কিনারা হবে।

ক্ষ্যাপার সঙ্গে বালিকার মিলন হল।

কিন্তু যে রহস্য ধরা-দেওয়া—দেওয়ার মতো হয়েছিল তা কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পুরুষের স্পর্শে বালিকা এক মূহুর্ত্তে নারী হ'য়ে জেগে উঠ্‌ল—পৃথিবীর বুক আঁক্‌ড়ে সেখানে ঘর বেঁধে বস্‌ল।

নারী একদিন ক্ষ্যাপাকে বল্‌লে—দেখ তুমি যে রহস্যের সন্ধানে ফিরছ সে রহস্যের আবির্ভাব হবার সময় এসেছে—আমি তার ব্যথা ও আনন্দ অনুভব করছি।

ক্ষ্যাপা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস কর্‌ল—কোথা থেকে তার আবির্ভাব হবে?

না। শুধু কবিত্বে নয়, সকল প্রকার চারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটা নির্লিপ্ততা থাকা চাই—মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছে, কর্ত্তৃত্ব তাহারি হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে যায় তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয় প্রতিমূর্ত্তি হয় না।"

অনেকদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন, সুতরাং "শেষ বয়সের বিকৃত বিচার" বলে উঠলে চল্‌বে না। লেখক-মহাশয় ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজ লেখকের নাম শুন্‌লেই আত্মহারা হয়ে ওঠেন, তিনি কবিতা সম্বন্ধে Wordsworth-এর সর্ব্ববাদীসম্মত সেই বাক্যগুলি কি ভুলে গিয়েছেন যে "Emotion remembered in tranquillity"-ই হচ্ছে কবিতার প্রকৃত উপাদান।

৫। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি ও সাধকের বিচ্ছেদ ঘটেছে এ কথা নূতন বটে! আমরা ত জানতাম কি দেশে কি বিদেশে সকলেই একবাক্যে স্বীকার কর্‌ছে যে "সাধক ও কবির হরগৌরীর মিলনেই" তাঁর প্রতিভার প্রধান বিশেষত্ব। তিনি ভগবানকে পাওয়ার জন্যে সংসার ছেড়ে অদৃশ্য মরীচিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন নি, মানুষের প্রতিদিনকার জীবনের সুখে দুঃখে, তার বিচিত্র অনুভূতি অভিজ্ঞতার মধ্যেই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় পেয়েছেন, সংসারের মধ্যে থেকেই তিনি সংসারের উর্দ্ধে উঠ্‌তে পেরেছেন। নিরাসক্ত নির্ব্বিকার সাধক বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনদিনই হতে পারলেন না। "গীতাঞ্জলির" সময় থেকে যে রবীন্দ্রনাথ কেবল, "নিছক নীতিকথা এবং দার্শনিক তত্ত্ব" বিবৃত করে আসছেন, কবির "ফাল্গুনী" "গল্প সপ্তক," "পলাতকা" এক তাঁর এখনকার "কথিকা" ও "শিশু"

কবিতা পড়ে লেখকের কি শেষে এই কথাই মনে হল! তিনি বলছেন খেয়া, নৈবেদ্য, ও গীতাঞ্জলির "অন্বেষণ, আবেদন ও নিবেদনের সুরের" পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের "অন্তরের সাধক-আমিটি কবিকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিশ্ব-বৈচিত্রের বাহিরে ছুটিল।" এর পর আর নিরুত্তর হওয়া ছাড়া কি উপায় হতে পারে?

৬। সমালোচকের শেষ মন্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথের যা বলার ছিল তা ফুরিয়ে গেছে তাঁর আধুনিক রচনা পড়ে ওঁর (সমালোচক মহাশয়ের) হৃদয় আর "অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠে না," অনুভূতির পশ্চাতেই অশ্রু প্রবল হয় না।" কথাটা যে দুঃখের সে বিষয়ে সন্দেহ কি।—কিন্তু আশা করি তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি সাঙ্গ করবেন না, এবং কবির লেখা পড়ে যাঁরা যথার্থ আনন্দ পেয়ে থাকেন তাঁদেরও প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁরা যেন এই আকস্মিক শোকের আঘাতে আত্মহারা না হয়ে পড়েন। জগতে সর্ব্বদাই কত দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সে যে অনিবার্য্য; সব কথা ভাবতে গেলেও কি আর চলে! কথায় কথায় চোখে "অশ্রু প্রবল" হয়ে উঠলে যে সকল কাজেই বাধা পড়বে, সংসারে বেঁচে থাকাই শক্ত হয়ে উঠবে! আর, সমালোচক-মহাশয়ের এই নিদারুণ মর্ম্ম-ব্যথার প্রতিবিধান করাও যে আমাদের সাধ্যাতীত, কারণ যার কোনো একটা জিনিষ কিছুতেই ভাল লাগছে না তাকে কি জোর করে সে-জিনিষ ভালবাসানো যায়? আমরা কেবল এইটুকু বল্‌তে পারি যে আমাদের কিন্তু খুব ভাল লাগছে! নিজের দিক থেকে আমি অকপট চিত্তে স্বীকার করছি যে রবীন্দ্রনাথের নূতন রচনা পাবার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকি, যেদিনে ওঁর কোনো

নূতন লেখা বেরোয় সে-দিন আমার কাছে স্মরনীয়, এ বিষয়ে আমার আকাঙ্খা এবং আনন্দের অবধি নেই। কবির প্রথম দিকের লেখা কি শেষের দিকের লেখা দু-ই আমার কাছে সমান উপভোগ্য; "একরাত্রি" আমার যেমন ভাল লাগে "শেষের রাত্রি"ও তেমনি, "কথা ও কাহিনীর" গল্প আমাকে যেমন আনন্দ দেয় "পলাতকার" গল্প কবিতাও তার চেয়ে কিছু কম দেয় না, এখন তিনি যে "শিশু" কবিতা লিখছেন তা আমাকে ততটাই বিচলিত করে যেমন করেছিল তাঁর আগেকার "শিশু" পুস্তকের কবিতাগুলি। "কথিকা" যখন পড়ি তখন পাশ্চাত্য দেশের বহুবিখ্যাত prose poem জাতীয় যা কিছু সাহিত্য সামগ্রী আছে সমস্তই আমার কাছে মলিন হয়ে যায়; "পথ-মোচন" আমার মনের অনেক রুদ্ধ দ্বার নূতন আলোকের দিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আর আমার কিছু বলবার নেই। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার বলেছিলেন যে "মানুষের বোঝবার শক্তির সীমা আছে কিন্তু তার না বোঝবার শক্তি অসীম।" এই সারগর্ভ সত্যটি স্মরণ করে এই প্রবন্ধ শেষ করি। ইতি—

চৈত্র ১৩২৮। শ্রীঅমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বক্শীস্*

—:*:—

বংশীবাবু শিকদারপুরের জমিদার। চাইর পরগণায় তিনির এলাকা। তার মধ্যে মস্ত একটা জমিদারী পদ্মার পারে। আর সব পরগণা থিকা এই পদ্মাপার‍্যা জমিদারীতেই তিনির আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ খাটে বেশী। পদ্মার ভাঙুনিতে জমিদারীর খেতিও যেমুন আবার জমিদার যদি চোটালু হন তায়লে লাভের মাত্রাও তেমনি জ্যায়দা। সে লাভ পদ্মার চর দখল নিয়া।

বর্ষার আসন আসন কালে গাছ গাছালির আবডালে দালান কুঠার রমরমা যে গাওখান দেখ্যা চোখ ফিরাণ যায় না, শাওন মাস যাত্যে না যাত্যেই দেখা যায় সেখান দিয়া ঘুন্নাপাক আর জলকায় ভরা গহিণ গাঙ্। তা দেখ্যা কোন কালে সেখানে একখান ডেরা কুড়া কি একটা কলাগাছও যে আচিলো তা ঠাওর করে কার সাধ্যি! ইসন পোষ মাঘের শুক্না গাঙেও যেখান দিয়া জাহাজ চলে ফিরা, কার্তিকে দেখা যায় সেখানে মুলুকজোরা বালুচর রৈদের জিলে ঝিক্ মিক্ করত্যাচে। পদ্মানদীর কাম ক্যাবল এই ভাঙণ, আর গরণ, তার ফলে জমিদারের এলাকা আর রায়তের জোৎ কিছুরই ঠিকানা থাকে না। তাই চর মুলুকে যার লাঠি তারি মাটি।

পদ্মাপারে যে সব রায়ৎ বসৎ করে তাগোরে কাম খালি মনিবের হৈয়া চর দখল করণ। হাল বাওনের বেলায় নাঙল্ পাইল

*মাণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত।

মতন চালাব্যার পারুক আর না পারুক, চর নিয়া কাইজা করণের সোমে লাঠী তাগোরে পরায় মানষের হাতেই চরক গাছের মতন ঘুরে। হাল গরু বেবাকের নাই, পাকা বাশের টুক্‌টুকা একখান কর‍্যা লাঠি ক'ল বেবাকেরি আছে। টান দেশী গিরস্তেরা পদ্মা পার‍্যা গোরে ঠাট্টা কর‍্যা কয়ঃ—

পদ্মাপার‍্যা রায়ৎ গোর লাঠী হাতে হাতে
গাঙের দিকে মুখ ফিরায়্যা ভাত মাখেন পাতে,
মাখা ভাতটী নাই ফুরাত্যে ভাইঙা পরে ঘর,
সান্‌কির ভাত কোছে ভর‍্যা খুজেন আরেক চর।

আবার পদ্মাপার‍্যাও টান মুলুকের মানষের নামে—

টান দেশী গিরস্তগোর বাপকালান্যা ঘাটি,
আঠু জলে ডুব দেন আর বুকে ঠেকে মাটি
আপনেরা পাও মেইলা বস্যা হুকায় মারেন টান,
এক পহরের পথ ভাঙ্যা বউ, জল আন্‌ব্যার যান।

এই ছরা আওড়ায়্যা তাগোরে খ্যাপাতে রেয়াৎ করে না।

পদ্মাপারে বংশীবাবুর অনেক লাঠ্যাল রায়ৎ। আর তাগোরে সর্দ্দার গফুর খার দাপটে চর মুলুকে তিনির নামে বেবাকেই থরি হরি কম্প। মাথার বাবরীটা এলায়্যা মালকোচা মারা গফুর খা লাঠী হাতে যখন দলের আগে ডাক ছার‍্যা খারায়, তখন তার একলার মোরা নেওম শতেক লাঠ্যালের সাহসেও কুলায় না। বংশীবাবুর লাঠ্যালের চোটে তিনির লগে কাইজায় না পার‍্যা, এক হাতিবান্ধার ভৈরব বাবু ছাড়া আর সকল জমিদারই হাইর মান্‌চেন। ভৈরব বাবুর জমিদারীর আয় বংশীবাবু থিকা কিছু বেশী, লাঠ্যাল সর্দ্দারও

তিনির কম নাই, তবু যে তিনি পার‍্যা উঠেন না তার একমাত্র কারণ গফুর খার মোরা নেওনের মতন লাঠ্যাল তিনির এলাকায় নাই। বংশীর বাবুর লগে কাইজায় যতই হারেন জিদ্‌ তিনির ততই চর‍্যা যায়। পর্‌তি বারেই তিনির লাঠ্যালের দল চরে থিকা বেদখল হয়্যা ফিরা আসে আর কয়—মনিষ্যের কাছে কি আমরা হটি, গফুর সর্দ্দারের জিন পরির আশ্রয় আছে তারে হটানের সাধ্যি মনিষ্যের নাই।” একজায় গফুর খার নাম শুন্যা ভৈরব বাবুর রুখ চাপল্যো যত্‌কে যতই হোক এই লোকটারে হাত করনই চাই। রুখ চাপল্যো কি হৈবো? টাকা পয়সা জমি জিরাৎ কিছুর লোভেই গফুর সর্দ্দারের মন টৈল্‌লো না। ভৈরব বাবুর চর যতবার যায় “মনিবের ভিটা সয়তানে ছারে” তার মুখে এই একই জোয়াব শুন্যা শুন্যা ফির‍্যা আসে। শেষে একবার সে তিনির চরের এমুন অপমান কর‍্যা দিলো যে না পার‍্যা তিনি চর পাঠান রহিৎ কৈর্‌লেন।

গফুর খার গিরস্তালির মধ্যে মানুষ মাত্র তিন জন। সে নিজে তার বিবি আর ছাওয়াল রমজান। আশ পাশের লোকের কাছে সর্দ্দার মানুষের খাতির মুরাদ যতই হোক তাগোরে বিবি হওন যে কি—তা রমজানের মার মতন কেউই জানে না। টান দেশী গিরস্তের বেটী সে—বাপ ভাইয়েরে দেখ্‌চে দিনমান খ্যাতে কাম করে সাঁঝ সকালে ঘরে আস্যা, ছাওয়াল পাওয়াল নিয়া আমোদ আহ্লাদে খায় দায়, জোচনা রাইত হৈলে পারা পোশি জন কয়েকে মিলা গল্প সল্প বা বয়াৎ গান করে, আর তামান রাইত মনের সুখে নিদ্রা যায়। সর্দ্দারের বিবি হওন যার কপালের লেখা তারই সকল সুখের কথা মনে আনন, চক্ষু মেল্যা স্বপন দেখনের সমান।

লাঠ্যাল সর্দ্দারের ঘর গিরস্তালি তে বেবাক কামই আল্যা মাল্যা। রান্ধন বারণ সারা হৈচে, সাম্নে বারাভাত, এমুন সোমে ডাক আইলো আর কার ভাত কে খায়, সর্দ্দার লাঠী হাতে বারয়্যা পৈলো। তার পরে এক লাগারে কয়দিন তলাক সে আছে কি নাই তাও টের পাওনের জো থাকে না। ইরকম মানুষের জানের উপর ভরসা রাখন আর ভরা গাঙের ভাঙুনী পারে ঘর বান্ধ্যা থাকন একই কথা।

আধেক বয়েস একা একলা চিন্তায় ভাবনায় ভাজা ভাজা হয়্যা কাটানের, পর ভাটি বয়েসে যখন বিধাতা দয়া কর্য্যা রমজানেরে সর্দ্দারের বিবির কোলে দিলেন তখন সে মনে মনে ঠিক কৈর্লো যদি বাচায়্যা তুল্বার পারে, তয় ছাওয়ালেরে আর লাঠ্যাল সর্দ্দারের কাম কর্ব্যার দিবোনা। তার বাপ ভাইগোরে মতন নিজের ছাওয়ালটাও লক্ষ্মীর পুৎ গিরস্ত হৈয়া সুখে সচ্ছন্দে বাস বাস্তব্য কৈর্বো এইটা আছিলো তার মার মনের একমাত্র সাধ। আর সেই আশা ফলায়্যা তুলনের লাইগা যতকষ্টই তার নিজের হোক্ না তা বরদাস্ত করনে সে একপায় খারা আছিলো।

ছাওয়াল পাওয়াল কঞ্চি বাঁশ, যে পাইলে নোয়াও সেই পাইলেই নোয়ায় যা শিখান যায় তাই শিখে, বাপের দেখাদেখি পাছে লাঠ্যালিরদিগেই রমজানের মন যায় তার মার মনে মনে এইটা আছিল এক আশঙ্কা। তাই ছয় বছুর্য্যা ছাওয়াল রমজানের নিয়া সে বাপের বাড়ী যায়্যা দৈখ্লো দিনকয়েকের মধ্যেই ছাওয়াল তার দাদু আর দাদির বাধুক হৈচে, আর বাড়ীর চেংরার দলে খেল্যা বেড়াত্যাচে তখন সে রমজানেরে তাগোরে কাছেই রাখ্যা

আসন ঠিক কৈর্‌লো। সোয়ামির ঘরে একলা ফিরণ কালে মনটা ধূক্ ধূক্ কর‍্যা উঠ্‌লেও সে একলাই ফির‍্যা আইলো। একমাত্র ছাওয়াল কাছ ছাড়া হওনে, থাক্যা থাক্যা তার বুকের মধ্যে ফাপর কর‍্যা উঠ্‌লেও পার্য্যমাণে সে তারে আন্‌ব্যার চাত্যোনা। গফুর খাঁ নিজে যায়্যা পাইল পরবের উষ্টুস্বে যখন নিয়া আস্‌ত্যো তখনো মাসেক যাত্যে না যাত্যেই নানান্ ছুত্যা নাতা কর‍্যা সে আবার রমজানেরে তার মামাগোরে বাড়ীতেই পাঠায়্যা দিতো।

গফুর সর্দ্দারের তুনিয়ায় মান্যা চলনের মানুষ, আচিলো মাত্র দুইজন। এক মনিব আর বিবি। মনিবের হুকুমে সে জান দেওনেও করুল, খালি লাঠি ধরণ আর মনিবের হুকুম মানন এই তুই কাম বাদে বাকী সব্‌তাতেই সে আচিলো বিবির বশ। তাই সোমথ বাপের একমাত্র বেটার মামাবাড়ীতে মানুষ হওন সর্দ্দারের কাছে নেহাৎ না-পছন্দের কাম হৈলেও তা নিয়া মধ্যে মধ্যে খালি এক আধটু খিচ্ মিচ্ করণ ছারা ছাওয়ালের আপন বাড়ীতেই রাখনের লাগ্যা সে বিবির উপ্‌রে কোন রকম জোর খাটাব্যার পারে নাই। রমজান মামাবাড়ীতেই মানুষ হব্যার লাগ্‌লো।

রমজানের দাতু বুড়া মিঞার গিরস্তালির মতন সাইরের গিরস্তালি সে গেরদায় বড় আচিলো না। ছাওয়াল আর বৌরা, ঘর গিরস্তালির তামান কাম নেওনে বুড়া বুড়ী, সংসারে থিকা একরকম আল্‌গোচ্। পাচউক্ত ঠিক মতন নমাজ পরণ আর বাকী সময় নাতি নাতোর নিয়া আমদ আহ্লাদ করণই এখন বুড়া মিঞার কাম। এত বড় সুখের সংসারে আন্যা খালি খেলানে বেড়ানেই রমজানের দিন কাটব্যার লাগলে।

আট ছারায়্যা নয়ে পর‍্যা
নয়া নাঙল আনে গর‍্যা
নও ছারায়্যা দেশে পাও
গিরস্তের পো চকে যাও

গিরস্তের ছাওয়াল দশ এগার বছর বয়েস হৈলেই বাপ ভাইয়েরে লগে হাল গরু নিয়া যায়, নিজে খেত-খোলার কাম শিখে আর তাগোরেও আগরের কামে অল্প বিস্তর সাহায্যও করে। বুড়া বুড়ির সোয়াগ্যা নাত্তি বল্যা এগার বছর পার হয়্যা গেলেও বাড়ীর কেউই রম্‌জানেরে উঠ্যা বস্‌ব্যারও কৈতো না। তার উপ্‌রে এক, মামারো মামীবাদে বাড়ীর আর বেবাকের কাছেই তার আখইটু আব্দারও বেশ খাটুতো। গায় জোর থাকনের ফলে আসনের দিনে থিকাই বাড়ীর চেংরার দল কেউ ডরে কেউ বা ভালবাস্যা তার এক্‌বারি বশ হয়্যা পৈলো। এই রকমে সকল দিগ্‌ থিকাই লাই পায়্যা দিনের দিন তার স্বভাবটা হয়্যা উঠ্‌লো খুব একরোখা। এম্নে বচ্ছর কয় কাটনের পরে তার দলে তোকা আস্যা জুটুলো। তোকা রমজানের মামাগোরে পাড়ারই আর একজন গিরস্ত আকবর সেকের ম্যায়ার ঘরের নাতিন। তোকা আর সকলের মতন না বোধ করি, এই জন্যেই তার উপর রমজানের খুব টান পর‍্যা গেলো। রমজান যখন ১৮ বচ্ছর‍্যা যুয়ান বয়েস বারনের লগে, তার ছোট্ট-কাল্যা চলন চরিত্রি তোকার উপর তার পরাণের টান একটুও কমে নাই।

রমজানের দাদু বুড়ামিঞা যেমন মারা যায় সে কিরাকার শাওন-মাসে পদ্মার চোরা ভাঙ্‌নির চোট সে মুলুকের চেংরা বুড়া কেউই কোনকালে ভুলব্যার পার্‌বো না। পাতলা পাতলা দেওয়ার তার

চাইর দিগ নিভাজ থমথমা,—ঝর বিষ্টি তুফান তাফানের নাম গন্ধও নাই, তবু জলের সেকি কলকলানি ডাক! আর গাঙের ধারা ভাঙ্‌নির মুখে চাপের উপুর চাপ পরণ। গিরস্তেরা ঘরের জিনিষ বাইর করব্যার যায় তো গোরু সাম্‌ল্যাব্যার পারে না, নাওখান পারে ভিরায় তো মানুষ তুলব্যার পারে না। চাইর দিগে খালি হৈ চৈ। কে কারে দেখে! যার যার তা নিয়া সকলেই ব্যস্ত। এই দারুণ ভাঙ্‌নির চোটে পুর্‌য়া দুইটা দিনও লাগলো না—গফুর সর্দ্দার গোরে গাওখান নিচিন্ন হয়্যা পদ্মার জলে মুছ্যা গেল। যা গোরে ইষ্টি কুটুম বাড়ী ধারে কাছে আচিলো, তারা গরু বাছুরের রাখণের আর নিজেগোরেও মাথা গুজনের ঠাই কর্‌য়া জিনিষ পত্রও কিছু কিছু বা সারাব্যার পাইর্‌লো, আর যা গোরে তা নাই তাগোরে দুঃখের আর সীমা রইলো না। গফুর সর্দ্দার একা মানুষ। সাহা-য্যের অভাবে জিনিষ পত্র বেশী কিছুই বাইর করব্যার পারে নাই, বিবিরে নায় উঠ্যায়া সারাসারি কর্‌য়া একলার দুইখান হাতে যা কিছু তুলব্যার পারছিলো তা বেবাক সমেৎ বিবিরে তার ইচ্ছামত বাপের বাড়ী পাঠায়্যা দিয়া নিজে পারা পোর্শিগোরে এই দারুণ মুস্কিলের দিনে তহিৎ তাদরক কর্‌য়া ফির্‌ব্যার লাগলো।

একেই তো নদীর চরে চরে উরাট্যা গিরস্তালি সর্দ্দারের বিবি ইস্তককালে পছন্দ করে নাই, তার উপর-ই ফিরাকার সর্ব্বনাশ্যা গাঙ ভাঙ্‌নিতে ঘর গিরস্তালির তামান জিনিষ খোয়া যাওনে চর্‌য়া বসতির উপর সে হারে হারে চট্যা গেচে। তাই বাড়ী ভাঙনের পর বাপের বাড়ী যায়্যা টানদেশী গোরে মিজিলের গিরস্তালি তার চোখে আর আর ফিরা খিকা দুগুন ভাল ঠেকব্যার লাগলো। সে

মনে মনে ঠিক কর‍্যা ফেলাল্যো সর্দারেরে বুঝায়্যা পরায়্যা টান মুলুকেই নতুন গিরস্তালি সুরু করন চাই। ইসব তা লিয়া তার মনের মধ্যে অষ্টক্ষন বুঝাপড়া চল্‌ত্যাচে—ইয়ারি মধ্যে আচাম্বিতে একদিন আকবরের নাতিন তোকারে দেখ্যা তার মনে আর একটা নতুন সাধের উদয় হৈলো। আর, তার পরদিনই আকবর সেকের পুবদুয়ার‍্যা ঘরের দাওয়ায় বস্যা রমজানের মার লগে তোকার মার যে কথা হৈলো—তাতে দিন কয়েকের মধ্যেই গায়ের পরায় মানুষেই শুনলো যে রমজানের লগে তোকার বিয়া এক রকম ঠিক ঠাক।

রমজানের কানে যখন এই খবরটা গেল সুখের তুফানে তার বুকের মধ্যে তোলপার। যে দিগে তাকায় সেই দিগই তার চোখে ভরা ভরা ঠেকে। সাথী সাঙাত যত জনের লগে দেখা হয় বেবাকেরি উপর তার মনের টান রোজকার থিকা বেশী ঠেকব্যার লাগলো। তার তেলে-টুকটুক্যা বাশের নক্সিদার বাশীটার উপর ইলিমের অনেক দিন থিকা নজর। কতবার চায়্যা ও সেটা যে পায় নাই, সেদিন না চাত্যেই আপ্‌নেথিকা রমজান তারে সেটা একিবারে দিয়া ফেলাল্যো দেখ্যা তার তো তাক লাগ্যা গেচে। খালি বাশীটাই না,—পালা-শালিকের ছাওটা, পাহার‍্যা ব্যাতের লাঠীখান, আরো তার নানান রকমের হাউসের অনেক জিনিষ সে আইনা তার সাথী গোরে ডাক্যা আস্যা বিলায়্যা দিলো। সেদিন খালি তার মনে হত্যায় লাগলো আগেরি মতন মাঠে মাঠে লবনদার‍্যা আর বিলের অঠাই জলে চোরা ডুবি খেলানের বয়েস আর তার নাই। খেলার সাথীগোরে পাছে ফেলায়্যা এই একদিনেই সে য্যান বুঝমন্ত মুরুব্বি মানুষটা হয়্যা উঠচে।

বাড়ী ভাঙনের পরে থিকা গফুর সর্দ্দারের আর ফুরসুৎ নাই। নতুন গেরামের পত্তনের কি করণ না করণ সে সবতার বৈঠক তার গরজ ছারা হয় না, জমিদারের দরবারে হাটাহাটির বেলাই ও সেই। সে যা করে বা কয় আর সকল মাতব্বরেই তাতেই 'হয় হয়' কর‍্যা তারি পাছে পাছে চলে। গাওয়ালী মানুষের নিজেগোরে বৈঠকের বুদ্ধি পরামিশ্ সারা হৈলে মাস খানেক জমিদার বাড়ী হাটাহাটি করণের পর যে জাগাটা নতুন গেরাম পত্তণের লাগ্যা ঠিক হৈলো সেটা বংশীবাবু আর ভৈরব বাবু এই দুই জমিদারের ভারি একটা কাইজার জমি, ইলসামারির চরে। এইটা বাদে বংশীবাবুর নিজ এলাকার আরো যে সব চর নিঝঞ্ঝাটে আছে তার বেবাক গুলাই কাচি। তাতে গফুর সর্দ্দার গোরে গেরামের বেবাকের বাড়ীর সংগস্তা হয় না। গেরামের দুই চাইর জন মাতব্বরের এই খামাখা কাইজায় মাথা দেওনে বড় মত আচিলো না, তবে এক সাথে থাকনের মায়ায় শেষ কাঠালে সকলেই একমত হয়্যা ঠিক কর্‌লো বর্ষার পর কালে কার্ত্তিক মাসে গেরামের বেবাক মানুষ একদিনে একলগে নতুন জমি দখল কর‍্যা বসুব্যো, তার পারে তাগোরে হাতের লাঠি আর মনিবের হুকুমের জোরে বরাতে যা আছে তাই।

ইদিগের তামান বন্দবস্ত সারা হৈলে পর সর্দ্দার কিছু কাল নিচিন্ত মনে জিরাণের লাগ্যা শশুর বাড়ী গেচে। পয়লা ২।৪ রোজ হাসি তামাসায় কাটানের পর একদিন নিরালায় বস্যা সর্দ্দারের বিবি সোয়ামির কাছে ঘর গিরস্তালির কথা তুল্যা বসল্যা। সে টান মুলুকে নতুন বাড়ী করনের যতগুলো নজির দিলো সর্দ্দার তা বেবাকই হাস্যা উড়াল্যো দেখ্যা বিবি খুব রাগ্যা তারে কয়েকটা চড়া কথা

শুনায়্যা দিলো। পরের বাড়ীতে এম্নিকর্য়া ঘরের শুমর ফাক করনে সর্দ্দারের মেজাজ ও রুখ্যা উঠ্লো। আর তার ফলে কোন কিছু থির হওনের বদলে দুইজনের খালি রাগা রাগিই সার হৈলো। ইয়ার পর আর যে কয়দিন সে শশুর বাড়ী রৈলো বিবির লগে কাজের কথা আর কিছুই হৈলোনা। বাড়ীর আর আর মানুষের কাছে সে রমজানের সমন্ধের কথা কিছু কিছু শুন্‌চিলো, তবে বিবি নিজেথিকা কিছু না কওনে সেও তা নিয়া কোন কথাই উঠায় নাই। সর্দ্দারের মনে অষ্টক্ষণ খালি নতুন গেরাম পওনের কথাটাই জাগ্‌ত্যাচে।

কার্ত্তিক মাসের শেষা শেষি বর্ষার ভিজা স্যাৎস্তা চরের জমি শুকায়্যা বেশ টনক হয়্যা উঠ্‌লে পর একদিন বংশী বাবুর লাঠ্যালরায়তের দল ইলাসামারির শূন্যা চরটারে রাতারিতির মধ্যেই এমুন কর্য়া ফেলাল্যো যে আগের দিনও যে সব জাইলারা তার বাকে মাছ মার্য়া, শুন্যা চরে চাল শুকায়্যা নিচে—পরের দিন বিহানে আস্যা চরের দিগে চোখ ফিরাত্যেই তাগোরে তাক্ লাগ্যা গেলো। কাতারে কাতারে কলা গাছের ধার দিয়া বাচারি ঘরের সাইর, তারো আবার পুরাণ খামখোটা পুরাণ দরির বান্ধন ছান্দন দেখ্যা একদিন আগে তো পাছের কথা, কোন কালেই যে সে জাগাটা পতিত পর্য়া আচিলো ই কথা কে কব্যার পারে। এক রাইতের মধ্যে এতবড় জবর একটা কারসাজি যে হব্যার পারে ভৈরব বাবুর চর মুলুকের নায়েব তা স্বপনেও ভাবেন নাই। বেবাক দেখ্যা শুন্যা তিনি পয়লা চোটে এতই ঘাবরায়্যা গেলেন যে কর্ত্তারে না জানায়্যা, তিনির হুকুম না নিয়া গফুর খাঁর দলের কোন বাধাই তিনি দিলেন না। এই

তারে জোপায়্যা তারাও জাগায় জাগায় আস্তা বাশের ঝোপ, নানান রকম গাছ গাছালির চারা বুন্যা দিয়া, সরকারী তদন্তের সোমে হাকিমের চোখে তাগোরে বস্‌তিটা যাতে সে দিনকার বল্যাই না ঠেকে তারি আয়োজন উর্যোগে মন দিলো। এই সকল পাচ রকম কামে যড়্‌জালে সর্দ্দারের যখন নাওন খাওনের ফুরস্থৎ নাই তখন শশুরবাড়ী থিকা খবরের উপর খবর আস্‌ব্যার লাগ্‌লো রমজানের বিয়া ঠিক কর্‌ব্যার জন্যে একবার যাওনের লাগ্যা।

তোক্কা রমজানের বিয়ার কথা নিয়্যা তাগোরের তুই মায়ের সেই আলাপের পর তোকার বাপ তিন চাইর যাত্রায় আস্যা সর্দ্দারের দেখা না প্যাওনে রমজানের মামা বাড়ীর আর আর মান্‌ষের লগেই সম্বন্ধের যাকিছু ঘোর প্যাচের কথা বেবাক মিট্যায়া গেছে। এখন খালি দেইন্‌মোহরের টাকাটা লেইন দেইনের পর দিন তারিখ ঠিক করণ বাকী। সর্দ্দার না আইলে সেটা হব্যার পারে না। তুই বাড়ীর মান্‌ষে খালি তার অসনের পথই চায়্যা রৈচে।

অনেক খবরের পর মাত্র দিনেকের লাগ্যা সর্দ্দার শশুর বাড়ী আইচে। আঙিনায় পাও দিতে না দিতেই ছাওয়ালের বিয়ার কথা নিয়া শশুর বাড়ীর বেবাক মান্‌ষে তারে ঝাক্যা ধর্‌লো। যে যা কিছু কৈলো সব তাতেই সে হাস্যা হাস্যা সায় দিলো দেখ্যা সকলেই খুব খুসি। বিবির টান-দেশে গিঃস্তালি করনের হাউস্‌টা না মিটাব্যার পর্যা তার মনে ভারি একটা খেদ রয়্যা গেচে তাই সে মনে মনে ঠিক কর্যা আইচে ছাওয়ালের বিয়া নিয়া বিবির পছন্দের উপরে সে কোন কথাই কইবো না। নিরালায় বিবি লগে যখন তার দেখা—তখন সে আগ্গেথিকাই রমজানের এই বিয়াতে তার

পূরা মত যে আছে এই জানায়্যা দেওনে বিবি তো আল্লাদে একিবারে ডগমগ। অনেক দিন পরে সে আইজ সোয়ামীর লগে পরাণ খুল্যা মনের কথা কব্যার লাগ্‌লো। নানান্ কথায় অনেক্ষণ কাটানের পর তোকার বাপের নাম আর ঠাই ঠিকানার পরিচয়টা উঠাত্যেই সর্দার একিবারে থম্ ধর‍্যা গেচে। আকবর সেকের ম্যায়ার ঘরের নাত্তিনের লগে তার ছাওয়ালের সমন্ধের কথা চল্‌ত্যাচে—মাত্র এই খবরটাই সে এতদিন শুন্যা আস্‌ত্যাচে। ম্যায়ার বাপের বাড়ী যে হাতিবান্ধায় আর তার বাপ যে সেই গায়েরই জমিদার ভৈরব বাবুর রায়ৎ, ইয়ার কানি কোনাও যদি সে আগে টেরপাতো তায়ল্যে কার সাধ্যি এই সমন্ধ নিয়া ইস্তক নাগাদ কথা চালায়! যেখানে দুই মনিবের মধ্যে দিনরাইত বাঘে মইষের ঝগরা;—এক মনিবের রায়ত হুকুমের আগে আরেক পক্ষের রায়তের মাথায় লাঠি চালানের লাগ্যা এক পায় খারা—সেখানে দুই পক্ষের রায়তে রায়তে—কুটুম্বিতা? ইরকম জলে কচুপাতায় মিতালির কথা খালি এক নিমুখারামেরই মুখে খাটে। এই সবতা ভাব্‌ত্যে ভাব্‌ত্যে গফুর খাঁ অনেক্ষন তক রাও-চাও কিছুই কর্‌লো না। তারপর ফট্‌কর‍্যা উঠ্যা খারায়্যা যখন সে কৈলো—"না ইবিয়া কিছুতেই আমি হব্যার দিমুনা"—বিবির তখন কেমুন এক রকমের চমক লাগ্যা গেচে। যে মানুষ দণ্ডেক কাল ও কাটে নাই—হাসিমুখে এক কথা কৈলো, সেই মানুষ যে ঠোটের কোণা না শুকাত্যেই মুখটারে কালা আংরা কর‍্যা আরেক কথা কয়—তার সোয়ামিরি এমুন স্বভাব তো কোন কালেই আচিলো না। ক্ষনিকক্ষণ তব্দ লাগ্যা থাকনের পর বিবি যখন মাথা তুল্যা তাকাল্যো—সর্দার

তখন আর সে ঘরে নাই। বিবির লগে কথা হওনের একটু পরেই শশুর বাড়ীর আর বেবাকেরেও আকবর সেকের নাতিন লগে রমজানের সম্বন্ধ করণে তার অমতটা খুব চোটে পাটে জানায়্যা সেই দিনই সে ইল্‌সা মারির চরে ফির‍্যা গেচে।

সকল দিগে থিকাই বিয়াটা যখন পারায় ঠিক ঠাক হয়্যা আইচিলো এমুন সোমে মধ্যিখান থিকা বাপে আস্যা এই খামাখা নাবস্তা করনে রমজানও মনে মনে খুব রুখ্যা খারাল্যো। সে জিদ কর‍্যা বস্‌লো—তোক্কারে তার বিয়া করণই চাই। অনেক খোসামুদ পরামুদে ও যখন তার মামারা কি আকবর সেক কেউই সর্দ্দারের নিষেধ উল্টায়্যা রমজানের কথায় রাজী হৈলোনা তখন সে দুই বাড়ীর মানুষের উপর খুব ফান্দি কুন্দি সুরু কর‍্যা দিলো। তাতেও যখন কোন ফল হৈলোনা তখন একদিন বাড়ীর কাউয়্যা পক্ষীটারেও নাজানায়্যা সে কোথায় যে নিরুদ্দিশ হৈলো আশ পাশে তানা তানা তালাস কর‍্যা ও তার কোনই ঠিকানা করণ গেলো না।

ইদিগে ছাওয়ালের লাগ্যা রমজানের মা যখন পাগল হয়্যা অন্নজল মুখে ছোয়ান ছাড়চে—এমুন সোমে একদিন খবর আইলো ইলসামারির চরের কাইজায় ভৈরব বাবুর তরপের এক লাঠ্যাল খুন হওনে দলের আয়ো কয়েকজনের লগে গফুর সর্দ্দারেরেও আসামী কর‍্যা জেলার হাজতে চালান দিচে। ইযাত্রায় তার ফাটক নির্ঘ্যাস। উপরা উপরি দুই দুইটা বুকফাটা দুঃখের চোট সর্দ্দারের বিবি সামলায়্যা উঠ্‌ব্যার পার্‌লোনা, সোয়ামির হাজতে যাওনের খবর শুননের দিন সেই যে সে শয্যা নিলো তার থিকা সে আর উঠে নাই।

* * *   * * *   * * *

চাইর বচ্ছর ফাটক খাটনের পর আইজ গফুর সর্দ্দার আর তার দলের আরো তিনজন আসামীর খালাসের দিন। জেলের দরজায় বংশী বাবুর চর মুলুকের নায়েব আর তিনির একধারে ভোজপুরী বরকন্দাজ রামদেও সিং খারা। রামদেওয়ের ডান হাতে সোনায় রূপায় নক্সাকরা পাকা বাশের গাইঠ্‌ তোলা একখান লাঠী, আর বাও হাতে একটা কাপরের বোচকা। দলের আর তিনজন লাঠ্যালের আগে আগে গফুর খাঁ জেলখানার দরজা পারয়্যা বাইরে আস্‌তেই—বরকন্দাজের হাতে থিকা সেই লাঠিখান নিজের হাতে নিয়া নায়েব মশয় গফুর খাঁর দিগে বারায়্যা দিয়া কৈলেন—"এই নেও সর্দ্দার কত্তা বাবুর বক্‌সীস্। রামদেও সিং সর্দ্দারের কাপর পিরণ আগে দিয়া তারপরে আর বেবাকেরে ছ্যাও।" গফুর খাঁ নায়েব মশয়রে সেলাম জানায়্যা ডান হাতে বক্‌শীশী লাঠীখান ধর্‌য়্যা কপালে ছোয়াল্য তারপরে তিনির দিগে তাকায়্যা কব্যার লাগ্‌লো—বক্‌শীশ্‌ তো পাইলাম, ৪ বচ্ছর জেল খাট্যাও বাইরল্যাম, আরো চাইর বচ্ছর খাট্‌লেও দুঃখু আচিলোন,—এই কত কয়্যা ছল্ ছল্ চোখে কি জানি কি একটু ভাব্‌লো তারপরে মাথা খারা কয়্যা আবার কব্যার লাগ্‌লো—যা হওনের তাতো হয়্যাই গেচে, তার লাইগা আর আপসস্ করি না, তয় দুঃখু রয়্যা গেল এই বেবাক কাইজারই হাতিবান্ধার জমিদারের হট্যায়া দিয়াও এত সাধের চরটা কত্তা বাবুর দখলে রাখ্‌বার পার্‌লাম না। সর্দ্দার আরো কি জানি কব্যার লাগ্‌চিলো নায়েব মশয় তার মুখের কথা কার্‌য়্যা নিয়া কয়্যা উঠ্‌লেন—"সর্দ্দার খবর সবই ভাল। ইল্‌সামারির চর আবার তোমাগোরেই নতুন বস্তিতে ছায়্যা যাইবো। আর

সেখানে তোমার লাগ্যা কর্ত্তাবাবু চাইর খাদা ভূই লাখেরাজ মঞ্জুর কৈরাচেন। ইল্‌সামারির চরটা আমাগোরে দখলেতো চির কালের লাগ্যা আইচেই, ভগবান কৈর্‌লে ভৈরব বাবুর তামান জমিদারীটাই কালে কালে আমাগোরে কর্ত্তাবাবুর ছাওয়াল কোকন বাবুরই হৈবো। কিছুই বুঝব্যার নাপার্যা সর্দ্দার তিনির মুখের দিগে হা কর্যা তাকায়্যা রৈচে—দেখ্যা নায়ব মশয় কব্যার লাগল্যেন—সেইযে বছর দুয়েক আগে জেলখানায় যায়্যা তোমার লগে দেখা করি—তারপরে আইজ তক অনেক ঘটনাই ঘট্‌চে, আর তার মধ্যে আসল ঘটনাটা হৈলো—হাতিবান্ধার ভৈরব বাবুর ছাওয়াল পাওয়াল বৈল্‌তে সবার একই মায়্যা। আর সেই মায়্যারি লগে মাস আষ্টেক আগে আমাগোরে কোকন বাবুর বিয়া হয়্যা গেচে—এই বিয়ায়—নায়েব মশর কথার বাকীটুক তিনির মুখে থিকা বাইর হতে না হত্যেই জমিদারের দেওয়া সোনায় রূপায় নক্সিকরা লাঠীখান সর্দ্দারের মুঠের থিক্যা খস্যা ধপ্‌ কর্যা মাটিতে পর্যা গেলো। মাটিতে পরা সেই চক্‌চকা লাঠিটার দিকে বেবাকের নজর যাত্যে না যাত্যেই দেখা গেলো—সে নিজেও টাল খায়্যা পথের ধূলায় বস্যা পরচ্যে। সর্দ্দারেরে আচম্বিতে পথের মধ্যে এই ভাবে বস্যা পরত্যে দেখ্যা উপস্থিত বেবাকেরই খুব এক চোট ভাব্যা চাক্যা লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ হেপাজতের পর সে যখন নায়েব মশর পাছে পাছে চলব্যার সুরু কৈর্‌লো তখনো তার মুখে রাও শব্দ কিছুই নাই।

সেদিনকার রাইতখান বংশীবাবুর জেলা সহরের বাসাবাড়ীতেই কাটায়্যা পরের দিন ভোর বিহানে নায়েব মশর লগে তাগোরে গাঁয়ের দিগে যাওনের কথা। রাইত পোয়াল্যে পর যখন যাত্রার

সময় হৈলো—তখন দেখা গেলো সর্দ্দারের কোন নিশানাই নাই—খালি জমিদারের দেওয়া আগের দিনকার সেই লাঠীখান ঘরের মাইঝার এক কিনারে পৈরা রৈচে।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

কঃ পন্থা*

—:•:—

কিছুদিন হতে যার সঙ্গে দেখা হয় তিনিই জিজ্ঞাসা করেন—কঃ পন্থা।—এমন কি তাঁরাও যাঁরা দুদিন আগে নবাবিষ্কৃত পলিটিক্যাল নিবৃত্তি-মার্গকে, এক লম্ফে স্বরাজে উত্তীর্ণ হবার অদ্বিতীয় পথ বলে প্রচার করতেন এবং দেশশুদ্ধ লোককে সেই পথে খেদিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত নাটকে দেখতে পাই যে, সেকালের রাজা রাজড়ারা দু পা চলতে হলেই, বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে আদেশ করতেন "মার্গং প্রদর্শয়।" এটা অবশ্য ছিল একটা রাজ-কায়দা। কেননা এ ঘর থেকে ও ঘর যাবার পথ বেচারা কঞ্চুকী যতটা জানত, রাজা বাহাদুরও নিশ্চয় ততটাই জানতেন। সেকালের রাজপ্রাসাদ ত আর গোলকধাঁধা ছিল না।

আজকের দিনে, আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের এই পথ জিজ্ঞাসাটাও কি একটা স্বরাজ-কায়দা? আমার বিশ্বাস তা মোটেই নয়। স্বরাজের সিধে রাস্তা, ডাইনে কি বাঁয়ে, সুমুখে কি পিছনে, মাথার উপর কি পায়ের নীচে? সে কথা আজ আমরা নিঃসন্দেহে কেউ বলতে পারি নে, অথচ সবাই জানতে চাই, তাই না এত জিজ্ঞাসাবাদ।

(২)

একটা সোজা ও সিধে পথ, আমরা যে চট্ করে দেখিয়ে দিতে পারি নে, তার কারণ ইতিপূর্ব্বে বহু মহাজন বহু পথ দেখিয়েছেন,

---

* বিজলী হইতে উদ্ধৃত।

আর সে সব পথ যে অপথ, বহু বিজ্ঞজন তাও আবার প্রমাণ করেছেন। ফলে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি. "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। এ স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ-প্রদর্শিত গোটাকয়েক পথের উল্লেখ করা যাক্।

স্বরাজের পথ কারও মতে বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আবার কারও মতে তা দেবালয়ের ভিতর দিয়ে। কেউ বলেন তা ছাপাখানার ভিতর দিয়ে, কেউ বলেন কারখানার ভিতর দিয়ে, কেউ আশা করেন যে তা কাউন্সিলের ভিতর দিয়ে, আবার কেউ বিশ্বাস করেন তা জেলের ভিতর দিয়ে।

এ সব মতের বিরুদ্ধে যে সব তর্ক উঠেছে—সেগুলি একবার স্মরণ করা যাক।—(১) বিদ্যালয়ের বাঙলা ত গোলামখানা। সেখানে আমরা গোলাম না বনে মানুষ হব কি করে? তারপর গোলাম কি কখনো স্বরাট হতে পারে? এ কথা কে না জানে যে এক তাসখেলা ছাড়া, জীবনের অপর কোন খেলাতেই গোলাম সাহেবের চাইতে বড় হতে পারে না। তারপর যাঁরা স্কুল কলেজের বিপক্ষে নন, তাঁরাও বলেন যে, যদি ভারতবর্ষের আপামর-সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হওয়া তক্, ভারতবাসী স্বরাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে না পারে,—তাহলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সে রাজ্যে প্রবেশ করা আমাদের ভাগ্যে ঘট্‌বে না।—অতএব ও পথ হয় অ-পথ নয় অনন্ত পথ।

(২) দেবালয়ের পথ ত পুণ্যপথ। ও পথ ধর্‌লে মানুষ যে দেবতুল্য হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে কথা হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক যদি তেত্রিশ কোটি দেবতা হয়ে ওঠে তাহলে স্বরাজ্য ত কোন ছার, এ দেশ স্বর্গরাজ্য

হয়ে উঠবে। মানুষ দেবতা নয় বলেইত তার পক্ষে স্বরাজ্য বিরাজ্য সাম্রাজ্য যা হোক একটা না একটা রাজ্য চাই। নইলে অরাজ্যতেই ত কাজ চলে যেত। এ ছাড়া আর একটা কথা আছে। আমরা যদি সব দেবালয়ের পথ ধরি ত, হিন্দুর পথ হবে মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর মুসলমানের মসজিদের। নিজ নিজ পথ ধরে আমরা চলব কাশীতে আর ওঁরা মক্কায়। তারপর মাঝপথে দুদলের মাথা ঠোকাঠুকিও হতে পারে। সত্য কথা এই যে এ পথ তখনই পুণ্যপথ, যখন তা হয় শূন্যপথ। কিন্তু স্বরাজ ত আশমানের নয়—জমিনের রাজ্য।

(৩) ছাপাখানা থেকে বেরয় ত এক কাগজ। কাগজের স্বরাজ্য ত তাসের ঘর। ও জিনিয় মানুষে তয়ের করে সুধু অবসর বিনোদনের জন্য। ওটা কাজ নয় খেলা। আমরা সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে স্বরাজ্যের তাসের ঘর ত অনেক বানিয়েছি কিন্তু তাতে করে মাটির স্বরাজ্যের দিকে এগিয়েছি কি পিছিয়েছি বলা কঠিন। জানোয়ারের ভিতর একমাত্র মানুষেরই ভাষা আছে অতএব কথা আমরা কইবই কিন্তু সেই এক কথার সাহায্যে স্বরাজ গড়ে তোলা অসম্ভব। স্বরাজ ত আর কাব্য নয়,—ইতিহাস, অর্থাৎ তা গড়ে তুলতে হয়, কলমে নয়, হাতে-কলমে।

(৪) ছাপাখানার উপর যাঁদের ভরসা নেই তাঁরা দেখিয়ে দেন কারখানার পথ। এঁদের কথা হচ্ছে বালবিধবার স্তনের মত "উত্থায় হৃদি লিয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথা।" অতএব আমরা ধনী না হলে স্বরাট হতে পারব না। ধনী হব কি করে?—উত্তর—হাতুড়ি পিটে। কারখানা হচ্ছে আসলে টাঁকশাল তাই এস সকলে

মিলে সেখানে ঢুকে লোহা পিটে সোনা তৈরি করি;—তারপর সেখান থেকে বস্তা বস্তা মোহর মাথায় করে যেখানে আসব; তারি নাম স্বরাজ। এর উত্তরে লোকে বলে টাঁকশাল হাতে না থাকলে, কারখানা চালানো যায় না। যার ধন নেই তাকে স্থধু পেট-ভাতাতেই হাবুড়ুবু পিট্‌তে হয়। সুতরাং কারখানার ভিতর দিয়ে আমরা টাঁকশালে নয় হাঁসপাতালে গিয়ে পৌঁছব।

(৫) কাউন্সিলের ভিতর দিয়ে কি করে স্বরাজ্যে যাওয়া যায় তা বাঙলার নূতন লাট একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন এ পারে রয়েছে অধীনতা আর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বাধীনতা,—কাউন্‌সিল হচ্ছে এ উভয়ের মধ্যে সেতু, এই সেতু ধরেই আমরা ওপারে গিয়ে উঠব। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—কাউন্সিল Bridge বটে কিন্তু ও Ass's bridge অতএব ও সেতু আমরা পার হতে পারব না। আর যাঁরা কাউন্সিলের পক্ষেও নন বিপক্ষেও নন, তাঁরা বলেন—যে ও সেতু অবলম্বন করবার পূর্ব্বে জানা দরকার সেতুটা কতখানি লম্বা আর তা টেঁকসই কি না। যা স্থলপথ ভাবা গেছ্‌ল তা যদি জলপথ হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই ত ডুবেছি। অথবা স্বরাজ্যের সেতু যদি স্বর্গের সিঁড়ির মত অফুরন্ত হয় তাহলে তা পার হবার জন্য চাই অনন্ত জীবন।

(৬) জেলের পথটা যে স্বরাজের রেলের পথ এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। ওখানে ঢোকা সহজ বেরনই কঠিন, কারণ এর প্রথমটি আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ দ্বিতীয়টি নয়। আসলে ও পথটা হচ্ছে একটা চোরাগলি। কেউ কেউ এ আপত্তিও তোলেন যে, আমরা ত শাস্ত্রের শাসনে সমাজের জেলখানাতেই বাস করছি,

কেউ কেউ আবার বলেন যে, আমরা ত সংসার গারদে যাবজ্জীবন মেয়াদ খাটছি, সুতরাং ওখান থেকে বেরবার যদি কোনও পথ থাকে ত সঃ এব পন্থা। এ সব হচ্ছে নৈতিক ও দার্শনিক আপত্তি, রাজনৈতিক নয়, অতএব উপেক্ষনীয়। একমাত্র পলিটিক্সের দিক দিয়ে যাঁরা এ পথ ধরেছিলেন এবং ধরিয়েছিলেন, তাঁরাও আজ বলছেন, থুড়ি। জেলে নিজে যাওয়াতে নাকি স্বরাজ্যের ক্ষতি, অপরে নিয়ে যাওয়াতেই লাভ। অতএব দাঁড়াল এই যে, যে পথটা আমাদের ধরে নিয়ে যাবার পথ সেটা আমাদের ধরবার পথ হতে পারে না।

(৩)

এই সব পণ্ডিতের বিচারের ফলে দাঁড়াল এই যে, এ সব পথের কোনটা যে স্বরাজের একমাত্র পথ, এ কথা এখন আর কেউ বলতে পারে না। তাই বলে যে ধরে নিতে হবে, যে "কঃ পন্থার" উত্তর "ন পন্থা" অবশ্য তাও নয়। সম্ভবতঃ উক্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হচ্ছে উপরোক্ত সব কটিই পথ। অন্ততঃ এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে ও কটি পথ বন্ধ করার নাম নূতন পথ খোলা নয়।

জীবনের স্রোত সমাজের ভিতর দিয়ে নানা দিকে নানা আকারে বয়ে যাবে, এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম। যদি এ কথাও মানা যায় যে দেশকাল হিসেবে, এই শত ধারার মধ্যে একটি না একটি ধারা প্রবল হয়ে উঠবে, তাহলে সেই সঙ্গে এও মানতে হবে যে অপর সকল ধারা যার শাখা উপশাখা নয়, সে জীবন-গঙ্গা দু দিনে মরাগাঙে পরিণত হবে।

এতক্ষণে আসল কথায় আসা যাক্। পৃথিবীতে এমন কোনও

তৈরি পথ নেই যা ধরে আমরা চোখ বুঁজে সোজা ও চোঁচা স্বরাজে গিয়ে পৌঁছব! ওহেন পথ স্বধু যে নেই তা নয়, থাকতেও পারে না। তৈরি পথ মানেই পরের হাতে গড়া পথ। স্বরাজের পথ কিন্তু গড়ে তুলতে হবে আমাদের পায়ে পায়ে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককেই যুগপৎ পথিক ও পথকর্ত্তা হতে হবে। এক কথায় পথিক গড়ে উঠলে পথও আপনি গড়ে উঠবে।

১২ই এপ্রিল, ১৯২২। বীরবল।

জেনোয়া কনফারেন্স।

—:*:—

সেকালের একজন রোমান কবি বলেছেন যে—"তীরে বসে সমুদ্রে জাহাজডুবি দেখতে বেশ মজা লাগে।" এ ধরণের কথা অবশ্য আমাদের মুখে শোভা পায় না। কেননা উক্ত রোমান কবি Lucretius ছিলেন ঘোর materialistic আর আমরা হচ্ছি জোর আধ্যাত্মিক। তাই সেদিন বাঙালির লেখা একখানি ইংরাজি খবরের কাগজে Genoa Conference:কে farce বলা হয়েছে দেখে একটু অশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

লেখক মহাশয়ের কথা হচ্ছে ও conference ফেঁসে যাবে। তা যদি যায় তাহলে ত সেটা একটা মস্ত হাসির জিনিষ হবে না। গতযুদ্ধে সে দেশে বহুকাল ধরে মানুষের তন-মন-ধন দিয়ে গড়া ঘরসংসার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, সেই ভগ্নাবশেষ থেকে আবার নূতন সংসার গড়ে তোলাটা হচ্ছে তাদের পক্ষে জীবন-মরণের কথা। মৃত্যুমুখে পড়লে বাঁচবার চেষ্টা জীব মাত্রেই করে থাকে, এমন কি সেও যে নিজের দোষে নিজে যমের দুয়োরে পৌঁচেছে। এ ব্যাপারের ভিতর হাস্যকর কিছুই নেই। তবে এ কথা সত্য যে কোন বিষয়ের উদ্দেশ্য আমাদের মনঃপুত হলেও তার উপায়টা আমরা হাস্যাস্পদ মনে করতে পারি। এক্ষেত্রে সে দেশে জাতি-

শত্রুতার ফলে যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে নূতন ফুটুম্বিতার সাহায্যে তার প্রতিকার করবার চেষ্টা হচ্ছে। এ ছাড়া অপর কি উপায় ইউরোপের লোক অবলম্বন করতে পারত, তা আমার বুদ্ধির অগম্য, যুদ্ধপর্ব্বের পর শান্তিপর্ব্ব রচনা করাই হচ্ছে, শুধু কাব্যের নয়, জীবনেরও নিয়ম। ইউরোপের এ চেষ্টা যদি বিফল হয়, তাহলে সেটা যে একটা মহা ট্র্যাজেডি হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আর ট্র্যাজেডিকে প্রহসন বলায় রসজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না, অতএব আধ্যাত্মিকতারও নয়। রসই যে আত্মা এই হচ্চে অধ্যাত্মশাস্ত্রের মুলসূত্র। তবে রসজ্ঞান কাউকে কেউ দিতে পারে না। অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে "রস" হচ্ছে "সহৃদয়ানাং হৃদয় বেদ্য"।

এর উত্তরে খবরের কাগজ-ওয়ালারা কি বলেবেন তা জানি। তাঁদের সাক্রোশ জবাব হবে এই যে—"রাখো তোমার কবিত্ব। আমাদের যা অবস্থা তাতে ইউরোপের উপর হৃদয়ের বাজে খরচ করবার এখন আমাদের সময় নয়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে নিজের চরকায় তেল দেওয়া; পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে।" এ হচ্ছে কাজের কথা—অতএব এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, শুধু একটি কথা ছাড়া। পরের ভাবনা ভাববার জন্য কেউ কারও মাথার দিব্যি দেয় নি,—কিন্তু যদি ভাবো ত ঠিক করে ভাবাই উচিত। দুইয়ে দুইয়ে ঠিক দেবার সম্ভবত কারও গরজ নেই, তবে কেউ যদি সখ করে তা দেয় তবে তার ফলে চার হওয়া উচিত। ছেলেখেলার আঁকের হিসেব থেকে দেখলেও দেখা যাবে এই Genoa ব্যাপারটা ঠিক হাসির ব্যাপার নয়। একের সম্পদ অবশ্য অপরের সম্পদ নয়, কিন্তু একের বিপদ অনেক ক্ষেত্রে অপরেরও বিপদ। দুনিয়ার এ

একটা অদ্ভুত নিয়ম যে, স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, কিন্তু রোগ একজন আর একজনকে অনায়াসে দিতে পারে। পাশের বাড়ীর লোকের প্লেগ হলে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনে, আনন্দ ত করতেই পারি নে, যদিচ সে লোক আমাদের শত্রুও হয়। অট্টালিকাতে আগুন লাগলে তার পার্শ্বস্থ পর্ণকুটীর দগ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে। সে অট্টালিকা রাজার আর সে পর্ণকুটীর সন্ন্যাসীর হলেও আগুন উভয়ের প্রতি সমান ব্যবহার করে। ধ্বংসশক্তির Conscience নেই। এই দেখুন না কেন?—ইউরোপ করলে যুদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে দেউলে হলুম আমরা। Genoa-Conferenceএর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার এই দেউলে অবস্থা থেকে মানুষের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। দেনদার দেউলে হলে পাওনাদারও দেউলে হয়, আর আজকে পৃথিবীর সকল জাতির পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের দেনা পাওনার সম্বন্ধ। এইত হয়েছে মুস্কিল। সুতরাং ইউরোপের জীবন-তরী ফাঁসতে দেখে আমরা হাসতে পারি নে। কারণ সত্য কথা এই যে, আমরা তীরে বসে নেই, আমাদেরও ঐ জাহাজে চড়ানো হয়েছে—অবশ্য deck passenger করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শটি idealist-এর গাঁজাখুরী নয়, তার হন্তারক হওয়াটাই realist-এর মাতলামি।

পৃথিবীর সকল ভূভাগের মত, ইউরোপেও idealistএর সংখ্যা অতি কম, আর realistএর সংখ্যা অতি বেশি। যে ব্যক্তি নামে না ভোলে সেই এ সত্য জানে। অপর পক্ষে realistরা যে জনসাধারণের কাছে নিজেদের idealist বলে চালিয়ে দেয়—এ সত্য তার কাছে কখন গোপন থাকে না যে আবাকে আব ব'লে ভুল

করে না, বেশকে দেহ ব'লে ভুল করে না। কিন্তু গোল ঘটেছে এতেই যে, জনসাধারণ ভাষা ও বেশেরই বশ।

এই কারণে Genoaর মেলামেশা যে নানা জাতের আত্মীয়তায় পরিণত হবে, এ আশা আমি করিনে। রাগ মানুষের যত শীগ্‌গির হয় তত শীগ্‌গির পড়ে না। সে যাই হোক, ও Conferenceএর উপর আমাদের যখন কোন হাত নেই, আমরা এ ক্ষেত্রে যখন দর্শক মাত্র, তখন ওখানে যা হচ্ছে, তাকে অভিনয় হিসেবে দেখা আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার কাছে এই নাটকটি হচ্ছে একটি tragi-comedy,—অর্থাৎ সেখানে আজ যা হচ্ছে তা comedy আর কাল যা হবে তা tragedy। যাঁরা সকল জাতির স্বার্থসিদ্ধি করতে একত্র হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে শুধু নিজের স্বার্থই দেখছেন। যে মনোভাবের প্রসাদে যুদ্ধ ঘটেছিল, সেই মনোভাব নিয়ে শান্তি-স্থাপনার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই পরস্পারের ভিতর স্রধু বকাবকি চটাচটি হচ্ছে। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের এতাদৃশ গরমিল দেখলে দর্শকের কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর হবেই হবে। স্বার্থ অবশ্য কোন জাত স্বেচ্ছায় ছাড়তে পারে না, এবং কোন জাত কোন অপর জাতকে ছাড়তে আদেশ করতে পারলেও, অনুরোধ করতে পারে না। তোমরা সকলে ভাল হও আর আমার ভাল হোক, এমন কথা মনে থাকলেও মুখে আনা কঠিন। কিন্তু একের স্বার্থের সঙ্গে অপর সকলের স্বার্থের যোগ করাটা কি এতই অসম্ভব? আমরা যাকে সমাজ বলি তা বহু ব্যক্তির বিভিন্ন স্বার্থের যোগাযোগের উপরেই ত খাড়া রয়েছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি মিলে যখন সমাজ গড়তে পেরেছে তখন জাতির সঙ্গে জাতি মিলে একটা সকল জাতীয় সমাজ

কি কখনো গড়ে তুলতে পারবে না? আমার বিশ্বাস ওরূপ আন্তর্জাতিক সমাজ-গঠন মানুষের পক্ষে সহজ না হলেও অসম্ভব নয়।

নানা জাতির এই সন্ধির ভিত্তি হবে কি বিশ্বপ্রেম? অবশ্য নয়। স্বজাতির প্রতি ভালবাসার চাইতে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ মানুষের পক্ষে ঢের বেশি স্বাভাবিক। সুতরাং হঠাৎ যে একদিন পৃথিবীর সকল জাতি পরস্পর পরস্পরের ভালবাসায় পড়ে যাবে তার কোনই সম্ভাবনা নেই। আর যদিও একদিন তা হয় তাহলে দুদিন সে প্রণয় টিঁকবে না। বিজয়ার দশমীর কোলাকুলি যে একাদশীর দিন দলাদলীতে পরিণত হয়—এ ত তোমার আমার চোখে দেখা সত্য। হৃদয়ের মত অস্থির জিনিষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

তবে কি সে ভিত্তি হবে মানুষের ন্যায়বুদ্ধি? নীতি যদি স্বার্থের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হয় তা হ'লে তা হয় আকাশকুসুম; আর যেখানে এ দুটি পরস্পর বিরোধী হয় সেখানে নীতি হারে স্বার্থ জেতে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ কথা লেখা আছে। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা একই শাস্ত্রকে কখনো নীতিশাস্ত্র বলেছেন, কখনো অর্থশাস্ত্র বলেছেন।

তাহলে দাঁড়াল এই যে যেমন মানুষের, তেমনি জাতির সঙ্গে জাতির স্বার্থ সমন্বয়ের মূলে থাকবে অর্থের সমন্বয়। আমি ভোক্তা আর তুমি কর্ত্তা অথবা তুমি ভোক্তা আর আমি কর্ত্তা যতদিন আমরা পরস্পর এই মনোভাব পোষণ করব, ততদিন আমরা মারামারি কাটাকাটি করবই। আমাদের সকলকেই যুগপৎ কর্ত্তা ও ভোক্তা হতে হবে এই সুবুদ্ধি মানুষের মাথায় যেদিন ঢুকবে তখন বিশ্বমানবের

মৈত্রীর গোড়া পত্তন হবে। এ সত্য মানুষে শুনে শিখতে পারবে না, তাকে ঠেকে শিখতে হবে। মানুষ আজ যে বিপদে ঠেকেছে, তাতে করে তার এ বুদ্ধি জন্মান আশ্চর্য্য নয়। এই স্বার্থজ্ঞান জন্মালে তার অনুরূপ ন্যায়বুদ্ধিও জন্মাবে, কেননা মানুষের আর্থিক ব্যবহারের শাসন কর্ত্তা হচ্ছে তার ন্যায়বুদ্ধি। তার পর চাই কি সেই নবনীতি থেকে তার মনে নবপ্রীতিও জন্মলাভ করতে পারে। ইতিমধ্যে প্রতি জাতকে, মনে, চরিত্রে, ব্যবহারে, নিজেকে এমন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে যার ফলে সে জাত অপর জাতের বিদ্বেষ নয়, প্রীতি আকর্ষণ করতে পারে। এর কোনটিই মানুষের অসাধ্য নয়। তাই আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি—মানব সভ্যতার এই চরম আদর্শ একদিন না একদিন বাস্তবে পরিণত হবে। এ বিশ্বাস হারালে মানুষ যে বাদবাকী চারপেয়ে জানোয়ারের চাইতে শ্রেষ্ঠ জীব সে বিশ্বাসও হারাতে হয়, আর তা হারালে কাব্য কলা দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি সব এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়; বাকী থাকে সুধু ঘাস আর বিচিলি।

আমার এ বিশ্বাসের কথা শুনে যদি কেউ বলেন যে আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি—তার উত্তরে আমি বলব "হাঁ তাই"। ভবিষ্যতের স্বপ্ন যখন আমাদের দেখতেই হবে, তখন দুঃস্বপ্ন দেখার চাইতে সুস্বপ্ন দেখাই ভাল।

আর এক কথা। সাদা লোক আত্মহত্যা করলে যে কালো লোক সব অমৃতস্য পুত্রাঃ হবে, এ হেন দুরাশা মানুষে অচৈতন্য না হলে করতে পারে না। স্মরণ রাখবেন যে, রঙ চর্ম্মের ধর্ম্ম। আর নানা রঙের চামড়ার নীচে আছে একই রক্ত মাংস আর সেই রক্ত

মাংসের দাবী মিটিয়েই সাদা কালো, সকলকেই আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি করতে হবে। গোল ত ঐখানেই। আত্মা অশরীরী হলে ত তার আর কোন বালাই থাকৃত না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

২৮শে এপ্রিল ১৯২২।

(রবীন্দ্রনাথের Natalism in "Japan" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ)

জাপানের জাতীয়তা।

অবসাদের বন্ধনই সব চেয়ে গুরুতর বন্ধন—আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীনতার শৃঙ্খলে আমাদের চিরতরে শৃঙ্খলিত করে রাখে। আমরা পুনঃপুনঃ শুনছি যে এসিয়া অতীতের মধ্যে বাস করে। সমাধি মন্দির যেমন মৃতকে অমর করবার প্রয়াসেই তার ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করতে থাকে আমাদের অবস্থাটা ঠিক সেইরূপ। আমাদের মুখটা পীছুর দিকে ফিরে আছে বলে আমরা অগ্রসর হবার পথে আদৌ চল্‌তে পারি না। আমরা এই অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়েছি এবং নিজেরাও একে বিশ্বাস করতে সুরু করেছি। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লোক এই অভিযোগের হীনতায় একান্ত অধীর হয়ে নানারূপ আত্ম-প্রতারণার দ্বারা একে গর্ব্বের বিষয়ে পরিনত করবার ব্যর্থ অধ্যবসয়ে ব্যাপৃত হয়েছেন। কিন্তু এইরূপ গর্ব্ব লজ্জারই ছদ্মরূপ এ নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করে না।

যখন অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়িয়েছিল এবং আমরা যখন ভাবছিলাম এর ব্যতিক্রম হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, জাপান তখন তার স্বপ্ন থেকে উত্থিত হল এবং পুরাণ-কথিত দানবের ন্যায় এক পাদক্ষেপে শতাব্দীর নিশ্চেষ্টতাকে অতিক্রম করে বর্ত্তমান যুগের চরম সিদ্ধিকে অধিকার করে নিল। জড়তাকে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা বলে

ধরে নিয়ে এতদিন আমরা যে মোহে অভিভূত হয়ে ছিলাম এই ঘটনায় তা' দূর হয়ে গেছে। এই এসিয়ায় যে একদিন বড় বড় সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল, দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য কলা যে একদা এই এসিয়ায় উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, জগতে যে কটি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে তাদের সব কয়টার যে জন্মভূমি এই এসিয়া আমার একথা বিস্মৃত হয়েছিলাম। অতএব এসিয়ার জল মাটির কোনও দোষ যে মানুষের চিত্তকে নিশ্চেষ্ট এবং গতি-শক্তিকে ক্ষীণ করে দেয় একথা কোনও মতেই বলতে পারা যায় না। পশ্চিম যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তারও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই পূর্ব্ব ভূখণ্ডে সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হয়েছে। একে কখনই জড়-চিত্ত এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির লক্ষণ বল্‌তে পারা যায় না।

তারপর হঠাৎ পূর্ব্বের আকাশ অন্ধকারে ঢেকে গেল। কালের প্রবাহ যেন সহসা থেমে গেল, আর এসিয়া যেন নূতন খাদ্য গ্রহণ করা বন্ধ করে দিয়ে অতীতের চর্ব্বিতচর্ব্বন কর্‌তে আরম্ভ করে দিলে। এই নীরবতা মৃত্যুরই সমান। যে সত্য মানুষের জীবনকে যুগ যুগান্তর কলুষ হতে রক্ষা করে আসছে—যা বায়ুপ্রবাহের মত পৃথিবীকে চিরকাল স্নিগ্ধ ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে, যে কণ্ঠ থেকে সেই মহাসত্য উদ্গীত হয়েছিল তা নীরব হয়ে গেল।

জীবনে নিদ্রা বলে একটা অবস্থা আছে। এই অবস্থায় আমরা সকল চেষ্টা থামিয়ে দিই—তখন আমাদের গতিশক্তি থাকে না, তখন আমরা নূতন খাদ্য গ্রহণ করি নে—জাগ্রত অবস্থায় যা খেয়েছি তারই রোমন্থন করে তখন আমরা জীবন যাপন করি। তখন আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ি—আমাদের মাংসপেশী সকল শিথিল হয়ে

আসে, এই জড়তা নিয়ে মানুষ তখন আমাদের উপহাস করে। কিন্তু জীবন ছন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে যতির সঞ্চার করে তাকে নবীভূত করে নিতে হয়। জীবন সচেষ্ট অবস্থায় নিজেকে কেবলি ব্যয় করতে থাকে এই ব্যয় বরাবর একটানা চল্‌তে পারে না বলে, তার পশ্চাতে পশ্চাতে এই নিশ্চেষ্ট অবস্থাটা অনুসরণ করে, এই অবস্থায় আমরা সকল ব্যয় থামিয়ে দিই এবং সকল চেষ্টা হতে বিরত হয়ে বিশ্রামের মধ্যে নিজেদের ক্ষতিপূরণ করে দিই।

মানুষের মন বড়ই মিতাচারী। প্রতিপদে চিন্তা কর্‌বার ঝঞ্চাট এড়াবার তরে সে অভ্যাসের সৃষ্টি করে নেয় এবং তারই খাঁজে খাঁজে একান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে থাকে। আদর্শ একবার গঠিত হয়ে গেলে মন আপনা আপনি অলস হয়ে পড়ে। তখন নূতন চেষ্টায় এর সঞ্চয়কে ভারযুক্ত কর্‌তে এ ভীত হয়। অভ্যাসের দুর্গের অন্তরালে এর সমস্ত গুণগ্রামকে আবদ্ধ করে দেওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে; কিন্তু এতে নিজেকেই নিজের সঞ্চয়ের ভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ কৃপনতারই অনুরূপ। বর্দ্ধিষ্ণু এক পরিবর্ত্তনশীল জীবনের সংস্পর্গ থেকে আদর্শকে বিচ্ছিন্ন কর্‌লে তার সজীবতা নষ্ট হয়। নির্ব্বিঘ্নতার সীমার মধ্যে আদর্শের যথার্থ স্বাধীনতা থাকে না—নব নব চেষ্টার এবং নব নব অভিজ্ঞতার দায় সঙ্কুল পথেই তার স্বাধীনতা।

জাপান যখন একদিন তার প্রাচীন অভ্যাসের বেড়া ভেঙ্গে হঠাৎ বিজয়ীর মত বাহিরের জগতে বের হয়ে এল, সে দিন সমস্ত বিশ্ব বিস্ময়-চকিত নেত্রে তা' দেখে বস্তুতঃ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এটা এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হল যে, মনে হল সমস্ত ব্যাপারটা

যেন বেশ পরিবর্ত্তনের মতই একান্ত সহজ ও সরল এবং একে একটী নূতন দুঃসাধ্য সৃষ্টির মত একেবারেই মনে হল না। সে একই সময়ে পূর্ণতার এবং নবীনতার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াল। এই ব্যাপারটীকে ইতিহাসের একটা খেয়াল অথবা মহাকালের ছেলে-খেলা বলে অনেকেই আশঙ্কা করে ছিল। অনেকেই একে সাবানের বুদ্বুদের মত অন্তসার-হীন বলে প্রথমটা অবজ্ঞা করেছিল। কিন্তু জাপান এটা চূড়ান্তভাবে প্রমান করে দিয়েছে যে তার এই ক্ষমতার বিকাশ একটা ক্ষণস্থায়ী স্ফূর্ত্তি মাত্র নয়—আজ সে যে কালের একটা আকস্মিক প্রবাহে প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশ্বের অঙ্গনে উত্থিত হয়েছে, পরমুহূর্ত্তেই আবার বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাবে এ তার নিয়তি নয়।

আসল কথা হচ্ছে—জাপান একই সময়ে প্রাচীনতা এবং নবীনতাকে পেয়েছে। পূর্ব্ব ভূখণ্ডের যে বৈদগ্ধ্য মানুষকে আত্মার মধ্যেই শক্তি এবং সম্পদের সন্ধানে প্রেরণ করে—বিপদ এবং ক্ষতির মুখে যা' মানুষকে ধৈর্য্য ধরবার উপদেশ দেয়—যা' মানুষকে নিষ্কাম আত্মত্যাগের বিধান দেয়, যার শিক্ষায় মানুষ সত্যের জন্য মৃত্যুকে অম্লান মুখে বরণ করে এবং বিচিত্র ও সামাজিক বাধ্যতাকে চিরজীবন বহন করে, জাপান উত্তরাধিকার সূত্রে অতিত থেকে তা' লাভ করেছে। এক কথায় জাপান শতদল পদ্মের মত প্রাচীন পূর্ব্ব ভূখণ্ডের গভীরতার মধ্য থেকে সুকুমার সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয়ে, তারই গভীরতাকে এখনও দৃঢ়ভাবে ধরে আছে।

এই প্রাচীন পূর্ব্ব-ভূখণ্ডের সন্তান জাপান তার পৈতৃক প্রাচীনতাকে অবলম্বন করে অভিভূত হয়ে পড়ে নি। সে বর্ত্তমান

যুগের কাছ থেকেও তার শ্রেষ্ঠ সম্পদের দাবী করছে। সে যেদিন তার অভ্যাসের বাঁধ ভেঙ্গেছে—সে যেদিন জড়চিত্তের নিরর্থক প্রথা-ঘটিত আবর্জ্জনা সঞ্চয়ের মায়া কাটিয়ে বিচারের পথে বের হয়ে এসেছে, সেদিন আমরা তার অন্তরের নির্ভীকতার পরিচয় পেয়েছি। সে এই ভাবেই আজ জীবন্ত কালের সংস্পর্শে এসে বর্ত্তমান সভ্যতার দায়িত্বকে একান্ত ব্যাকুল উৎসাহের সহিত স্বীকার করে নিয়েছে।

এই ঘটনাই আজ সমস্ত পূর্ব্বমহাদেশকে প্রাণবান করে তুলেছে। আমরা বুঝেছি যে, আমাদের মধ্যে এখনও প্রাণ ও শক্তি আছে—শুধু বাহিরের মৃত আবরণটা সরালেই তা' প্রকাশ হয়ে উঠবে। আমরা এখন বেশ উপলব্ধি করেছি যে, মৃতের মধ্যে আশ্রয় নিলে, মৃত্যুকেই স্বীকার করা হয়। জীবনের সমস্ত দায়কে যতক্ষণ আমরা স্বীকার করি, ততক্ষণই আমরা সজীব থাকি।

জাপান যে পশ্চিমের অনুকরণ করে আজ তার বর্ত্তমান অবস্থায় পঁহুছিতে পেরেছে, একথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমরা জীবনের অনুকরণ করতে পারি না—দীর্ঘকাল শক্তির ভাণ করাও সম্ভব নয়। অনুকরণ মাত্রেই দুর্ব্বলতার হেতু। কেননা এ আমাদের স্বভাবকে কেবলি প্রতিহত করে, এ আমাদের পথের বাধা। অপর লোকের চামড়া দিয়ে যদি আমাদের অস্থিপঞ্জরকে ঢাকা যায়, তাহলে যেমন সেই বাহিরের চামড়ার সঙ্গে দেহের অস্থিপুঞ্জের নিয়তই সংঘর্ষ হতে থাকে, এই অনুকরণ ব্যাপারটা ঠিক তেমনি।

আসল কথা এই যে, বিজ্ঞান মানুষের অন্তরঙ্গ নয়—ওটি জ্ঞান এবং শিক্ষা মাত্র। বস্তু জগতের নিয়মের জ্ঞান থেকে আমাদের অন্তরতর মনুষ্যত্বের আদৌ বিকাশ হয় না। অপরের কাছ থেকে জ্ঞান ধার

করা যায়—কিন্তু পরের স্বভাবকে আমরা কদাচই ধার করতে পারি না।

আমাদের শিক্ষায়, অনুকরণের একটা পর্য্যায় আছে। সেই অবস্থায় আমরা আসল থেকে বাজে জিনিসকে পৃথক করতে পারি নে। পাছে কিছু বাদ পড়ে যায়, এই ভয়ে আমরা তখন শস্যের সহিত খোসাকেও গলাধঃকরণ করি। লোভে পড়ে আমরা সবটা খাই বটে, কিন্তু আমাদের জীবনীশক্তি সব ত আত্মসাত করতে পারে না। সজীব পদার্থ নিজের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের মধ্যে কতক গ্রহণ এবং কতক বর্জ্জন করেই নিজের সজীবতা সপ্রমাণ এবং রক্ষা করে। সজীব পদার্থ নিজেকে খাদ্যের মধ্যে মগ্ন করে না, সে খাদ্যকেই নিজের মধ্যে নিজের রক্তমাংসে অস্থি মজ্জায় রূপান্তরিত করে নেয়। এই রূপেই সে সতেজ হয়ে উঠে। শুধু খাদ্যের সঞ্চয়ের দ্বারা নয়।

জাপান পশ্চিম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এনেছে, কিন্তু জীবনী-শক্তিকে সে সেখান থেকে আনে নি। জাপান পশ্চিম থেকে বিজ্ঞানের যে সব উপকরণ আহরণ করে এনেছে, সে তার মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিয়ে নিজেকে একটা ধারকরা যন্ত্রে পরিণত করতে পারবে না। তার একটা আত্মা আছে। সে তাকে তার সকল প্রয়োজনের উপরেই জয়ী করবে। তার যে এ ক্ষমতা আছে—এই পরিপাক ক্রিয়া যে ইতিমধ্যে চলেছে, তার সবল স্বাস্থ্যের লক্ষণ থেকেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আমাদের ঐকান্তিক আশা এই যে, জাপান যেন কদাচ তার বাহিরের সঞ্চয়ের তরে নিজের আত্মাকে না হারিয়ে ফেলে। এইরূপ গর্ব্ব বস্তুতঃই হেয়। এই হীনতা মানুষকে দারিদ্র্য এবং দুর্ব্বলতার মধ্যে নিয়ে যায়। পোষাকী বাবুরা

যেমন দেহের অপেক্ষা দেহের আবরণ নিয়ে অধিক গর্ব্ববোধ করে, এও ঠিক তাই।

বর্ত্তমান সভ্যতার হাত থেকে জাপান যে সুবিধা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তা নিয়ে সে কি করবে তাই দেখবার জন্য সমস্ত জগত উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যদি তা' পশ্চিমের অনুকরণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তবে তার সম্বন্ধে বিশ্বমানব যে আশা করে আছে, তা' ব্যর্থ হবে। পশ্চিম, বিশ্বের সম্মুখে অনেক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত করেছে—কিন্তু তাদের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে নি। ব্যক্তির সহিত সমাজের, ধনীর সহিত শ্রমিকের, পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সংঘর্ষ সেখানে দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে। সেখানে ঐহিক সুখ-লালসার সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের, জাতিগত স্বার্থপরতার সহিত মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শের, রাজ্য বাণিজ্যের বিপুল ব্যবস্থার কদর্য্য জটিলতার সহিত মানুষের অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষিত সরলতা, সুষমা এবং অবকাশ-প্রবণতার যে বিরোধ বেধেছে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাই এখন বিশ্বের পক্ষে সব চেয়ে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছে। সবাই জাপানের কাছ থেকে এই সমস্যার মীমাংসা প্রত্যাশা করছে।

এই পশ্চিমের সভ্যতার অপরিমেয় সঞ্চয়ের ভারে আজ যে তার নিজেরই শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে, তার লক্ষণ যেখানে সেখানে ফুটে উঠছে। এ মুখে মানবপ্রেমের যতই আস্ফালন করুক, এ যে আজ মানুষের পক্ষে ভয়ানক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। ইতিহাসের আরম্ভে বর্ব্বরদের অত্যাচারে মানুষ যে ভাবে পীড়িত হত, এর অত্যাচার তার চেয়েও শতগুণে পীড়াদায়ক একথা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। এ স্বাধীনতা প্রিয় বলে

মুখে বড়াই করে বটে, কিন্তু এ যেরূপ দাসত্বের বিস্তার করছে, তার কাছে অতীত যুগের কৃতদাস-প্রথাও লজ্জায় নত হয়ে যায়। এর এই ভয়ানক হীনতার মোহে মানুষ যে দিন দিন মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে—যে সব মহৎ গুণ মানুষকে বড় করে, তারা যে দিন দিন তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে, সে কথার উল্লেখ মাত্রই বাহুল্য।

অতএব এই পশ্চিমের সভ্যতাকে নির্ব্বিচারে একেবারে লঘুভাবে গ্রহণ করা কোনও মতেই শ্রেয় হতে পারে না। এর উদ্দেশ্য, এর উপায় এবং এর উপকরণকে আজ যদি আমরা অপরিহার্য্য বলে স্বীকার করে নিই, তাহলে বস্তুতঃই সাংঘাতিক ভুল করা হবে। এর মধ্যে আমাদের পূর্ব্বদেশের চিত্তকে, আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে, আমাদের সরলতার আদর্শকে প্রয়োগ করতে হবে—সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যে বিচিত্র দায় আছে, তাদের স্বীকার করে নিয়েই এই সভ্যতার তরে আমাদের নূতন পথের আবিষ্কার করে নিতে হবে। এ প্রতি পদে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাধীনতা এবং প্রাণ হরণ করে চলেছে, আমাদের এর সেই নির্ম্মমতাকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে আসতে হবে। পুরুষ পুরুষানুক্রমে আমরা যে আমাদের নিজের ভাবে চিন্তা করে—উপলব্ধি করে—কর্ম্ম করে এসেছি, তাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত আজই পরিত্যাগ করা অসম্ভব। এ আমাদের রক্তের সঙ্গে, আমাদের অস্থিমজ্জায়, আমাদের মাংসে, আমাদের মস্তিষ্কে নিহিত হয়ে আছে। সুতরাং আমরা যাতেই হাত দেব, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের এই সাধনার ফল আমাদের অজ্ঞাতসারে এমন কি আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূলেও তার উপর প্রভাব বিস্তার করবেই করবে। একদা জাপান তুমি মানবের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান

করেছিলে। তোমার দর্শন ছিল—তোমার জীবনযাত্রার নিজস্ব প্রণালী ছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাকে তোমার সেই সব সাধনা প্রয়োগ করতে হবে। তা' থেকে যে অভিনব সভ্যতার সৃষ্টি হবে, তা পশ্চিমের অনুকরণ মাত্র হবে না। সেই সৃষ্টির মধ্যে তুমি তোমার আত্মাকেই অভিব্যক্ত করে তুলবে—বিশ্ব মানবের কল্যাণ যজ্ঞে তোমার সেই দান তোমার আত্মাকেই ধন্য করে তুলবে। এসিয়ার মধ্যে তোমরাই এখনও স্বাধীন আছ। পশ্চিম থেকে তোমরা যে সব উপাদান সংগ্রহ করেছ একমাত্র তোমরাই নিজেদের প্রতিভা এবং প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে সক্ষম। অতএব তোমাদের দায়িত্বও সবার চেয়ে বেশী। মানব সভায় পশ্চিম যে সমস্যা উপস্থিত করেছে এসিয়া তোমারই কণ্ঠে তার উত্তর দিবে। যন্ত্রের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে স্বার্থপরতার জায়গায় মনুষ্যত্বকে বসিয়ে বর্ত্তমান সভ্যতাকে সংস্কার করে তুলবার ভার ভগবান এই পূর্ব্বদেশের উপর ন্যস্ত করেছেন। তোমাদেরই দেশে ইতিমধ্যে তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। এখন ক্ষমতা এবং সফলতার প্রলোভনে উন্মাদ হওয়া তোমাদের পক্ষে একেবারেই অশোভন এবং অন্যায় হবে। এখন তোমাদের সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনাতেই নামতে হবে।

সখ্যের বন্ধনই ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মধ্যে সত্যকার বন্ধন। যে দিন ব্রহ্মদেশ থেকে জাপান পর্য্যন্ত এই মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিল সেই অতীতের কথা আজ আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছি না। তখন আমাদের মধ্যে একটা সজীব হৃদয়ের যোগ ছিল—সেই যোগসূত্রে তখন আমাদের মধ্যে

মনুষ্যত্বের গূঢ়তম প্রয়োজনের বাণীর আদান প্রদান হ'ত। তখন আমরা পরস্পরকে ভয়ের চক্ষে দেখতাম না—পরস্পরকে বিধ্বস্ত করবার তরে তখন আমাদের এত অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন করতে হ'ত না। আমাদের মধ্যে তখন যে সম্বন্ধ ছিল, তার সহিত স্বার্থের কোনও সম্পর্কই ছিল না। তখন আমরা অবাধে ভাব ও আদর্শের আদান প্রদান করতাম। তখন আমরা প্রেমের দ্বারাই পরস্পরকে পেয়েছিলাম। ভাষা অথবা প্রথার পার্থক্য আমাদের সেই মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। জাতি-গর্ব্ব কিম্বা ধন ও বলের গর্ব্ব আমাদের সেই প্রেমের সম্পর্ককে কলুষিত করতে পারেনি। এই সম্মিলিত হৃদয়ের অরুণ কিরণের প্রভাবে আমাদের সাহিত্য ও আমাদের শিল্পকলা নব নব পত্র পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন ইতিহাসের মানুষ, প্রেমের প্রভাবে সকল বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে নিজেদের মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। যখন মানুষ পরমার্থের তরে এমন উদারভাবে মিলিত হচ্ছিল—সেই শান্তি ও প্রেমের যুগে তোমাদের মধ্যে যে অমৃত সঞ্চিত হয়ে এসেছে, আজ যে তোমরা তারই প্রভাবে এই নবযুগের মধ্যেও নিজেদের প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারবে এমন আশা হয়। আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তর এসেছে, সৃষ্টির আদি থেকে অদ্যাবধি এমন যুগান্তর কখনও ঘটে নাই। তোমাদের সেই পিতামহদের অমৃতের সঞ্চয় আজ তোমাদের এই বিপ্লবের হাত থেকে কি রক্ষা করবে?

যে রাজনৈতিক সভ্যতা ইউরোপের মাটি থেকে উত্থিত হয়ে আজ সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, বর্জ্জন ও সংহারই তার

ভিত্তি। সে সকলকেই দূরে রাখতে অথবা নির্ম্মূল করবার তরে সজাগ হয়ে আছে। এ যে শুধু মাংসাশী, তা' নয়—এ নর-মাংসাশী। এ পরস্বাপহরণ কর্তে কুণ্ঠিত হয় না—এ যেন বিশ্বের সমস্ত ভবিষ্যতকে আত্মসাৎ কর্তে চলেছে। অন্য জাতের একটু উন্নতি দেখলেই এ ভীত হয়ে পড়ে। নিজের সীমার বাহিরে একটু শ্রীবৃদ্ধি দেখলেই তাকে বিপদ ভেবে এ ব্যাকুল হয়ে উঠে। যারা দুর্ব্বল তাদের দুর্ব্বলতার মধ্যে চিরদিনের তরে বদ্ধ করে রাখতে, এ আদৌ দ্বিধা অনুভব করে না। এই সভ্যতা যখন ক্ষমতা লাভ করেনি—তার পূর্ব্বে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, রাজ্য সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে, তার ফলে মানুষে অনেক রকম দুঃখের ভাগী হয়েছে। কিন্তু এমন বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসী দৃশ্য পৃথিবীতে এর পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নি। এমন, জাতকে জাত বিলুপ্ত করবার চেষ্টা এর পূর্ব্বে কখনও কেউ দেখেনি। আজ যেন একটা প্রকাণ্ড হিংসা সমস্ত পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করবার তরে তার জঘন্য নখ দন্তকে বিস্তার করেছে। এই রাজনৈতিক সভ্যতা বিজ্ঞান-সম্মত হতে পারে, কিন্তু এতে মনুষ্যত্ব নেই। ধনী যেমন আত্মাকে খর্ব্ব করে ধন সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করে ক্রমান্বয়ে ধনশালী হয়ে উঠে, এও তেমনি এর সমস্ত শক্তিকে একই উদ্দেশ্যে সংহত করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। এ স্বার্থের তরে অনায়াসে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এ স্বার্থসিদ্ধির তরে মিথ্যার জাল বুনতে আদৌ লজ্জা বোধ করে না। এ লোভকে দেবতার আসনে বসিয়ে দেশভক্তির অঞ্জলি দিয়ে তাকে পূজা করে। যাই হোক, এটা নিশ্চয় বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপার বরাবর চল্তেই পারে না। কেননা, পৃথিবীতে ন্যায় বলে একটা জিনিস আছে, সে কখনই

এই ব্যভিচারকে চিরদিন রেয়াৎ করবে না। ব্যক্তিভাবে আমরা যে ন্যায়ের শাসনের সুবিধা ভোগ করে চলেছি, জাতের নামে সেই ন্যায়কে লঙ্ঘন করা বেশীদিন সম্ভব হবে না। এই রাজনৈতিক সভ্যতার আয়ু যে দীর্ঘ নয়, একথা নিশ্চয় জানবেন। গ্রীসের প্রদীপ আজ নির্ব্বাপিত—রোমের শক্তি আজ তার সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের মধ্যে সমাহিত। কিন্তু সেই সভ্যতা সমাজ এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ যার ভিত্তি, তা' আজও চীন এবং ভারতের মধ্যে সজীব হয়ে আছে। এই কলিযুগের কলগত শক্তির আদর্শে একে বিচার করলে, একে হয়ত আপাততঃ দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হতে পারে; কিন্তু এ বীজের মত; ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্যে এখনও জীবনের সম্ভাবনা নিহিত হয়ে আছে—একদিন এ অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়বে; কিন্তু শক্তি এবং লোভের ভগ্নাবশেষকে ঈশ্বরের প্রসাদ ধারাও সজীব করে তুলতে পারবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কখনই জীবন ছিলনা - তারা বিশ্ব-ভুবনের বিরোধরূপেই অবতীর্ণ হয়েছিল। যে সব জাত ক্ষমতার মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চিরন্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে, তারা তাদেরই ভগ্নাবশেষ মাত্র।

পূর্ব্বদেশের আদর্শ স্থিতিশীল—তাদের মধ্যে গতির তত্ত্ব নাই এমনি একটা অপবাদ সচরাচর শুনা যায়। এর কারণ আমাদের জ্ঞান যখন অস্পষ্ট থাকে, তখন আমাদের সেই জ্ঞানের বিষয়কে আমরা অস্পষ্ট বলে গাল দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কালার সামনে হারমোনিয়াম্ বাজালে সে যেমন আঙুলেরই নড়াচড়াটেকেই হারমোনিয়াম্ বাজনার উদ্দেশ্য বলে ভুল করে, পাশ্চাত্য দেশের

অধিবাসিরাও আমাদের সভ্যতাকে কেবলি নিরবচ্ছিন্ন দার্শনিকতা বলে উড়িয়ে দেয়। আমাদের সভ্যতা যে একটী গভীর সত্যের উপর স্থাপিত, এ তারা মনেই করে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সত্যকে উপলব্ধি না করলে, তাকে অপর উপায়ে সপ্রমাণ করা যায় না। আমার সাম্‌নে যে দৃশ্যটী আছে, তাকে যদি আমি না দেখি, তাহলে তাকে আমার দৃষ্টির মধ্যে সত্য করে তোলা কোনও মতেই সম্ভব হতে পারে না। তেমনি আমাদের সভ্যতা যে ভুয়ো নয়—তাতে যে এমন একটা সত্য আছে, যাতে মানুষ আশ্রয় লাভ করতে পারে, যার বিশ্বাস নাই তাকে একথা বোঝান অসম্ভব।

যারা বলেন আমরা আদৌ অগ্রসর হচ্ছি না—আমাদের মধ্যে একেবারে গতির তত্ত্ব নাই, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি—তাদের এ ধারণার কারণ কি? লক্ষ্যের আদর্শে গতি নির্ণয় করতে হয়। রেলগাড়ী তার গন্তব্য ষ্টেসন অভিমুখে অগ্রসর হয়, ইহাই গতি। কিন্তু গাছের এ রকম গতি নাই—তাহলেও গাছ স্তরে স্তরে, গোপনে গোপনে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। সে সূর্য্যের আলোক থেকে উত্তাপ এবং মাটি থেকে রস আহরণ করে এমনি বেঁচে চলে।

আমরাও শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে চলেছি। এখনও আমরা বেঁচে আছি। আমরা যা চাই, তার শেষ নাই—তা মৃত্যুকেও অতিক্রম করে পাই। আমাদের এই অন্তরের ধনটী প্রাণে ভরা—তাই জীবনের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করে মৃত্যুর মধ্যেও এ অমরতা লাভ করে। যখন বর্ত্তমান সভ্যতা ক্লান্ত হয়ে ধূলি সমাচ্ছন্ন বেশে ঘরে ফিরবে, যখন এর ধনের সঞ্চয় ফতুর হয়ে যাবে, এর দর্প যখন

চূর্ণ হবে, যখন মানুষের অন্তরাত্মা সংসারের ঘটনার মধ্যে সত্যকে পাবার তরে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন কর্বার তরে ব্যাকুল হয়ে উঠবে, তখন নিশ্চয়ই এর দরকার হবে। এর সার্থকতা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার মধ্যে—বস্তুর সঞ্চয়ের মধ্যে নয়।

অনেক সময় অপেক্ষা কর্‌লে ঠক্‌তে হয়। যদি হাটের মধ্যে সব চেয়ে সুবিধার জায়গাটী অধিকার করতে হয়, তাহলে দীর্ঘশ্বাসে সবার আগে ছুটতে হয়। পাছে চঞ্চল সুবিধাগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়, এর তরে সদাই জাগ্রত থাকতে হয়। কিন্তু জীবনের আদর্শ ঠিক এর বিপরীত। সে আমাদের সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলে না। সে ধীরে ধীরে বীজ থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে এবং গাছ থেকে ফুলে ফলে পরিণত হয়ে চলে। অনেকদিন ধরে সে যেমন গড়ে উঠে, তেমনি সে অক্লেশে অনেক দিনের অবজ্ঞার মধ্যেও আত্মরক্ষা করে চলে। পশ্চিম, সুবিধার পিছু পিছু ছুটে ছুটে যতদিন না বেদম ও বিফল হয়ে পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাচ্য-সভ্যতা অনায়াসেই তার অতীতের সঞ্চিত তপস্যার প্রভাবে ধৈর্য্য ধরে থাকবে। পশ্চিম এখন রেলগাড়ী করে তার কাজ বজায় কর্‌তে চলেছে—আমরা পথের পাশে ধান কাটছি, চলার নেশায় উন্মাদ পশ্চিম আমাদের দেখে গতি-হীন বলে উপহাস কর্‌তে পারে। কিন্তু তার এই চলা একদিন শেষ হয়ে যাবে, তার কাজও কালক্রমে ফুরিয়ে যাবে, তখন তার ক্ষুধিত অন্তর যখন খাদ্যের তরে ব্যাকুল হয়ে উঠবে, সে তখন নিশ্চয়ই আমাদের কাছে নেমে আসবে। অফিসের কাজ থাম্‌তে পারেনা, কেনা বেচারও বিরাম হতে পারেনা; কিন্তু প্রেমের ধৈর্য্য অপার। শুভ লগ্ন না আসা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেশ সেই প্রেমের জোরেই অপেক্ষা করে থাকবে।

পশ্চিম যেখানে মহৎ সেখানে তাকে মহৎ বলে স্বীকার করতেই হবে। তার এমন অনেক গুণ আছে, যাদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। পশ্চিমকে আমি আমার অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। ইউরোপ যখন তার সাহিত্য ও শিল্পকলার যোগে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালের মধ্যে সত্য ও সুন্দরকে প্রসারিত করে দেয়—যখন সে তার বিপুল মানসিক শক্তিকে মানুষের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত করে, যখন পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে তখন তার কাছে মাথা স্বতঃই নেমে আসে। এই সব কাজ আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন হতেই পারে না। মানুষের আত্মাই বাধাকে অতিক্রম করতে পারে। আত্মার চরম সার্থকতার উপর বিশ্বাস আছে বলেই সে বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রা করে—যে উদ্দেশ্য সমস্ত জীবনেও সম্পন্ন হবার নয়, সে এই বিশ্বাসের প্রভাবেই তার তরে হাসিমুখে দুঃখকে বরণ করে নেয়। সে বারবার ব্যর্থ হলেও হার মানে না। ইউরোপ যে অন্তরে অন্তরে মানুষকে ভালবাসে, তার যে ন্যায়ের প্রতি একটী শ্রদ্ধা আছে, সে যে উচ্চ আদর্শের তরে দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়, এর লক্ষণ আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। খৃষ্টান ধর্ম্ম আজ বহু শতাব্দী ধরে তার অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। ইউরোপের মধ্যে আমরা এমন অনেক মহাত্মার পরিচয় পেয়েছি, যারা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানুষের অধিকারকে পরাধীনতা থেকে উদ্ধার করবার তরে প্রাণপণ করেছেন। যারা মনুষ্যত্বের তরে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, যারা নিজের জাতের অনাচারকে অনাচার বলে ঘোষণা করে দেশবাসীর অপ্রিয়তাকে বরণ করেছেন। এই সব সত্যনিষ্ঠ মহাত্মারা ন্যায়কে এবং সত্যকে জয়ী

করবার তরে ভৌগলিক বাধা আদৌ মানেন না। আজও যে ইউরোপে জীবনের উৎস নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এরাই তার প্রমাণ। তাদের দ্বারায় ইউরোপ যুগে যুগে নব নব জন্ম লাভ করবে। ইউরোপ যেখানে ক্ষমতা প্রসারে ব্যস্ত, সেইখানেই সে তার অন্তরাত্মাকে উপেক্ষা করে নিজের পাপকে কেবলি পুঞ্জিত করছে। একদিন ঈশ্বরের রুদ্র রোষ এই পাপের শোধ নেবেই—ইউরোপ যে আজ তার বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের তরে, কদর্য্য লোভের জালে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, এ কখনই চিরদিন সইবে না। ইউরোপ যখনই মনুষ্যত্বের দিকে ফিরেছে, তখনই তার মুখ গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং যখনই সে নিজের স্বার্থের দিকে ফিরে মানুষের অন্তর-নিহিত অনন্ত ও নিত্য পুরুষকে আঘাত করেছে, তখনই সে কলঙ্কে ম্লান হয়ে গেছে।

পূর্ব্ব এসিয়া তার নিজের পথেই চলে আসছে। সে যে সভ্যতাকে অভিব্যক্ত করে তুলেছে, রাজনীতি তার ভিত্তি নয়—সমাজ-নীতিই তার প্রতিষ্ঠা ভূমি। এই কলিযুগের কলের সভ্যতার মত আমাদের এই সভ্যতা কার্য্যকরী না হলেও, তা' আধ্যাত্মিক এবং তা' মনুষ্যত্বের বিচিত্রতর ও গভীরতর সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা নিরিবিলিতে সমাজ-সমস্যার মীমাংসা করে এতদিন নির্জ্জনে তাকে চালিয়ে আসছিলাম। রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তনে তার ইতর-বিশেষ হয় নি। কিন্তু এখন বাহিরের জগত আমাদের উপর এসে পড়েছে—আমাদের নির্জ্জনতাও ভেঙ্গে গেছে। তাহলেও এর তরে যেন আমরা ক্ষুব্ধ না হই। বীজ যখন তার আবরণ ভেদ করে ওঠে, তখন কি ক্ষোভ করবার সময়? বিশ্বের সমস্যাকে এখন

আমাদের সমস্যা কর্‌তে হবে—আমাদের সভ্যতাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সভ্যতার মধ্যে প্রসারিত করে দিতে হবে—তাদের মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাতে সামঞ্জস্য আন্‌তে হবে। এখন আর আমাদের কুণো হয়ে থাক্‌লে চলবে না। আমরা এতদিন আত্মরক্ষার তরে যে আবরণ রচনা করেছিলাম আজ তাকে ভাঙ্গতেই হবে।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানই প্রথম এই বাধামোচনের কাজে ব্রতী হয়েছে। তার সফলতা আজ আমাদের আশান্বিত করে তুলেছে। সৃষ্টির কাজ মাত্রেই এই আশার ইন্ধনের দরকার আছে। এসিয়াকে যে সজীব কিছু সৃষ্টি করতে হবে তার যে অবসাদের মধ্যে পড়ে থাকলে চল্‌বে না—ভয়ে অথবা লোভে পড়ে পশ্চিমের অনুকরণ কর্‌লে, তাকে যে শুধু ব্যর্থ হতে হবে, একথা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌ছে। এইটুকুর তরে আজ আমারা জাপানকে আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর্‌ছি। বিশ্বযজ্ঞে প্রাচ্য যা কিছু দেয় সে যে জাপানের দিয়েই তা' দিতে আরম্ভ করেছে, এই কথাটা জাপানকে স্মরণ রাখতেই হবে। আজ তাকে তার আদর্শটাকে সবার উচ্চে ধরে রাখতে হবে। স্বার্থের আবর্জ্জনায় তা যেন আচ্ছন্ন না হয়। সে যেন চিরকাল মুক্ত থেকে প্রভাতের আলোকে এবং রাত্রের অন্ধকারে বিধাতার আশীর্ব্বাদ লাভ করে ধন্য হয়।

শ্রীঅমূল্য রতন প্রামাণিক।

পঁচিশে বৈশাখ।

—:০:—

রাত্রি হ'ল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি
হাতে করে' আনি,
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল তাল শিরীষের মিলিত মর্ম্মরে
বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে আসে ধরণীর পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,

মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কাল-বৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয় তলে লয়ে মোর প্রাণ-দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে।
জন্ম মরণের
দিগ্বলয় চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলালো।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরী হ'তে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে'।
আলোকের অসীম সঙ্গীতে
চিত্ত মোর ঝঙ্কারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয় দিক্‌প্রান্ত তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নব মল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল ছন্দে,
শ্যামলের বুকে
নির্নিমেষ নীলিমার নয়ন-সম্মুখে।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি'
এসেচি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।
হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে

প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক্ তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন!
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক্ কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন!
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্ত্তে অরণ্য দেয় ভরি'—
সেই মত, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন!
ব্যক্ত হোক্ জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক্, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়!"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

———

যুদ্ধের কথা।

(প্রশ্ন)

শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সুহৃদবরেষু—

—"পৃথিবীতে এমন দিন কি কখনো আস্‌বে মশায় যখন আর যুদ্ধ থাকবে না" ?

—"আমার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি নেই, তাই এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌তে আমি অপারগ"।

—"কিন্তু আপনি কি মনে করেন্" ?

—"আমি আশা করি যে যুদ্ধ একদিন বাতিল হয়ে যাবে"।

—"কিছুতেই যাবে না। এ পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন যুদ্ধ চলবে"।

—"আমি আগেই বলেছি আমার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি নেই, অতএব যার আছে, তার কথার আমি প্রতিবাদ কর্‌তে পারিনে"।

—"ঠাট্টা করবেন না মশায়। আমি যা বল্‌ছি তা ঠিক। যুদ্ধ করা হচ্ছে human nature, ভবিষ্যতে আর যারই বদল হোক, মানুষের nature ত আর বদলাবে না"।

আজ থেকে ছ-বছর আগে জনৈক যুবকের সঙ্গে আমার উক্ত বচসা হয়। তাঁর শেষ কথার পর আমি যে নিরুত্তর হয়ে গেলুম,

তার কারণ nature-এর নাম শোনবামাত্রই আমি ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তখন আর আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। জানি আর যার সঙ্গেই হোক্ nature-এর সঙ্গে রসিকতা চলে না।

এর পর বহু লোকের মুখে ঐ একই কথা শুনেছি; এমন কি বৃদ্ধের মুখে, বণিতার মুখে, রোগীরও মুখে, ভোগীরও মুখে। ইউরোপে যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধের আলোচনাও এদেশে কিছুদিন থেমে ছিল। তারপর non-violent non-co-operation-এর আন্দোলনের পিঠ পিঠ এ আলোচনা নবজীবন লাভ করলে। ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়াতে গিয়ে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় বললেন যে, তাদের এখন mobilise করতে হবে। তারপর দেখা গেল যে, সামরিক-পরিভাষা ছাড়া এ বিষয়ে কেউ কথাই কইতে পারেন না। Volunteer enlistment, recruitment camouflage, discipline, obedience, dictator, sacrifice, suffering, প্রভৃতি পদ যে সামরিক অভিধানের, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথা, তা অবশ্য সকলেই জানেন। এমন কি কেউ কেউ স্ত্রীহস্ত-প্রসূত অতি সূক্ষ্ম পদার্থকেও যুদ্ধের উপকরণ করে তোলবার চেষ্টায় ছিলেন। একটি উদাহরণ দিই।

আমার জনৈক অতি শান্ত শিষ্ট সুপণ্ডিত বন্ধু আমাকে চরকা ঘোরাতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য তিনি নিজে ওকাজে কখনো হাত লাগান নি। উত্তরে আমি বলি যে, "কথার টিপ্পনী কাটা যার ব্যবসা, তাকে তুলোর সূতা কাটতে বলাটা কি কামারের দোকানে দইয়ের ফরমায়েস দেওয়া নয়"? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন যে—"যুদ্ধের সময় সকলকেই সব কাজ ফেলে, যুদ্ধের কাজেই হাত

লাগাতে হয়। ফরাসী দেশে যুদ্ধ সুরু হতেই সে দেশের সব স্যাকরা রাতারাতি কামার হয়ে গেছে”। আমি বল্লুম যে, “একথা যদি সত্যও হয় যে, যারা সোণার নথ বানাত, তারা আজ লোহার কামান বানাচ্ছে, যারা নোলক তৈরি করত—তারা গুলি তৈরি করছে, আর যাদের হাত থেকে চুলের কাঁটা বেরত—তাদের হাত থেকে আজ বন্দুকের সঙ্গীন বেরচ্ছে; তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কেননা, স্ত্রীলোকের ভূষণ যে আয়ুধ—একথা সংস্কৃত কবিরা বলে গেছেন। যারা এক ধাতুর অস্ত্র বানাত, তারা আর এক ধাতুর অস্ত্র বানাচ্ছে, এই যা তফাৎ। ও analogy এখানে খাটে না—বস্ত্র যে অস্ত্র, এমন কথা কখনো শুনিনি; বরং দেখেছি যে, মল্লযুদ্ধ করতে হলে পালোয়ানরা বিবস্ত্র হয়। এর পর তিনি হাসলেন, আমি হাসলুম; ফলে কথাটা তর্কযুদ্ধে পরিণত হল না।

(২)

এ সব কথার উল্লেখ করলুম এই প্রমাণ করবার জন্য যে, অধিকাংশ লোকের যুদ্ধের প্রতি হয় মোহ নয় মায়া, হয় প্রীতি নয় ভক্তি, এক কথায় একটা মনের টান আছে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মনের টানটা কি মানুষের প্রাণের টান—অর্থাৎ এই প্রবৃত্তি অথবা প্রীতির মূল কি human nature? এ প্রশ্ন করবার উদ্দেশ্য অবশ্য আপনি বুঝতে পারছেন। Nature বলতে আমরা বুঝি বাইরের এমন সব বাঁধাধরা নিয়ম, যা অমান্য করা মানুষের সাধ্যের অতীত, অর্থাৎ যা মানুষের পুরুষকারের অধীন নয়। এখন আমি জানতে চাই যে, human nature বলে এমন কোনও

জিনিস আছে কিনা, যা আমরা প্রত্যেকেই আবহমান কাল আমাদের অদৃষ্ট বলে মেনে নিতে বাধ্য? তারপর জিজ্ঞাস্য এই যে, যুদ্ধ-প্রবৃত্তি কি উক্ত nature-এর একটি অঙ্গ না উক্ত natureয়ে তা প্রক্ষিপ্ত?

মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, একের nature, আর একের nature নয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ না থাকতে পারে, কিন্তু জীবাত্মায় জীবাত্মায় প্রভেদ বিস্তর। তারপর ছেরেফ "অহং"-এর দিকে নজর দিলেও দেখতে পাই যে, নিজের ভিতরও বহুবিধ পরস্পর বিরোধী nature আছে। যাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁর কাছেই এ সত্য প্রত্যক্ষ যে, মানুষের অন্তরটা হচ্ছে পশু ও দেবতার একটা গুপ্ত রণক্ষেত্র এবং সে ক্ষেত্রে কখনো পশু কখনো দেবতা জয়লাভ করে। সুতরাং মানুষের কাছ থেকে human nature-এর সন্ধান পাওয়া যাবে না। কাজেই সব মানুষের ভিতর ঐক্য বার করতে হলে ধরে নিতে হবে যে, মানুষ মূলত হয় পশু নয় দেবতা; সংক্ষেপে human nature-এর মূলতত্ত্বের সন্ধান নিতে হবে inhuman nature-এর কাছে অর্থাৎ হয় তার sub-human nature-এর নয় তার super human nature-এর কাছে।

শুনতে পাই মানুষে এ দু-দিকেই যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু তার ফলে তারা স্বর্গ থেকে কি সার সত্য পেড়ে নামিয়েছে আর পাতাল থেকেই বা কি গভীর তত্ত্ব খুঁড়ে তুলেছে, তা আমার অবিদিত। লোকে বলে মানুষের আদিম পশুত্বের পুরো খবর জানবার জন্য ইউরোপীয় নূতন বিজ্ঞানের পারদর্শী হওয়া দরকার আর তার আদিম দেবত্বের পুরো খবর জানবার জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন

দর্শনের পারগামী হওয়া দরকার। এ বিজ্ঞান আর ও দর্শনের আমি মুখ চিনি; কিন্তু এ দুয়ের কারও সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই এবং সে পরিচয় নেবার আমার প্রবৃত্তি থকেলেও শক্তি নেই। তাই আমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।

(৩)

Inhuman natureয়ে সশ্রদ্ধ হবার পক্ষে আমার কোথায় বাধে, তা উপরে ইঙ্গিতে জানিয়েছি। এখন একটু মন খুলে আপনার কাছে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দেই। তা না দিলে আপনি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারবেন না। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এ সন্দেহ দূর করবার জন্য আমি এত ব্যস্ত কেন? ব্যস্ত এইজন্য যে, মানব-প্রকৃতি বস্তুটা যে কি, তা জানবার কৌতূহল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; নইলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে আমার ঘুম হয় না তা নয়। ভাষায় বলে চোখ বুঁজলেই অন্ধকার। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে প্রতি লোকের ভবিষ্যতের মেয়াদ, তার মরণ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানেরই সামিল। আর দেহ-খাঁচা ভেঙ্গে গেলে যদি আত্মা-পাখী সত্যিই উড়ে যায়, তাহলেও সে ইহলোকে থাকবে না, পরলোকে চলে যাবে; তখন সেই পরলোকের এবং সম্ভবত পৃথিবীর চাইতে বড়লোকের বড় পলিটিক্স নিয়ে সে আত্মাকে এত বিব্রত থাকতে হবে যে, তুচ্ছ মর্ত্তলোকের পাঁপড়ের লড়াই হয় কি না হয়, সে ভাবনা ভাববার তার আর অবসর থাকবে না। এ ছাড়া আর একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা আছে। মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি

একদিন থেমে যাবে—এই আশা করার দরুণ; লোকে বলে আমি sentimental। কথাটা খুব সম্ভবত সত্য। মানুষ দেখে দেখে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে, যার শরীরে emotion-এর লেশমাত্র নেই, সেই লোকই হয় ঘোর sentimental। এক কথায় sentimentality হচ্ছে emotion-এর ভেঙচামি। আমার বন্ধু বান্ধবেরা তাঁদের দিব্যদৃষ্টির X rays দিয়ে দেখেছেন যে, আমার মাথার ভিতর হৃদয় নেই, সেখানে আছে শুধু মস্তিষ্ক, অতএব sentimental হওয়ার বিপদ আমার আছে। তবে আমি যে, সমাজে জাল emotion-এর ছদ্মবেশ পরে বেড়াচ্ছি, একথা মনে করতে ভাল লাগে না। এই জন্যই human natureটা যে কি, তা জানতে চাই।

(৪)

মানুষের ভিতর যে পশু আছে, তা মানুষ আদিকাল থেকেই জানে—কিন্তু শরীরের কোন ছিদ্র দিয়ে সেপশু যে তার অন্তরে প্রবেশ করলে, তা সে পূর্ব্বে ভেবে ঠাওর করতে পারেনি। তারপর ডারউনিনের Descent of Man প্রকাশ হবার পর এ সত্য আর মানুষের কাছে চাপা থাকল না যে, মানুষ পশুর বংশধর। আর উত্তরাধিকারী সম্বে সে তার পৈতৃক পশুত্ব লাভ করেছে। সুতরাং মানবধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যাবে পশুধর্ম্মের কাছে—অর্থাৎ human nature হচ্ছে sub-human nature। তার পর পশুধর্ম্ম যে কি, তাও ডারউইন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। Struggle for existence হচ্ছে ও ধর্ম্মের আদি ও অন্তসূত্র। ও সূত্রের বাংলা

হচ্ছে—"বড় মাছ ছোট মাছটাকে খায়", আর সংস্কৃত হচ্ছে—"মৎস্য ন্যায়"। সুতরাং উক্ত মৎস্য ন্যায়ের বশবর্ত্তী হয়েই পশু যখন মানুষ হয়েছে, তখন একই পদ্ধতি অনুকরণ করে আমরাও দেবতা হব, survival of the fittest-এর বিধি অনুসারে। বড় মাছটা ছোট মাছটাকে না খেয়ে, ছোট মাছটা যদি বড় মাছটাকে খেত, তাহলে পৃথিবীতে যা কিছু বড় সব মারা যেত, আর যা কিছু ছোট—সব টিঁকে থাক্‌ত। তাহলে সৃষ্টির উল্টো উৎপত্তি হত, আর তখন এ বিশ্বকে ভগবানের বিশ্ব বলে কিছুতেই মানা চলত না। অতএব মানুষের মনে যতদিন বড় জিনিষের প্রতি ভক্তি আছে; ততদিন মানুষের মধ্যেও যে বড়, সে ছোটকে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বলতে বাধ্য "যুদ্ধং দেহি"।

এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে, পশু-জগতে সকলেই ত আর আমিষাশী নয়, বহু পশু নিরামিষাশী। মানুষ যাদের নিয়ে ঘর করে, তারা ত প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, যথা—গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ ইত্যাদি। ষাঁড়ে ষাঁড়ে অবশ্য লড়াই করে; কিন্তু সে মাসের জন্যও নয়, ঘাসের জন্যও নয়। আর মেড়াকে লড়াই কর্‌তে শিখিয়েছে মানুষ। সে লড়াইয়ে মেড়া বেচারার কোনরূপ স্বার্থ নেই—আর সে লড়াইয়ে তার যে প্রবৃত্তিও নেই; তার প্রমাণ মেড়ার প্রথমে কাণে ফুঁ না দিলে, তারপর তার কাণ না মলে দিলে, সে লড়াই করে না। সুতরাং বাঁচবার জন্য জীবমাত্রেই যে যুদ্ধ করে, একথা সত্য নয়। তারপর আমিষভোজী পশুরাও যুদ্ধ করে না, কিন্তু জীবহত্যা করে শুধু তার মাংস খাবার জন্যে। বাঘে বকরিতে যুদ্ধের কথা কেউ কখনো শুনেছে? সুতরাং ও নজিরও মানুষের পক্ষে

খাটে না। জর্ম্মাণরা যদি ফরাসীদের আহার করবার জন্য বধ করত, তাহলে তাতে কারও কোন আপত্তি থাকত না। কেননা তাতে অনর্থক এত নরহত্যা হত না। শুনতে পাই যে, একজন জর্ম্মাণ দশজন ফরাসীকে মারতে পারে—কিন্তু দশজন জর্ম্মাণ একজন ফরাসীকে খেতে পারে না। অভক্ষ্যকে বধ করা পশুর ধর্ম্ম নয়, মানুষের ধর্ম্ম। দল বেঁধে লড়াই অর্থাৎ যুদ্ধ পশুতে করে না, অন্তত শাক্ত পশুরা ত নয়ই—অতএব sub-human natureয়ে যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। দলবেঁধে লড়াই পীঁপড়েকে করতে দেখেছি আর মৌমাছিরা করে শুনেছি। কিন্তু মানুষ যে পোকা মাকড়ের বংশধর—এমন দুর্ব্বাক্য ডারউইনও বলেন নি। আর আমরা যুদ্ধ করি বলেই যদি ধরে নিতে হয় যে, আমরা মৌমাছি, পীঁপড়ের প্রপৌত্র, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, আমরা মাকড়সারও অধস্তন পুরুষ—কেননা, আমরা সূতো কাটি। পোকা মাকড়ের পৃষ্ঠ দন্ত নেই, আমাদের আছে, অতএব আমরা একজাত নই। ডারউইনের কথা আমি মানি কিন্তু অন্য অর্থে। Struggle for existence-এর মানে আমি বুঝি struggle against death আর যুদ্ধের মানে হচ্ছে struggle for death সুতরাং আমার মতে যুদ্ধ হচ্ছে ডারউইনের কথার প্রতিবাদ।

আমার মত অবশ্য ভুল, কেননা আমার একটি বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেছেন যে, যুদ্ধ-প্রবৃত্তির নামই যে human nature, তা বুঝতে হলে বক্ষ্যমান বিজ্ঞানগুলি জানা চাই। (১) Cosmology, (২) Geology, (৩) Metereology, (৪) Biology, (৫) Zoology, (৬) Geneology, (৭) Anthropology, (৮) Histo-

logy, (৯) Physilogy, (১০) Ethnology, (১১) Sociology, (১২) Psychology, (১৩) Sexology, (১৪) Pathology—

এই চৌদ্দ শাস্ত্রের দশটির আমি নাম শুনেছি, কিন্তু কখনো তাদের চোখে দেখি নি। আর বাকী চারটির বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আমার বিদ্যের দৌড়। তাই Sentimentalityর অপবাদ হতে মুক্ত হবার জন্য আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। বিজ্ঞানের ঐ চৌদ্দ ভুবন ভ্রমণ করে—আপনি যদি বলেন যে, human nature হচ্ছে sub-human nature আর sub-human nature একদম মারাত্মক, তাহলে কালই আমি non violence-এর দলে নাম লেখাব।

(৫)

যতদিন তা না হয়, ততদিন আমার মনে এ ধারণা থেকে যাবে যে, ঐতিহাসিক যুগের মানুষের মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড sentimentality আছে; বিশেষত বই পড়া মানুষের মনে। এর কারণও স্পষ্ট। মানুষের যত মহাকাব্য, সব যুদ্ধের কাব্য। ইলিয়াড, মহাভারত, রামায়ণ, মেঘনাথ বধ, বৃত্র-সংহার ও পলাশীর যুদ্ধের আসল কথা যে কি, তা শেষ তিনখানির নামেই পরিচয়। প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও, অপর সব মহাকাব্যও হচ্ছে বীরগাথা, যথা—শিশুপাল বধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম, পৃথ্বিরাজ, শিবাজি প্রভৃতি। এ শ্রেণীর একখানি কাব্য আছে, যার বিষয়টা একটু স্বতন্ত্র। কিন্তু একটুখানি তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, Paradise Lost-এর বিষয়ও হচ্ছে যুদ্ধ, মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, সয়তানের সঙ্গে ভগবানের যুদ্ধ।

তারপর সকল দেশের সকল ইতিহাস যুদ্ধের ইতিহাস। আর সকল দেশের সকল বিদ্যালয় ঐ সব কাব্য ইতিহাসই ছেলেদের পড়ান; এবং তা ছাড়া আর কিছু পড়ান না। ধরুণ যদি আমাদের অপর কোনও মহাকাব্য না থাকৃত তাহলে এ দেশের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে "ছুছুন্দরীবধ কাব্য" পাঠ্যপুস্তক করতেন, সে বিষয়ে আপনার মনে কি সন্দেহ আছে? রবীন্দ্র নাথের কাব্য বধ কাব্য নয়, অতএব তা বদ কাব্য। এই হিসাবেই সে কাব্যের বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষেধ। অপর পক্ষে যে নাটকের বিষয় হচ্ছে চুলবাঁধা, তাও Text book হয়েছে, "বেনিসংহার" এই নামের গুণে। কাব্য ইতিহাস ছেড়ে আর কোনও শাস্ত্র ধরলেও যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার নেই। কৌটীল্য থেকে স্বরু করে শুক্রনীতি পর্য্যন্ত সকল নীতিশাস্ত্র ত মলাট থেকে মলাট পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন আয়োজনের বিচারে ভরপুর। নীতি ছেড়ে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হয়েও কোনও লাভ নেই। মনু যুদ্ধের বিষয় দুদশ পাতা লিখে ও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য চানক্যের উপর বরাত দিয়েছেন। তার পর যদি পুরাণ ধরা যায় ত সেখানেও একই কথা। মার্কণ্ডের চণ্ডীর কথা কোন বাঙালী না জানে? চণ্ডীপাঠ ছেড়ে যদি গীতাপাঠ করি তাহলেও শুনি "যুদ্ধায় যুজ্যস্ব"।

এই শিক্ষা পেয়েই মানুষ যখন মানুষ হয়েছে, তখন যুদ্ধপ্রীতি ও বীরভক্তি মানুষের মনে শিকড় গাড়্‌তে বাধ্য।

তবে এ sentimentalism অতীতমুখী, ভবিষ্যৎমুখী নয়। সুতরাং এতেও আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। বিশেষতঃ এই সব দলিলই যখন প্রমাণ যে, যুদ্ধপ্রীতি আমাদের মনে পুস্তক জাত অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত।

(৬)

একজন ফরাসী লেখক বলেছেন যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে কবিতা লেখেন তাঁরা যাঁরা যুদ্ধ কখনও করেনও নি দেখেনও নি; আর যুদ্ধ সম্বন্ধে কবিত্ব করেন তাঁরা যাঁরা যুদ্ধ কখনো করবেনও না দেখবেনও না। কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা উক্ত লেখক Pegoui গতযুদ্ধে রণক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন। অতএব যাচিয়ে দেখা যাক্ ও কথার ভিতর কতটা সত্য আছে।

প্রথমতঃ মহাকবিদের ধরা যাক্। হোমার কখনো যুদ্ধ করেন নি, কেননা তিনি রাজা ছিলেন না, ছিলেন ফকির। তারপর তিনি যুদ্ধ কখনই দেখেন নি, কেননা তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। বেদব্যাস ছিলেন ঋষি, অতএব স্বীকার করতেই হবে, যে তিনি কখনো যুদ্ধ করেনও নি দেখেনও নি। তপোবনে যখন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তখন সেখানে যে যুদ্ধ হয় না তা বলাই বাহুল্য। বাল্মীকিও ছিলেন মুনি, উপরন্তু তিনি রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর আগে রামায়ণ লিখেছিলেন, সুতরাং রামরাবণের যুদ্ধে তিনি যোগও দেন নি, এবং তা চোখেও দেখেনও নি। মাইকেল ছিলেন ব্যারিষ্টার, হেমচন্দ্র উকিল, আর নবীন চন্দ্র ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, অতএব যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের যতটা পরিচয় আছে তাঁদেরও ততটাই ছিল।

প্রথম ছেড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসা যাক্। ভারবি যে চরিত্রে আরবি ও মাঘ মাঘ ছিলেন, তার কোনই প্রমাণ নেই। আর পৃথ্বি-রাজের বাঙালী চাঁদকবি হচ্ছেন মাষ্টারমশায়। এইত গেল লেখক-দের কথা। তারপর জনগণের চরিত্রের পরিচয় নেওয়া যাক্।

দুপুর রাতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে মথুরার গোপিনীরা বেরুল-

কোলের ছেলে ও হাতের কাজ ফেলে বৃন্দাবনে ছুটে গিয়েছিল, দিন দুপুরে বড় রাস্তায় গড়ের বাদ্যি শুনে, যে সব স্ত্রী পুরুষ কোলের ছেলে ও হাতের কাগজ ফেলে বাড়ীর বারেণ্ডা ও জানালায় ছুটে যায়, তারা যে কখনো যুদ্ধ করবে না ও দেখবে না, সে ত স্বতঃসিদ্ধ।

এর থেকে মনে হয় যে Pegouir কথা সত্য। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে সে কথা পুরো সত্য নয়। মসীজীবী যেমন রণ বিলাসী হয় অসিজীবীও তেমনি রণোন্মত্ত হতে পারে। আসল ঘটনা এই যে, যে ব্যক্তি একধারে মসীজীবী ও অসিজীবী শুধু তারই যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনরকম sentimentality নেই।

(৭)

পুরাকালে গ্রীসে Æschylus ও Euripides উভয়েই ছিলেন, একধারে কবি ও সেনাপতি। এস্কিলাসের Agamemnon এর কোরাস আর ইউরিপিডিসের Trojan women পড়ে দেখবেন তাতে যুদ্ধের terror এবং pity ছাড়া আর কিছুই নেই। ও দুখানি নাটকের খাঁটিরস করুণরস, বীররস নয়। বর্ত্তমান ফিরে এলেও ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। ইউরোপের এযুগের তিনটী বড় কবির গন্ত কাব্যে যুদ্ধ ব্যাপারটাকে যেমন ভীষণ ও বীভৎস ভাবে দেখানো হয়েছে, এমন আর কোনও কাব্যে হয় নি। Tolstoi, Guy de Maupassant ও Barbusse এই তিনটি কবিই যোদ্ধা। আমি ইউরোপের আরও দু চার জন বড় লেখক জানি যাঁরা অর্দ্ধেক জীবন রণক্ষেত্রে কাটিয়েছিলেন, অথচ তাঁদের লেখায় যুদ্ধের নাম

পর্য্যন্ত নেই। এর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে যুদ্ধপ্রীতি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নয়।

নীতিশাস্ত্রে যুদ্ধের মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন থাকলেও মোক্ষশাস্ত্রে নেই। এর কারণ উপনিষদ ক্ষত্রিয়ের লেখা। তারপর অহিংসা পরমধর্ম্ম, এই বাণী যিনি প্রচার করেছিলেন, তিনিও ছিলেন ক্ষত্রিয়, আর যে সে ক্ষত্রিয় নয়, একাবারে রাজপুত্র। আর ভারতবর্ষের যে রাজা, পাষাণের মুখে অহিংসার বাণী অক্ষয় করে গিয়েছেন, সেই অশোকের তুল্য নরহত্যা এদেশে পূর্ব্বাপর কোন রাজাই করেন নি।

লোকে বলে যে এই অহিংসার বাণী হচ্ছে মানুষের super-human nature-এর বাণী। তা যদি হয় ত যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল, মানুষের super nature-ও পাওয়া যাবে না।

যা sub-nature-ও পাওয়া যায় না super nature-রেও পাওয়া যায় না, তা যদি কোথাও পাওয়া যায় ত human nature-রেই পাওয়া যাবে। এবং মানব-মনের যাতে পূর্ণ প্রকাশ তাতেই অর্থাৎ কাব্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, মহাকাব্যেও তা মেলে না।

ইলিয়াড, মহাভারত, রামায়ণ এ তিনখানি কাব্যেই কবি যুদ্ধের দায়িত্ব নিজ নিজ নায়কের শত্রুর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। জিনিষটিকে তাঁরা যদি পাপ মনে না করতেন, তাহলে তা পরের ঘাড়ে চাপাবার প্রয়োজন কি ছিল? প্রকৃতপক্ষে ও তিনের অন্ততঃ দুখানি কাব্য রূপক কাব্য, অর্থাৎ Paradise Lost-এর আদি সংস্করণ। রামায়ণ মহাভারতের যথার্থ বিষয় হচ্ছে, অবতীর্ণ সয়তানের সঙ্গে অবতীর্ণ ভগবানের লড়াই। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত দুটি nature-এর লড়াইয়ের ব্যক্ত চিত্র।

তারপর দেখা যাক ও সকল কাব্যে মানুষে কি পেয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে যে গোটা মহাভারত নিংড়ে পাওয়া যায় শুধু "শান্তরস", আর রামায়ণের রস যে করুণ তার প্রমাণ সংস্কৃতের আদি শ্লোক। ব্যাধকে ক্রৌঞ্চবধ কর্‌তে দেখে যে কবির শোক শ্লোকে পরিণত হয়েছিল তাঁকে অবশ্য Bernhardiর মাসতুতো ভাই বলা চলে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে human natureও যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করে।

মানুষের অধঃ উর্দ্ধ ও মধ্য কোনরূপ প্রকৃতিতেই যুদ্ধের মূল আমি খুঁজে পাই নি বলেই আপনার কাছে তার সন্ধান নিতে এসেছি।

যদি বলেন যে, যার মাটিতে মূল নেই তার অস্তিত্বও থাক্‌তে পারে না, তাহলে আপনি ভুল কথা বলবেন। মাটিতে যার মূল নেই অথচ যা দিব্যি বেঁচে থাকে উপরন্তু বেজায় বেড়ে যায় ও ছড়িয়ে পড়ে এমন জিনিষ আপনিও দেখেছেন আমিও দেখেছি যথা "অলোক লতা"। এ জাতীয় পরের ঘাড়েচড়া আর তার রক্তশোষী উদ্ভিদকে ইংরাজেরা parasite বলেন। মানুষের মনে যুদ্ধ প্রবৃত্তি কি ঐ জাতীয় একটা প্রক্ষিপ্ত অপসৃষ্টি?

বীরবল।

১লা মে, ১৯২২।

যুদ্ধের কথা।

(উত্তর)

শ্রীযুক্ত "বীরবল" মহোদয়—
সমীপেষু।

আপনার আলাপী এত সব পণ্ডিত লোক থাক্‌তে এই যুদ্ধ জিজ্ঞাসা চিঠিটার শিরোনামায় কেন যে আমার নাম বসিয়ে দিলেন, তা ভেবে একটু চিন্তিত হয়েছি। কেননা আপনার কলম যা লেখে, তার কোথাও না কোথাও কিছু বিদ্রূপ আছে, এ বাঙ্গালী পাঠকদের জানা কথা। আর যে চৌদ্দশাস্ত্রের পারগামী না হলে, ও জিজ্ঞাসায় উত্তর দেওয়া চলে না তার একটারও যে জলস্পর্শ করে নি, তাকে ঐ প্রশ্ন করার বিদ্রূপটা ত অতি স্পষ্ট। কিন্তু সেটা প্রধানত হ'ল, আপনার পণ্ডিত বন্ধুটীর উপব যিনি ঐ চৌদ্দ "লজির" লিষ্টি তৈরী করেছেন। সুতরাং ও চিঠিতে আমার নাম যোগের মধ্যে আরও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে, আর সেটা আপনার নানা পাঠকের বুদ্ধিতে কতরূপে প্রকট হবে তা যথার্থ আশঙ্কার কথা। কিন্তু চিঠি যখন আমার নামে দিয়েছেন, তখন মরিয়া হয়ে ও সম্বন্ধে দুই একটা মনের কথা খুলে বলব স্থির করেছি। গত মহাযুদ্ধের ফলাফল দেখে যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু কথা সবারি মনে জন্মেছে। আর ও যুদ্ধের মধ্যে ও যুদ্ধের পরে, ইউরোপের পণ্ডিতেরা এবিষয়ে এত লেখা লিখেছেন ও

লিখছেন যে তার কিছু না কিছু চোখের ভিতর দিয়ে মনে প্রবেশ করে' সেখানে একটু আধটু গোলমালের সৃষ্টি করেছেই।

যে যুবকটি "যুদ্ধ মানুষের nature, সুতরাং মানুষ যতদিন পৃথিবীতে টিঁক্‌বে ততদিন সে যুদ্ধ কর্‌বেই" আপনার সঙ্গে এই তর্ক করেছে, মানুষের ইতিহাসের সাক্ষী যে তারি পক্ষে একথা স্বীকার কর্‌তে হবে। এক কথায় দেশ কি জাতির ইতিহাস যে কতকগুলি যুদ্ধ পরম্পরার বিবরণ এ ত যে কোনও ইতিহাসের পুঁথি হাতে নিলেই দেখা যায়। আর মাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা থেকে ইতিহাস বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব্বে একথা আমাদের দেশের ইস্কুলের সকল ছেলেই জান্‌ত।* আপনার পাঠকদের মধ্যে যদি কেউ ইস্কুল পাঠ্য ইতিহাসের নামে নাসা কুঞ্চিত করেন তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, যে ইতিহাস সাহিত্যের সব মহাগ্রন্থেরও এই শিক্ষা। ও সাহিত্যের ইউরোপে দুই মহাপুরুষ হলেন হিরোডোটাস্‌ ও থিউসিডাইডস্‌। আর এদের লেখার মোহে বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ। এর মধ্যে থিউসিডাইডসের পুঁথি হল স্পষ্ট বলাকওয়া সাতাশ বছর ব্যাপী এক যুদ্ধের ইতিহাস। আর হিরোডোটাসের প্রকাণ্ড নয় খণ্ড পুঁথির যদিও কেবল শেষ তিন খণ্ড গ্রীস ও পারস্যের লড়াই-এর ইতিহাস, কিন্তু ওর প্রথম ছয় খণ্ড নাকি ঐ যুদ্ধেরেই উদ্দেশ্য পর্ব্ব মাত্র। "The last three books of Herodotus give the history of the invasion of Xerxes and its repulse; the first six form a sort of introduc-

---

* আমার বিশ্বাস ও যুবকটির মাট্রিকুলেশনে ইতিহাস ছিল "অপশনাল" বিষয়, আর আই, এ, ও বি, এ, তেও ও ইতিহাস পড়েছে।

tion to them.........The connection is at first loose, visible only as we go on we begin to feel the growing intensity of theme—the concertation of all the powers and nations to which we have been gradually introduced, upon the one great conflict." (১) অর্থাৎ ঐ যে ছয় খণ্ড জোড়া নানা দেশ ও জাতির রকমওয়ারী বর্ণনা তার আকর্ষণ মানুষের বিবরণ হিসাবে নয়, একটা মহাযুদ্ধের পক্ষ হিসাবে।

এর যা চল্‌তি উত্তর তা সবাই জানি। ইতিহাস লেখকেরা এ পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসের ধারাটি ঠিক ধর্‌তে পারেন নি। মানুষের ভাঙ্গা গড়া ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে, যুদ্ধ প্রায় একটা অবান্তর ও অত্যন্ত অপ্রধান ঘটনা। কিন্তু জিনিষটা খুব চমকপ্রদ ও জমকালো হওয়াতে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস ঐ ঘটনা গুলিকেই বেশী স্মরণ করে রেখেছে; এবং ঐতিহাসিকেরা কতকটা মোহে আর কতকটা পুঁথি জমিয়ে তোলার লোভে যুদ্ধের নানারঙে তাদের পুঁথি রাঙিয়েছেন। এ হয়ত সত্য। কিন্তু যুদ্ধ জিনিষটা কেবল মানুষের ইতিহাসের পুঁথি জুড়ে নেই, ঐতিহাসিক মানুষের মনও যে কতটা জুড়ে রয়েছে তা আপনি প্রাচীন ও নবীন নানাশ্রেণীর কাব্যের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। আমাদের বর্ত্তমান নির্ব্বিরোধ পলিটিকাল আন্দোলনের ভাষা কি পরিমাণে যে বিরোধের অভিধান থেকে ধার করা তাও আপনার চোখে এড়ায় নি। যদি কাব্য ও পলিটিক্‌স্ ছেড়ে একবারে অধ্যাত্মতত্ত্ব কথায় কান দিতেন সেখানেও উপনিষদের "প্রণবো ধনুঃ শরোহহ্যাত্মা" ইত্যাদি থেকে রামপ্রসাদের

(১) গিলবার্ট মারের History of Ancient Greek Literature, পৃঃ ১২৬।

"আয় মা সাধন. সমরে" পর্য্যন্ত ঐ একই কথার প্রমাণ পেতেন। মোট কথা যতদিন মানুষের মোটামুটি একটা ইতিহাস পাওয়া যায় অর্থাৎ গত পাঁচ ছয় হাজার বছর, ততদিনই দেখা যায় যে, বরাবর সে ছোট বড় যুদ্ধ করে আসছে। এবং এও বেশ জানা যায় যে ঐ যুদ্ধকে সে তার ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড ও প্রধান ঘটনা রূপে দেখে আসছে। যদি এই প্রমাণে কেউ বলে যে যুদ্ধ মানুষের nature; অর্থাৎ ও যখন এতদিন ধরে মানুষের সমাজে কায়েম হয়ে বসে রয়েছে তখন মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ওর কারণ আছে, আর সে কারণ একেবারে মানুষের মূল প্রকৃতির অংশ, তার আর বদল সম্ভব নয়—তবে আমার মনে হয় না যে সরকারি আদালতে তাকে নিরুত্তর করা চলে। কেননা আমার মতে নিরপেক্ষ বিচারে, প্রমাণ অর্থাৎ অপ্রমাণের ভারটা হ'ল বিরুদ্ধ বাদীর উপর। সুতরাং এঁদের যুক্তি তর্কই বিচার করা দরকার।

গত মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে শ্মশান-বৈরাগ্যের মত যে যুদ্ধ বৈরাগ্য দেখা দিয়েছে তার উত্তেজনায় অনেকে প্রমাণ করছেন যে যে মানুষের প্রকৃতির মূলে যুদ্ধ আদবেই নেই, ওটা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত। এবং মানুষের প্রকৃতির যখন বিশুদ্ধ সংস্করণ বেরুবে ও প্রক্ষিপ্ত অংশটা তখন ছাঁট পড়বে। অর্থাৎ মানুষের সমাজে যুদ্ধ আদিতেও ছিল না, অন্তেও থাকবে না; ওটা মাঝের দুর্দিনের একটা বিভীষিকা মাত্র। একটা পুঁথিকে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যাক্। আপনার পাঠকদের অনেকেই নিশ্চয় মিথুন-তত্ত্বজ্ঞ হ্যাভেলক্ এলিসের নাম জানেন। তিনি 'যুদ্ধ সময়ের প্রবন্ধাবলী' নাম দিয়ে যে দু খণ্ড বই বের করেছেন তার দ্বিতীয় খণ্ডে 'যুদ্ধের উৎপত্তি'

(The Origin of War) ও "বিরোধের তত্ত্বকথা" (The Philosophy of Conflict) নামে দুটী প্রবন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি তর্ক অল্প কথায় বেশ গুছিয়ে বলেছেন। এঁর প্রথম কথা হ'ল যে যুদ্ধ মানুষের nature নয় কেননা চিরকাল মানুষের সমাজে যুদ্ধ ছিল না। ও আগন্তুক, ঘরের ছেলে নয়। যতদিনের ইতিহাস আছে ততদিন যে যুদ্ধও রয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু মানুষের আয়ুকালের তুলনায় তার প্রাগৈতিহাসিক যুগ তার ঐতিহাসিক যুগের চেয়ে অন্তত লাখ গুণ বেশী লম্বা। মানুষের ইতিহাস পাওয়া যায় এখন থেকে বড় জোর পাঁচ ছয় হাজার বছরের, আর মানুষ পৃথিবীতে জন্মেছে সম্ভব পাঁচ দশ লাখ বছর। সুতরাং ঐ শেষ কটা দিনের ব্যাপার দেখে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও কথা বলা চলে না। এই তর্কে বিপক্ষের প্রমাণের দুর্ব্বলতা দেখিয়ে স্বপক্ষের প্রস্তাব প্রমাণের জন্য নৃবিদ্যা আর প্রত্নবিদ্যা Anthropology ও Archæology এই দুই বিজ্ঞানকে বিরুদ্ধবাদীরা সাক্ষী মানেন। এই দুই বিজ্ঞান নাকি বিংশ শতাব্দীতে একযোগে প্রমাণ করেছে যে আদিতে মানুষের সমাজে যুদ্ধ ছিল না; ও জিনিষটা এই অল্প কিছু দিনের নতুন আমদানী। নৃবিদ্যা নাকি এখন আবিষ্কার করেছে যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী' দক্ষিণ আফ্রিকার বুস্‌ম্যান আর গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো এ সব অসভ্য জাতি ইউরোপে আদিপ্রস্তর যুগে, ধরুন এখন থেকে পনর বিশ হাজার বছর আগে, যে সব নানা জাতির মানুষ ছিল তাদেরি বংশধর। এদের পূর্ব্ব পিতামহেরা ইউরোপের আব্‌হাওয়ার পরিবর্ত্তনে সেখানে না টিক্‌তে পেরে এই সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। নৃবিদ্যার পণ্ডিতদের কেউ কেউ

এই সব অসভ্য জাতিদের ভাল করে দেখে শুনে এখন মত দিয়েছেন যে যুদ্ধ জিনিষটা প্রকৃত পক্ষে এই সব অসভ্য জাতির সমাজে নেই। মারামারি খুনাখুনি অল্প বিস্তর থাকতে পারে, কিন্তু সে প্রায়ই দ্বৈরথ্ দ্বন্দ্ব, না হয় একদিকে দুচার জন অন্য পক্ষে দুপাঁচ জন। এবং তার লক্ষ্য প্রায়ই দোষীর দণ্ড বিধান। দল বেঁধে অন্য বাঁধা-দলকে, যে দলকে-দল খুনের চেষ্টার নাম যুদ্ধ, তা এ সব অসভ্য সমাজে নেই। এ থেকে অনুমান করা হয় যে তাদের পূর্ব্ব-পুরুষ আদি প্রস্তর যুগে মানুষের সমাজেও যুদ্ধ ছিল না ও জিনিষের মানবসমাজে অনেক পরে জন্ম হয়েছে। এবং যে অবস্থার ফেরে তা হয়েছে এই অসভ্য জাতিগুলি ঘটনাক্রমে সে অবস্থায় না পড়ায় তাদের সমাজে সেই পূর্ব্বের ভাব অর্থাৎ যুদ্ধের অভাব এখনও বহাল আছে। এ যুক্তিতে অবশ্য ফাঁক আছে। কেননা এমনও ত হতে পারে যে যুদ্ধ মানুষের সমাজে বরাবরই আছে, কেবল ঐ দুই একটা ছোট খাট মানুষের দল পৃথিবীর কোণে কাণ্‌চেতে অতি বেতর রকম অবস্থায় পড়ায় তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধ লোপ পেয়েছে। আর এদের অবস্থা যে অসাধারণ তাত এতেই বোঝা যায় যে মানুষের জন্মের আদি থেকে এ পর্য্যন্ত তারা অসভ্যই রয়ে গেছে; কোনও রকম সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে নি। এই ফাঁক পুরণের জন্য সাক্ষী মানা হয় প্রত্নবিদ্যা বা Archæologyকে। প্রত্নবিদেরা মাটি খুঁড়ে আদিপ্রস্তর যুগের মানুষদের যে সব কঙ্কাল আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে নাকি যুদ্ধে মরলে যে রকম আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা তা মোটেই দেখা যায় না। আর অস্ত্র শস্ত্র যা পাওয়া গেছে তা সবই পশু শিকারের সরঞ্জাম, একটিও মানুষে মানুষে যুদ্ধের হাতিয়ার

নয়। এবং এদের আঁকা যে সব ছবি আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে শিকারের ছবি আছে, মানুষে পশুতে লড়াই এর ছবি আছে, কিন্তু কোনও যুদ্ধের ছবি নাই। এই দুই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ জোড়া দিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন তাদের সিদ্ধান্ত প্রমাণ হয়েছে। আদিকালে মানুষের সমাজে যুদ্ধ ছিল না।

যারা বলেন যুদ্ধ মানুষের সমাজে চিরকালই ছিল, তাদের একটা প্রমাণ ইভলিউশন থিওরির প্রমাণ। পশু থেকে যে মানুষ হয়েছে, এ কথাকে ঠাট্টা করা চলে, কিন্তু অবিশ্বাস করা চলে না। পশুদের মধ্যে যুদ্ধ আছে, এমন কি লেগেই আছে। সমস্ত ঐতিহাসিক কালটা মানুষের মধ্যে যুদ্ধ আছে। কেবল মাঝখানটা যখন মানুষ পশুর অনেকটা কাছাকাছি ছিল, তখনি তাদের মধ্যে যুদ্ধ ছিল না, একথা অশ্রদ্ধেয়। এর জবাবে বিরুদ্ধবাদীরা দেখিয়ে দেন, যে মনুষ্যেতর প্রাণিদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে আছে এটা মনে করা মহাভুল। যে পিঁপড়ে ও মৌমাছির আপনি নাম করেছেন, তারা ছাড়া আর কোনও প্রাণি যুদ্ধ, অর্থাৎ একই জাতিয় প্রাণীর একদল আর এক দলকে আক্রমণ করে না, আর ডারউইন যে strugle for existence-এর কথা বলেছেন তার মধ্যে যুদ্ধের, কি জীবে জীবে লড়াই-এর কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি struggle for existence-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন "মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম" তা আপনার পাঠকেরা "বীরবলী" ব্যাখ্যা বলে মনে করবেন কি না জানি নে, কিন্তু ওটা খাঁটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, একবারে ডারউইনের নিজের কথা। ও struggle-এ যে জীব মারা যায়, সে হাতে নয় ভাতে। এই যে যত জীব জন্মে তার অতি অল্প কিছু অবশিষ্ট থাকে আর বাকী সবই

মারা যায় সে লড়াই করে নয়, না খেতে পেয়ে। যে খাবার আছে, তাতে সবার কুলোয় না, সুতরাং জোরদার কজনা দল বেঁধে বাকী গুলিকে মেরে ফেলে নিজের জন্য সবটা খাবার দখল কর্‌ল এটা সভ্য মানুষের ব্যবস্থা হতে পারে, পশুদের মধ্যে ঘটা অসম্ভব।* Survival of the fittest-এর "ফিট্‌নেস্" অপরকে হত্যা করার "ফিট্‌নেস্" নয়, নির্দ্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে টি*কিয়ে রাখার "ফিটনেস্"।

আপনার তার্কিক যুবকটি যদি এই যুক্তি তর্কেই নিরুত্তর হয়ে যায় তবে বুঝ্‌ব যে-দেশে "ন্যায়ের বিধান দিল, শিরোমণি" তার সম্মান সে রাখ্‌তে পার্‌লে না। যথার্থ তার্কিকের কাছে এর মধ্যে চুক কত দেখুন :—

পশুদের মধ্যে যুদ্ধ নেই? বেশ কথা। যুদ্ধ পশুর nature-ত বলি নি, বলেছি মানুষের "নেচার"। পশুপ্রকৃতি আর নরপ্রকৃতি যে একবারে এক, একথা কোন নরাধমও বলে না। বরং এতে প্রমাণ হ'ল যে যুদ্ধ মানুষের বিশেষ ধর্ম্ম; যা না থাক্‌লে মানুষ হয়ত পশু হবে।

Anthropology আর Archæology প্রমাণ করেছে, আদি মানব সমাজে যুদ্ধ ছিল না? ঐ দুই বিজ্ঞানের মতবাদগুলির পরমায়ু কত? আর যে মতগুলি "সুপ্রতিষ্ঠিত" তার প্রত্যেকের স্বপক্ষে যত পণ্ডিত, বিপক্ষে তত পণ্ডিত কি না? আর এ সব কথা যদি ছেড়েও দিই ঐ বিশিষ্ট সাক্ষী Archæology-র প্রমাণটা দাঁড়াল

* ও ঘটনাকে ডারউইন natural selection বল্‌তেন না; ওটা পড়ে artificial selection-এর পর্য্যায়ে।

কেমন? যুদ্ধে মরা মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় নি, সুতরাং ওযুগে যুদ্ধে কেউ মরে নি! যুদ্ধের অস্ত্র পাওয়া যায় নি, ত যুদ্ধ কেউ করে নি! যুদ্ধের ছবি দেখা যায় না ত যুদ্ধের ছবি কেউ আঁকেই নি! জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কি, আদি প্রস্তরযুগের চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বছরে পৃথিবীতে মানুষ জন্মেছিল কত, আর সে যুগের মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে কটি? তারা যত অস্ত্র গড়েছিল, আর যত ছবি এঁকেছিল তাব কি পরিমাণ আবিস্কার হয়েছে, বা কোনও দিন কি হবাব সম্ভবনা আছে? ডারউইন যে তার Origin of species-এর পুঁথিতে Palæontology বা প্রত্নপ্রাণি-বিদ্যায় ভাবাত্মক প্রম ণই প্রমাণ, অভাবাত্মক প্রমাণ প্রমাণ নয় দেখবার জন্য একটা গোটা অধ্যায় লিখেছিলেন তা কি সাবাই ভুলে গেছে নাকি? "জানি না ত ছিল না" এ যুক্তি কি এক্ষেত্রে চলে? কেননা যা জানি বা জান্‌তে পারা যাবে তা, যা ছিল তার তুলনায় একরকম কিছুই নয়।

ধরেই যদি নেওয়া যায় যে যুদ্ধ আদি প্রস্তরযুগের বা "পেলিও-লিথিক্" যুগেব মানুষের "নেচার" নয়, মেণ্ডেল আবিস্কার হবার পর, আর ডিভ্রিসের অলোচনা সামনে থাক্‌তে এমন কোন মূর্খ আছে যে না জানে যে জীব শরীরে অনেক পরিবর্ত্তন হঠাৎ আসে, কিন্তু স্থায়ী হয়ে বংশপরম্পরা চলতে থাকে। আর এই সব "রিভলিউশানের" যোগ করেই যে "ইভলিউসন" এইত হালের মত। অবশ্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজ, বাঙ্গালা দেশের গর্ভণর, ন্যাশানাল লিবারেল লিগের সভ্য এদের মত আলাদা। আর খৃষ্টানি মতেও আত্মার আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই। যুদ্ধ মানুষের সমাজে অনাদি নয় এতেই কি প্রমাণ হল যে অন্ত পর্য্যন্ত সে ওখানে থাকে না। লেখাপড়াও

মানুষের সমাজে অনাদি নয়, কিন্তু এ আশা কি করা চলে, যে জঞ্জাল একদিন সেখান থেকে বিদায় হবে !

যুবকটি এ-সব তর্ক তুলবে কিনা বলতে পারি নে, কিন্তু সত্য কথা এই যে "মানুষ এতকাল যুদ্ধ করছে সুতরাং চিরকাল করবে" এও যেমন কেবলান্বয়ী, "এম্পিরিক" যুক্তি, "মানুষ অল্পকাল যুদ্ধ করছে সুতরাং চিরকাল করবে না" এও তেমনি "এম্পিরিক" যুক্তি মাত্র। কার্য্যকারণের সঙ্গে যোগ না থাকায় ও দুই-এরই ভিত কাঁচা। আর এও ঠিক যে প্রশ্ন করে মানুষের সমাজে চিরদিন যুদ্ধ থাকবে কিনা সে কিছু এ জানতে দেয় না যে পৃথিবীজোড়া হিমপ্রলয়ে যদি বেশীর ভাগ লোক মরে যায়, আর যারা বাকী থাকে তারা বনে' যায় "এস্কিমো" তবে তাদের মধ্যে যুদ্ধ থাকবে কিনা। ও জিজ্ঞাসার সরল অর্থ আমরা যাকে সভ্যতা বলি, আর তার গতি ও পরিণতি অনুমান করতে পারি, তাতে সভ্য মানুষের সমাজ থেকে যুদ্ধ লোপ হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে যা অনুসন্ধান করতে হবে তা মানুষের মধ্যে যুদ্ধ কবে এল নয়, কেন এল। শ্বেত বরাহ কল্পে যুদ্ধ ছিল কিনা, আর কল্পান্তে যুদ্ধ থাকবে কিনা এ দুপ্রশ্নের কোনটির বা দুটিরও উত্তরে ও জিজ্ঞাসার শান্তি হবে না !

আপনি হয়ত মনে ভাবছেন এ স্পষ্ট কথাটা এত করে' বলছি কেন। তার কারণ আছে। আমার সন্দেহ হয় যেমন গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপের জার্ম্মান অজার্ম্মান "মিলিটারীষ্টরা" "বায়লজির" সরাসরি প্রমাণ করেছিলেন যে, যুদ্ধ মানব সমাজে অক্ষয়, তেমনি যুদ্ধের পরে ইউরোপের "প্যাসিফিষ্টরা" "আরকিওলজির" প্রমাণে সরাসরি প্রমাণ করছেন মানব সমাজে থেকে যুদ্ধের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

এ দুএর মধ্যেই যুক্তির জোরের চেয়ে গরজের জোর বেশী। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। হ্যাভেলক এলিসের যে "বিরোধের তত্ত্বকথা" নামে প্রবন্ধের নাম করেছি তার এক জায়গায় তিনি বল্‌ছেন, দেখ্‌তে পাওয়া যায় বালকদের মারামারির প্রকৃতিটা মোটামুটি নয় বছর থেকে বারবছর পর্য্যন্ত থাকে। এ থেকে কল্পনা করা অসঙ্গত নয় যে যুদ্ধ মানবজাতির পৌগণ্ডকালের একটা অস্থায়ী ঘটনা মাত্র। জাতির শৈশবেও ছিল না, যৌবনেও থাক্‌বে না। কেননা প্রতি জীবের জীবনের ইতিহাস তার জাতির ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। আপনার পাঠকদের অনেকে হয়ত জানেন যে ভ্রূণবিদ্যা বা "এম্‌ব্রিওলজি" ইভলিউশন থিওরীর একটা বড় পোষক প্রমাণ। মাতৃগর্ভে যে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে জীব ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে নিজের জাতীয় শরীর ও চেহারা পায় সে পরিবর্ত্তন তার জাতির লক্ষ বছরের ক্রমপরিবর্ত্তনের যে একটা অতি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, এ মনে করার কারণ আছে। সুতরাং ভ্রূণের ক্রমবিকাশ জাতিব আদি থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের একটা মোটামুটি ধারণা করে দেয়। কিন্তু এ সম্বন্ধ হ'ল কার্য্যকারণের সম্বন্ধ। জাতির সমস্ত অতীতের চাপ, অর্থাৎ তার পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃতির চাপ প্রত্যেক জীবের উপর রয়েছে। এই চাপই ভ্রূণের বিকাশের ক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং জাতির ভবিষ্যৎ জীবের বিকাশের মধ্যে দেখা দেবার কোনও কারণ নেই। ও কল্পনা কবিত্বহিসাবে হয়ত মন্দ নয় কিন্তু বিজ্ঞানে অচল। এবং হ্যাভেলক এলিসের মত বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত যখন ওকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বলে চালাতে চান তখন "গরজ বড় বলাই" ছাড়া আর কি ভাবতে পারেন।

একটু প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাক্। যুদ্ধের আদিকারণ ধনের লোভ। মানুষ প্রথমতঃ প্রধানতঃ ছিল শিকারী। দিনের প্রয়োজন তাকে একদিনে সংগ্রহ করতে হত! এবং সে কাজ সচরাচর দল বেঁধে করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং মানুষ চিরদিনই ছোট বড় দলে বাস করলেও দলের সম্পত্তি বলে কোনও জিনিষ তার এখন জীবনে বড় একটা গড়ে উঠ্তে পারেনি। মানুষের বুদ্ধি একদিন তাকে এই অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিল। প্রয়োজন ও ভোগের সামগ্রী নিত্য জোগান পাবার কৌশল আবিষ্কার করে, তার উপায় ও উপাদান মানুষ আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করল। ভূ হল সম্পত্তি এবং তা থেকে আহার্য্য আদায়ের জন্য মানুষের দল তাকে ঘিরে ঘ্যাসাঘেঁসি বাসা বাঁধলে্। শিকার ছেড়ে মানুষ হল কৃষক। মোটামুটি বলা চলে সেইদিনই হ'ল মানব-সমাজে যুদ্ধের জন্মদিন। কেননা, এমন এক জিনিসের সৃষ্টি হ'ল, যা একদলের কেড়ে নেবার লোভ ও অন্য দলের রক্ষা করবার চেষ্টা একসঙ্গে জাগিয়ে তোলে। সম্পত্তি সৃষ্টির সঙ্গে মানুষ যখন ধাতু দিয়ে মারাত্মক অস্ত্র সব গড়তে শিখ্ল তখন দলের সঙ্গে দলের বিরোধের চেহারা হল আমাদের পরিচিত যুদ্ধের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। আপনি যে পিঁপ্ড়ের যুদ্ধ দেখেছেন, আর মৌমাছির যুদ্ধের কথা শুনেছেন তারও সম্ভব কারণ এইখানে। এই দুটি প্রাণী মানুষের মত দল বেঁধে সম্পত্তি অর্জ্জন ও সঞ্চয় করে, এবং যুদ্ধের অস্ত্র বিধাতা এদের শরীরের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। অবশ্য যুদ্ধ যখন মানুষের সমাজে এল তখন নিজের আব দশটা সৃষ্টির মত ওর উপরেও মানুষের মমতা পড়েছে, বুদ্ধি ধন ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেও প্রতিষ্ঠানেরও ক্রমোন্নতি ঘটেছে।

কর্ম্মের বিভাগে এ কর্ম্মের জন্যও একটা পৃথক বর্ণের নিরূপণ হয়েছে। এবং সে বর্ণের লোকেরা অনন্যকর্ম্মা হয়ে যুদ্ধকে বিদ্যা ও কলা দুই রকমেই গড়ে তুলেছে। মহাভারতখানা হাতের কাছে নেই বলে' তুলে দেখাতে পারলুম না; শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যপর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ আর কর্ণের চোখে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চেহারাটা কেমন দেখিয়েছে। পাছে এতদিনের আকাঙ্খিত পরিণামটা আপোষের প্রস্তাবে মাটি হয়ে যায় এতে কর্ণের কি ব্যাকুল আশঙ্কা। কর্ণের যুদ্ধাকাঙ্খার মূলে লোভ নেই, ক্রোধও নেই, রয়েছে শিল্পের উপর শিল্পীর যে টান। কর্ণ কেবল যুদ্ধ বিদ্যার আচার্য্য নন, তিনি যুদ্ধকলার আর্টিষ্ট। এমনি করে, যেমন মানুষের আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠান তেমনি যুদ্ধেও যে মনোভাবে ওর উৎপত্তি তার চারপাশে ছোট বড়, উচু নীচু বহুভাব জমে উঠে তাকে পুষ্টি দিচ্ছে, নানা রঙ্গীন তুলিতে তাকে রঙাচ্ছে। কিন্তু সব রকম সাজসজ্জা ও মুখোষের মধ্য দিয়েও সেই আদিম মানবের চেহারা দেখা দেয়। এই যে গত মহাযুদ্ধে দু' পক্ষের কোনও জাতিই বিশ্বমানবের হিত ছাড়া আর কোনও কথাই উচ্চারণ করে নি, তবুও মন্দলোকের চোখে পরেছে যে এর মধ্যে পৃথিবীর নানা জায়গার মাটির কথা, খনির কথা ও তেলের কথাও রয়েছে। যুদ্ধ যে ডাকাতির রাজসংস্করণ এটা কেবল আলেকজেণ্ডার ও দস্যুর গল্পে ছেলেদের পাঠ্যপুঁথির 'মরাল' নয়, ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে যাচাই করা খাঁটি সত্য।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা বল্লুম তার সোজা কথা ত এই মানুষের সভ্যতার যেখানে শিকড়, যুদ্ধেরও সেইখানেই মূল। তাই কেউ কেউ সন্দেহ করেন ওর একটাকে ছেড়ে আর একটাকে রাখা চলবে না।

কাটতে গেলে দুই-ই একসঙ্গে কাটা পড়বে। এতটা নিরাশার বোধ হয় সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে, চোখ না বুজে একথা বলা যায় না যে, যে সব কারণে যুদ্ধের উৎপত্তি ও স্থিতি তা লয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে দলে দলে স্বার্থের সংঘর্ষ যুদ্ধের মূল সে দলের বর্ত্তমান আকারের নাম "নেশন"। আপনার মুখেই শুনেছি—একজন ফরাসী পণ্ডিত দেখিয়েছেন 'নেশন' কথাটা ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে খুব প্রাচীন, কিন্তু 'ন্যাশানালিজম্' কথাটা অতি হালের সৃষ্টি ; ওর বয়স একশ' বছরও নয়। অর্থাৎ এই গেল একশ' বছরের মধ্যে ইউরোপের 'নেশন' নামধেয় দলগুলি প্রতিদলের লোকের মধ্যে স্বার্থের একতা, আর দলে দলে স্বার্থের বিরোধ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ফসল ফলাতে এর চেয়ে সার মাটী আর নেই। এই নেশনে নেশনে যুদ্ধের আন্তরিকতা ও প্রচণ্ডতার সঙ্গে প্রাচীন রাজায় রাজায় ঢিলে রকম যুদ্ধের কোনও তুলনাই হয় না। কেননা, এ যুদ্ধে অতি সহজেই এক নেশনের প্রত্যেক সৈন্যকে বিপক্ষ নেশনের প্রতি সৈনিকের প্রকৃত শত্রু করে' তোলা যায়, যে শত্রুতা কেবল হাতের নয়, মনের। আর এই শত্রুতা সাধনের যে সব অস্ত্র মানুষ এখন আবিষ্কার করেছে ও করবে বলে' ভরসা করছে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু কোনও দিন মানুষের হাতে পূর্ব্বে ছিল না।

জানিনা আপনার কোনও পাঠক ওয়াশিংটন ও জেনোয়ার দিকে আমাকে তাকাতে বলবেন কিনা। ওদিকে তাকিয়েছি এবং যাতে সব চেয়ে শঙ্কিত হয়েছি, সে ও দুই বৈঠকের নিষ্ফলতায় নয়, ওদের সফলতার আদর্শে। যে কাজের জন্য আটলাণ্টিকের দুই পারে ঐ

দু' জায়গায় 'নেশনদের' ডাকা হয়েছিল, তা অবশ্য সভ্য মানুষের সমাজ থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দেবার উপায় উদ্ভাবন করা। কিন্তু তার মানে এ নয় পৃথিবীর সকল রকম দলের লোকের স্বার্থের একটা একতা ঘটান! যুদ্ধ রদের এই যে উপায় কল্পনা হয়েছে, তা হচ্ছে যে সব লোকের দল আধুনিক যুদ্ধ লড়বার ক্ষমতা রাখে, তাদের স্বার্থের বিরোধ মিটান। কেননা, এ সব দল মিলিয়ে যদি একটা বড় দল গড়া যায়, তবে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠে যাবার সম্ভাবনা আছে, কারণ দলের বাইরে যারা থাকবে, তারা সংখ্যায় বেশী হলেও স্বার্থ নিয়ে ওদলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি তাদের নেই। বাঘে মেষে যে যুদ্ধ হয় না সে ত আপনি মনে করিয়েই দিয়েছেন। সুতরাং সহজেই এদের শান্ত রাখা চলবে। আর তাদের একটু আধটু খাটিয়ে যদি মানুষের ধনসম্ভার কিছু বাড়ান যায়, তবে যোদ্ধাদলগুলির স্বার্থের বিরোধও অনেকটা মিটতে পারে। প্রাচীন এথেনীয় ডেমক্রেসির সাম্যের ভিত্তি যে ছিল দাস ও প্রভুর বৈষম্য এ ত সবাই জানি। মানুষের সমাজে যুদ্ধ আসার পূর্ব্বে ছিল পশুশিকার; 'লীগ অব্ নেশনে' যদি যুদ্ধ যায়, তবে পরে থাকবে মানুষ-শিকার। যারা 'নেশন' নয়, যাদের 'লীগও' নেই, তা'রা যদি এতে বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানায় 'মানুষের সমাজে যুদ্ধ অক্ষয় হোক', অধর্ম্ম হলেও কি সেটা খুবই অন্যায় হবে?

'মানুষের সমাজে চিরদিন যুদ্ধ থাকবে' আর মানুষের সমাজ থেকে অল্পদিনেই যুদ্ধ যাবে' এর কোনটাই ভবিষ্যদ্বাণী নয়। এ দুইই বর্ত্তমানের চেষ্টার লক্ষ্য। কোন লক্ষ্য মানুষকে কি রকম কাজে ব্রতী করে তাই নিয়েই ওদের বিচার। ভুল-শুদ্ধের মাপ-কাটিতে ওদের যাচাই করতে বসা নিরর্থক।

আমি স্পষ্ট দেখছি চিঠি শেষ হ'ল দেখে আপনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লেন। আর আমার মনে ত আশা হচ্ছে, এর পর জবাব চেয়ে আপনার এ বন্ধুর নামে আর চিঠি বের করতে ভরসা পাবেন না। ইতি—

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

——

যুদ্ধের কথা

(প্রত্যুত্তর)

শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত ;—

সুহৃদবরেষু।

আপনি জানতে চেয়েছেন যে দেশে এত পণ্ডিত লোক থাক্‌তে, "যুদ্ধ থাক্‌বে কি যাবে", এ প্রশ্ন আমি আপনাকে কেন করেছি ; এর জবাব খুব সোজা। আমি জানতুম এ প্রশ্নের জবাব আপনার কাছ থেকে পাব আর কারও কাছ থেকে পাব না। আমি যে ঠিক অনুমান করেছিলুম তার প্রমাণ যুদ্ধের তরফ থেকে আপনার এই দীর্ঘ বর্ণনাপত্র।—

মানুষ যে পশুর দ্বিপদী সংস্করণ, এ কথা আপনি মানলেও, মানবধর্ম্ম যে পশুধর্ম্ম এ কথা আপনি মানেন না। আপনার এ মত শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। বিজ্ঞান আজকাল সব জিনিষেরই গোড়ার খবর বার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। Origin নিয়েই যে বিজ্ঞানের কারবার তার প্রমাণ পাবেন ডারউনের কেতাবের মলাটে। তিনি Origin of species না লিখলে মানবধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম, এক কিনা এ তর্ক উঠতই না। কিন্তু এই সব মূল তত্ত্বের একটা গোড়ায় গলদ আছে। "কিসের থেকে কি হয়েছে" আর "কি হয়েছে" এ দুই এক জিজ্ঞাসা নয়। ছেলেবেলায় স্কুল

ফ্রেণ্ডদের মুখে শুনেছি যে শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হয়। ধরে নিচ্ছি যে তাই হয়, তাহলেও ও দুটী জীবের রূপও এক নয় চরিত্রও এক নয়। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলতে আমরা শুঁয়োপোকার সম্বন্ধ বুঝি নে। কর্ত্তা কর্ম্মের জ্ঞান যে অপাদান উপাদানেরই জ্ঞান, এই উল্টোজ্ঞানের নামই বিজ্ঞান আর আমি যে nature এর নাম শুনতেই ডরাই তার কারণ nature আজ কাল এসেছে বিজ্ঞানের দখলে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে nature ও যেমন illogical বিজ্ঞানও তদ্রূপ। আপনি বিনয় করে বলেছেন যে আমি যে চৌদ্দ বিজ্ঞানের নাম করেছি তার একটির সঙ্গেও আপনার পরিচয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি উপরি চারিটি বিজ্ঞানের বিচার করেছেন, যথা archæology, embryology; morphology ও palæontology। বিজ্ঞানের এই অষ্টাদশ পর্ব্ব ঘেঁটে আপনি যে তত্ত্ব উদ্ধার করেছেন দেখা যাক্ তাতে আমার প্রশ্নের কতটা উত্তর পাওয়া গেল।

আপনার বক্তব্য এই যে মানুষ পশুর বংশধর কিন্তু পশু নয়, এ দুয়ের চেহারায় ঢের মিল থাকলেও, তাদের স্বভাবে তাদৃশ মিল নাই। এ কথা আমি মানি। evolution-এর প্রধান আচার্য্যেরা, যথা— Darwin, Spencer ইত্যাদি মুখাকৃতিতে অবিকল বানর, কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারিনে যে, আলিপুর চিড়িয়াখানার Ezra Houseয়ে বসে কোনও কপিরাজ Descent of Man কিম্বা Synthetic Philosophy লিখছে। ভাল কথা—William Butler প্রশ্ন করেছেন,—"কবি মাত্রেই সুন্দর হয় কেন, আর বৈজ্ঞানিক মাত্রেই কুৎসিত হয় কেন"? এ প্রশ্নের উত্তর আমি করতে পারিনে, কেননা

আমি বৈজ্ঞানিক নই। Embryologyতে কি এর সন্ধান পাওয়া যাবে? তবে কবি মাত্রেই যে কন্দর্প, এ কথাও সত্য নয়। Wordsworth-এর মুখ ছিল ঠিক ঘোড়ার মত। তবে Wordsworth কবি ছিলেন কিনা, সে সন্দেহও অনেকে করে থাকেন।

এ তর্ক তোলায়, এ লেখার অবশ্য প্রকরণ-ভঙ্গ দোষ হল। কিন্তু কি করা যায়। বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করে Origin সম্বন্ধে কৌতূহল মানুষে কিছুতেই ছাড়াতে পারে না; বিশেষতঃ যখন এ যুগের বিজ্ঞানের মহাপুরুষরা, "যত্রাকৃতিস্তত্রগুণাঃ", আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের এই মতকে সবাই মিলে মুখ ভেঙচাচ্ছেন।

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক্। মানুষ পশু না হলেও, মানুষে মানুষে একটা মস্ত তফাৎ আছে। মানুষকে মোটামুটি দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক সভ্য আর এক অসভ্য।

যতদূর আমরা জানি, মানুষ হাজার ছয়েক বছর হল সভ্য হয়েছে। তার আগে হাজার পঞ্চাশেক অথবা লাখ-পঞ্চাশেক বছর সে অসভ্য ছিল।

এক দলের বৈজ্ঞানিক বলেন যে, অসভ্য মানব যে যুদ্ধ করত, তার কোনও প্রমাণ নেই, আপনি এর উত্তরে বলেছেন যে, তারা যে যুদ্ধ করত না, তারও কোনও প্রমাণ নেই। অতএব অসভ্যকে ছুটি দেওয়া যাক। ওকে জেরা করে কিছু পাওয়া যাবে না। ও বেচারা নাবালক।

আপনি বলেছেন যে, সভ্য-মানব ওরফে ঐতিহাসিক মানব চিরদিন যুদ্ধ করে এসেছে, অতএব "এষঃ ধর্ম্ম সনাতন"। ইতিহাস যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে কিম্বা যুদ্ধ ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে, এ তর্ক আমি তুলছি নে;

কেননা ও দু' কথাই সত্য। যুদ্ধ যেমন ইতিহাসের মাল জুগিয়েছে, ইতিহাসও তেমনি যুদ্ধের মন জুগিয়েছে। আর এক কথা মানব-মন যেমন ইতিহাস গড়েছে, মানব-ইতিহাসও যে তেমনি মানব-মন গড়েছে, এই হচ্ছে ইভলিউসনের সিদ্ধান্ত। আপনি আমার প্রশ্নের স্পষ্ট কোন উত্তর না দিলেও, ঈঙ্গিতে বলেছেন যে, যুদ্ধ যখন অতীতে হয়ে এসেছে, তখন ভবিষ্যতেও হবে। কেননা, ওটি হচ্ছে ঐতিহাসিক মানবের বিশেষ ধর্ম্ম। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের কপালে যুদ্ধ লেখা আছে। আর অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে। fatalism তা naturalই হোক্ আর historicalই হোক্, দুইই fatalism। এস্থলে আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে, মানুষ কোনরূপ fatalism মেনে নিতে পারে না। কেননা, সে হচ্ছে আসলে spirit—আর spirit হচ্ছে স্বরাট, অর্থাৎ ভৌতিক কিম্বা ঐতিহাসিক কোনরূপ বিরাটের অধীন নয়। মানুষ প্রকৃতির দাস হয়ে জন্মাতে পারে—কিন্তু সে তার প্রভু হবে এই তার পণ। একথা অস্বীকার করলে Spiritকে অস্বীকার করতে হয়— অর্থাৎ জড়বাদী হতে হয়, আর তা যদি হই ত, উচিত অনুচিতের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। জড়পদার্থের Science আছে, কিন্তু Conscience নেই। আর যে প্রশ্ন আমরা তুলেছি, সে Conscience-এর প্রশ্ন—Science-এর নয়। সুতরাং Conscience-এর দ্বিধা Science দূর করতে পারবে না, পারবে শুধু Conscience। আপনি লিখেছেন যে, আমার প্রতি কথার ভিতর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকে। একথা সত্য। কিন্তু সে বিদ্রূপ কিসের বিরুদ্ধে? প্রচ্ছন্ন জড়বাদের বিরুদ্ধে। আর দেশ যে আজ প্রচ্ছন্ন জড়বাদীতে ভরে গেছে, তার পরিচয়, কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি সাহিত্য,

কি পলিটিক্‌স্‌—সকল ক্ষেত্রে নিত্য পাওয়া যায়! আমাদের নব আধ্যাত্মিকতা যে প্রচ্ছন্ন জড়বাদ, এ সত্য আমার বিশ্বাস আপনার দার্শনিক দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বর্ণচোরা বস্তুর ভিতরের রূপটা যে কি, দেখতে হলে, তাকে চিরে দেখতে হয়। তাই আমার কলমকে আমি তুলি কর্‌তে চাইনে, ছুরি কর্‌তে চাই।

(২)

আপনি যুদ্ধের স্বপক্ষে যে ঐতিহাসিক Case খাড়া করেছেন, শেষটা একটা হৃদয়ের যুক্তি দিয়ে, আপনি নিজে হাতেই তাকে সমূলে ধ্বংশ করেছেন। তা যে করেছেন, তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

মানব সমাজ থেকে কালে যুদ্ধ দূরীভূত হবে কিনা এ প্রশ্ন হচ্ছে সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে প্রশ্ন অর্থাৎ এটা একটা দার্শনিক প্রশ্ন।

কোন বিশেষ জাতির পক্ষে কোন বিশেষ অবস্থায় যুদ্ধ করা উচিত কি না, যথা ফ্রান্সের পক্ষে কাল রুসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত কি না এ হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রশ্ন অর্থাৎ practical প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের কোনরূপ দার্শনিক জবাব নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও রাসিয়ার উপস্থিত স্বার্থ ও পরস্পরের রাগদ্বেষের উপরই এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে মানবজাতির ভবিষ্যত নিয়ে কোন বিশেষ জাতির বিশেষ স্বার্থ কিম্বা তার দ্বেষ হিংসা প্রবৃত্তির সাহায্যে ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না।

স্থতরাং আপনি যখন বর্ত্তমানে ইউরোপের নিরস্ত্র হওয়াটা বাকী পৃথিবীর পক্ষে ভয়ের কথা কি না; এ প্রশ্ন তুলেছেন, তখন আপনি দার্শনিক সমস্যার, দিকে হঠাৎ একদম পিঠ ফিরিয়েছেন আর উক্ত প্রশ্নের উত্তরে যখন বলেছেন যে হাঁ ভয়ের কারণ তখন আপনার আগাগোড়া যুক্তিকে এক কথায়, ধূলিসাৎ করেছেন।

(৩)

যুদ্ধ কেউ সখ করে' করে না। আপনি বল্ছেন যে কর্ণ এ বিষয়ে একজন আর্টিষ্ট ছিলেন, তিনি War for war's sake ই করতেন। কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সাধারণ মানবের কোনও তুলনা হয় না। কর্ণ কবচ ধারণ করেই ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। এ দেশের চাষাদের মুখে শুনেছি যে তাদের সমাজের কোন কোনও ছেলে হুঁকো হাতে করে ভূমিষ্ট হয়। সে সব ছেলেদের ধূমপানও যেমন কেউ বন্ধ করতে পারবে না, কর্ণের মত বীরের যুদ্ধ করাও কেউ বন্ধ কর্তে পারবে না। তবে পৃথিবীতে অদ্যাবধি একমাত্র কর্ণই সবর্ম্ম অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বাদবাকী সকলে হন সচর্ম্ম।

স্থতরাং এ কথা বলা যেতে পারে যে কর্ণ বাদ দিয়ে বাদবাকী লোক সখ করে যুদ্ধ করে না, একটা নয় একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে করে। আর তার সে উদ্দেশ্য সফল হবে কি না, তা নির্ভর করে যুদ্ধে সে হারে কি জেতে তার উপর। যুদ্ধে জয়লাভ না হলে কোনও ফললাভ হয় না।

হয় আত্মরক্ষা নয় স্বার্থসিদ্ধিই হচ্ছে যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এবং আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধন যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এত আমরা

সবাই মনে জানি, আর কেউ কেউ মুখেও মানি। তার উপায়টা নিয়েই যা তর্ক। এই কথাটা মনে রেখে এ বিষয়ের বিচার করা যাক।

(৪)

কোনও ব্যাপার পৃথিবীতে বহুকাল থেকে চলে আসছে বলে চিরকাল যে তাকে রাখ্‌তে হবে এ কথা কেউ বলে না। আপনার মুখেই শুনেছি যে থুকিদিদিসের ইতিহাসে প্লেগের বর্ণনা আছে। কিন্তু এই পুরোণো দলীলের বলে, পৃথিবী থেকে প্লেগ তাড়ানোর চেষ্টা যে তার দখলী সত্বের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা এ কথা আপনিও বলবেন না।

যখনি আমরা কোন বস্তুকে সনাতন বলি, তখন এই বলি যে সে বস্তু শুধু পুরাতন নয় তা স্থায়ী হওয়ায় উচিত। আমার যুবক বন্ধুটি যে যুদ্ধ পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হবার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তার আসল কারণ ও কথা শুনে তাঁর ধর্ম্ম বুদ্ধিতে আঘাত লেগেছিল। কেননা যুদ্ধের প্রতি কোনরূপ দৈহিক টান তার ছিল না। দেহে সে যুবকটি ছিল, বালক ও বৃদ্ধের একটি অপূর্ব্ব মিলন।

যুদ্ধকে চিরকালই মানুষে একটা মহৎ অনুষ্ঠান বলে মনে করে এসেছে। এবং তার কারণও আছে।

যদি অনুমতি করেন ত যুদ্ধের স্বপক্ষে একটু ওকালতি করি। যুদ্ধের প্রসাদে মানুষের নানাদিকে নৈতিক উন্নতি হয়। এতে মানুষের সাহস বাড়ে, সংযম শিক্ষা হয়। স্বার্থত্যাগ ও আত্ম-

বলিদান করতে সে অভ্যস্ত হয়। তারপর নেতাদের প্রতি ভক্তি, সহযোদ্ধার প্রতি সখ্য, স্বদলের সহিত ঐক্যজ্ঞান, এ সব মনোভাবও যোদ্ধার মনে জন্মাতে বাধ্য। এক কথায় বৈশ্যের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের চরিত্র মহৎ।

ব্যক্তি ছেড়ে জাতিতে আসা যাক, তাহলেও দেখতে পাব যে যে জাতিকে অপর জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা কিম্বা স্বার্থসাধন করতে হয়, সে জাতিকেও ঐ সকল গুণ অর্জ্জন করতে হয় নচেৎ সে জাতি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হবে। নিরাপদে চিরজীবন খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার আদর্শ মানুষকে উন্নত করে না তাকে অবনত করে। এ সত্যের অন্ততঃ একটা অস্পষ্ট ধারণা সকলের মনেই আছে। তাই মানুষ যখনই ভোগসুখকে বিসর্জ্জন দিয়ে কোন মহৎ কার্য্যে ব্রতী হয় তখনই তার মুখের কথা যুদ্ধের পারিভাষিক শব্দ হয়ে উঠে।

(৫)

কাব্য ইতিহাসে যুদ্ধের যে এত গুণ কীর্ত্তন করা হয়েছে, তার মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা কোনও বিশেষ জাতির দিক থেকে দেখলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোনও রূপ নৈতিক আপত্তি হতে পারে না।

সমগ্র মানবের দিক থেকে দেখলেই আমাদের মনে যুদ্ধের সার্থকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। একের জিত অপরের হার। যেখানে আমরা দুপক্ষের কোনপক্ষই নই সেই

ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে একজাতির স্বার্থের জন্য অপর জাতির সর্ব্বনাশে বিশ্বমানবের কি স্বার্থ। একের হার আর অপরের জিতে যদি কাটাকাটি যায় ত সমগ্র মানবের হিসাবে যুদ্ধের ফল শূন্য। সুতরাং যুদ্ধ বজায় রাখতে হলে দেখাতেই হবে ওতে বিশ্বমানবের উন্নতি হয়। যিনি তা না দেখাতে পারবেন, তাঁকে যুদ্ধের মামলা সরাসরি ডিসমিস করতেই হবে।

যুদ্ধ যে মানবের উন্নতির সহায়, এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বক্ষ্যমান যুক্তি দেখান হয়েছে ! যুদ্ধে যে জাত জেতে সে প্রবল, যে হারে সে দুর্ব্বল। এ ক্ষেত্রে বলের, অর্থ শুধু বাহুবল নয়; সেই সঙ্গে চরিত্র বল ও বুদ্ধিবল। এই তিনবলের একত্র সমাবেশ না হলে কোনও জাতি যুদ্ধে একাধিকবার জয়ী হতে পারে না। অতএব প্রবলের উন্নতির একটি উপায় হচ্ছে দুর্ব্বলের বিনাশ। এতে পৃথিবীতে প্রবল টেঁকে যায় আর দুর্ব্বল টেঁসে হয়। ধরুণ যদি ব্যাপার উল্টো হত,অর্থাৎ যুদ্ধে দুর্ব্বলের জয় হত, আর প্রবলের ধ্বংশ হত, তাহলে উত্তরোত্তর পৃথিবী দুর্ব্বল লোকেরই স্বর্গ হয়ে উঠত। ও পরিণতিতে কি সমাজিক কি আধ্যাত্মিক কোন হিসেবেই মানব সভ্যতার আদর্শ পরিণাম হত না। আমাদের শাস্ত্রে আছে, “দেবাঃ দুর্ব্বল ঘাতকা” আর উপনিষদ যে বলে “নয়মাত্মা বলহীনেন লভ্য”— তা যে প্রবাসী-পত্রিকার মলাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে সেই জানে। ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের পরীক্ষা পাস হয়েই মানুষকে তার চরম পদলাভ করতে হবে, আর তার ফলে মানুষ এই পৃথিবীতেই দেবত্ব লাভ করবে, অবশ্য দুর্ব্বলদের ইতিমধ্যে হয় বধ করে নয় তাদের দাস করে। অর্থাৎ দুর্ব্বলকে হয় মারা নয় তাকে প্রবলের পোষমানা—

জানোয়ার করাই হচ্ছে প্রবলের দেবত্ব লাভের একটি উপায়। অতীতে ঘটনা যে এই ভাবেই ঘটেছে, তাও স্বীকার্য্য।

(৬)

উক্ত মত যিনি না গ্রাহ্য না করেন তাঁর যুদ্ধের স্বপক্ষে কোনরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলবার নেই। অতএব তিনি এবিষয়ে একমাত্র sentimentalise-ই করতে পারেন। যুদ্ধ জিনিষটে ভাল, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে করা ভাল নয়, যেহেতু আমি দুর্ব্বল এরূপ কথার ভিতর যদি কোন লজিক থাকে ত সে হৃদয়ের লজিক, ইংরাজিতে যাকে বলে, pathetic fallacy. যুদ্ধের উকিলদের মুখে এ fallacy শোভা পায় না। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ না করলে, যে যুদ্ধ দর্শনে অধিকার জন্মায় না, এ কথাত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন।

আপনার পত্রের শেষাংশে আপনি দুর্ব্বলদের প্রতি দরদ দেখিয়েছেন। ইউরোপের নিরস্ত্র হওয়াটা আপনি ভয়ের কথাই মনে করেন। আপনি এই ভেবেই আকুল হয়েছেন যে ওদের যদি পরস্পরের মিল হয়ে যায়, তাহলে আমাদের গতি কি হবে? প্রবলে প্রবলে যদি কাটাকাটি করে মরে তাহলেই দুর্ব্বলেরা দুনিয়াতে আরামে কাল কাটাতে পারে। এরূপ মনে করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু সঙ্গত নয়, বিগ্রহ মানেই হচ্ছে প্রবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের নিগ্রহ। আপনি যখন দুর্ব্বলের পক্ষ তখন ধরে নিতে হবে, আপনি যুদ্ধের বিপক্ষ। যুদ্ধের সঙ্গে বুদ্ধ মেলালে পদ্য হতে পারে, কিন্তু

গন্ত হয় না, আর আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছি, তার চেয়ে নির্ম্মম গন্ত পৃথিবীতে আর নেই।

আমি বলেছি যে আমি আশা করি পৃথিবীতে যুদ্ধ একদিন চিরদিনের জন্য চলে যাবে, কিন্তু তার থেকে মনে করবেন না, যে আমি এমন দিন দেখতে চাই, যখন মানব জীবনে বলের কোনও সার্থকতা থাক্‌বে না। দুর্ব্বলের দুঃখে দুঃখী হওয়া খুব ভাল কথা, কিন্তু দুর্ব্বলতার প্রতি মায়া অতি সর্ব্বনেশে মনোভাব। ও মনোভাবের মানুষ যতই চর্চ্চা করবে, ততই সে অধঃপতিত হবে, যুগপৎ মনে ও চরিত্রে। যত দিন মানুষের দেহে প্রাণ বলে বস্তু থাক্‌বে, ততদিন মানুষ শক্তির উপাসক থাক্‌তে বাধ্য। কেননা প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও শক্তির স্ফূর্ত্তি একই জিনিষ।

(৭)

এ কথা বলায় আমি নিজের মত নিজেই খণ্ডন করছি নে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক।—সভ্য মানব অদ্যাবধি যে যুদ্ধ করে এসেছে এটাও যেমন একটা ঐতিহাসিক সত্য ; মানুষের মধ্যে যাঁরা মহাপুরুষ বলে গণ্য, তাঁরাও যে যুগে যুগে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এসেছেন, সেটাও তেমনি একটি ঐতিহাসিক সত্য।

তার ফলে, ধর্ম্ম যুদ্ধ, অধর্ম্ম যুদ্ধ, বৈধ হিংসা, অবৈধ হিংসা প্রভৃতি কথা সকল সভ্য জাতির মধ্যেই জন্মলাভ করেছে। যুদ্ধ যে অধর্ম্ম হতে পারে, অবৈধ হতে পারে সে কথা সভ্য মানব মাত্রেই মানে।

তারপর মানুষ হালে এ বিষয়েও সজ্ঞান হয়েছে যে শান্তির জীবন গড়ে তুলতে ও তার শারীরিক মানসিক সকল বলের একত্র

চর্চ্চার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। আর যে জাত শান্তির ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় না করতে পারে, সে জাত যুদ্ধের সময়ও শক্তি ব্যয় করতে পারে না, কেননা সে শক্তির পুঁজি তার নেই। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে জাতি শান্তির জীবনে কৃতী হয় নি সে জাতি যুদ্ধেও কোনও কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। সুতরাং শান্তি যে দুর্ব্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত আর যুদ্ধ বলের উপর এ হচ্ছে গোঁয়ারের কথা। এক কথায় যুদ্ধ শান্তিরই বিকল্প মাত্র, যেমন সন্ন্যাস গার্হস্থ্যের বিকল্প। অতএব যুদ্ধ বন্ধ হলে যে মানুষ দুর্ব্বল ও জড়পদার্থ হয়ে পড়বে তার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, যুদ্ধ গত হলে ভবিষ্যতে মানব সমাজ রুগ্ন ও ভগ্নদের একটা পিঁজরাপোল হয়ে উঠবে।

(৮)

যুদ্ধের প্রতিবাদ যুগপৎ ন্যায়বুদ্ধির ও হৃদয়ের প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদ অবশ্য তাদের মুখেই শোভা পায় যারা যুদ্ধ করে ও করতে পারে কেননা যুদ্ধ বন্ধ করতে যদি কেউ পারে ত তারাই পারবে। যুদ্ধ যারা করে না ও করতে পারে না, তারা যুদ্ধ চালাতেও পারবে না থামাতেও পারবে না। আপনার আমার মত ব্যক্তি এর দার্শনিক সমস্যার বিচার করতে পারে practical সমস্যার নয়।

কথাটা উঠেছে অবশ্য practical হিসাবে, আমরা কিন্তু দার্শনিক হিসাবে দেখতে চাইযে মানব শক্তির একটা গত্যন্তর হওয়া ভবিষ্যতে

সম্ভব কি না। শক্তি অবশ্যই থাকবে কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রয়োগ হবে তাই নিয়েই ত এই তর্ক।

(৯)

যুদ্ধ চলে যাবে এরূপ আশা করা যে অসঙ্গত নয় সে বিষয়ে দু চার কথা বলে এই তর্ক যুদ্ধ শেষ করব।

আপনি যখন ইভলিউসান মানেন তখন আপনি conscience এর আভিব্যক্তিতে বিশ্বাস করতে বাধ্য। মানুষে ও পশুতে আসল প্রভেদ কোথায়। বুদ্ধি ও ন্যায়বুদ্ধি আমাদের আছে, পশুদের নেই। আর এ দুই বুদ্ধি মানুষের মনের লেজ নয় অর্থাৎ ওর দ্বারা তার শোভা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কাজ হয় না এমন নয়। ইভলিউসান উভয়ের জন্ম দিয়েছে, একথা স্বীকার করলেও, সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে এই দুই বুদ্ধিই তার spiritual ইভলিউসনের প্রধান সহায়। সুতরাং মানুষের intelligence এবং conscience যদি যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করে, তাহলে জিত যে কার হবে সে কথা বলবার কি আর প্রয়োজন আছে?

আর আজকের দিনে, যে দেশে লোকে যুদ্ধ করে ও করতে পারে, অর্থাৎ ইউরোপে মানুষের conscience যে যুদ্ধের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রমাণ ইউরোপের সাহিত্যে নিত্যই পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের ঘা খেয়েই অবশ্য এ conscience সজাগ হয়েছে। মানব conscience চিরদিনই ঘা খেয়ে খেয়ে বেড়েছে। মানুষ যদি বিশ্বের আদুরে ছেলে হত, তার যদি কোনও দুঃখ কষ্ট না

থাকৃত ত ধর্ম্মজ্ঞান তার মনে কস্মিন কালেও জন্মাত না। মানুষ এ পৃথিবীতে যা শিখেছে তার বেশির ভাগ সে ঠেকে ও ঠকে শিখেছে শুনে ও শুয়ে শেখেনি। সুতরাং এ আশা নির্ভয়ে করা যায় যে আজকের দিনের conscience এর প্রতিবাদের ক্ষীণস্বর ক্রমে এতটা প্রবল হয়ে উঠবে যে যুদ্ধের ঢাক ঢোলের গণ্ডগোলকে সে আওয়াজ ছাড়িয়ে উঠবে। আপনি দেহের ইভলিউসানে বিশ্বাস করেন, আমি উপরন্তু spirit এর ইভলিউসানেও বিশ্বাস করি, তাই বলে দুর্ব্বলতা আর spirit যে একই বস্তু এ ভুল আমি কখনই করি নি, নিজের মনকে স্তোক দেবার জন্যও নয়।

আর এক কথা। আপনি ঠিকই ধরেছেন, যুদ্ধের মূল—মানুষের বুকে নয়, তার পেটে। এ দেশে এ সত্য বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটি অতি প্রাচীন গাথায় এ সত্য লিপিবদ্ধ আছে। "গাথাম চ ভাসতে"।

যস্যার্থে গহনে চরন্তি বিহগাঃ
গচ্ছন্তি বন্ধং মৃগাঃ।
সংগ্রামে শরশক্তিতোমর ধরা
নশ্যন্তি অজস্রং নরাঃ॥
দীনাদুর্দ্দিনচারিণশ্চ কৃপনা মৎস্যাঃ
গ্রসন্তি অয়সং।
অস্যার্থে উদরস্য পাপকলিলে দূরাৎ
ইহাভ্যাগত ইতি।
(দিব্যাবদান)

অতএব যুদ্ধের মূল পাওয়া যায় economics-এর ক্ষেত্রে। আর এ সত্য আপনার অবিদিত নেই যে ডারউইন তার struggle for existence-এর আইডিয়া, তৎসাময়িক ইংলণ্ডের economics-এর ক্ষেত্র হতে অজ্ঞাতসারে চুরি করে Biologyর ক্ষেত্রে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ও অইডিয়া হচ্ছে economics যাকে competition বলে, তারি বায়লজিকাল অনুবাদ।

এখন আমার বক্তব্য এই যে ইকনমিকসে যদি—conpetition এর বদলে co-operation আসে, তাহলে যুদ্ধের মূল নির্ম্মূল হবে।

আর আজকের দিনে যখন প্রতি জাতি তার নিজের সমাজে co-operation আনতে চেষ্টা করছে, তখন ভবিষ্যতে মানব সমাজে যে জাতিতে জাতিকে co-operation হবে—এরূপ আশা করা—sentimentalism নয়, আর তার উল্টো মতই যে sentimentalism, তা আপনি অবশ্য মানবেন।

বীরবল

২৯শে মে, ১৯২২।

পুনশ্চ,

যুদ্ধ বন্ধ করবার একটা সহজ উপায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল। দুনিয়ার লোককে যদি দার্শনিক করে' তোলা যায়, তাহলে তাদের যুদ্ধের সাধ তর্কে মিট্‌তে পারে। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন, কেননা মানুষকে তার্কিক করে' তোলার কাজে, আপনি আর আমি দুজনেই যে হাত লাগাতে পারি, তার প্রমাণ আমাদের এই চিঠিপত্র।

জুলি রোমেন।

(Manpassant-র ফরাসী হইতে)

বছর দুই আগে একবার বসন্তকালে মেডিটারেনিয়ানের তীর ধরে পায়ে হেঁটে ইটালীর দিকে যাচ্ছিলেম। জোরে পা ফেলে চলছি, মনে কত কথায় না উদয় হচ্ছে, কত স্ফূর্ত্তিই না বোধ করছি। চারিদিকে অপর্য্যাপ্ত আলো, গায়ে ঝির ঝির করে হাওয়া লাগছে,—পাহাড়ের গা বেয়ে, সমুদ্রের তীর দিয়ে চলেছি। স্বপ্নপুরীর দোর বুঝি খুলে গেছে! কত অবাস্তব সুখের কথা, কত ভালবাসার—স্বপ্ন, কত কীর্ত্তি-কাহিনী সেই ছুটি-পাওয়া মনের মধ্যে ফুটে উঠেছে! মানুষের প্রাণের লক্ষ অর্দ্ধোস্ফুট আশা, উল্লাসের ঢেউ তুলে চোখের সুমুখে নেচে বেড়াচ্ছে! সেই খোলা বাতাসে তাদের দীপ্তকান্তি নিয়ে তারা ভিতরে ঢুকে পড়ে, হাঁটবার পরিশ্রমের দরুণ শরীরের ক্ষিদের সাথে সাথে মনেও সুখের ক্ষিদে জাগিয়ে তুলেছে। একটার পর একটা করে কত সুখের চিন্তাই না মনে আসছে,—আর পাখীর মত সুর তুলে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সেঁইন্ত-রাফেল থেকে যে পথ ইটালী মুখে গিয়েছে, সেই পথ বেয়ে আমি চলছিলেম;—আর কি সেই পথ! পৃথিবীতে প্রেমিক কবিরা যত প্রণয়-স্বপ্ন, কাব্যে প্রকাশ করেছেন সে গুলোকে বাস্তব করে তোলবার জন্যই বুঝি সেই পথের দু'ধারে প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে! এ দৃশ্য দেখে আমার মনে হল যে

সুনীল, সুন্দর আকাশের তলে গোলাপ ও নেবু ফুলের গন্ধে ভরা কানেস থেকে মনাকো পর্য্যন্ত এই আশ্চর্য্য দেশে মানুষ আসে কিনা, কেবল টাকার জাঁক দেখাতে, কারবার করতে, গোলযোগসৃষ্টি করতে, তার অহমিকা, দাম্ভিকতা ও লোভের ঘৃনিত পসরা সাজাতে,—মূর্খ, উদ্ধত, লোভী ও হীন মনুষ্য-চরিত্রের নগ্ন কদর্য্যতার পরিচয় দিতে।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই নজর পড়ল একটা পথের মোড়ে গুটিকতক ভিলা, চারটে কি পাঁচটা হবে—পাহাড়ের গোড়ায়, একেবারে সমুদ্রের ধারে। তাদের পিছনে দুটো উপত্যকা—পথ ঘাট বিহীন দুর্গম দেবদারু বনে আচ্ছন্ন। এদের মধ্যে একটা ভিলার সুমুখে আমার পা দু'টো মুগ্ধ মনের সঙ্গে সঙ্গে রূদ্ধগতি হয়ে হঠাৎ থেমে গেল—এত তার সৌন্দর্য্য! ছোট একটা শাদা বাড়ী, ভিতরে লালচে রঙের কাজ, ছাদ পর্য্যন্ত তার গোলাপের লতা বেয়ে উঠেছে।

আর সে বাড়ীর বাগান!—তার শোভা বাড়াবার জন্য এলো-মেলো ভাবে মিশিয়ে পোঁতা ফুলগাছে সব রকম রঙ ও চেহারার ফুল ফুটে বাগানখানিকে ঢেকে দিয়েছে। ছোট লেনটুকু ঘাসে সবুজ; সিঁড়ির প্রতি ধাপের কোণে গাছের টব; প্রতি জানলার সুমুখে স্তবকে স্তবকে নীল বা হলদে আঙ্গুর, লতাশুদ্ধ হেলে পড়েছে; পাথরের রেলিং দেওয়া ছাদের চারদিক রক্তবর্ণ বড় বড় বেল ফুলের লতা, মালার মত করে ঘিরে রেখেছে।

বাড়ীর পিছনে সার বাঁধা ফুল-ভরা কমলার গাছ, পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

দুয়োরের উপর ছোট সোনালী হরফে বাটীর নাম লেখা—ভিলা—দ্য অঁজা।

আমি ভাবলেম কে এই কবি বা পরী কিংবা বিলাসী বনবাসী যে এই জায়গা আবিষ্কার করে স্বপ্নের মত সুন্দর এই আশ্রম সৃষ্টি করছে, যা এক স্তবক ফুলের মতই শোভা করে আছে।

একজন লোক একটু দূরে বসে রাস্তা তৈয়েরীর পাথর ভাঙছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেম—এ পরী-আবাসের মালিক কে? সে বলল,—মাদাম জুলি রোমেন।

জুলি রোমেন! অনেক কাল আগে, আমার ছেলেবেলায়, বিখ্যাত অভিনেত্রী, রাচেলের প্রতিদ্বন্দী জুলি রোমেনের সম্বন্ধে কত গল্পই না শুনেছি।

আর কোন রমণীও এত সুখ্যাতি ও এত ভালবাসা,—বিশেষ করে এত ভালবাসা কখনো পায় নি! তার জন্য কত ডুয়েল, কত আত্মহত্যা, কত আশ্চর্য্য কাণ্ডই না হয়ে গিয়েছে। এ রমণীর বয়স এখন কত হবে?—ষাট, সত্তর, না পঁচাত্তর? জুলি রোমেন! এখানে? এই বাড়ীতে, সেই স্ত্রীলোক থাকে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য ও শ্রেষ্ঠ কবি যাঁকে পূজো করেছেন?

এখনও আমার মনে পড়ে সমস্ত ফ্রান্সব্যাপী সে কি তুমুল আন্দোলন উঠেছিল (তখন আমার বয়েস বার বছর) যখন এক সঙ্গীতাচার্য্যের সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদের পর সে এক কবির সাথে পালিয়ে সিসিলীতে চলে যায়।

সে যায় একদিন রাত্রে, রঙ্গমঞ্চে একদফা অভিনয় সেরে। দর্শকেরা সে রাত্রে আধ ঘণ্টা ধরে হাততালি দিয়েছিল, এগার বার তাকে ফিরে ডেকেছিল। কবির সঙ্গে সেকালে প্রচলিত ঘোড়ার ডাক গাড়ী করে সে চলে যায়। তারপর সাগর পেরিয়ে, তাদের

প্রেমকে নিবিড় ও সুন্দর করে তোলবার জন্য গ্রীস-দুহিতা সেই প্রাচীন দ্বীপে উপস্থিত হয়। যেখানে কমলার বন সমস্ত পাহাড়মো ঘিরে রেখেছে, আর লোকে যার নাম দিয়েছে—"সোনার সাঁখ"।

সকলে গল্প করত যে, তারা দুজনে গালে গাল দিয়ে, আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে এমনি করে' এটনার উপর উঠে তার গহ্বরের মুখে ঝুলে থাকৃত, যেন অগ্নিময় গহ্বর গর্ভে এ অবস্থাতে তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

তারপর সে কবি মারা যায়। একটা যুগ ধরে লোকে তার কবিতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এতই ভাব সম্পদ পূর্ণ ছিল তার কাব্যসৃষ্টি। সে কাব্য এতই সুন্দর, এতই গভীর যে, নূতন কবিদের চোখের সুমুখে সে একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি যা একটা সম্পূর্ণ নূতন জগতের দ্বার খুলে দেয়।

য'কে সে ত্যাগ করেছিল, সেও বাঁচে নি—প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করে যে গীত সে গেয়েছিল, এখনও তার স্মৃতি লোকের মনে মোহ সঞ্চার করে, আশা নিরাশায় উচ্ছ্বসিত, আবেগে ও মর্ম্মবেদনায় কম্পিত কি সে অপূর্ব্ব গীত।

আর কেবল সেই স্ত্রীলোক ছিল এ পর্য্যন্ত বেঁচে, ফুলের ঘোমটা ঢাকা ছোট এই গৃহখানিতে। ইতঃস্তত না করে আমি দুয়োরের কড়া ধরে নাড়লেম।

বেকুব ও অসভ্য গোছের চেহারার একটি বছর আঠারোর ছোকরা দুয়োর খুলে দিল। আমি কার্ডের উপর বৃদ্ধা অভিনেত্রীর উদ্দেশে দু'একটা প্রশংসা বাক্য লিখে ও তার সঙ্গে দেখা করবার আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়ে পাঠিয়ে দিলেম। হয়ত আমার নাম জানলে দেখা করতে আপত্তি নাও করতে পারে।

ছোকরা চাকরটা চলে গেল, তারপর ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে করে একটা সালোনে নিয়ে গিয়ে বসাল, ঘরটা অতি পরিপাটী করে, লুই ফিলিপের আমলের ষ্টাইলে সাজানো,—তেমনি সব ভারি ভারি পাথরের মুর্ত্তি দিয়ে। বছর ষোল বয়েসের বেঁটে সুন্দরী একটি ঝি, আমার সম্মানের জন্য সে মুর্ত্তিগুলোর ঘেরাটোপ তুলে দিয়ে গেল।

আমি একাই বসে রইলেম। দেয়ালে দেখলেম তিনখানা চিত্র রয়েছে। একখানা নাটকীয় সজ্জায় সেই অভিনেত্রীর, দ্বিতীয়খানা কবির, রাইডিং কোট ও ফ্রিল দেওয়া কামিজ গায়ে, তৃতীয়খানা গায়কের, একটা হার্পিসকডের সুমুখে বসে। সেই সাবেক কালের পোষাকে সজ্জিত হয়ে অভিনেত্রী তার নতনেত্র ও মিষ্ট মুখে মধুর হাসি নিয়ে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিগুলো সব সযত্নে অঙ্কিত, সুন্দর, পরিপাটি ও নীরস।

সেগুলো দেখে মনে হয় ভবিষ্যতের দিকে তারা যেন চেয়ে রয়েছে।

চারদিকের জিনিষ গুলোর চেহারাও গত যুগের,—যেদিন গত হয়েছে তাই নিয়ে, যে সব মানুষ বেঁচে নাই তাদের নিয়ে।

একটা দরজা খুলে গেল, একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল, দেখতে সে বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধা, অতি খাটো—মাথা সাদা চুলে ভরা, সাদা ভুরু—

এগিয়ে এসে সে আমার হাত ধরল, তারপর তরুণ, মধুর, সতেজ কণ্ঠে বলল, আপনাকে ধন্যবাদ ম্যসে; আজ কালকের পুরুষেরা যে আমার মত রমণীদের কথা মনে রাখে সেটা সৌভাগ্যের বিষয় বটে। বসুন, বসুন।

আমি তাকে বললেম, আমি তাঁর বাড়ী দেখে মুগ্ধ হয়ে মালিকের নাম জানতে চাই ; তারপর নাম জানতে পেরে দুয়োরে ধাক্কা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

সে বল্‌ল—এবাড়ীতে এরকমের অতিথির সাক্ষাৎ এই প্রথম বলে আমার আনন্দের সীমা নেই। যখন প্রশংসা বাক্যে পূর্ণ আপনার কার্ড খানি হাতে এল, আমি কেঁপে উঠলেম, মনে হল কুড়ি বছরের হারাণো কোন বন্ধুর বার্ত্তা বুঝি ফিরে পেলেম। আমি ত মৃত ব্যক্তির মতই, কারো স্মৃতিতে, কারো চিন্তায় আমার স্থান নেই। তারপর এরিমধ্যেই একদিন সত্য সত্য যখন মরব,—তখন দেশের সব কাগজ গুলো দিন তিনেক ধরে জুলি রোমেনের কথা বলবে, দু' একটা গল্প, কথাবার্ত্তা, একটু স্মৃতিকথা, দু'চারটে আড়ম্বরপূর্ণ প্রশংসা ছাপা হবে। তারপর আমার আপনার বলতে যা কিছু সব শেষ হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে সে ফের বললে,—এই শেষ হবার আর বেশী দেরী নেই। হয়ত কয়েকটা মাস, কয়েকটা দিন পরে এখনোও জীবিত এই ক্ষুদ্রকায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির থাকবার মধ্যে তেমনি ক্ষুদ্র একটি কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাক্‌বে।

সে তার দুটি চোখ তার নিজের চিত্রের দিকে তুলে ধরল,—সেটা তার দিকে,—তার বর্ত্তমান জরা জীর্ণ রূপহীনতার দিকে, চেয়েই যেন মৃদুহাসি হাসছিল, তারপর আর দুটি চিত্রের উপর গিয়ে তার দৃষ্টি পড়ল, গর্ব্বিত কবির ও ভাবোন্মত্ত গায়কের। তারা যেন তার দিকে চেয়ে বলছে,—

এখন একে কে চায়?

হঠাৎ আমার সমস্ত মন একটা প্রবল, তীব্র, অব্যক্ত বিষাদে

বিকল হয়ে গেল। জীবনে যার কাজ ফুরিয়ে গেছে, তার বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা গভীর বিষাদময়; তাই আমার হৃদয়কে সে বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল। গভীর জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন করে হাত পা নেড়ে ভেসে থাক্‌তে চায়, এমন কাজ-ফুরাণো জীবনও তেমনি করেই সমাজের মনে নিজের স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখ্‌তে প্রয়াস পায়।

যেখানে বসেছিলেম সেখান থেকে দেখলেম কয়েকখানা জমকালো গাড়ী দ্রুতবেগে নিস থে:ক মনাকোর পথে চলে গেল। গাড়ীর ভিতরে কয়েকটি রূপবতী, যুবতী রমণী, যাদের পয়সা ও সুখ সৌভাগ্য দুইই—আছে— এবং কয়েকটি পুরুষ -হাসি মুখ ও খুসি মন। সে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখল। দেখে, আমার মনের ভাব বুঝে একটুখানি উদাস ভাবে হেসে বলল,—

আগে যেমন ছিল কেউ আর কি তেমন হতে পারে?

আমি বললেম—আপনার জীবন কত সুখেরই না ছিল?

সে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,– খুব সুখের, খুব সুন্দর। তাইত আমার এত আপশোষ।

আমি দেখলেম নিজের জীবনের কথা বলতে তার ইচ্ছা আছে। ব্যথার জায়গায় লোকে যেমন সন্তর্পণে হাত দেয়, তেমনি সাবধানে আমি তাকে প্রশ্ন করতে লাগলেম।

তার সফলতার গল্প, তার কালের, তার বন্ধু বান্ধবের, তার বিজয় গৌরব মণ্ডিত সমস্ত জীবনের ইতিহাস, সে বলতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলেম,

আপনার জীবনের বেশীর ভাগ আনন্দ, প্রকৃত সুখ—নিশ্চয় থিয়েটার থেকেই আপনি পেয়েছেন?

— মোটেই না।

আমি হাসলেম, চিত্র দুখানির দিকে একটু বিষাদের দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলল,

—ঐ দুইজনের কাছ থেকে,

আমি না জিজ্ঞাসা করে থাক্‌তে পারলেম না,

—দুজনের কোনটি?

দু'জনই। এ বৃদ্ধ বয়সে ওদের দু'জনকে এক করেই আমি ভাবি। এতদিন পরে যেন ওদের একটির সাথে আমার ব্যবহারের জন্য একটু অনুতাপের মত বোধ করছি।

—তাহলে বলুন—ঐ দুজন নয়, প্রেমের দেবতা স্বয়ং আপনার কৃতজ্ঞতার দাবী করতে পারেন,—ওঁরা দুজন সে দেবতার পুরোহিত মাত্র।

—সম্ভব। কিন্তু কি দরের পুরোহিত!

—আচ্ছা আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন যে আপনি কি ঠিক সমান, হয়ত বেশী, ভালবাসা পেতেন না, যদি ওঁদের পরিবর্ত্তে কোন কোন সাধারণ পুরুষ, যার কোন খ্যাতি নেই, যে সমস্তজীবন, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন, সমস্ত সময়, তার যা কিছু সমস্ত আপনার জন্য উৎসর্গ করত—যেখানে ওঁরা দুজন আপনাকে কেবল প্রেমের দুটি বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী—সঙ্গীত ও কাব্য—এই দুটির মধ্যে টেনে এনেছিলেন?

সে উচ্চস্বরে, তার তখনো তরুণ কণ্ঠে, আবেগ ভরে বললে—

—না মঁসিও, কখনো না। আরেক জন হয়ত আমাকে বেশী ভালবাসত, কিন্তু ওদের মত করে ভালবাসতে পারত না। আমার জন্য প্রেমের সঙ্গীত যেমন করে তারা গেয়েছে, পৃথিবীতে

আর কেউ তেমন করে গাইতে পারত না। কেমন করে আমাকে মাতিয়ে তুলত তারা! কোন লোক'—বলুন ত পৃথিবীতে আর কোন লোক শব্দ ও কথার ভিতর থেকে, যা তারা বের করছে, তা বের করতে পারত? স্বর্গ মর্ত্ত্যের সব কাব্য, সব সঙ্গীত যে প্রেমকে মহিমাময় করে তোলে নি, সে প্রেম কি করে সম্পূর্ণ হবে? তারা জানত কি করে শুধু কথা ও শব্দের সাহায্য নারীকে পাগল করে তোলা যায়? হয়ত আমাদের ভালবাসার ভিতরে নিছক রক্ত মাংসের টানের চাইতে কল্পনার মোহ ছিল বেশী, কিন্তু রক্ত মাংসের টান যেখানে এই মাটির পৃথিবীতে আমাদের ফেলে রাখে, এই মোহ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের রাজ্যে। অপরে হয়ত আমাকে বেশী ভালবেসেছে, কিন্তু তাদের দিয়েই আমি প্রেমকে বুঝতে, অনুভব করতে, পূজো করতে শিখেছি।

হঠাৎ সে কেঁদে ফেললে।

নিরাশার বুক ভাঙ্গা কান্না সে—শব্দ নেই, উচ্ছ্বাস নেই!

দূরের দিকে চেয়ে, মুখ ফিরিয়ে কিছুই যেন দেখছিনে আমি এই ভাব দেখালেম। একটু বাদে সে ফের বললে,—

আপনি ত জানেন মঁসিও সকল মানুষের দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও বুড়ো হয়। আমার বেলায় কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমার দেহটার বয়েস হয়েছে ঊণসত্তর বছর, আমার মনের বয়েস রয়েছে কুড়ি, সেই জন্যই একা একা এই ফুল পাতা আর স্বপ্ন নিয়ে ... ...

কিছুক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করে থাকলেম। সে সুস্থির হয়ে, মৃদু হাসি হেসে বলতে লাগল,—

—আপনি যদি আমার সব কথা জানতেন তাহলে নিশ্চয় ঠাট্টা করতেন—যদি জানতেন কি করে সন্ধ্যাবেলাটা আমি কাটাই—যখন আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে। আমি সে কথা ভেবে নিজেই নিজের জন্য লজ্জা ও করুণা বোধ করি।

আমি তাকে অনেক অনুরোধ করলেম, সে তা কিছুতেই বলতে চাইল না কি করে সে সময়টা তার কাটে? তারপর বিদায় নেবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালেম।

সে বলে উঠল, এর মধ্যেই?

আমি যখন বললেম যে মণ্ট-কারলোতে আমার ডিনারের অর্ডার আছে, সে ইতস্ততঃ করে বলল,—

—আপনি আমার এখানে ডিনার খাবেন না কি? খেলে বড় খুসী হব।

বিনা আপত্তিতে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেম। সে পরম আহ্লাদিত হয়ে ঘণ্টা বাজালে। তারপর ঝিকে গোটা কয়েক আদেশ দিয়ে বাড়ীটা দেখবার জন্য আমাকে নিয়ে চল্‌ল।

খাবার ঘরের সম্মুখে গাছের টব ভরা, কাঁচে-ঘেরা একটা বারান্দার মত জায়গা—সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাড়ীর পিছনে, পাহাড়ের নীচ পর্য্যন্ত কমলা গাছের সার চলেছে। তাদের মধ্যে একখানা নীচু বেঞ্চ,—দেখলেই বোঝা যায় যে বৃদ্ধা অভিনেত্রী প্রায়ই সেটার উপর বসত।

তারপর ফুল পাতা দেখবার জন্য আমরা বাগানে ঢুকলেম। ধীরে ধীরে তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। আমরা যখন ডিনারে বসলেম, তখনো আলোর রেখা আকাশে একেবারে মুছে যায় নি।

ডিনারের যোগাড় মন্দ ছিল না, অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া চলল। পরে পরে সে ও আমি—দু'জনে পুরোণো বন্ধুর মত হয়ে উঠলেম, যখন সে বুঝতে পারল, তার কাহিনীতে কি গভীর সহানুভূতি আমার প্রাণে জেগে উঠেছে, তখন দুই চুমুক ক্লারেট খাবার পর সে দিল-খোলসা হয়ে উঠল—তার আলাপ জমে উঠল।

সে বলল,—আসুন, একবার চাঁদ দেখা যাক্। আমি চাঁদের আলো বড় ভালবাসি। চাঁদ আমার জীবনের পরম সুখের সময়গুলোর সাক্ষী। আমার মনে হয় কি জানেন,—সে গুলোর সমস্ত নিদর্শন আমার অন্তরেই রয়েছে, একটু চিন্তা করলেই আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাই। হয়ত ... ... কখন সন্ধ্যাবেলায় ... ... নিজে নিজে একটা চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করি ... ... ভারি চমৎকার দৃশ্য ... ... যদি আপনি জানতেন? না,—জানলে নিশ্চয় আমাকে ঠাট্টা করতেন ... ... সেটা বলতে পারিনে ... ... আমি সাহস পাইনে ... ... মোটেই সাহস পাইনে।

আমি মিনতি করে বললেম,—

—কি দৃশ্য আমাকে বলবেন না? আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ঠাট্টা করব না—শপথ করছি, বলুন।

সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমি নিজের হাতে তার হাত দুটো নিলেম—তার সেই একটুখানি, শীর্ণ, শীতল দু'টো হাত ধরে, সেকালের প্রথামত সে দু'টো হাত চুম্বন করলেম। তাতে সে বিচলিত হল। তখনো সে ইতস্তত করতে লাগল,—

—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে হাসবেন না—

—আমি শপথ করে বলছি।

—আচ্ছা, আসুন।

সে উঠে দাঁড়াল। সেই বেকুব চেহারার বেঁটে চাকরটা তার পিছন থেকে চেয়ারখানা সরিয়ে নিলে, সে তার কানে কানে খুব আস্তে ও খুব দ্রুত কয়েকটা কথা বল্‌লে। চাকরটা বললে,—

—হাঁ মাদাম, এখনই।

তারপর আমরা দু'জন বারান্দার নীচে নেমে এলেম।

কি চমৎকার দেখতে সেই পথ,—দু' ধারে কমলা গাছের সার! মাথার উপরে পুর্ণিমার চাঁদ তখন আলো ঢেলে দিচ্ছে,—ছায়ার মত স্তব্ধ, অস্পষ্ট চেহারার গাছগুলোর মাঝে হল্‌দে রংয়ের বালির উপর জ্যোৎস্নার ক্ষীণ রেখা পড়ে মাঝের পথটি দেখাচ্ছে—যেন রূপো-বাঁধান।

গাছগুলোর গায়ে ফোটা ফুলের সাজ, চারদিক মিষ্ট গন্ধে ভরপুর। কালো কালো ডাল পাতার মধ্যে হাজার হাজার জোনাকী ও আলো-পোকা, তারার টুকরোর মত ঝিক্‌মিক্ করছে।

আমি উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেম,—বাঃ! প্রেমের উপযুক্ত লীলা ক্ষেত্র এমন আর হয় না!

সে হাসল,—

—তাই নয় কি? এখনই দেখবেন।

সে বসে, তার পাশে আমাকে বসাল।

তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগল,—চারিদিকে যে সব দেখছেন, এ গুলোই আমার মনে, জীবনের জন্য আপশোষ আনে। আপনারা, অর্থাৎ আজকালকের লোক যারা, এ গুলোর কথা ভাবেন কিনা সন্দেহ। আপনারা কেবল টাকার পিছনে ফেরেন—কেউ ব্যবসায়ী,

কেউ মামলাবাজ, এই সব। আমাদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়, তা পর্য্যন্ত আপনারা জানেন না,—আমাদের অর্থ তরুণীদের। আজকালকের ভালবাসা এসে দাঁড়িয়েছে, অবৈধ সম্পর্কে (liasion), তার আরম্ভ হয়ত অখ্যাতনামা কোন নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের বেনামী প্রণয়-পত্রে। যদি ঐ পত্রটাকে ঐ মেয়েটির চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করেন, তবে ঐখানেই খতম, আর তার দাম যদি বেশী মনে হয়, তবে দেও পয়সা। আহা! কি চমৎকার নীতি, কি চমৎকার ভালবাসা!

তারপর আমার হাত ধরে বলল,—

—ঐ দেখুন—

আমি উল্লসিত, বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে গেলেম। ঐ সরু পথের মোড়ে, চাঁদের আলোয়, মাথায় প্রায় সমান দুটি মূর্ত্তি ধীরে আসছে। অতি ধীরে পা ফেলে, হাত ধরে, মোহন বেশে তারা এগোচ্ছে, পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো তাদের উপর পড়ে একবার দু'জনকে উজ্জ্বল করে তুলছে, এগিয়ে আসতে আসতে আবার তারা অন্ধকারে ঢুকছে। পুরুষটির পরণে, গত যুগের ফ্যাসনে শাদা সাটিনের পোষাক, মাথার টুপীতে অষ্ট্রীসের পালক। রমণীর পরণে, রীজেন্সী আমলের ফ্যাশনে মহিলাদের মত হুপ-পেটি-কোর্ট ও মাথায় পাউডার মাখা চুল।

আমাদের কাছ থেকে একশ' হাত দূরে তারা থেমে গেল, তারপর পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল।

হঠাৎ চিনতে পারলেম—ঐ দু'জন আর কেউ নয়, ঐ বাড়ীর সেই চাকর আর ঝি। অদম্য হাসির উচ্ছ্বাসে আমার পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হল। কিন্তু আমি হাসলেম না। অতি কষ্টে, বহু চেষ্টায় হাসি

চাপতে লাগলেম—কোনো মানুষের একখানা পা কেটে দিলে, সে যেমন করে কাঁদবার জন্য হা করেও কান্না চাপতে চায় তেমনি করে।

দু'জন পথের ওদিকটা বনের ভিতর ফিরে গেল—তখন দেখতে আবার তাদের তেমনি সুন্দর বলে মনে হল। ধীরে ধীরে তারা পিছিয়ে যেতে লাগল, তারপর স্বপ্ন-দৃষ্ট একটা সুন্দর দৃশ্যের মতই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তারা ফিরিল না,—খালি সরু পথটা একেবারে ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

তারপর আমি উঠে বিদায় হলেম, বিদায় হলেম এইজন্য যে সে দুজনকে যেন আর না দেখতে হয়। ভাবলেম যে-দৃশ্য এইমাত্র দেখলেম বহুকাল সেটা মনে থাকবে। ঐ দৃশ্য একবার দেখামাত্রই সেই বৃদ্ধ অভিনেত্রীর সমস্ত গত জীবন, তার ভালবাসা, তার ভোগ, সমস্ত অতীত যুগ,—তার বিকৃত রুচি, তার মোহ, তার সৌন্দর্য্য, তার প্রবল সম্মোহন নিয়ে, আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠল,—আর টের পেলেম, কেমন উজ্জ্বল হয়ে সেগুলো ঐ বৃদ্ধা অভিনেত্রী ও প্রেমিকার মনে বেঁচে রয়েছে।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

৮ই জুন, ১৯২২।

গৃহ-লক্ষ্মী

—:০:—

এ দেশের নারীকে যিনি সর্ব্বপ্রথম গৃহ-লক্ষ্মী এই আখ্যাটী দান করেছিলেন তিনি যে কবি নন শাস্ত্রকার, তা একরকম নিঃসন্দেহে বলা চলে। কেননা কবির কথা সকলে সমান ভাবে মানে না, কিন্তু নির্ব্বিচারে শাস্ত্র বাক্য মেনে-চলার এই দেশে আবাল বৃদ্ধ সবাই যে এক বাক্যে নারী কুলকে গৃহলক্ষ্মী বলে, এ কথা কে না জানে। কবির বিস্ময়ভরা ধ্যানের চোখে যিনি হলেন চঞ্চলা কমলবন বিহারিণী, শাস্ত্রকার তাঁর সেই চঞ্চলপদকে খোঁড়া করে, আগে আর একটা বাহন দিলেন আলোতরাসী পেঁচা লক্ষ্মী, তারপর অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুগৃহে সেই খোঁড়া লক্ষ্মীকে আবদ্ধ করে পরম নিশ্চিন্ত হলেন। স্ত্রীলোকের প্রতি শাস্ত্রকারদের আস্থা যে খুব বেশী তার পরিচয় তো, "স্ত্রীয়াঃশূদ্রাঃ" বলে নারীকে শূদ্রের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানোতেই পাওয়া যায়। তাই এ দেশের শাস্ত্রবাহক জ্ঞানীগণ খাঁচার পাখী হিন্দু মহিলাকে মুখে যখন গৃহলক্ষ্মী বলে গর্ব্ব করেন মনে মনে তখন তাঁরা সবাই বোঝেন যে, ও পদটির অর্থ গৃহরক্ষী মাত্র, তার একবর্ণও বেশী নয়।

অনেকে হয়ত জোরগলায় বলে উঠবেন—কেন "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" এও তো আমাদেরি শাস্ত্রকারদের কথা। ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা চাই যে, "যারে বলি ভালবাসা তারে বলি পূজা" এটা হচ্চে কবির কথা। শাস্ত্রকার যাকে পূজা বলেছেন, তা এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাণহীন প্রতিমারই

হয়, সে পূজায় যদি কিছু ফললাভ হয় তো সে এক পূজারীরই চিত্ত বিনোদন, প্রতিমা শুধু মণ্ডপের শোভা মাত্র।

তারপর এই সব পরস্পর-বিরোধী শ্লোক বচনের ছড়াছড়িতে এইটেই প্রতিপন্ন হয় যে, যাদের বিষয় নিয়ে এই সব রচিত তাদের নিজেদের কোন কথাই বলবার অধিকার না দিয়ে, নানান মুনি খেয়াল মজন নানান মত প্রচার করে গিয়েছেন মাত্র। তাতে করে নারীর অধিকার তো দূরের কথা তাদের স্বাভাবিক মর্য্যাদাজ্ঞান পর্য্যন্ত এক তিল বাড়ানো হয় নাই। তাই আজ দেখ্‌তে পাই হিন্দুঘরের ভক্তিমতি গৃহিণীগণ পূজা পার্ব্বণের দিনে নিরম্বু উপবাসী থেকে যে ষোড়শোপচার ভোগ রান্না করেন, সেটীকে নিজের হাতে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন কর্‌বার অধিকার পর্য্যন্ত তাদের নেই। তাই যেখানে একাদশী তত্ত্ব বলে—ষাট পেরুলে নির্জ্জলা উপোস অবিধি সেখানে শাস্ত্রী-সমাজের পুঁথির পাতায় অশীতিপরা বৃদ্ধা অশক্ত বিধবার পক্ষেও তৃষ্ণায় বুকফাটা বোশেখী রোদের দিনেও নিরম্বু একাদশী পালনই অকাট্য বিধান।

সেদিন হিন্দুশাস্ত্রের উদারতা নিয়ে পরম গর্ব্বকারী দলের এক ব্যক্তির বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখি,—বৃদ্ধামাতা হবিষ্যান্নের ভোগ প্রস্তুত করে পূজার আয়োজন সাজিয়ে নিয়ে—পাহারা দিচ্ছেন। বেলা হেলে পড়েছে, তবু তাঁর অনাহারে তদবস্থায় বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেলো, সেদিন দ্বাদশী, গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলার পূজা না হলে পারণ করা চলবে না; পুত্র কি এক জরুরী কাজে কোথায় বেরিয়েছেন। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ অভাবে তাঁর ঘরে না ফেরা পর্য্যন্ত ঠাকুর পূজা বন্ধ। ব্রাহ্মণের চেয়েও সদাচার ও কঠোর

ব্রত পালন করে' যে গৃহে ব্রাহ্মণ-বিধবার শালগ্রাম শিলাটী ছোঁয়ার অধিকার পর্য্যন্ত নাই, সেখানে নারীত্বের অর্থ শূদ্রত্ব বই আর কি হতে পারে! এদেশের মেয়েদের মনের উপর এই যে শূদ্রত্বের চাপ, এই যে নিত্যি তিরিশ দিন কেবলমাত্র ঘর গিরস্তালির নির্দ্দিষ্ট কাজটী কলের মতন করে চলার মনন-বিহীন জীবনযাত্রা, এরি নামই তো গৃহ-লক্ষ্মীত্ব। এতে করে এদেশের নারীকুল যাদের জননী, তারা এই ধরাতলে ভৃত্যমাত্রই হয়ে রয়েছে, ভর্ত্তা হতে পারে নাই এবং এই অবস্থায় আরো কিছুকাল থাক্‌লে কোনো কালেও পার্‌বে কিনা সন্দেহ।

(২)

বিশ্ব-ব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে নারীকে বাদ দিয়ে চলার দরুণ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সমুদায় প্রতিষ্ঠানগুলিই যে বিকলাঙ্গ, আজকের দিনে সকলজাতিরই এই কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম্মে রাষ্ট্রে সমাজে সর্ব্বত্রই সাম্য স্থাপনের একমাত্র পুরুষ প্রবর্ত্তিত তন্ত্রের, হার হয়েছে। তাই খৃষ্টানে খৃষ্টানে, হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমান মুসলমানে পরস্পর মৈত্রীর চোটে হিন্দু অহিন্দু, খৃষ্টান অখৃষ্টান, মুসমমান অমুসলমানের ভিতরকার বিদ্বেষ পোষণ ও প্রচারই হয়ে এসেছে, এই হচ্ছে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মুখ্য কাজ। রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তার ভিতরকার একটী কারণ হচ্ছে এই—পুরুষের দম্ভভরা ক্ষুরধার বুদ্ধির মুখে মানুষের হৃদয়-বৃত্তির কঠোরতা যতটা অটুট্‌ হয়ে টিঁকে থাকতে পারে, তার কোমলতা ও কমনীয়তা প্রায় ততটাই আবর্জ্জনার মতন কাটা পড়ে যায়। আর তারি ফলে বিধি-নিষেধের সরল বিধানগুলি ক্রমাগত

কৃষ্ট রীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে হয়ে একমাত্র পুরুষেরি পরিচালিত তন্ত্রকে যন্ত্রেরি চলন-উপযোগী করে মাত্র। এক্ষেত্রে নারীর দান যে কি প্রকৃতির হবে—সেটী ঠিক করে বলবার সময় এখনো আসে নাই। কেননা আজ পর্য্যন্ত মেয়েরা ব্যবস্থা প্রণয়ণ ও পরিচালন ব্যাপারে যতটুকু কাজ করে এসেছে, তার বেশীর ভাগেরই প্রেরক মন্ত্র পুরুষেরই শিখানো বুলি।

কেউ কেউ আবার পশু পাখী প্রভৃতির ইন্‌ষ্টিনক্‌টেরি বশবর্ত্তী জীবের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, পুরুষের নির্ব্বিচার বশ্যতাই নারীদের পক্ষে প্রাকৃতিক বিধান বলে ব্যাখ্যা করেন। অথচ যখন দেখি অন্যত্র তাঁরাই আবার উচ্চরোলে প্রচার করতে থাকেন—প্রকৃতিকে অতিক্রম করে চলাই মানবতা, আর একমাত্র তারি নিদেশ অনুসারে যে জীবন যাপন, সে হচ্ছে সাধারণ জীবেরই ধর্ম্ম। তখন মুখটা ফিরিয়ে একটু হেসে নেওয়া ভিন্ন আর কোনো উপায়ই দেখি না।

আর এক দলের লোক আছেন, যাঁরা নাকি মেয়েদের শারীরিক দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়ে পুরুষের প্রবল প্রতাপের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে লালিত পালিত হয়ে থাকাকেই নারীর পক্ষে পরম পুরুষার্থ বলে নির্দ্দেশ করেন। মেয়েদের স্বাভাবিকই শারীরিক দুর্ব্বলতা আছে কি নাই এবং থাকলেই বা তার কারণ কি, এসব আলোচনার আগেই তাঁদের কাছে আমাদের এই উত্তর যে, গায়ের জোরের উপরেই যে দুনিয়ার আধিপত্যের ভিত্তি নয়, তার প্রমাণ তো মানুষ নিজেই। বাঘ, ষোষ, গণ্ডার প্রভৃতি এই সব হোম্‌রা চোম্‌রা নখী-শৃঙ্গীরা থাকতেও যখন দুর্ব্বল মানবই হয়ে বসেছে তামাম দুনিয়ার বাদশা, তখন গায়ের জোর নেই বলে' পরবশ্যতার ওজর একেবারেই টিক্‌তে পারে না।

"সর্ব্বং আত্মবশং সুখং" এই যে পরম মুক্তির বাণী, একি নারীর জন্যে নয়? অনেক দিনের অন্ধ-প্রথা ও প্রভুত্বের জড়ভারে তার আত্মা যে মুমূর্ষুপ্রায় একথা তার নিজের যতটা জানা উচিত, ততটা জানবার আগ্রহকে আজো যারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়,—সে কেবল তারা নিজেরাও ঠেকে রয়েছে বলেই। নিজে যে অশক্ত, অপরের শক্তিলাভকে সে সন্দেহের চোখেই দেখে। তাই জাগ্রত-জীবনের যাত্রামুখে তারা যখন পথ আগলে বাধা দিতে দাঁড়ায়, তখন হয় তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে নারীর স্বাভাবিক সঙ্কোচের যতটুকু ত্যাগ করা দরকার, সেটুকু অবশ্য ত্যাগ করতেই হবে, নয় তো নতুন পথ কাটবার মতন বল সঞ্চয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

এদেশের কর্ত্তা-জাতির মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে' পরিচিত, তাঁদেরও পৌনে ষোল আনা লোকই অন্তঃপুরবাসিনীদের নিজেদের বাড়িয়ে তোলার এই ভাবটাকে অবিশ্বাসের চোখেই দেখেন। সাগর পারের হাওয়ায় আপাতোজ্জ্বল ভাবের এই ফাঁকা ফানুসটা যদিই বা দৈবযোগে আর্য্য-ভূমির পুণ্য আকাশতলে উড়ে এসেছে, একটু ধৈর্য্য ধরে থাকলেই দেখা যাবে, কিছুকাল জ্বলে জ্বলে শেষটায় আপনা হতেই কখন তা যে নিভে যাবে, তা কেউ টেরও পাবে না। এই হলো তাঁদের বিশ্বাস। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে, নারীর নব জাগরণের গানটাকে বেফাঁক তুড়ি দিয়েই তাঁরা উড়িয়ে দিতে চান। বিশ্বাস অন্ধ, যে জায়গায় একবার হাঁটুগেড়ে বসে, সেখান থেকে সহজে নড়তে চায় না। আমাদের মতন নগণ্যের কথায় বিচক্ষণ কর্ত্তাজাতির বিশ্বাসের কিছুই এসে যাবে না জেনেও, তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন,—এই যে সেদিন কলিকাতা ও

মফঃস্বলের বুকের উপর সভাবন্ধের খামখেয়ালী আইনকে না মেনে চলা নিয়ে এত সব কাণ্ড হয়ে গেলো, তাতে যে সকল পর্দ্দানসীন হিন্দুঘরের বাঙালী-মেয়েরা সাতপুরুষের ঘেরাটোপের খোপ ছেড়ে নিঃসঙ্কোচে নব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কাজের প্রতি বাংলার পনোরো আনা পুরমহিলার অন্তরের অনুমোদন ও সহানুভূতি ছিলো। অবশ্য দিদিমাদের চোখে সেই সব নারীর তেজস্বিতা ও কর্ম্মপটুতা নির্লজ্জ বিবিয়ানার চূড়ান্ত নিদর্শন! কিন্তু দিদিমাদের আমল যে আজ আর নেই, তার প্রমাণ দেশমাতার এই সব অক্লান্ত সেবিকারা যেখানেই উপস্থিত হয়েছেন, অন্তঃপুরবাসিনীদের আদর ও আনন্দের হাসিতে নিজেদের মর্য্যাদাকে উজ্জ্বল করেই ফিরেছেন।

পৃথিবীতে নবযুগ আগতপ্রায় না হলেও, তাকে আহ্বান করবার আয়োজন সংগ্রহের জন্য সকল জাতির ভিতরই আজ অল্প বিস্তর চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার মুখে কোথাও পুরাতন একদম বাদ পড়ে যাচ্ছে, কোথাও বা তাকে নামে মাত্র খাড়া রেখে তার উপর নতুনেরি পূজার সিংহাসন বসান হচ্চে। আজকের দিনেও যদি এদেশের মেয়েরা শিকলটা সোণার বলেই তার উপর অলঙ্কারের গৌরব আরোপ করে, অক্ষমের মুখের গোটাকতক মিষ্ট বচনের মোহে আবিষ্ট থাকে, আর পোষমানা প্রাণের ঝিমন্ত ভাবটাকেই নারীত্ব বলে মেনে নিয়ে, পরম নিশ্চিন্তে খেয়ে শুয়েই কাল কাটায়, তাহলে দু'দিন বাদেই তাদের দেহ মনের এই পঙ্গুত্ব প্রতিকারেরও বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে।

শ্রীসোণামাখা দেবী।

আমাদের শিক্ষা-সঙ্কট *

(১)

আপনার লেখা "মারাত্মক একতা" পড়ে আমার মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, আপনি বি-মতকে কখনই বয়কট করবেন না, অবশ্য সে বি-মত যদি সত্যি একটা মত হয় আর তা যদি বেনামি না হয়। যাঁরা বয়কটের পক্ষপাতী তাঁরা ভুলে যান যে, মতে মতে সংঘর্ষের ফলে ঠিক মত দাঁড়িয়ে যায়, ভুল মত ভেঙ্গে প'ড়ে। বিরোধী মতের উপর জয়ী না হওয়া তক্ স্বমতের শক্তি কেউ জানতে পারে না। ও পরীক্ষায় যে মত পাস না হয়, তা দুদিনের বেশী টেঁকে না।

তার পর এটা কখনো লক্ষ্য করেছেন যে, মতে মতে সংঘর্ষ হলে অনেক সময়ে সে দুই পৃথক মত পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একটা নূতন মতের সৃষ্টি করে—যার ভিতর উভয় মতের গুণ থাকে আর কোনটারই দোষ থাকে না। Thesis ও antithesis মিলেই যে synthesis হয়, হেগেলের এ আবিষ্কার হচ্চে একটা মহা সত্যের আবিষ্কার।

দার্শনিক-তত্ত্বের দিকে পিঠ ফিরিয়েও দেখতে পাই যে, মানুষে নিত্য তর্ক করে; অবশ্য তাদের ভিতর মতভেদ হয় বলে, আর সেই সঙ্গে তারা একমত হতে চায় বলে। মানুষের মনে যতদিন সংশয় বলে একটা জিনিস থাকবে, ততদিন মানুষ তর্ক করবে, আর মানুষের

---

* আত্মশক্তি হইতে উদ্ধৃত।

মনে সংশয় ততদিন থাকবে, যতদিন সে সব-জান্‌তা না হবে। আর যিনি সব-জান্‌তা তাঁর কিছু বলবার নেই, কেননা তাঁর কিছু শোনবার নেই।

তাই একটা তর্ক তোলা যাক। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে এখন কি ভাঙ্গা উচিত? আপনি অবশ্য একথা স্বীকার করবেন যে, এ বিষয়ে বহুলোক নিঃসংশয়-চিত্ত নন। সুতরাং এটা যথার্থই একটা তর্কের বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমি তর্কের খাতিরে পূর্ব্ব পক্ষ অবলম্বন করছি :—

যা আছে, বিনা কারণে তার অস্তিত্ব নষ্ট করা, আমি বৈধ হিংসা মনে করিনে। আর সত্য কথা বলতে গেলে ইউনিভারসিটী ভাঙ্গবার পক্ষে কোন্ সুযুক্তি নেই। অতএব এখন বিচার সুরু করা যাক। এ বিচারে হারলে আমি দুঃখিত হব না, কেননা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় যে আদর্শ বিদ্যালয় নয়, তা আমি বিশেষ করেই জানি। তবে ইউনিভারসিটীর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য না থাকলেও তার সঙ্গে আমার সখ্য আছে।

(২)

ইউনিভারসিটীর নিন্দে জ্ঞান হয়ে অবধি শুনে আসছি, অবশ্য ইংরেজের মুখে। তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন যে, ওখানে কিছু হয় না অর্থাৎ ছেলেরা লেখা পড়া শেখে না। কেউ বলেন যে, যে লেখাপড়া আমরা ওখানে শিখি, তাতে আমাদের চরিত্র গঠন হয় না। আবার একদল বলেন যে, ইউনিভারসিটীর শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে সব কংগ্রেসওয়ালা। দেশী লোককে বিলেতি শিক্ষা দেওয়া

আর দুধ দিয়ে সাপ পোষা একই কথা, অতএব ও সাপের বাসা ভেঙে ফেল। তার পর আর একদল আমাদের হিতৈষী ইংরেজ আছেন, যাঁরা বলেন, ও-শিক্ষার ফলে আমরা denationalised হই। বিলেতি বিদ্যে পেটে পড়লেই নাকি দেশী মনে বিলেতি নেশা ধরে, আর তখন আমাদের মনোজগতে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে। আমাদের এই বিদেশী হিতৈষীরা চান না যে, আমাদের স্বদেশী আত্মা মাথায় হাঁটে, তাই তাঁরা আমাদের আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার how do you do করিয়ে দিতে চান। এর নাম orientalism.

অতঃপর আমরাও বল্‌তে সুরু করলুম যে ইউনিভারসিটি আমাদের আত্মার মাথা খেয়ে দিচ্ছে। ওখানে শিক্ষা পেলে প্রথমতঃ আমরা denationalised হই, আর তার ফলে আমাদের মনে দাসভাব জন্মায়, সংক্ষেপে আমরা যুগপৎ সাহেব ও মোসাহেব বনে' যাই; অতএব সরকার যদি ইউনিভারসিটি বন্ধ না করেন, তবে আমরা সেখানে ছেলে পাঠান বন্ধ করব। আমরা চাই ন্যাসনাল এডুকেশন তা ছাড়া আর কিছু চাইনে কেননা আমরা চাই re-nationlised হতে।

এ সব মত আমি যে ষোল আনা শিরোধার্য্য করতে পারি নি তার কারণ এসব মত পরস্পর বিরোধী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ইউনিভারসিটি একাধারে hot bed of sedition এবং গোলামখানা হতে পারে না। এবং এ দুয়ে মিলে একও হতে পারে না। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলে, যে—"পরস্পর বিরোধেহির্ন প্রকারান্তরস্থিতি"—অর্থাৎ যা পরস্পর বিরোধী তা পরস্পর বিরোধীই থেকে যায়, তারা অন্যপ্রকারে থাকতে পারে না। জর্ম্মান লজিকে

শুনি এর উল্টো কথা আছে কিন্তু আমি জর্ম্মান জানিনে আর যে লজিকে—"হয় নয়" এক হয়ে যায় সে লজিক থাকা না থাকা দুই সমান।

(৩)

সে যাই হোক, আমি national education কথাটাকে ভক্তি করি, কারণ ও-কথার উৎপত্তি ভাঙ্গবাব প্রবৃত্তি থেকে জন্মায় নি, গড়বার প্রবৃত্তি থেকে জন্মেছে, তবে যে আমাদের দেশী বিলেতি জাতীয় শিক্ষার প্রচারকের দল ঐ ভাঙ্গবার দলে জুটেছেন, তার কারণ তাঁরা কোন্ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় তা জানেন, কিন্তু কোন্ শিক্ষা দেওয়া উচিত তা জানেন না। জানেন না এই জন্যে যে, উক্ত যুক্ত পদটীর চার রকম ব্যাখ্যা হয়। যথা—(১) National education হচ্ছে সেই শিক্ষা যা ন্যাসনালও নয় এডুকেশনও নয় (২) যা ন্যাসনাল বটে কিন্তু এডুকেশন নয় (৩) যা এডুকেশন অথচ ন্যাসনাল নয় (৪) যা যুগপৎ ন্যাসনাল ও এডুকেশন।

বলা বাহুল্য এই চতুর্থটাই হচ্ছে গড়বার জিনিষ, কিন্তু সেটা যে কি, অদ্যাবধি কেউ তা আবিষ্কার করতে পারেন নি। আজ পর্য্যন্ত এবিষয়ে যা কিছু বলা কওয়া হয়েছে সে সব যুক্তি তর্ক যে উপরোক্ত প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত তা এতই প্রত্যক্ষ যে, সে সত্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তার পর জাতীয় শিক্ষার যে সব স্কুল-কলেজ গড়া হয়েছে, সে সবই যে সরকারি স্কুল-কলেজের এক-জাতীয় জিনিষ তা এক পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে। এর কারণ

জাতীয় শিক্ষা কেউ রাতারাতি গড়তে পারে না—ও কালক্রমে আপনি গড়ে' ওঠে। ব্যাসকাশি অবশ্য একদিনে গড়া যায়, কিন্তু সেখানে মানুষ গাধা হয়, শিব হয় না।

একদিকে বিলেতি ইম্পিরিয়ালিষ্ট আর একদিকে দেশী ন্যাশনালিস্ট, দুধার থেকে এই দু-দলের আক্রমণ সত্ত্বেও ইউনিভারসিটি যে টিকে আছে, তার কারণ দেশে তার কোনও মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। National Education আজ তক্ শব্দকায় মাত্র। আর শব্দের ধাক্কায় বস্তু ওলটায় না।

তা হলেও national education-এর আদর্শ আমরা ছাড়তে পারিনে কেননা ঐ হচ্ছে শিক্ষার একমাত্র আদর্শ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই national education আছে, এক আমাদের দেশ ছাড়া। অর্থাৎ পৃথিবীর অপরাপর দেশে জাতীয় বুদ্ধি ও জাতীয় অবস্থা এই দুয়ের যোগাযোগে সে দেশের education গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাস উল্টো, তাই তা ডানদিক থেকে পড়তে হয়।

আমাদের দেশে রয়েছে ইউনিভারসিটি, আর আমরা চাই national education। আমাদের শিক্ষার এই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। এখন আমার বিবেচনায় এ সমস্যার সমাধান সহজেই হয় যদি, আমরা ইউনিভারসিটিকে nationalise করতে পারি, অর্থাৎ ইউনিভারসিটির দেহে যদি আমাদের আত্মা ঢুকিয়ে দিতে পারি, বররুচি যেমন বৈয়াকরণ-ব্যাড়ীর আত্মা মগধরাজের দেহে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এর সমগ্র বিবরণ কথা-সরিৎ-সাগরে পাবেন।

যদি বলেন যে ইউনিভারসিটির আত্মা ও জাতীয়-আত্মা একটা

পৃথক যে ও দুয়ের যোগ কিছুতেই হবে না। তার উত্তরে আমি বলব যে ও দুই যদি পরস্পর thesis ও anti-thesis হয়, তাহলে তাদের synthesis হতে বাধ্য।

তবে এ পরিণতি হতে পারে, যদি ইউনিভারসিটির দেহটি বজায় থাকে। তা থাক্‌বে কি না বলা কঠিন। ইউনিভারসিটি যে সুস্থ নয়, এবং তার চিকিৎসা যে করা দরকার এ বিষয়ে অনেকে একমত। তাই আমাদের রিফরম কাউন্সিল ইউনিভারসিটির চিকিৎসার ভার হাতে নিয়েছেন, কিন্তু সে চিকিৎসায় তার রোগত্যাগ হবে, কি দেহত্যাগ হবে, তা মা গঙ্গাই জানেন।

এ চিকিৎসায় ঔষধ-পথ্যের নামগন্ধও নেই, আছে শুধু লঙ্ঘনের ব্যবস্থা। তাতেই ত ভয় হয়।

আর একটি কথা বলেই এ বিচার বন্ধ করব। শিক্ষার প্রতি দেশের মন আজ চটে গেছে সুতরাং সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শিক্ষা হচ্ছে মনের জলবায়ু, যতক্ষণ তা আছে ততক্ষণ মানুষে তার মূল্য বোঝে না, তার অভাবেই আমরা খাবি খাই।

বীরবল।

৮ই জুন, ১৯২২।

আমাদের শিক্ষা-সঙ্কট

(২)

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে, ইউনিভারসিটির পরমায়ু ফুরিয়েছে। ও ব্যাপার আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার অভাবে।

ইউনিভারসিটির ব্যয় নাকি বেশির ভাগই অপব্যয়। তাই আমাদের education minister ইউনিভারসিটিকে টাকা আর জলে ফেলতে দেবেন না। আর যদি কিছু কিঞ্চিৎ দেন ত সে টাকার কান আঁচড়ে (ear marked করে) দেবেন। ইউনিভারসিটি ও কানমলা টাকা নেবেন না। আর টাকা না হলে গভর্ণমেণ্টও চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে না, কংগ্রেসও চলে না, কিছুই চলে না, সুতরাং ইউনিভারসিটিও চলবে না।

আমাদের education minister ইউনিভারসিটির উপর কোন-রূপ violent হস্তক্ষেপ করতে চান না, শুধু non-co-operation করতে চান। হাতে মারা প্রহার, কিন্তু ভাতে মারা আহার, এ মত দেখছি উপরে উঠে গিয়েছে।

অবশ্য ইউনিভারসিটি চুপ করে নেই। তার কথা হচ্ছে এই—

"আমার খরচ ব্যয় কি অপব্যয়, তা তুমি বুঝবে কি? ব্যয় ও অপব্যয়ের প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে স্থূলদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তার পর একের মতে যা ব্যয়, অপরের মতে তা অপব্যয় হতে পারে।

---

* বিজলী হইতে উদ্ধৃত।

আমার মতে ministerদের যে মাইনে দেওয়া হয়, তার ষোল-আনাই অপব্যয়। সে যাই হোক্ আমার কোন ব্যয়টা সদ্ব্যয় আর কোনটি অপব্যয়, সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে বাধ্য নই। আমি যে রকম ভাল বুঝি, সেই রকম খরচ করবার অধিকার আইনত আমার আছে। হিসেব তুমি দেখতে পারো, কিন্তু তার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা তোমার নেই—ইউনিভারসিটি হচ্ছে স্বরাট্।"

এর উত্তরে minister মহাশয় বলেন :—

"তোমার স্বরাজ্য আমার সাম্রাজ্যের ভিতর। আর তা যদি না মানতে চাও ত মেনো না, একটি পয়সাও পাবে না। রাখো তোমার আইন। আমার হাতে টাকার থলি আর তোমার হাতে ভিক্ষের ঝুলি, অতএব কে কার অধীন, তা সবাই জানে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-সচিবের এ লড়াই হচ্ছে, মনের সঙ্গে ধনের লড়াই। অতএব ধনেরই জয় হবে। ইউনিভারসিটি হচ্ছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের কাছে ভিক্ষা না পেলে তার কপালে উপবাস অনিবার্য্য, আর তার ফল মৃত্যু। তাই ইউনিভারসিটি প্রয়োপবেশন করবে সংকল্প করেছে।

অতএব এটা নিশ্চিত যে রিফরম কাউনসিলের প্রথম এবং প্রধান কীর্ত্তি হবে, ইউনিভারসিটী ভাঙ্গা। লোকমত এ কার্য্যের সহায় হবে, কেননা এ হচ্ছে ভাঙ্গার যুগ, তাই একটা কিছু ভাঙ্গা হচ্ছে দেখলেই লোকে খুসি হবে। ও বিদ্যালয় বন্ধ করবার পর, তার লোকজন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কি করা যায়, সেটাই হচ্ছে আপাতত আসল ভাবনার কথা।

আমি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করছি, আশা করি বাঙলার

বিদ্বজ্জন সমাজ আমার আরজি বিনা বিচারে ডিসমিস্ করবেন না। এ সব প্রস্তাব অনেক ভেবে চিন্তে করা হয়েছে।

(২)

(১) ইউনিভারসিটি বন্ধ হলে অধ্যাপকদের কি গতি হবে? আমার পরামর্শ যদি নেন ত, গণিতের অধ্যাপকেরা বড়বাজারে চলে যান মাড়োয়ারীর খাতা লিখতে, কেমিষ্ট্রির অধ্যাপকেরা পেটেণ্ট ঔষধ বানান—ওতে দু-পয়সা আছে, physics-এর অধ্যাপকেরা বিজলী বাতি, বিজলী পাখার মিস্ত্রি হোন, আর সাহিত্যের অধ্যাপকেরা আট আনা সিরিজের বই লিখুন আর তাও যদি না পারেন ত খবরের কাগজ লিখুন। বাকী থাকল এক দর্শনের অধ্যাপক। তাঁরা সকল কর্ম্মের বার, অতএব তাঁরা চরকা নিয়ে বসে যান—তাহলে তাঁদের হাতে ঐ চরকার ভিতর থেকে বেদান্ত-সূত্র বেরবে।

(২) ছাত্রদের পথ সব দিকেই খোলা! তাদের কতক পাঠানো হোক টোলে, কতক জেলে, কতক পাঠশালায়, কতক পশুশালায়, কতক হাটে, আর কতক মাঠে। হট্টে, গোল করবার জন্য আর মাঠে, গুলি-ডাণ্ডা খেলবার জন্য।

(৩) লাবরেটারির যন্ত্র পাতি সব যাদুঘরে পাঠান হোক। মৃত বিজ্ঞানের কঙ্কাল-স্বরূপ সেখানে সে সব কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হবে। এতে দুদলের উপকার করা হবে—এক জনগণের, আর আর এক প্রত্নতাত্ত্বিকদের। জনগণ ঐসব ত্রিভঙ্গ বিভঙ্গ অপরূপ বস্তু হাঁ করে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হবে। তারা চিনতে পারবে যে ও সব হচ্ছে রূপকথার দেশের রাজকন্যার

যাদুর যন্ত্র-তন্ত্র, আর ওরই ভিতর মানুষের জিওনকাঠি মরণ-কাঠি দুই লুকানো আছে। অপর পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐসব কঙ্কালের ভিতর থেকে, বৈজ্ঞানিক যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সব উদ্ধার করবেন, এবং তার জন্য সরকারের কাছ থেকে মোটা মাইনে পাবেন।

(৪) বইগুলো নিয়েই পড়েছি মুস্কিলে। ও অনাসৃষ্টির কোথাও জায়গা হবে না, এমন কি পাগলা গারদেও নয়। অতএব পূরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর যেরূপ সৎকার করা হয়েছিল, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীও তদ্রূপ হওয়া উচিত। তবে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে পাঁজিপুঁথির অগ্নি সৎকারের বিরুদ্ধে আমার একটা নৈসর্গিক কু-সংস্কার আছে। তাই ও প্রস্তাব আমি মুখে আনব না। তবে তা করবার লোকের অভাব হবে না। বিদ্যাদাহের মুরদাফরাস দেশে ঢের মিলবে।

(৫) Senate Houseকে, মাধববাবুর বাজারের অন্তর্ভূত করা হোক। ইউনিভারসিটি উক্ত বাজারকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাতে সরকারের অগাধ টাকা ব্যয় হত; অথচ এক পয়সাও আয় হত না। আর আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হলে, সরকারের এক পয়সাও ব্যয় হবে না, উল্টে ঢের টাকা আয় হবে। আমার বিশ্বাস ও ঘরের যে ভাড়া পাওয়া যাবে তার থেকে একটি নূতন minister অর্থাৎ fish market minister এর মাইনে দেওয়া যাবে।

(৬) আমার শেষ প্রস্তাব এই যে, ইউনিভারসিটি কলেজে একটি নতুন পুলিসকোর্ট বসান হোক্। এ বিষয়ে নজির আছে। ডফ সাহেবের কলেজ ইতিপূর্ব্বে জোড়াবাগান পুলিস কোর্টে পরিণত হয়েছে। এই নজির অনুসারে, ইউনিভারসিটি কলেজকে, গোলদিঘি

পুলিসকোর্টে রূপান্তরিত করা হোক। গোলদিঘির ধারে যে একটা পুলিসকোর্ট থাকা দরকার একথা বোধ হয় কোনও মিনিষ্টারই অস্বীকার করবেন না।

আশা করি Reform Council আমার উক্ত প্রস্তাব সব গ্রাহ্য করবেন। ইতি

বীরবল।

৪ঠা জুন, ১৯২২।

পত্র।

Zevgholatio,
Pelopsonnesos (Greece).
৭ই জুন, ১৯২২।

মান্যবরেষু,

যেখান থেকে আপনাকে চিঠি লিখছি, সে জায়গাটায় বাধ্য হ'য়ে এক রাতের জন্য আটকে গিয়েছি। বিকাল তিনটেয় এখানে এসে পৌঁছেচি, কাল সকাল সাড়ে আটটার ট্রেণ ধ'রে স্পার্টার দিকে (ত্রিপোলিস্ হ'য়ে) যাত্রা করবো। এটা চমৎকার পাহাড়ের অঞ্চলের মধ্যে একটা ছোট্ট গ্রীক গাঁ, এক গেঁও হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। হাতে কিছু কাজ নেই, সারা সকালটা টাট্টুর পিঠে চ'ড়ে চড়চড়ে রোদ্দুরে টহল দিয়ে, তারপর তিন ঘণ্টা ধ'রে এই ভীষণ গরমে তৃতীয় শ্রেণীর রেলে ভ্রমণ করে, শরীর আর মন দুইই ক্লান্ত। ঘরে জামা টামা খুলে ঠাণ্ডা হয়ে, জানালার ধারে ফুরফুরে হাওয়ায় ব'সে, ভাগ্যিস্ রবিবাবুর চয়নিকা একখানা সঙ্গে এনেছিলুম, সেখানার পাতা উল্টে উল্টে দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় মনে হ'ল, আপনাকে একখানা চিঠি লিখি—কারণ এই ভ্রমণের আনন্দের সমজদার আপনার মত পাবো না। গ্রীসে এসেছি দিন নয় দশ হ'ল। আপনাকে বোধহয় শেষ চিঠি লিখি লণ্ডন থেকে। তার পরের মধ্য-পর্ব্বটা একটু

আপনাকে ব'লে নিই। ১৯২১-এর আগষ্ট থেকে ১৯২২-এর এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত, এই মাস নয়েক একটানা পারিসে কাটাই। এখানে জনকতক বড় বড় আচার্য্যের—যেমন অধ্যাপক আন্তোআন মেইয়ের—শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে সর্‌বন্ আর কলেঝ্-দ্য-ফ্রাঁস-এর ছাত্র হ'য়ে থাকি—কোনও ডিগ্রির জন্য চেষ্টা করি নি। মাঝে কিছুকাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আর আনুষঙ্গিক বাতে বড্ড ভুগি। তারপর পারিসের পাট চুকিয়ে, ইউরোপের অন্য দেশ একটু ঘোরবার জন্য বার হই। মে মাসের মাঝামাঝি ইটালীর পাদুআ বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তশতকীয় উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম পাদুআয় আসি। পাদুআয় তিন দিন থাকি। ভারতীয় প্রতিনিধি আমরা ছিলুম তিনজন—তিনজনই কলকাতার—আর দুজন হচ্ছেন, ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক আর ডাক্তার ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ। প্রায় ৪০।৪৫টী ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধি জড় হয়েছিলেন—কোথায় চিলি আর কোথায় ফিন্‌লাণ্ড আর চীন। ভারতের মান এক ক'ল্‌কাতাই রক্ষা করেছে কতকটা। অথচ পাদুআ থেকে ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ পত্র এসেছিল, ইটালীয়ানে আর সংস্কৃতে। সপ্তশতকীয় উৎসবের প্রধান দিনে প্রতিনিধিদের মধ্যে জনকতক আর সকলের হ'য়ে পাদুআর প্রতি অভিনন্দন বাণী পাঠ করেন। এঁদের প্রোগ্রামে ছিল যে, প্রতিনিধিরা যাঁরা বলচেন তাঁরা যে যার নিজের দেশের ভাষায় বলবেন। আমরা তাই সংস্কৃতে একটা ছোট সাময়িক নিবেদন লিখে রাখি। সেটীকে আমি দেবনাগরী অক্ষরে হাণ্ডমেড পেপারে পুরাণো পুঁথির আকারে তৈরী করে রাখি। যোগাযোগে হয়ে গেল যে ভারতবর্ষের—এসিয়ার

তরফ থেকে সেটা বৃহৎ সভায় আমাকেই আগে পড়তে হ'ল। ফলে প্রোগ্রামের এই অংশটুকু দেবভাষায় স্বস্তিবাচন ক'রে আরম্ভ হ'ল। আমার মনে হয়—এই গর্ব্বটুকু ক্ষমা করবেন—দেবভাষার অপমান আমি করি নি, বিরাট জনসঙ্ঘের মধ্যে সংস্কৃতের উদার ধ্বনি একটু শ্রদ্ধা ও হর্ষের সঞ্চার করেছিল। পারিসে ক'মাস থাকার দরুণ ফরাসী ভাষাটায় কাজ-চালানোগোছ একটু দখল হয়েছে—সাধারণ কথাবার্ত্তা এক রকম চালাতে পারি, তাই অবলম্বন ক'রে পাড়ুআর অন্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে, ইটালিয়ান অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ সালাপ কিছু কিছু করতে পারা গিয়েছে। প্রায় সব শিক্ষিত লোকই,—ছাত্রদের মধ্যে একটু বেশী চিন্তাশীল আর খোঁজ-খবর-রাখিয়ে আর পড়িয়ে যারা,—তারা রবিবাবুর বই পড়েছে, আর তাঁর অনুরাগী। তিনজন শ্যামবর্ণ ভারতীয় প্রতিনিধি এই বিশ্ব-পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত থাকায় ফল ভালই হয়েছে। অনেকের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষা-চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করতে পারা গিয়েছে। Li delegati Indiani dell' Universitá di Calcutta, chi parlano Sanscrito হিসেবে দলে দলে ছাত্র ছাত্রী এসে রোমান আর দেবনাগরী অক্ষরে আমাদের তিনজনের হস্তাক্ষর নিয়েছে। পাড়ুআর ইটালীয়ান শিক্ষিত সমাজের যে ভদ্রতার আর সৌজন্যের পরিচয় পেয়েছি, বাস্তবিকই সেটা একটা মাথা পেতে নেবার জিনিস। পাড়ুআ প্রথম এইরকম এক বিরাট ব্যাপারে ভারতকে আহ্বান ক'রে, তাকে বিদ্যানুশীলন আর তত্ত্বজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে অন্য জাতের সঙ্গে সমান আসন দিয়েছে—এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। ইচ্ছে আছে, পাড়ুআর ব্যাপার আর আমাদের ভা

কেমন লাগল, এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ক'রে কোনও বাঙলা পত্রিকার জন্য লিখবো। কিন্তু স্থির হ'য়ে না ব'সলে তা হচ্ছে না। এখন যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে আছি—সারাদিন ঘুরে শ্রান্ত হ'য়ে বাসায় ফিরে কিছু লেখবার মত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা থাকে না। সব বিষয়ের নোট্ রাখছি কিছু কিছু, এই যা।

পাদুআ থেকে ভেনিসে আসি, ভেনিসে কাটাই পাঁচ দিন। সান্‌মার্কো আর কানাল্ গ্রান্দে দেখে মনটা বিশেষ পুলকিত হয়েছে—বিশেষ সানমার্কোর বিজান্তীন-বাস্তুপ্রণালীর মন্দির, আর তার ভিতরের মোসাইক্ কাজ, চিত্তকে অভিভূত করে ফেলেছে। আবার একবার অন্ততঃ ভেনিসে যেতেই হবে। ভেনিসের পর দুদিন বলঞাতে, দুদিন রাভেন্নাতে। এ দুটী জায়গায় ইটালীপন্থী বাঙালী সাধারণত বোধহয় যায় না। রাভেন্নার দুটো টান—দান্তের সমাধি, আর আমি বিশেষ করে যে জন্য গিয়েছিলুম—এর বিজান্তীন যুগের মন্দির আর তার ভিতরকার মোসাইক্ দেখতে। দেখে খুসী হয়েছি খুব। রাভেন্না থেকে দিনের ট্রেণে ব্রিন্দিসি পর্য্যন্ত লম্বা পাড়ী। ও পথটা আপনার নিশ্চয় দেখা আছে। একদিকে আদ্রিয়াতিক সাগর, আর একদিকে সবুজে-ভরা ইটালীর পাহাড়, ক্ষেত, গাঁ—প্রকৃতি নীল আকাশের তলায় হাসছে—ইটালী বাস্তবিকই সুন্দর দেশ। আঙুরলতার মাচার (pergolaর) নীচে ইটালীয়ান মেয়েদের দল হাসি আর গানের মধ্যে গৃহকার্য্যে রত রয়েছে, বড় সুন্দর লাগল। ব্রিন্দিসি থেকে এক গ্রীক জাহাজে করে সরাসরি আথেন্স্-এ। পথে ঘণ্টা তিনেকের জন্য করফুতে নামতে পাই, সেখানে সহর ছেড়ে একটু ভিতরে গাড়ী করে ঘুরে আসি—করফু ইটালীর মতই সুন্দর।

গ্রীস দেশটা মোটেই সুন্দর নয়—কেবল পাহাড়, পাহাড়, গাছপালার অভাব, আর সহর ছেড়ে এখানকার মফঃস্বলের একটু পরিচয় পেয়ে, এখানকার ভ্রমণপ্রণালীর উপর, আর গাড়োয়ান, ঘোড়াওয়ালা, দালাল, হোটেলওয়ালা জাতীয় জীবের উপর তাদৃশ প্রীতির ভাব হচ্ছে না। আথেন্স-এ কিন্তু আক্রোপলিস্-এর উপর পার্থেননের ভাঙা মন্দির দেখে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পার্থেনন যতটা সুন্দর, ছবি দেখে দেখে, বর্ণনা প'ড়ে, মনে মনে কল্পনা করে আসছিলুম, প্রকৃতই পার্থেনন ততটা, কি তার বেশী, সুন্দর। এ পর্য্যন্ত মানুষের সৃষ্টি বড় বড় কতকগুলি মন্দির দেখলুম—যেমন ভুবনেশ্বরের মন্দির, তাজ, ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের কতকগুলি গথিক কাথিড্রাল, সান্‌মার্কো—সব গুলিই সুন্দর, কেউ কারুর চেয়ে বড় তা বলা চলে না; কিন্তু পার্থেনন ও ঐ জাতীয় গ্রীক মন্দিরের সরল অনলঙ্কৃত রূপে যে একটা গাম্ভীর্য্য, দার্ঢ্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে সৌকুমার্য্যের সমাবেশ পাওয়া যায়, তা আমার মনে হয় অন্য মন্দিরগুলিতে মেলে না। আর এইজন্য আমি গ্রীক-বাস্তুশিল্পের একটু বিশেষ পক্ষপাতী। আথেন্স-এ ছিলুম দিন চার, রোজই পার্থেনন দেখে এসেছি—ফিরবো আথেন্স-এ দিন পাঁচেক পরে, দুদিনের জন্য, চাঁদিনী রাতে পার্থেনন দেখতে পাবো তখন। আথেন্স্ থেকে বার হয়ে সরাসরি আসি দেল্‌ফিতে। আপোল্লোনের ক্ষেত্র এখন ভাঙা পাথরের ধস্‌নায় পরিণত হ'য়ে আছে। তবে পারণাসস্ পাহাড়, আর আশপাশের গম্ভীর mystic ধরণের প্রাকৃতিক দৃশ্য,—মন্দিরের স্থানটা পাহাড়ের গায়ে এক বিরাট amphitheatre-এর এক অংশে যেন—আর কাস্তালিয়া ঝরণা, খুবই উপভোগ করা গেল। দেল্‌ফি আসা একটু মুস্কিল—আথেন্স্

থেকে ঘণ্টা নয়েক জাহাজে ক'রে, তারপর পাহাড়ে উঠতে হয়, তিন ঘণ্টা গাড়ী, না হয় ঘণ্টা দুই আড়াই টাট্টুতে ক'রে। আথেন্স-এর কতকগুলি ভদ্র, শিক্ষিত গ্রীক পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে একত্র আসি। দেল্‌ফির কাস্তালিয়া ঝরণার তলায়, এঁদের আয়োজিত গ্রীক গ্রাম্য-ভোজ আর উৎসব দেখতে পাওয়া যায়—নিকটবর্ত্তী গাঁ থেকে কতক-গুলি পল্লীবাসীদের এঁরা ডাকিয়ে এনে, গ্রীক-গান, গ্রীক-নাচ, গ্রীক-বাজনা, এই সব ঘণ্টাকতক ধ'রে করান। গ্রীক-গান যা শুনলুম, তার সুর আমাদের দেশের মতই লাগল, আর কতকগুলি folk-songs একেবারে বাউলের বা রামপ্রসাদীর মত বোধ হ'ল। আবার কতকগুলি তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ার মত। নাচে waltz-জাতীয় নাচের ভাব নেই, মেয়ে পুরুষে হাত ধ'রে গোল হ'য়ে ধীরে ধীরে পাঁয়তারা ক'রে ঘোরে, অতি ধীরে, মাঝে মাঝে হাতের সুন্দর ভঙ্গী দেখা যায়। এই দুটী জিনিস গ্রীক-চাষাদের পূর্ব্বপুরুষদের থেকে লব্ধ বলে বোধহয়, গান আর নাচ। বাজনা মনে হ'ল তুর্কীদের কাছ থেকে নেওয়া—সানাই, আর এক রকম ঢাক্, ব্যস্। গ্রীক-ভোজের উপকরণ হচ্ছে, ছাগলের মাংসের কাবাব,—আস্ত ছাগলের ধড়টাকে আগুণে ঝলসায়,—রুটী, ছাগল দুধের দই। এঁরা খুব সৌজন্য দেখালেন আমাকে—জিনিসটা নোতুন ব'লে বেশ আমোদ পাওয়া গেল। তারপরে এঁদের গান টানের পর আমায় ধরলেন, ভারতীয় গান কি আবৃত্তি কিছু এঁদের শোনাতে। প্রায় সকলেই "তাগোরে"র (Tagore-এর গ্রীক উচ্চারণ) কিছু কিছু পড়েছেন,—গ্রীকে। রবিবাবুর কিছু শুনতে সনির্ব্বন্ধভাবে চাওয়ায়, কাস্তালিয়া ঝরণার তলায়, প্লেন গাছের ঘন ছাওয়ায়, উর্ব্বশী থেকে গোটা

তিনেক পর্ব্ব আবৃত্তি করলুম। ভাষার মাধুর্য্যের খুব তারিফ হ'ল—বাঙালী কেউ থাকলে আবৃত্তি করতে সাহস করতুম না—আবৃত্তির পর যা পড়লুম তার ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ এল। মোটের উপর, শনিবার দুপুরটী বেশ কাটল।

দেল্‌ফি থেকে টাট্টুতে চ'ড়ে উৎরাই ক'রে আবার ইতেয়া বন্দরে সন্ধ্যেবেলা জাহাজ ধরে, পাত্রাস হয়ে, পরশু দিন ওলিম্পিয়াতে এসে পৌঁছই। দ্যৌঃ পিতা Zeus Pater-এর ক্ষেত্র, ওলিম্পিক খেলার স্থান। মন্দিরের মধ্যে একটীও আর খাড়া নেই। এক মিউজিয়ম ক'রে সেখানে এইখানে পাওয়া ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কিছু কিছু রেখেছে, তার মধ্যে প্রাক্সিতেলেসের হের্মেস আর ওলিম্পিয়ার জেউসের মন্দিরের কিছু কিছু মূর্ত্তি সুপ্রাচীন, পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ভাস্কর্য্যের চমৎকার নমুনা। আর জায়গাটা অতি সুন্দর, চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, তার খুব ঘন গাছপালা, ঝাউ গাছ, সাইপ্রেসই বেশী।

এ অঞ্চলে ট্রেণ আসে একদিন অন্তর। ওলিম্পিয়ায় দু'রাত কাটাতে হয়। মতলব, স্পার্টায় যাবো—খানিক পথ রেলে, খানিক মোটরে। স্পার্টায় প্রাচীন গ্রীক—লিকুর্গস, লেওনিদাস-এর সময়ের সহরের চিহ্ন নেই—খালি কিছু প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে, তা স্থানীয় মিউজিয়মে জমা হয়ে আছে। স্পার্টার আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অতি সুন্দর—তাইগেতস্ পাহাড়ের। কিন্তু স্পার্টার দিকে টেনেছে আমাকে, স্পার্টার কাছে মিস্ত্রার বিজান্তীন যুগের এক সহরের ধ্বংসাবশেষ—এত সুন্দর বিজান্তীন মন্দির বাড়ী ফ্রেস্কো নাকি আর কোথাও নেই। এই সহরের ভোগকাল ১৪।১৫ শতক। পরশু মিস্ত্রা দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবো।

স্পার্টার পর আথেন্স, রেলে ক'রে, পথে আর্গস, তিরিন্স, মিসেনী (বা মুকেনাই) সারবার বাসনা আছে। তারপর দিন দুই আথেন্স-এ থেকে আবার ব্রিন্দিসি। ইটালীতে পাএস্তুম্ (নেপল্‌স্-এর দক্ষিণে), নেপল্‌স্, রোম, আসিসি, পেরুজিয়া, ফ্লরেন্স, পিসা, জেনোয়া, মিলান—এতগুলো জায়গা দেখতে হবে। তারপর অষ্ট্রিয়া হ'য়ে জারমানী—জারমানীতে দু'মাস—জুলাই, আগষ্ট—তারপর লণ্ডন—লণ্ডনে সেপ্টেম্বারে হপ্তা তিনেক—তারপর অক্টোবারে জাহাজ ধ'রে বাড়ী।

নেহাৎ একলা ঠেকলেও, এরকম বেড়াতে আমার মন্দ লাগে না। সকালে ওলিম্পিয়াতে সাতটার ট্রেণ ধরে, পির্‌গস্ বলে এক জংশনে আটটায় নেমে, সেখানে বারোটায় অন্য গাড়ী ধরে, জেভঘোলাত্তিওতে তিনটেয় আসবার কথা। স্পার্টার দিকে যাবার গাড়ী সেই কাল সকালে। এখানে একটী বিকেল আর রাত্তিরটী কাটানো, ভ্রমণের প্লানের মধ্যেই আছে। এখন ওলিম্পিয়া থেকে গাড়ী ছাড়ে সকাল সাতটায়—latest যে টাইমটেবল্ কিনেছি, তাতে তাই বলে। সব ঠিক ঠাক ক'রে, ছ'টায় উঠে সাতটার গাড়ী ধরে পির্‌গস্ আসবো এঁচে আছি,—না আজ ভোর পৌনে পাঁচটায় হোটেলওয়ালা দরজায় ধাক্কা দিয়ে হল্লা সুরু কল্লে, ভাঙা ফরাসীতে আর খুব তড়বড়ে গ্রীকে,—গাড়ী সাতটায় নয়, পাঁচটায়। এ গাড়ী না পেলে ওলিম্পিয়ায় আবার দু'রাত কাটাতে হবে—তাড়াতাড়ি পনেরো মিনিটের মধ্যে কাপড় চোপড় প'রে ব্যাগটী নিয়ে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ষ্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতেই দেখি, গাড়ী ছেড়ে দিলে! হোটেলওয়ালা তখন তার ফরাসী ভুলে গিয়ে ক্রমাগত গ্রীকে excited ভাবে আলাপ সুরু

করলে। কিছুক্ষণ pantomime-এর পর একজন ইংরেজী-ওয়ালা গ্রীক পাওয়া গেল (গ্রীস থেকে হাজার হাজার লোক বছর বছর আমেরিকায় যায়, সেখানে ২।৩।৫।৭।১০ বছর কাটিয়ে, কিছু কামিয়ে আবার দেশে ফিরে আসে, তাই প্রায় প্রতি গ্রামে ২।৪ জন ইংরেজি বা আমেরিকান-ওয়ালা লোক মেলেই—সহরে ফরাসী আর ইংরেজিতে চলে, আর গাঁয়ে দেখছি ইংরিজি হলে আটকায় না—গ্রীক না জানলেও চলে যায়)—ঠিক হল, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় ক'রে ঘণ্টা তিনেকের ভিতর এক ছোট ষ্টেশনে পৌঁছনো যাবে, যেখানে পিরগস্-জেভ্‌গোলাতিওর বারোটার গাড়ী ধরা যাবে। কিন্তু ৩০ দ্রাখ্‌মা বেশী লাগবে এতে। তথাস্তু। গম্ভীর হ'য়ে ঘোড়ার পিঠে একদিকে ব্যাগ, আর একদিকে যুগল জঙ্ঘা রেখে বসা গেল। এক-দল সঙ্গী জুটল—এক আমেরিকা-ফেরত গ্রীক, স্ত্রী আর চারটী কাচ্চা বাচ্ছা নিয়ে ওলিম্পিয়া থেকে আমাদেরই পথে পড়ে এক গাঁয়ে যাচ্ছে; এরা চলেছে পায়ে হেঁটে, মালপত্র বোঁচকা বুঁচকি চড়িয়েছে এক খচ্চরের পিঠে। এক সহিসই আমাদের দুটো জানোয়ারের তদারকের ভার নিয়েছে। আর লোক পাওয়া গেল না। এদের নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেল একটু। এরা তো তাড়াতাড়ি চলতে পারে না—আবার এক বিপদ হ'ল, এক নদী পেরুতে হ'ল, ঘোড়ার পেট অবধি জল—একে একে এদেরও পার করাতে হ'ল ঘোড়ায় ক'রে। অবশেষে এরা ঘরে পৌঁছতে, সহিস এক ঘোড়ায়, আর আমি আরটীর, দস্তুর মত সওয়ার হ'য়ে, ঘণ্টা দুই চড়াই উৎরাই ক'রে, যথাস্থানে উপস্থিত হলুম। এরকম experience জন্মে হয় নি—মন্দ লাগছিল না। যদিও আবার ট্রেণটী miss করার সম্ভাবনা বিভীষিকা দেখাচ্ছিল। জিনিসটার

নোতুনত্ব ছিল, তবে মাথার উপর সূর্য্যদেব দেশেরই মত প্রখরভাবে করুণা বিতরণ করছিলেন, সেটা পুরাতন বটেই, কিন্তু পুরোণো বন্ধুর মত আনন্দদায়ক ছিল না।

এখন স্পার্টায় কি ঘটে জানা নেই, তবে এইবার সভ্য-জগতে প্রবেশ করছি, ট্রেণ এদিককার ষ্টেশনগুলোতে দিনে বার দুই ক'রে পাওয়া যায়।

আশা করি' আপনি ভালো আছেন, আর বন্ধুবর্গের কুশল। সত্যেন্দ্রের খবর কি? আর ধূর্জ্জটীর? * * *
দিলীপের সঙ্গে প্যারিস ত্যাগ করার পূর্ব্বে প্যারিসেই দেখা হয়েছে—Sévres-তে আমাদের অধ্যাপক ঝুল-ব্লকের বাড়ীতে গান টানের মজলিস বেশ জমানো গিয়েছিল। আমি ভাল আছি। ব্যারলিনে বিস্তর ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হবে। ইতি—

শ্রীসুনীতি।

সাহিত্যে সমদর্শন।

আজ যখন য়ুরোপের রাষ্ট্রনীতির শাসন ভারতবর্ষকে কুমারিকা হতে হিমালয় পর্য্যন্ত মথিত করচে, তখনো আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়, কবি এবং রসজ্ঞগণ একাগ্র চিত্তে আলোচনা করচেন য়ুরোপের সাহিত্য।

এর কারণ কি?

স্বার্থের দিক থেকে যাঁরা জীবনের অসংখ্য চেষ্টার সার্থকতা দেখতে চান, তাঁরা বলবেন য়ুরোপের স্বাধীন জাতিগণের সাহিত্যের আলোচনায়, আমাদের মনে, স্বাধীনতা লাভ করবার স্পৃহা জাগ্রত হবে; কালে আমরাও তাঁদের সঙ্গে সমান পা ফেলে চলতে পারব।

বেশ ভাল কথা।

কিন্তু এরও চেয়ে একটা বড় স্বার্থ যে মানুষের আছে—একমাত্র মানুষেরই। সেটা হচ্ছে আমাদের মন যতই কেন দেশ, কাল, এবং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার অধীন হউক, স্বরূপে উহা বিশ্বজনীন। এবং এই বিশ্বজনীন মনে যে ভাব, রস, এবং আনন্দ রয়েছে, কবিগণ তা অখণ্ড ভাবেই উপভোগ করেন, এবং আমরা পাঠকগণ তার মন, ভাব, রস ও আনন্দকে সাহিত্যে অখণ্ড ভাবেই উপভোগ করতে চাই। একমাত্র মানুষই এ উপভোগ করতে পারে—তার দেহ যতই নশ্বর হউক। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মাটির উপর পা ফেলে চলে যাওয়ায় যে সুখ নেই, তা নয়; কিন্তু ঐরূপ মনোভাব ত জলচর, স্থলচর, খেচর জীবেরও আছে। কিন্তু তাদের সাহিত্য নেই। এইটি ভগবান মানুষকে বিশেষ ভাবেই দান করেছেন; বিশ্বের সাহিত্যের পানে চাইতে চাইতে রসজ্ঞ পাঠক উপলব্ধি করেন "আমার এত রূপ!"

(২)

নানা দেশের নানা কালের কবিগণের বাহিরের আকৃতিতে যে পার্থক্য দেখা যায়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপের কবিগণের সভা হতে, বাংলার কবিকে আমরা এক নজরেই চিন্‌তে পারি। এটা শুধু আধারের বিশিষ্টতা; সত্য-বস্তুতে, ভাব, রস এবং আনন্দে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আধারের বর্ণ ও আকার আধেয় পায় বটে এবং এই আধারটি গঠিত হয় কবির দেশের জলে, মৃত্তিকায়, পারিবারিক এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায়। বাংলায় সেক্স্‌পিয়ারের কিম্বা ইংলাণ্ডে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কখনই সম্ভব নয়,—কেননা উক্ত দুই দেশের জলবায়ু, সমাজ, ধর্ম্ম এক নয়।

ভাব, রস এবং আনন্দের আধারে আধারে পার্থক্য আছে বলে আমরা যেন আধেয়কে বিচ্ছিন্ন করে না দেখি। অশিক্ষিত মনের স্পষ্ট লক্ষণ বংশাভিমান, জাত্যভিমান কিম্বা আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে বিশ্বসাহিত্যে সেই একই সত্যবস্তু উপভোগ করবার সময় এসেছে। আমাদের উপভোগের জন্যই ত "রসো বৈ সঃ" এর এই আত্মদান; এই দান গ্রহণ যে না করবে, সেই দরিদ্র থাকবে, এই লীলা যে উপভোগ না করবে, সেই নিরানন্দ থাকবে।

কিন্তু মানুষ এত নির্ব্বোধ নয়। এই জন্যই দেখা যায় যে, স্বাধীন এবং পরাধীন জাতিগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ে যখন যুদ্ধ বেধে যায়, তখনও রসজ্ঞ মানুষ তাঁদের প্রতিযোগীর সাহিত্যও আলোচনা করে থাকেন। কেননা ভূমির বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে, ভূমার মধ্যে বিশ্বজনীন মনকে এবং মনের ভাব, রস, আনন্দকে উপভোগ না করে তার নিষ্কৃতি কোথায়?

(৩)

অস্ত্রধারী সম্রাট যখন দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা রক্ষা করতেন, তখন যাই হউক না, এখন দেখা যাচ্চে যে, সকলেই ইচ্ছা করেন, রসজ্ঞ মানুষের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপিত হয়। বিষয়ীগণ তাঁদের দেশের কবিকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে দাবী করলেও, এই সত্য তাঁরাও উপলব্ধি কচ্চেন যে, কবিগণ কখনো কোনো দেশের জাতীয় সম্পত্তি ছিলেন না, কখনো হবেনও না; তাঁরা বিশ্ববাসীর চিরসুহৃৎ, তাঁরা স্ব স্ব মনের বিশ্বজনীন ভাব উপলব্ধি করে, বিশ্ববাসীর মনের মধ্যে সত্য স্থান স্ব-বলে এবং সবলে অধিকার করেছেন; নিখিল মানব মনের উপর তাঁদের স্বত্ব স্থাপিত হয়েছে; এখন, এমন কোনো অস্ত্রধারী সম্রাট কিম্বা শাস্ত্রব্যবসায়ী ধর্ম্মসংঘ নেই—যাঁরা কবিগণকে তাঁদের এই স্ব-স্থান হতে ভ্রষ্ট করতে পারেন; গণপ্রাণ এখন ভাবে, রসে, আনন্দে জীবিত থাকবার ব্যাকুলতায় নিখিল মানব-মনের সহবাস কামনা করচে, কবিগণ—যাঁরা "বিশ্বের বাসিন্দা"—তাঁরাই এই মিলন এই যুগে ঘটিয়ে তুলছেন।

(৪)

কবির সত্য বাসস্থান কোথায়? আলোচ্ছায়ায় রহস্যময়ী, অনন্ত ভাবময়ী প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির কি অনন্ত যৌবন-লীলা, কত বর্ণের বৈচিত্র্য, কত রাগিণীর রমণীয়তা, কত রসের রহস্য কত নিবিড় রোমাঞ্চ। আর কবির মনের মধ্যে অরূপকে রূপের মধ্যে দেখবার কি চেষ্টা, অনির্ব্বচনীয়কে নানা ছন্দে ঘোষণা করবার

কি আনন্দ! সাহিত্যের এবং তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নতি সঙ্গীতের উৎপত্তি ত ঐ চেষ্টা ঐ তৃষ্ণা, ঐ আনন্দ হতেই। ভূমির বন্ধন হতে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা, কবির পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমরা যেন এই ভ্রম না করি যে, ভাব, রস, আনন্দ হতে কবি মুক্তি কামনা করেন। এ বন্ধন থাকার দরুণ কবি কখনই এই ভয় করেন না যে, তাঁর মন ঊর্দ্ধগামী না হয়ে, রসাতলের তিমিরগর্ভে বিলুপ্ত হবে। প্রকৃতির মধ্যে বাস করাতে কবির মন স্তরে স্তরে জেগে ওঠে, তাঁরও ভাবময়ী প্রকৃতি ধীরে ধীরে পূর্ণ যৌবন লাভ করে সুন্দরী, লীলাময়ী, আনন্দময়ী হয়ে ওঠে, এবং সেই প্রকৃতি পরমপুরুষকে নানা ভাবে কামনা করে, কলা নিকেতন গড়ে ওঠে সৃষ্টির ক্রোড়ে, আর একটী নূতন সৃষ্টি; মানুষের অতুল কীর্ত্তি, ভগবানের যশোমন্দির।

(৫)

কিন্তু মানুষ মানুষ; মানুষের মনে, নেই যে কোন্ ভাব, কোন্ রস, তা ত দেখা যায় না; কামিনী এবং কাঞ্চনে স্পৃহা যেমন বলবতী, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করবার আকাঙ্ক্ষাও যেমন তীব্র, যশস্বী হবার আগ্রহ যেমন উন্মাদিনী, তেমনি সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পবিত্রতার জন্য, লোকহিতের জন্য আত্মদান করবার ব্যাকুলতাও তেমনি মানুষের মনের মধ্যে আছে; প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করবার স্পৃহাও এই মানুষের মনে, আবার মহাত্মাদের চরণে প্রণত হয়ে, ক্ষুদ্র অহঙ্কার বিলীন করে দেবার ব্যাকুলতাও এই মানুষের মনে। জগতের সঙ্গে সংগ্রামে যে তীব্র সুরাপানের উন্মত্ততা আছে, এ রস তাঁরা পেয়েছেন, যাঁরা যুদ্ধে মেতেছেন; আবার আশ্রিতকে রক্ষা করবার জন্যও

একমাত্র মানুষেরই অন্তরে দয়া আছে। সাহিত্যে সেই জন্য, এই মনেরই নানা বৃত্তির উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং বিলয় দেখা যায়। এই মন হতেই দুর্য্যোধনের সৃষ্টি, ধর্ম্মপুত্রের সৃষ্টি, শয়তানের সৃষ্টি, দেবব্রতের সৃষ্টি; এমন কি দেবগণেরও সৃষ্টি। এই মন হতেই সীতা সাবিত্রীর, ওফেলিয়া ইভের সৃষ্টি, এমন কি দেবীগণেরও সৃষ্টি। মন যখন প্রকৃতির আলোতে জেগে ওঠে, তখন তার সকল প্রবৃত্তিরই উৎপত্তি, বৃদ্ধি, বিলয় হয়ে থাকে; এই জন্যই কি কেউ মনকে প্রকৃতির আলোতে জাগিয়ে তুলতে ভয় করে?

কিন্তু জগতে বাস করে, তা কি করে সম্ভব? আর জাগিয়ে না দেখলেই কি সাত্ত্বিক ভাব লাভ হবে? জড়তা কিম্বা ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা কিম্বা কৃত্রিমতা মানুষকে কখনই সাত্ত্বিক করে না; কবিগণ মনকে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার, ভাবের, রসের মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব উপলব্ধি করেই মনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁদের কাব্যে নাটকে, উপন্যাসে, গানে দেখা যায়, এই মনের আশা কি সুদূর-ব্যাপিনী, এর আকাঙ্ক্ষাই না কি উন্মাদিনী। সেইজন্য আদি হতে শান্ত রস, দাস্য হতে মধুর ভাব পর্য্যন্ত সকলই সাহিত্যের সত্যবস্তু; সকল বিকার, সংস্কার এবং কৃত্রিমতা হতে মন মুক্ত হওয়াতে, নিখিল ভাব রস পান করবার অধিকার লাভ তাঁরা করেন।

এই মনকে আমরা যেন শ্রদ্ধা করি। কামনা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, মানব-জীবনের যা থাকে, তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, এক অব্যক্ত অবস্থা। তার কোন চিত্রই হতে পারে না। বৈচিত্র্য সেইখানে, যেখানে মন প্রাণের অব্যক্ত রহস্যপুর থেকে জেগে স্বপ্রকাশ আনন্দ-পুরে যাবার জন্য নানা দিকে পথ করে চলেছে। বৈচিত্র্য মনের

চলনে, তার আকাঙ্ক্ষায়, তার আত্ম-বিকাশের বেদনায়। তখন মনের একি আশ্চর্য্য উন্মেষ! কবিগণের ক্রিয়াশীল মনই বিশ্ব-মানবকে একই আকাশের নীল চন্দ্রাতপের নিম্নে, কলা-নিকেতনে নিয়ে এসেছে, এই মিলন সাধন এই যুগে কবিগণই ঘটিয়ে তুলছেন।

প্রকৃতি চিরদিনই নবীনা, চিরদিনই লীলাময়ী। এখনো বাতায়নের সম্মুখে বসে প্রান্তরের অপর প্রান্তে তিমির কন্যা উষার কিরণাভা কোমল নীল আকাশে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হতে গাঢ়বর্ণে ছড়িয়ে পড়তে দেখলে, সেই আনন্দই লাভ করা যায়, দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কবি যা উপভোগ করেছিলেন; এবং এখনও নানা দেশের কবিগণ যা উপভোগ কচ্চেন। সেই একই মন, সেই একই প্রকৃতি, সেই একই বাহিরের সহিত অন্তরের যোগ, সেই একই আনন্দ।

(৬)

সেইজন্য বিশ্বের সকল জাতির সাহিত্যকে এখন অখণ্ড ভাবে দেখবার সময় এসেছে। এ দেখার মানে উপভোগ করা। এই যে বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টির ক্রোড়ে আর একটি সৃষ্টি—এর মধ্যে আসলে আছে কি? বহির্জগতে রূপের মধ্যে, রসের মধ্যে, বর্ণের মধ্যে, যেমন ভগবানের বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হয়েও দেখা যায়, তাঁর দ্বারা বিধৃত হয়ে আছে, বিশ্ব-সাহিত্যেও ঐরূপ দেখা যায় যে, মানুষ কোনো প্রবৃত্তিরই শক্তিতে এতদূরে ছিট্‌কে পড়তে পারে না—যেখানে ভাব, রস, আনন্দ হতে সে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হতে পারে। কি সাধুর চিত্তের আত্ম-বিষাদে, কি পাপীর অনুতাপানলে, সেখানেও দেখতে পাই ভগবান বিরাজমান।

কত যুগ যুগ ধরে সাহিত্যে মানুষ তার প্রকৃতির মুক্তি কামনা করে আসচে। সংসারের লাভ ক্ষতির দিকে না চেয়ে, মান অপমানের দিকে দৃক্‌পাত না করে, নির্ভয় চিত্তে বিশ্বাত্মারই যশোগান করে কবিগণ চলেছেন, সেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার তীব্র গতিতে আত্মসমর্পণ করেছেন, সাহিত্য যতটুকু গড়ে যেতে পেরেছেন, তা অপেক্ষা কত অসংখ্য সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন; সেই বিরাটের, অসীমের স্বপ্নে বিমুগ্ধ সাধক কবিগণ কেবলমাত্র একটি আশায় প্রফুল্ল হয়েই সান্ধ্য-সূর্য্যের পানে স্তিমিত নেত্রে চাইতে চাইতে অনন্ত নিশীথের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেছেন; কেবল রেখে গেছেন, একই মনের বিচিত্র প্রকাশ; নানা ভাবের বৈচিত্র্য, নানা রসের আত্ম-বিহ্বলতা। যা রেখে গেছেন, তা কি সামান্য! যে আশার, আকাঙ্ক্ষার মহাসমুদ্র কবির প্রাণের অতল তলে নিত্য মথিত হয়, এবং ঋষির দূরদর্শিতায় ভবিষ্যতে সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, এমন সম্ভাবনা দেখেছেন—সেই আকাঙ্ক্ষাই বা কি অসীম।

আর তাঁরা রেখে গেছেন একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে ভাবময়ী প্রকৃতির লহরী লীলা মানুষকে তাঁরই কাছে নিয়ে যায়, যিনি অনন্ত ভাবময়, যাঁর ভাব, রস, আনন্দে তৃণ হতে তারকা পরিপূর্ণ; তাই বিশ্ব-সাহিত্য আশায়, বিশ্বাসে, আনন্দে উজ্জ্বল।

মানব মনকে এখন প্রশ্ন করবার সময় এসেছে, বিধাতার এই দান গ্রহণ করতে, এই আনন্দ উপভোগ করতে সে কি প্রস্তুত ?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

২০শে আষাঢ়, ১৩২৯।

আমাদের মত-বিরোধ।

(১)

নন্‌-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের মতভেদ থাকা উচিত কি না; সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তা যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; অতএব তা অস্বীকার করেও কোন ফল নেই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা-কংগ্রেস যে দিন নন-কো-অপারেশন গ্রাহ্য করে, সেই দিনই এ সত্য অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কংগ্রেসী বাঙালীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কংগ্রেসের এই নূতন প্রোগ্রামের বিপক্ষে ছিলেন।

তারপর, অর্থাৎ নাগপুর কংগ্রেসের পর, এ দলের ভিতর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ জন কয়েক অসহযোগ-ব্রত অবলম্বন করেন। বাকীবাকী সকলে ও ব্যাপার থেকে আলগা হয়ে থাকেন।

যাঁরা নন্‌-কো-অপারেশনে যোগ দেন নি, তাঁরা যে সকলে ও আন্দোলন থেকে একই কারণে স'রে দাঁড়িয়েছিলেন, তা অবশ্য নয়। অতএব এটা অনায়াসে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, যে ব্রত অবলম্বন করতে হ'লে, চিন্তার ও জীবনের চিরাভ্যস্ত পথ ত্যাগ করতে হয়, সে ব্রত গ্রহণ করবার পক্ষে কারও বাধা ছিল মনের, কারও বা চরিত্রের, আর অধিকাংশ লোকের একসঙ্গে ও দুয়ের।

এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। সাধারণতঃ মানুষের মতামতের পিছনে তার বিচারবুদ্ধি ততটা থাকে না—যতটা

---

* মাসিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত।

থাকে তার চরিত্র, তার রাগ-দ্বেষ, আর তার চিরকেলে অভ্যাস। হৃদয়ের ও উদরের কথাকে মস্তিষ্কের বেনামীতে চালিয়ে দেওয়ার অভ্যাসও যে মানুষের আছে, তা সেই জানে, যে মানুষের কথার পিছনে তার মন দেখতে চায়। যাঁরা নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের দর্শকমাত্র ছিলেন, তাঁরা সকলে যে একমন নন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কেন না, যাঁরা ও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাও সকলে একমন নন। আমি নিজ কানে নন্-কো-অপারেশনের অন্ততঃ পঞ্চাশ রকম ব্যাখ্যা শুনেছি, যা সব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। ও ব্যাপারের ঔদরিক ও আধ্যাত্মিক ভাষ্য-কারের সঙ্গে কার পরিচয় নেই? আর যাঁরা নন্-কো-অপারেশনের একটি নিয়মও একদিনের জন্যও পালন করেন নি, অথচ উক্ত মতের গোঁড়া ভক্ত তাদের সংখ্যা অসংখ্য। এ শ্রেণীর লোকের মতামত যে অকিঞ্চিৎকর, তা বলাই বাহুল্য। নন্-কো-অপারেশন যে একটা কর্ম্মের পদ্ধতি, শুদ্ধ জ্ঞানের কিংবা ভক্তির বিষয় নয়, ও মতানুসারে কাজ না করে ও মত গ্রহণ করায় যে কোনই সার্থকতা নেই, এই সহজ কথাটা মনে রাখলে বাঙলার বহুলোক সকাল সন্ধ্যে ওকালতী করে, রাত্তিরে দুর্দ্দান্ত অসহযোগী হয়ে উঠতেন না। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি বার্দ্দোলীতে যে রিজলিউসান পাস হয়, তার ফলে এঁদের মুখ বন্ধ হয়েছে।

(২)

উক্ত মত সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যখন মতভেদ আছে, তখন তাঁদের কথায় ও লেখায় সে মতভেদের প্রকাশ অনিবার্য্য। কেন না, লেখাপড়া হচ্ছে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কাজ।

তারপর নিজের মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলে লোকে সেই সঙ্গে তার স্বপক্ষে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতেও বাধ্য, আর বিপক্ষ মতখণ্ডন করবার চেষ্টা করতেও বাধ্য। এরূপ তর্কস্থলে লোক চিরকাল ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এসেছে, আর চিরকাল তা করবে। তর্ক-যুদ্ধও যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য লোকে নানা প্রকার আলঙ্কারিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। আর যে তা করতে পারে না, সে চীৎকার করে। এ হচ্ছে মানুষের স্বভাব। মানুষের মন একমাত্র syllogism-এর পথ ধ'রে চলে না। মানুষের মস্তিষ্ক তার রক্ত-মাংসের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। এ যোগ থাকাটা মোটেই দুঃখের বিষয় নয়। দুঃখের বিষয় হয় তখন, যখন রক্তমাংসে মস্তিষ্ক একদম চাপা পড়ে।

মানুষে মানুষে মতভেদ ঘটলেও তাদের ভিতর সকল সময়ে মনোমালিন্য ঘটবার প্রয়োজন নেই। দেখতে পাওয়া যায় যে, মনোমালিন্য বেশীর ভাগ সেই ক্ষেত্রেই ঘটে, যেখানে পরস্পর পরস্পরের কথা ভুল বোঝে। আমাদের পলিটিকসের কাম্যবস্তু যে কি, সে বিষয়ে বোধ হয় আমরা সকলেই একমত। আর যে ক'জন নন, তাঁদের কোন কথাই বলবার নেই। তাঁরা হয় অতিমানুষ, নয় অমানুষ। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের ভিতর যা প্রভেদ, সে হচ্ছে উক্ত উদ্দেশ্যলাভের উপায় নিয়ে। সুতরাং প্রথম থেকেই ধ'রে নেওয়া উচিত নয় যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাতিশত্রু। দ্বিতীয় কথা, আমাদের কারও মত এতাদৃশ চূড়ান্ত নয় যে, তার আর কোন বদল হ'তে পারে না। আমরা তর্ক সুরু করি অবশ্য অপরের মত বদলে দেবার জন্য, কিন্তু তার ফলে শেষটা অনেক সময়ে নিজের মতই বদলে যায়। বুলি বদলায় না শুধু ভোতাপাখীর।

(৩)

এই নন্-কো-অপারেশন বিষয়ে তর্ক অনেক সময়ে যে অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হয়, তার কারণ পরস্পরের মতভেদ যে কোথায় তার্কিকেরা সকল সময়ে সে দিকে নজর দেন না। সে যাই হোক্, কোন্ বিষয়ে যে আমরা সকলে একমত, সেটা যদি আমরা স্পষ্ট জানি, তা হ'লে আমাদের তর্কে এড়ো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ক'মে আসে।

নন্-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাকলেও মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। এ কথা যে অন্ততঃ আমার মুখে স্বধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায়, তা পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। স্বতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায়, সেইটিই হচ্চে দ্রষ্টব্য।

ইংরাজীতে যাকে বলে asceticism, তার প্রতি আমার একটা সহজ শ্রদ্ধা আছে। কাষায় বসনকে আমি দেখবামাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই ব'লে যিনি শারীরিক ক্লেশ-সম্বন্ধে উদাসীন আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জ্জন করেছেন, তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বল্‌তে প্রস্তুত নই। কেন যে নই, তার উত্তর গীতার এই শ্লোকে পাবেন।—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

মাহাত্ম্য আত্মার ধর্ম্ম, দেহের নয়; সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে উপবাসাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই কটি অসাধারণ গুণ দেখিতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় এবং কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত; তাঁহার নির্ভীকতা আর পরার্থ-পরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বল্‌বার প্রয়োজন নেই। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কতদূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সকলে তা লক্ষ্য করেছেন কি না জানিনে। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোনও অলঙ্কার নেই, কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অত্যুক্তি নেই; তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত, তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ, ভাষায় তিনি তাঁর মনের নগ্ন রূপ লোকের চোখের সুমুখে ধ'রে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পিছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হ'তে পার্‌লে মানুষের ভাষা যে কি অসাধারণ প্রসাদগুণ লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃ-ভাষা নয়, একটি বিদেশী ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ কর্‌লুম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য, তাঁর বক্তৃতার সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেবার জন্য নয়। আমরা যাকে ষ্টাইল বলি, সেটা যে মনের গুণ, ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নন্‌-কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল। ঐ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ, যথা ভি, জে, পাটেল সৃষ্টি কর্‌তেন, তা হ'লে তার জন্ম মৃত্যু যে একই তারিখে হ'ত, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই।

বিপিন বাবু একবার বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন যে, তিনি "লজিক" বোঝেন, "ম্যাজিক" বোঝেন না। লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকে ঐন্দ্রজালিক বললে অত্যুক্তি হয় না, এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ম্যাজিক হচ্চে তাঁর চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

(৪)

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে আমার মনে কখনো তিলমাত্র সন্দেহ স্থান পায় নি। তবে তাঁর মুখের কথা যে পুরোপুরি তাঁর মনের কথা, এ বিশ্বাস আমার বরাবর ছিল না। আমার মনে এ সন্দেহ পূর্ব্বে হয়েছে যে, হয়ত তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেন নি। রাজনীতির সঙ্গে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ও নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পূত করে, আবহমান কালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব পলিটিশিয়ান-দের কথা যে সম্পূর্ণ সরল, সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তার পর অসংখ্য নন্ কো-অপারেশন-ভক্তদের মুখে অগণ্যবার শুনেছি যে, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদা ভাবে বোঝা, না বোঝারই সামিল, এবং এই সব ভাষ্যকাররা তাঁর কথার নানা গূঢ় ও কূট অর্থ আমাকে শুনিয়েছেন।

আদালতে তাঁর বিচারের সময়, তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, ঐ বিচারক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনও

একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও শক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে। নির্ভীকতায়, সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি—আমার কাছে একটি work of art স্বরূপে গণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের, সক্রেটিসের, বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধ'রে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও তুষ্ট ক'রে আস্‌ছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ প'ড়ে আমার ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সদ্ভাবে, সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিসের apology বাঙ্গালায় অনুবাদ কর্‌বার আমার ইচ্ছা আছে। যদি কখনো সে অনুবাদ কর্‌তে সমর্থ হই, তা হ'লে বাঙালী পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, ও উভয়ের ভিতর একটা মস্ত আভ্যন্তরিক ঐক্য আছে।

বর্ত্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মহত্ত্ব, কে কি করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই করি; কে কি, সে বিষয়ে ততটা মন দিই নে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে to do আর সে কালে ছিল to be, এই দুই অবশ্য এক নয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন:—

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥"

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলিতেছেন, তার দুটি চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"

যে প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এতদিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই প'ড়ে আস্ছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, অপর কারও চরিত্রে ততটা পাওয়া যায় নি।

যাঁরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর যে কোনও কর্ম্ম নেই, তা নয়, কিন্তু তাঁর কর্ম্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি আমাদের কর্ম্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি নয়।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥"

এ সব কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, মহাত্মা গান্ধী যে একজন আদর্শ পুরুষ, এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও নন-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম কেবলমাত্র পলিটিকাল প্রোগ্রাম হিসেবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যাঁরা মনে করেন যে উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছেন বলেই গান্ধী একজন মাহাত্মা। অপর পক্ষে আমার মতে মহাত্মা গান্ধীর প্রোগ্রাম বলেই জন-সাধারণের কাছে তার এত মাহাত্ম্য।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উল্টো প্রোগ্রাম বার কর্‌তেন, অর্থাৎ non-violence-এর বদলে তিনি যদি violence প্রচার কর্‌তেন, তা হ'লে জন-সাধারণ তা প্রত্যাখ্যান কর্‌ত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তা হ'লে তিনি স্থিতধী ব্যক্তির বশীকরণী শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এ কথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রয়েছে। এক চুল এদিক্ ওদিক্ হয় নি।

আমার শেষ কথা এই যে, নন্‌-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে, তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সুমুখে রাখা উচিত, যদিচ আমরা জানি যে, তাঁর মত স্থিতধী হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত নই। আমরা নির্ম্মমও নই, নিরহঙ্কারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে শান্তি নেই, আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সুমুখে রাখলে আমরা ভয়ে মিথ্যে কথা বল্‌তে ঈষৎ সঙ্কুচিত হব, এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(Anti-Intellectualism.)

দু'খানি চিঠি। *

["কলিকাতা রিভিউ" কাগজে আমার লেখাটি পড়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে দু'খানি চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি সে দু'টি ছাপাতে দিচ্ছি। এ গুলি প্রবন্ধ নয়, চিঠি—এই কথাটি পাঠকেরা স্মরণ রাখবেন। আমার দুঃখ এই যে চিঠি থেকে গোটা কয়েক অবান্তর কথা বাদ দিতে গিয়ে সেগুলি প্রবন্ধের মতন দেখাচ্ছে—সম্পূর্ণতার রস, যা আমি উপভোগ করেছি, ইচ্ছা করে, সে রস সকলকে বণ্টন ক'রে দিই। এ ইচ্ছা কত স্বাভাবিক তা যিনি প্রমথ বাবুর চিঠি পেয়েছেন তিনিই জানেন।—শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়]

---

* আমার যে দু'খানি প্রাইভেট চিঠি শ্রীযুত ধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নব্য ভারতে প্রকাশ করেছেন, সে দু'খানি সবুজ পত্রে পুনঃ প্রকাশিত করছি। এ দু'খানি যথার্থই পত্র, প্রবন্ধ যে নয়, তার প্রমাণ এ লেখার ভিতর দেদার ইংরাজী কথা আছে। বাঙলা লিখতে যদিচ আমরা ইংরাজি কথা একেবারে বাদ দিতে পারিনে, তবুও তার সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে চেষ্টা করি। শ্রীমান ধূর্জ্জটী Anti-intellectualism-এর বাঙলা করেছেন—"বুদ্ধিবাদের প্রতিবাদ"। যে বাদ শুধু প্রতিবাদ মাত্র, তা একটা নূতন বাদ নয়। যেমন protestantism ও একটা নূতন ধর্ম্ম মত নয়। ইংরাজি ভাষায় বলতে গেলে, ও মত অদ্যাবধি negative মত হিসেবেই যে গণ্য, উপরোক্ত চিঠি দু'খানিতে তাই বলবার চেষ্টা করেছি। একমাত্র Intellect-এর সাহায্যে বিশ্বের সকল রহস্য যে উদ্ঘাটন করা যায়, কিম্বা মানব-জীবনের সকল ব্যাপারের যে ব্যাখ্যা করা যায়, এ বিশ্বাস আমার কস্মিন্ কালেও ছিল না, আজও নেই। আমার আর একটি কথা বলবার আছে। Reason কথাটার এ যুগে জাত গিয়েছে, ওর দোহাই দিতে সকলেই ভয় পায়; কিন্তু তার কারণ লোকে rationalismকে reason বলে ভুল করে। ওর প্রথমটি ত্যাগ করলেও, দ্বিতীয়টি মানুষে কখনো ত্যাগ করতে পারবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(১)

ধূর্জ্জটী,

তোমার 'আর্টিকেল' পেলুম ও পড়লুম। লেখাটি একটু শক্ত হয়েছে, বিশেষতঃ সাধারণ পাঠকের পক্ষে ত নিশ্চয়ই। শক্ত হবার কারণ তুমি এক আর্টিকেলের ভিতর এমন অনেক জিনিষ ঢুকিয়েছ যার বিষয়ে অধিকাংশ লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের দেশের কজন লোক বলো ত "Regionalism", "Syndicalism" প্রভৃতির নাম শুনেছে? তবে তুমি বলতে পারো যে, এ প্রবন্ধ সকলের পড়বার জন্য নয়, সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য। তার উত্তরে কিছু বলবার নেই। Anti-Intellectualism বুঝবে অবশ্য শুধু intellectualsরা।

এখন তোমার প্রবন্ধের আসল বিষয় সম্বন্ধে আমার একটী কথা বলবার আছে। ইউরোপে যত সব নূতন মত বেরিয়েছে তার ভিত্তি অবশ্য এই সত্য, যে মানুষ সুধু মস্তিষ্ক নয়; আর তার সকল কাজের গোড়ায় থাকে, তার প্রকৃতি, তার বুদ্ধি নয়। আর মানুষের প্রধান motive force হচ্ছে তার emotion, যা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ শাসিত হয় না আর শাসিত হওয়াও উচিত নয়। এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর Reason-এর পাণ্ডারা যে reason অর্থে intellect বুঝতেন এ কথা সম্ভবতঃ সত্য নয়। Anti-Intellectualism যে reason-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সে বিষয়েও কিন্তু সন্দেহ নেই। এখন আমার প্রশ্ন এই যে, এই সব Anti-Intellectualism-এর পাণ্ডারা sincere কি না? আমার বিশ্বাস আর্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে anti-Intellectualism অকপট, কেননা ও দুই জিনিষ

reason-এর সৃষ্টি নয়, কিন্তু পলিটিক্‌স্ ও ইকনমিক্‌সের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ও একটা চাল মাত্র। পলিটিকাল হিসেবে massকে exploit করবার ও হচ্ছে একটা জবর উপায়। Pan-Slavism, Pan-Germanism প্রভৃতি সব যে, পলিটিকাল ব্যাপার, সে বিষয়ে ত কোনই সন্দেহ নেই; আর ও দুই ব্যাপারের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় আছে, তার থেকে দেখতে পাই, যে Slav আত্মা German আত্মা প্রভৃতির বিষয় যা বলা হয়, সে সব মিছে কথা, আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মনে বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা। এ ব্যাপারের মূল হচ্ছে intellect। আজকাল লোক জানে যে intellect যার জন্ম দেয়—অর্থাৎ idea—তার সাহায্যে অপরের emotion জাগানো যায়, ওঠানো যায়, নাচানো যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি লিখেছ যে religion হচ্ছে মানব-সমাজের একটা প্রধান বন্ধন। কথাটা খুব সত্য। তাই ইউরোপে আজ অনেক স্বদেশী নেতা religion নিজে না মেনে অপরকে তা মানাতে চান, তাদের মনের উপর প্রভুত্ব করবার জন্যে। যে কাজ Church আগে করত, এরা আজ তাই করতে চাচ্ছে। এই কারণে ইউরোপে আজকাল একদল anti-intellectualist জন্মেছে যাদের নাম হচ্ছে—Atheist-Roman Catholic। আর্ট ও সাহিত্যে মানুষের উচ্চাঙ্গের emotion-এর প্রকাশ, আর পলিটিকস্ তার নিম্নাঙ্গের emotion-এর খেলা, সুতরাং এ দুই ক্ষেত্রে anti-Intellectualism এক জিনিষ নয় বরং ঠিক উল্টো জিনিষ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

Anti-Intellectualism-এর গলদ এই যে, তার উপর কোনরূপ সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা যায় না। তোমার প্রকৃতি ও

আমার প্রকৃতি এক নয়, কিন্তু তোমাকে আমাকে যদি এক সঙ্গে ঘর করতে হয়, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার প্রকৃতির যেখানে অনৈক্য তার উপর ঝোঁক না দিয়ে যেখানে ঐক্য সেইখানেই ঝোঁক দিতে হয়। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের যাতে ঐক্য ঘটায় মনের সেই শক্তির নাম reason; ও জিনিষ মুখ্যতঃ moral এবং emotional এবং গৌণতঃ intellectual, সুতরাং anti-Intellectualism-এর একটা স্পষ্ট immoral ও un-emotional দিক আছে। যদি অনুমতি করত' একটা paradox বানাই। Anti-intellectualism-এর দোষ এই যে, তা ষোলআনা intellectual।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(২)

ধূর্জ্জটী,

তোমার প্রথম চিঠি শনিবারে পাই, আর দ্বিতীয়খানি এইমাত্র পেলুম। তুমি দেখছি আমার কথাগুলো একটু বেশী seriously নিয়েছে। আমার চিঠির নীচে "বীরবল" সই থাকলে, আমার মতের কতটা রাখতে হবে আর কতটা ফেলতে হবে, তা তুমি অনায়াসে ধরতে পারতে। ও চিঠিখানি আধমজা করে লেখা, তবে সে মজার ভিতর থেকেও এক আধটা সত্যও হয়ত বেরিয়ে পড়তে পারে। দেখ, সব দেশেই চলতি মতগুলো লোকমুখে ক্রমে বুলি হয়ে ওঠে। মানুষ একটা নাম পেলেই খুসি থাকে, তখন সে-নামের পিছনে রূপ দেখবার প্রবৃত্তি তার আর থাকে না। তারপর সেই নাম জপতে জপতে সে auto-hypnotised হয়ে যায়। যারা Folk-

Psychology লেখে, এ সত্য আমার বিশ্বাস, তারা নিশ্চয়ই ধরেছে।

ইউরোপের দশাই যখন এই, তখন আমরা যে বুলির দাস হয়ে পড়্‌ব তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের মনের ভিতর সজ্ঞানে-গড়া এমন কোন মত নেই যা, কোনও নূতন মতের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাল তলওয়ারে নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের দেশের অবস্থা যা, আমাদের মনের অবস্থাও তাই, অর্থাৎ ও দুয়ের কোনটীই আত্মবলে রক্ষিত নয়। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার ভার আজ যেমন ইংরাজের হাতে রয়েছে, নূতন মতের আক্রমণ থেকে মনকে রক্ষা করার ভারও আজ তেমনি ইংরাজের হাতে রয়েছে। এস্থলে ইংরাজ মানে, বিলিতি মত। আর বলা বাহুল্য যে, সে মত আমাদের হাতগড়া নয় বলে, আমাদের মনের উপর তা আলগা হয়ে বসে আছে;—যেমন দেশের উপর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আলগা হয়ে বসে রয়েছে! সুতরাং ইউরোপ থেকে আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত মতের প্রতি আমাদের "মম-তা" নেই, তা ছাড়্‌তে আমরা সবাই সদাই প্রস্তুত। এই জন্যেই আমাদের critical বুদ্ধি আদপেই নেই। Conservatismই হচ্ছে criticismএর জন্মদাতা। পুরাতনকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য নতুনকে যাচাই করার নামই criticism। অবশ্য নূতনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যও পুরাতনকেও মানুষে যাচাই করে—কিন্তু এ দুই হচ্ছে একই অস্ত্রের উল্টো প্রয়োগ। শেষটা কারও কারও হাতে ও অস্ত্র—"শঙ্খ বণিক করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে"—তাই হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ আমার হাতে criticism কতকটা ঐ রকম একটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে। এ criticismএর কাজ কোনও বিশেষ মতকে রক্ষা করা কিম্বা নষ্ট করা

নয় ;—মতের ভিড়ের মধ্যে মনকে রক্ষা করা। এখন ইউরোপের উপর একটু নজর দেওয়া যাক্। ফরাসীরা যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার মূলমন্ত্র যে reason, এ কে অস্বীকার করবে, যখন উক্ত বিপ্লবের গুরু-পুরোহিতের দল নিজমুখে স্বীকার করেন যে তাঁরা age of reason আনতে চেয়েছিলেন? আমার বক্তব্য শুধু এই যে, ও reason মানে intellect নয়। ও যুগের তিনটি মহাবাক্য—Liberty Equality Fraternity—intellect থেকে বেরয়নি, কেননা বেরতে পারে না। অসংখ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে উক্ত তিনটি কথা অতিশয় নির্ব্বোধের কথা। একমাত্র বুদ্ধির হিসেব থেকে তিনটির একটির পক্ষে দুটি ভাল কথা বলা যায় না। ও তিনটিরই মূল হচ্ছে মানুষের হৃদয় ও তার ন্যায়বুদ্ধি। Voltaire এর অস্ত্র, logic নয় irony, তর্ক নয় বিদ্রূপ। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর moral senseএর অস্ত্র করে তুলেছিলেন। Voltaireএর বিদ্রূপের মারাত্মক শক্তির মূল হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বলন্ত রোষ। খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে "Crush the infamy" বলা কি বুদ্ধিমানের কথা? এ হচ্ছে Churchএর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ। জর্ম্মান পাণ্ডিত্যপূর্ণ হাজার বইয়ের চাইতে Voltaireএর "Candide" এর মূল্য যে আজও শতগুণে বেশী তার কারণ শুধু তার wit নয়, সেই witএর পিছনে যে ন্যায়বুদ্ধি আছে তাই। Voltaire এর মতে ভুল idea হচ্ছে সকল অত্যাচারের মূল।

Rousseau যে কতবড় fool তা Maine পর্য্যন্ত অনায়াসে প্রমাণ করে দিতে পারেন। "Social Contract" যে উপন্যাস এ কথা

কোন ঐতিহাসিক না জানে? "Social Contract" বুদ্ধির ঠাস বুনানি। কিন্তু ও বইয়ের সব axiom যে postulate—তার রুসো যে পাগল ছিলেন এ ত আমরা সবাই জানি। তবে কি গুণে এ পাগল দুনিয়া পাগল কর্‌লে? এক তাঁর অসাধারণ sensibilityর গুণে। রুসোর সকল মতের মূল হচ্ছে তাঁর হৃদয়।

সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে ফরাসী বিপ্লবের প্রাণশক্তি এসেছে ফরাসী জাতির হৃদয় ও ন্যায়বুদ্ধি থেকে। Heine মস্করা করে বলেছেন যে ফরাসী-বিপ্লব হচ্ছে একখানা মহাকাব্য। কিন্তু এ মস্করার ভিতর একটা মহাসত্য আছে। ইউরোপের যত কবির দল, Goete থেকে আরম্ভ করে Shelley পর্য্যন্ত ঐ ব্যাপারে মেতে উঠেছিলেন। আর যত intellectualএর দল, ফরাসী বিপ্লবের reason যে un-reason তাই প্রমাণ করতে কাগজের উপর কালির আঁচড় কাটতে বসে গেলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর Enlightenment এর গলদ যে কোথায় তা বুদ্ধিমানের দল দুদিনেই লজিকের সাহায্যে ধরে ফেলবেন। ফল কথা ফরাসি বিপ্লবের ভিতরকার কথা, intellectualও নয় anti-intellectual ও নয়, non-intellectual।

ও যুগের ফরাসী মনীষীরা humanityতে বিশ্বাস করতেন অর্থাৎ তাঁদের ধারণা ছিল মানুষমাত্রেই এক ছাঁচে ঢালা। তারপর, ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যখন re-action এলো, তখন বুদ্ধির দিক থেকে, ফরাসী মনের ঐ universalityর উপরই প্রধান আক্রমণ হল। তখন বলা হল যে মানুষ বলে কোনও পদার্থ নেই, আছে জর্ম্মাণ, ইংরেজ, দিনেমার, ওলন্দাজ ইত্যাদি। সুতরাং বস্তুগত্যা যা আছে তা হচ্ছে concrete, Universal একটা abstraction মাত্র। আর হৃদয়ের

দিক থেকে এই বলা হল idea চরিত্র গড়ে না। Voltaireএর ও বিশ্বাস বিলকুল ভুল, আসলে চরিত্র idea গড়ে। সুতরাং ideaরও কোন শক্তি নেই কোনও Universality নেই। এই দুই মত থেকে জন্ম লাভ করলে Romantic Movement; অতএব এ movement একদম concreteকে আঁকড়ে ধরলে। রোমাণ্টিক কবিতা পড়ো, দেখ্‌তে পাবে Feudalism ও খৃষ্টধর্ম্মের গুণকীর্ত্তিনে তা পূর্ণ, অর্থাৎ ঐ জাতীয় কাব্যের প্রাণ হয়ে উঠেছিল history. তারপর তা ইতিহাস থেকে পিছু হটে পুরাণ, ও পুরাণ থেকে পিছু হটে রূপকথায় গিয়ে পৌঁছল। ইতিহাস nationalistic হল, ইকনমিকস ঐতিহাসিক হল, আর্ট জাতীয় হল, দর্শন প্রথম হৃদয়ের ভিতর ঢুকে গেল, সেখানে বেশীদিন না থাকতে পেরে তারপর willএর উপর ভর করলে, তারপর unconscious অর্থাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তারপর রোমাণ্টিসিজিমের মৃত্যু হল। রোমাণ্টিসিজিমের ভুল এই যে concreteএর পূজা করতে করতে সে Universalকে ভুলে মেরে দিলে। আর emotionকে মুখের কথায় বাড়াতে বাড়াতে তা sentimentalismএর সৃষ্টি করল।

তারপর এই রোমাণ্টিসিজিমের প্রতিবাদ স্বরূপে Realism এর জন্ম হল। এ জিনিষ হল একদম বৈজ্ঞানিক। এর মূলসূত্র হল এই যে, বুদ্ধি, ন্যায়বুদ্ধি, হৃদয় এর কোনটিই মানুষের চরিত্রের ও কর্ম্মের নিয়ন্তা নয়, natureই তাকে চালায়, সে nature কতকটা বাহ্য-প্রকৃতি, কতকটা তদনুরূপ মানুষের অন্ত প্রকৃতি। মানুষের মূল প্রকৃতি খুঁজতে খুঁজতে এরা instinct বার করে ফেলেছে—অর্থাৎ এমন একটা ভিতরকার ঠেলা, যা হৃদয় মনের অধীন নয়।

Conscious মন হচ্ছে উপকার মন—তার ভিতর যা আছে সে হচ্ছে ego-instinct, sex-instinct ও group-instinct; আর মানব-জীবন হচ্ছে এই তিনের খেলা। এ সত্য অবশ্য মানুষের analytic-intellect এর কাছে ধরা পড়েছে। এই জন্যই আমি বলেছি যে anti-Intellectualism হচ্ছে Intellectualism এর শেষ কথা। এখন দেখা যাক এর ফল দাঁড়াল কি।

বলা বাহুল্য মানুষ কর্ম্ম-মার্গেরও পথিক আর জ্ঞান-মার্গেরও পথিক; মানুষ শুধু কাজ করে খুসি হয় না, সে সকল বিষয়ের তত্ত্বও জানতে চায়। New Psychology, Folk-Psychology যদি সত্য হয় ত তাতে মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে। Einstein এর আবিষ্কারকে কালই আমরা ফলিত-জ্যোতিষে পরিণত করতে পারব না, কিন্তু তাই বলে তাঁর যে কোনও মূল্য নেই তা নয়। সুতরাং New Psychologyর সাহায্যে Psycho-Analysis না করতে পারলেও, আর Folk-Psychologyর সাহায্যে Folk-lore বানাতে না পারলেও, ও দুয়ের Science অর্থাৎ জ্ঞান হিসেবে যথেষ্ট মূল্য আছে। যে হেতু মানসিক দূরবীনের সাহায্যে Folk-Psychology আর অনুবীক্ষণের সাহায্যে New Psychology আবিষ্কৃত হয়েছে; সেইজন্য ওর একটার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের মনের ভিতর যা অতি ক্ষুদ্র বা অতি সূক্ষ্ম তাকেই মানব-মনের ভিত্তি করা, আর অপরটির বহুমানবের মধ্যে যা অতি স্থূল তাকেই উক্ত মনের ভিত্তি করা। বলা বাহুল্য এ দুই বিজ্ঞানই মানুষের personalityকে উড়িয়ে দেয়।

তারপর ঐ জ্ঞানের হিসেব থেকে দেখলে দেখা যায় যে জর্ম্মান

Romanticism আর ফরাসি Humanitarianism হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের thesis ও anti-thesis; কাজেই এ যুগে, দুইয়ে মিলে synthesis হয়েছে। আজকের দর্শনের শেষ কথা এই যে, Concreteএর মধ্যেই Universal থাকে। Concrete থেকে ছাড়িয়ে নিলে, universal যেমন একটা abstraction মাত্র হয়ে পড়ে, Universal থেকে ছাড়িয়ে নিলে Concreteও তেমনি একটা abstraction মাত্র হয়ে পড়ে, কেননা Concreteও থাকে Universalএর মধ্যে। সুতরাং Intellectualismও যেমন ভুল anti-Intellectualismও তদ্রূপ; তবে ও দুয়ের মধ্যেই আধখানা করে সত্য আছে। ফরাসীরা দিয়েছিল Humanityর উপর ঝোঁক, আর জর্ম্মানরা দিয়েছিল Nationalityর উপর ঝোঁক। একের ফলে ঘটেছিল French Revolution আর অপরের ফলে হয়েছে German War। ফরাসী বিপ্লবের ফলে শুধু ফরাসী জাত নয়, বিশ্বমানব নবজীবন লাভ করেছিল, আর জর্ম্মান যুদ্ধের ফলে শুধু জর্ম্মান জাত নয় বিশ্বমানব মৃত্যুমুখে পড়েছে। অতএব আমার বিশ্বাস, মানুষ আবার Humanitarianism-এর উপর ঝোঁক দেবে, শুধু বাঁচবার জন্য। Anti-Intellectualism জর্ম্মান রোমান্টিসিজমের গোঁড়ার ছেলে, সুতরাং এ যুগে তার প্রতিপত্তি আর বেশী দিন থাকবে না। কারণ মানুষ এখন সমগ্র মানব সমাজের একটা Spiritual synthesis চায়। এবং তার জন্য চাই Reason, যে হেতু ও জিনিস হচ্ছে, হৃদয়, মন ও আত্মার বুদ্ধির synthesis। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ষা

—:*:—

এমন দিনে কি লিখ্‌তে মন যায় ?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়্‌ছে, সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায় অথচ এত স্থূলও নয় যে তা' চোখ জুড়ে থাকে, আর কানে আস্‌ছে তার একটানা আওয়াজ—সে আওয়াজ কখনো মনে হয়, নদীর কুলুধ্বনি কখনো মনে হয় তা' পাতার মর্ম্মর ;— আসলে তা' একসঙ্গে ও দুই-ই ; কেন না আজকের দিনে জলের সুর ও বাতাসের স্বর, দুই মিলে মিশে এক সুর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয়, তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কি যে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয়, তা' বাঙ্গালী মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোন পাখীর পালক দিয়ে, বর্ষা তাকে আগা-গোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তারপর চেয়ে দেখি গাছপালা, মাঠঘাট সবারই ভিতর দিয়ে একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে

নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুল্‌ছে আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যে সব গাছের ডাল দেখা যায় না, সে সব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়্‌ছে, পরস্পর কোলাকুলি কর্‌ছে; কখনো বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে চুরে এমন আকার ধারণ কর্‌ছে যে দেখ্‌লে মনে হয়—বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান কর্‌ছে। আর এই খাম-খেয়ালি বাতাস নিজের খুসিমত একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতাপাতাকে নাচিয়ে দিয়ে, বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত, সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠ্‌বে, তারপর ব্যতিব্যস্ত হবে, তারপর মাথা নাড়্‌বে তারপর হাত পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে সিৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে, বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে, সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখ্‌ছি আর কান পেতে পেতে শুন্‌ছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোন ভাবনা চিন্তা নেই, আছে শুধু এমন একটা অনুভূতি, যার কোন স্পষ্ট রূপ নেই, কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় ত সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আমাদের বিষাদে মেশানো ঐ অনাবিল অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটখাট ভাব মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে উঠ্‌ছে, আবার মুহূর্ত্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুন্‌ গুন্‌ কর্‌ছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনো পুরোপুরি

কখনো আধখানা হ'য়ে আমার মনের ভিতর ঘুরে-বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যে সব কবিতা, যে সব গান আজ আমার মনে পড়্ছে সে সবই হয় সংস্কৃত, নয় বাঙলা, নয় হিন্দি।

"মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ—গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালী একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা' ভুল্‌তে পার্‌বে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও চরণ আপনা হ'তেই বাজ্‌তে থাক্‌বে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরোণো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশী অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত কর্‌বার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্দ্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্দ্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরোণো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আস্‌ছে—এমন দিনে তারে বলা যায়। এমন দিনে যা বলা যায় তা' হয়ত রবীন্দ্রনাথও আজ পর্য্যন্ত বলেন নি, সেক্সপিয়ারও বলেননি। বলেন যে নি, সে ভালই করেছেন। কবি যা' ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে, তা' হ'লে তাঁর কবিতার ভিতর কোনও mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়, পদ্য হ'তে পারে।

সে যাই হোক্, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেই সঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন, সেই সব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর একটি চ'লে যাচ্চে। ভাল কথা—এটা কখনো ভেবে

লেখেছেন যে, বাঙ্লার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন—ও ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর ; ওর ভীম মূর্ত্তি আর তার কান্ত মূর্ত্তি, দুই-ই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে ; দুই-ই তাঁর ভাষায় অমনি সাকার হয়ে উঠেছে ? নবাবী আমলের বাঙালী কবিরা এ ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেন নি। চণ্ডিদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে ? আমার ত তা' মনে হয় না। হয়ত বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হ'ত না, তাই তিনি ও ঋতুর বর্ণনা করেন নি। বাকী বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড় বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘ-বজ্র-বিদ্যুতের একটু আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে ; অর্থাৎ ও ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুসঙ্গিক ভাবে। অবশ্য এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই একশ'—

"রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে॥
পালঙ্কে শয়াম রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥" ইত্যাদি

সঙ্গীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য, আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যে সুর কথা আনাগোনা করছে, সে সব এতই বিচ্ছিন্ন, এতই এলোমেলো, যে সে সব যদি ভাষায় ধরে তারপর লেখায় পুরে দেওয়া যায়, তা

হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে তাদের গোলক ধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের law and orderকে আমরা যতই বিদ্রূপ করি, ভাবের law and orderকে না মান্য করে আমরা সাহিত্য ত মাথায় থাক্, সংবাদ পত্রও লিখ্‌তে পারি নে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন, যিনি বাঙ্‌লা দেশের ছেলে-ভুলান ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বদ্ধ গদ্য রচনা, মনের সুখে পড়তে পারেন, তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখ্‌তে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে, তার যা কিছু মূল্য আছে, তা আমার কাছেই আছে, অপর কারও কাছে নেই। বহুকাল-মৃত, বহুকাল-বিস্মৃত, কোনও শুক্‌নো ফুলের পাঁপ্‌ড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়, তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুষ্ক পুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জ্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুক্‌নো ফুল সঞ্চিত থাকে, যা অপরের কাছে বার করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল; বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না, আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি। ইতি

বীরবল।

আমাদের ভাষা-সঙ্কট *

—:*:—

দিন তিনেক আগে একখানা চিঠি পাই, তাতে পত্রলেখক আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে citizen শব্দের বাঙলা কি? তিনি একখানি হিন্দি বইয়ে নাকি দেখেছেন, যে "জানপদ" "নাগরিক" ও "পৌরজন" এই তিনটি শব্দই citizen এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ও তিনটীর মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য এই হচ্ছে তাঁর জিজ্ঞাস্য। আমি উত্তর দিয়েছি যে, যদি কোনটি হয় ত শেষটি।

প্রকৃতিবাদ অভিধানে দেখতে পাই যে, "জনপদের" অর্থ, দেশ, বসতিস্থান ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ কোষকার চাণক্যের এই বচনটি তুলে দিয়েছেন—"গ্রামং জনপদস্য অর্থে"। villager এবং citizen অবশ্য পর্য্যায়-শব্দ নয়।

'নাগরিক" শব্দের সঙ্গে বিলাস ও বৈদগ্ধ্যের যোগ অতি ঘনিষ্ট তাই নাগরিক অপভ্রষ্ট হয়ে বাঙলায় নাগর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব ও শব্দ পলিটিক্সে চলবে না, ও পতিতকে কংগ্রেসও উদ্ধার করতে পারবেন না, ওকে আর সহসা সাহিত্যের জাতে তোলা যাবে না।

বাকি রইল এক পৌরজন। "পৌরজন বলতে আমরা পাড়াগেঁয়েও বুঝিনে, ইয়ারও বুঝিনে। ও শব্দের সঙ্গে মূর্খতার কিম্বা

---

* শঙ্খ হইতে উদ্ধৃত।

দুইটার কোনও যোগাযোগ নেই। সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য ও-পদ লক্ষ্য করবার দরকার নেই। সে সাহিত্যে শুধু পৌরই চলে। কিন্তু পৌরের পিছনে, "জন" এই লেজুড় জুড়ে না দিলে আমাদের মন খুসি হয় না, কেন না, আমরা চাই citizen এর পুরো প্রতিধ্বনি।

উপোরোক্ত তিনটি শব্দের একটিও কিন্তু বাঙলা নয়, তিনটিই অটুট সংস্কৃত। সুতরাং citizenএর বাঙলা কি—এ প্রশ্নের উত্তর করা হল না।

তারপর citizenএর অনুবাদ সংস্কৃতেও করা যায় না। ও শব্দের জন্ম রোমে। আর পুরাকালে রোমক পত্তনে citizen বলতে যা বোঝাত, খুব সম্ভব পৌরজন বলতে অতীত ভারতবর্ষে তা বোঝাত না। প্রথমতঃ রোমের পুরবাসী মাত্রেই citizen ছিল না—পরে রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত সর্ব্বলোক রোমের citizen হয়ে উঠেছিল; তা তারা সে সাম্রাজ্যের যে ভূভাগে, যে গণ্ডগ্রামেই বাস করুক না কেন! এই থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, পৌরজন বলায় citizenএর প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হয় না।

citizenএর পরিচয়, পুরে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে পলিটিক্সে। যে ব্যক্তি কতকগুলি বিশেষ পলিটিকাল সত্বে সত্ববান সেই citizen, অপরে নয়। বর্ত্তমান ইউরোপের সকল ভাষাতেই citizen বলতে ব্যক্তি বিশেষের পলিটিকাল মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। কি বাঙলা, কি সংস্কৃত, কোন অভিধানে উক্ত শব্দের যে প্রতিশব্দ নেই, তার কারণ পলিটিক্স শব্দের প্রতিশব্দও আমাদের ভাষায় নেই।

বাঙলায় পলিটিক্স লেখবার বাধা ত ঐখানেই। পলিটিক্স লেখা মানে, বিলেতি পলিটিক্স অনুবাদ করা। আর উপযুক্ত কথার অভাবে আমরা হয় তা অনুবাদ করতে পারিনে, নয় তার ধাতু ধরে এমন সব নূতন সংস্কৃতশব্দ তৈরি করি, মনে মনে ইংরাজিতে পুনরনুবাদ না করে নিলে, যার অর্থ বোঝা যায় না। কখনো বা হাতের গোড়ায় যা মেলে, আমরা নির্ব্বিচারে সেই সংস্কৃত শব্দ টেনে নিই, তা তার আসল অর্থ যাই হোক না কেন। আমাদের সাহিত্যে, সংবাদ পত্রে যে সকল বিদেশী পলিটিকাল মনোভাব সংস্কৃত-ভাষার ছদ্মবেশ পরে বেড়াচ্ছে, সে পোষাকে তাদের বিলেতি চেহারা ঢাকা পড়ে না, শুধু যে বিকৃত হয়ে যায়, তা গোটাকতক উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট দেখানো যেতে পারে।

politicsএর বাঙলা করেছি আমরা রাজনীতি, বলা বাহুল্য যে, গ্রীক পলিটিক্সের অর্থ রাজার নীতি নয়। যে আথেন্সে ও কথার জন্ম সেখানে রাজা ছিল না, ছিল Republic, তাই আরিষ্টটলের politics আর প্লেটোর Republic একই বিষয়ের দুটি বিভিন্ন মীমাংসা, আসলে ওর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজ বেদের পূর্ব্ব মীমাংসা। আর প্রথমটি উত্তর মীমাংসা। তারপর "রাজনীতি" শব্দ আমার বিশ্বাস সংস্কৃত ভাষায় নেই, যদি কোথাও থাকে ত গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ও বস্তুর যথার্থ সংস্কৃত নাম হচ্ছে "নীতি"। আর নীতি ব'লতে Statecraft বোঝায়—পলিটিক্স বোঝায় না। "রাজনীতি" শব্দ আমরা নিজে বানিয়েছি বলেই যে তা অগ্রাহ্য তা অবশ্য নয়; ওর দোষ এই যে ও কথায় পলিটিক্সের অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। ঐ কথার প্রসাদে পলিটিকসের নাম শোনবামাত্র আমাদের চোখ

রাজার উপরে পড়ে এবং সেই খানেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় হাল পলিটিক্‌সে রাজার স্থান হয় এক কোণে, আর না হয়ত মোটেই নেই। Bolshevism পলিটিক্‌সের অন্তর্ভূত কিন্তু রাজনীতির নয়।

তারপর আমাদের পলিটিক্‌সের সব চাইতে বড় কথা Nation শব্দের আমরা বাঙলা করেছি জাতি। কিন্তু জাতি শব্দে Raceও বোঝায়, casteও বোঝায়, classও বোঝায়, creedও বুঝায়—অর্থাৎ শুধু বিভিন্ন নয়, উল্টো উল্টো অর্থও বোঝায়। এই ধরুণ না কেন, ইউরোপে Nation শব্দ যে মনোভাব প্রকাশ করে, Caste তার ঠিক উল্টো মনোভাব প্রকাশ করে। আর nation শব্দ যে ইউরোপীয় তার প্রমাণ, ওর ঠিক প্রতিশব্দ স্বভাষায় খুঁজে না পাওয়ায়, আমরা ওটিকে জাতিতে পরিণত করেছি। একদল ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতে, Nation-এর বসতি মানুষের মনে, বাইরে নয়, ও বস্তু subjective, objective নয়। যদি এ মত সত্য হয়, ও আমার বিশ্বাস তা পুরো সত্য, তাহলে বলা বাহুল্য যে nation—জাতি হতে পারে না। কেননা জাত অন্তত এদেশে এতটা স্পষ্ট objective যে, তার অস্তিত্ব নির্ভর করে স্পর্শের উপর। untouchability যে হিন্দু-সমাজের অ-জাতেরই ধর্ম্ম—তা কে না জানে। যে কথার পাঁচরকম বিভিন্ন অর্থ আছে, ও কোনও কোনও স্থলে পরস্পর বিরোধী অর্থ আছে—সে কথায় যে মনের ভিতর পাঁচমিশেলি মনোভাব নিয়ে আসে—আর তার ফলে—আমাদের সকল কথন সকল লিখন যে ঘোলাটে মেরে যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

আমাদের বিশ্বাস বিলেতি ভাব—সংস্কৃত ভাষায় পুরে দিলেই তা বাঙলা হয়। পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে, 'non-violent non-co-operation-এর কেউ কেউ বাঙলা করেছেন—"নিরুপদ্রব-সহযোগিতা-বর্জ্জন"। এরূপ অনুবাদ যে বাঙলা ভাষার উপর উপদ্রব, এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই। সমগ্র ইউরোপে একরকম আইন প্রচলিত আছে, যার নাম Private International Law। জনৈক বাঙালী অধ্যাপকের হাতে উক্ত বাক্য কি আকার ধারণ করে জানেন? "গুপ্ত আন্তর্জাতিক ব্যবহার শাস্ত্র"। উক্ত আকার যে কিম্ভূতকিমাকার তা বলাই বাহুল্য। তারপর এই ভাষান্তরিত বাক্যের দোষও অনেক। প্রথমত ও বাক্য কাণে সয় না, দ্বিতীয়ত ওর মানে হয় না, তৃতীয়ত ও বাক্য বাঙলাও নয়, সংস্কৃতও নয়; ওর গুণের ভিতর এই যে ওটি ইংরেজীর খুব গা-ঘেঁষা। "গুপ্ত আন্তর্জাতিক ব্যবহারশাস্ত্র" ও "নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন" এ দুইই একই তরজমার কলে তৈরি—আর দ্বিতীয়টি যে বাঙলা-ভাষার ভিতর খাপ খেলে না, তার প্রমাণ ঐ আধহাত লম্বা সমাসটি আপনা হতেই সঙ্কুচিত হয়ে "অসহযোগিতায়" দাঁড়াল। তারপর—ওর চাইতেও ছোট, ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দ, "নৈযুজ্য"ও, আমি নিজ কাণে লোককে ব্যবহার করতে শুনেছি। কিন্তু এ দুয়ের একটিও যে non-co-operation এর বাচক তা ভরসা করে বলা যায় না। বাঙলায় যদি ওর অনুরূপ কথা না পাওয়া যায় ত, আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজলে তা পাওয়া যেতে পারে।

সে যাই হোক অসহযোগ যে, অমনোযোগের অনুবাদ, কথাটার প্রতি একটু মনোযোগ করলেই তা ধরা পড়ে। co-operation,

non-co-operation বলতে addition, subtraction, বোঝায় না, সুতরাং যোগ-বিয়োগে ওর হিসেব মিলবে না। যোগ-বিয়োগ হয় শুধু সংখ্যার। কিন্তু operation হচ্ছে একটি ক্রিয়া। আমার মনে হয়, "সহযোগিতা" না বলে "সহকারিতা" বললে co-operation-এর ভাবার্থ অনেকটা পাওয়া যায়। ও অনুবাদ অনুসারে co operator হচ্ছেন "সহকারী", আর ওর আগে "আলেফ" কিম্বা "বে" যা লাগিয়ে দিন তাতেই non বোঝাবে। "সহযোগী ও "সহকারী" যে এক বস্তু কি এক ব্যক্তি নয়, তা সংবাদ পত্রের সম্পাদক মাত্রেই জানেন। তাঁরা "সহযোগী" বলেন এমন বস্তুকে অর্থাৎ এমন কাগজকে—যার সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই, আর সম্পাদকের সহকারী হচ্ছে তাঁর দক্ষিণ হস্ত। আমার অনুবাদ গ্রাহ্য করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে "সহকারী" ও "সরকারী" অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে, আর ও দুটিকে মেলালে একটি পদ্য হয়।

আমার অনুবাদ যদি কারও মনঃপূত না হয়, তাহলে তার চাইতে ভাল অনুবাদ বার করুন। ভুল অনুবাদের দোষ এই যে, তাতে মানুষের মনে ভুল ধারণা জন্মায়। পলিটিক্‌সের খেলা "জোড় কি বিজোড়ের" নয়, জোর কি বিজোরের খেলা।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বিলেতি পলিটিক্‌সের, ওরফে আমাদের শাসন-সংক্রান্ত সকল ইংরেজি-শব্দের বৃথা অনুবাদ করে, আমাদের সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। জিনিষ যদি স্পষ্ট হয় আর তার নাম যদি ছোট হয় ত, সে নাম নিজগুণে ও স্বরূপে বাঙলার ভিতর ঢুকে ও বসে যাবে—যেমন টেক্স আর পুলিশ বসে গিয়েছে। আর যে-সব শব্দ বাঙলার গায়ে সইবে না, সে সব শব্দের অনুবাদ না

করে তার অনুরূপ শব্দ বাংলা সংস্কৃত থেকে খুঁজে বার করতে হবে।

আমাদের এ যুগের পলিটিক্‌সে এমন একটি কথা এসেছে যে একাধারে স্বপ্রকাশ ও প্রাণবন্ত। "স্বরাজ" শব্দ যে সেই জাতের একটি কথা যা মানুষের ভিতরে বাইরে যুগান্তর আনে, তার একটি কারণ এই যে, ও শব্দ কোনও ইংরাজি কথার অনুবাদ নয়। Home Rule-এর অনুবাদ হয়ত আমরা করতুম "গৃহশাসন", আর Dominion Self-Goverument-এর কি যে করতুম তা আমি ভেবে পাই নে। বিপিন বাবুকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত তিনি বলতে পারেন। অপর পক্ষে "স্বরাজ" বলতে কি বোঝায় তা আমরা সবাই মনে মনে জানি। আর এও জানি যে স্বরাজের ইংরেজি অনুবাদ হয় না।

স্বরাজ ব্যক্তিগত কি জাতিগত, এ নিয়ে বাদানুবাদ শুনেছি। এ বাদানুবাদের মূল এই যে, ও শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যক্তির দখলেই ছিল। যতদূর জানি সংস্কৃতে স্বারাজ্য ও স্বরাট আছে—স্বরাজ নেই। স্বারাজ্য বলতে দেশেরই এক প্রকার রাজ্য বোঝায়। কিন্তু স্বরাট বিশেষণ আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ করে ভগবানকেই বিশিষ্ট করে। প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের এই প্রথম ছত্র—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।"

আমার মতে জাতির স্বরাজ্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বরাজ্যের কোনও বিরোধ নেই, মূলত ও দুই এক। ভগবান যখন সুধু অন্বয়ে নয়—ব্যতিরেকেও আমাদের সকলের ভিতর আছেন, তখন প্রতি ব্যক্তির স্বরাট হবার বাসনা বলেই তার ব্যক্তিগত স্বরাজ্য লাভ হয়,—আর তার অনুরূপ সাধনার ফলে জাতিও তার স্বারাজ্য অর্থাৎ ব্যক্তির

লাভ করে। আর এক কথা, ব্যক্তির উপরেই জাতি নির্ভর করে, সুতরাং ব্যক্তির স্বরাজ্য নষ্ট ক'রে জাতির স্বরাজ্য গড়ে তোলা যায় না। ব্যক্তি একদিকে যেমন জাতিতে লীন হয়ে যায় না; আর একদিকে ব্যক্তি তেমনি জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। বাইরে থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, ব্যক্তি জাতির ভিতরে আছে, আবার ভিতর থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, জাতি ব্যক্তির ভিতরে আছে। সংক্ষেপে মানুষের ব্যবহারিক আত্মা অম্বর ব্যতিরেকে সমাজ ও ব্যক্তি দুয়ের ভিতরই বর্ত্তমান। সুতরাং ইহলোকে সে মুক্তি মুক্তিই নয় যা, যুগপৎ ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তি নয়। "স্বরাজ" শব্দে, মানুষের উভয়মুখী মুক্তি বোঝায় বলেই ও শব্দের এত শক্তি। ও শব্দের এই মন্ত্রশক্তি হচ্ছে দৈবীশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টিকরী শক্তি। স্বারাজ্য ও স্বরাট এই দুয়ে মিলেই স্বরাজ হয়েছে—তাই তার এত অর্থগৌরব।

যাক্ এ বিষয়ে আর বেশী বকব না। কেননা দেখতে পাচ্ছি আমার বাঙলা ক্রমে জর্ম্মান হয়ে উঠছে। অতএব এ লেখা এখানেই শেষ করি। আমার আর বিশেষ কিছু বলবারও নেই। আমার গোড়ার কথা যা, আমার শেষ কথাও তাই। আমরা আর পাঁচরকম সঙ্কটের সঙ্গে ভাষা-সঙ্কটেও পড়েছি। আর তার থেকে উদ্ধার পাবার উপায় হচ্ছে, সঙ্কটে যে পড়েছি, এ বিষয়ে সজ্ঞান হওয়া। এ সত্য কি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভাষা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার না পেলে আমরা ভাব-সঙ্কট থেকেও উদ্ধার পাব না। আর মনই যদি আকন্ঠ-বন্ধে পড়ে থাকল ত মুক্তি পাবে কে? দেহ।

বীরবল।

১৮ই মে, ১৯২২।

আমাদের ভাষা-সঙ্কট *

(২)

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে আমার ভাষা সঙ্কর; অর্থাৎ আমার বাঙলার ভিতর থেকে ইংরেজী শব্দ স্ব-রূপে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এ অপবাদ সত্য। তবে বাঙলার ভিতর ইংরেজী ঢুকলে ভাষা যদি সঙ্কর হয়, তাহলে সুধু আমার নয়, দেশ-শুদ্ধ লোকের ভাষা সঙ্কর হয়ে গেছে।

বাঙলার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথপোকথনের দিকে কান দিলেই টের পাবেন যে, তাদের মৌখিক ভাষার বিশেষ্য বিশেষণ সব বেশীর ভাগ ইংরাজি, তার ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামই সুধু বাঙালা। তার পর জনগণের মুখেও যে কত ইংরাজি কথা "তদ্ভব" আকারে নিত্য চলছে তা সে শ্রেণীর বাঙালীর সঙ্গে কার্য্যগতিকে যাঁর নিত্য কথা-বার্ত্তা কইতে হয় তিনিই জানেন। রাজমিস্ত্রি ছুতোরমিস্ত্রিদের অধিকাংশ যন্ত্রপাতির নামের যে বিলেতে জন্ম তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—কেন না মিস্ত্রি কথাটাই বিলেতি। "বিলেতি" শব্দের অর্থ বিদেশী। আমি তাই ও শব্দটা "ইউরোপীয়" এই অর্থেই এ পত্রে ব্যবহার করছি, ইংরাজির প্রতিশব্দ হিসেবে নয়।

ইংরাজি কথা যেমন হালে আমাদের ভাষার ভিতর প্রবেশ করেছে, ইংরাজ রাজা হবার পূর্ব্বে অপর নানা জাতীয় বিলেতি

---

* বিজলী পত্রে উদ্ধৃত।

কথা, তেমনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ভাষার ভিতর অবলীলাক্রমে ঢুকে গেছে, আর বাঙলা ভাষার অঙ্গে সে সব এমনি বে-মালুম ভাবে বসে গিয়েছে যে, সে গুলি যে আসলে বিলেতি তাও আমারা ভুলে গিয়েছি। পশ্চিম ইউরোপেব ভাষাগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, প্রথম Romance language দ্বিতীয় Germanic। এখন দেখা যাক এ দুয়ের ভিতর কোন ভাষার কাছে আমাদের মুখের ভাষা বেশী ঋণী।

নবাবী আমলের কবি, ভারতচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই যে তাঁর কালে বাঙলায় এই সব বিলেতি জাতি বাস করত, যথা—(১) ফিরিঙ্গি (২) ফরাসি (৩) আলেমান (৪) ওলন্দাজ (৫) দিনেমার (৬) ইংরাজ। ফরাসি অবশ্য French, আলেমান German, ওলন্দাজ Dutch, দিনেমার Dane, আর ইংরাজ English, তাহলে ফিরিঙ্গি হচ্ছে নিশ্চয়ই পর্ত্তুগিজ; French ফিরিঙ্গি না হয়ে পর্ত্তুগিজ যে কেন তা'হল সে রহস্যের সন্ধান আমি জানিনে। শব্দের রূপান্তরের আইন কানুন আমি জানিনে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সব জাতেব চাক্ষুষ পবিচয় ছিল। তিনি বহুকাল ফরাসডাঙ্গায় বাস করেছিলেন আর পোর্ত্তুগিজদের আড্ডা ছিল হুগলি, ওলন্দাজদের চুঁচুড়া, দিনেমারদেব শ্রীরামপুর, সব শেষ ইংরেজদের কলিকাতা। মধ্য থেকে আলেমান কোত্থেকে এসে জুটল আর তাদের বসতিই বা ছিল কোথায়—তা আমার অবিদিত। ফরাসডাঙ্গায় যে জার্ম্মানরা ছিল না, সেটা নিশ্চিত; আর কলিকাতায় যে ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে সেকালে কোন জাতের সঙ্গে অপর কার যে entente cordiale ছিল সে কথা আমি বলতে

পারিনে; যেহেতু আমি ঐতিহাসিক নই। আমার বিশ্বাস আলেমানরা তখন আশমানে বাস করত, অর্থাৎ তারা সর্ব্বত্রই ছিল।

উল্লিখিত ছটি জাতের মধ্যে প্রথম দুটির ভাষা—Romance বাকী চারটির Germanic। এই Romance ভাষার দেদার কথা বাঙালীর অজ্ঞাতসারে বাঙলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বহুকাল পূর্ব্বে "সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায়" বাঙলার অঙ্গীভূত পোর্ত্তুগিজ শব্দাবলীর একটি ফর্দ্দ দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে যায়, কেননা সে ফর্দ্দ ছিল দশপাতা লম্বা। তারপর আমাদের ভাষায় ফরাসি শব্দও বড় কম নেই। তাস খেলার "জুয়ো" থেকে আরম্ভ করে প্রমারার "দুস" "ত্রেস" "তেরাস্তা" "কোরেস্তা" "মাছ" "কাতুর" পর্য্যন্ত প্রায় সকল কথাই ফরাসি। ঐ সূত্রে দেখতে পাই জার্ম্মানিক ভাষারও দুচার কথা আমাদেব ভাষায় ঢুকে গিয়েছে। শুনতে পাই "হরতন" "রুইতন" হচ্ছে খাস ওলন্দাজী। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নবাবের আমলে দু হাতে বিলেতি কথা আত্মসাৎ করে' বাঙলা-ভাষা তার দেহ পুষ্ট করেছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, বিদেশী শব্দকে স্বদেশী করা হচ্ছে আমাদের ভাষার চিরকেলে ধর্ম্ম।

মুসলমান যুগে কত ফারসি ও আরবি শব্দ যে বাঙালা হয়ে গেছে তা কি আর বলা প্রয়োজন? আমরা হচ্ছি কৃষীজীবী জাত অথচ "জমি" থেকে ফসল" পর্য্যন্ত কৃষি-সংক্রান্ত প্রায় সকল কথাই হয় ফারসি নয় আরবি। আর জমিদারীসংক্রান্ত, সকল কথাই ঐ আরবি ফারসির দান, ও ভাষার ভিতর সংস্কৃতের লেশ মাত্র নেই। আমাদের কর্ম্মজীবনের যা ভিত্তি অর্থাৎ দেশের মাটি তারও নাম জমি। বাঙলার মত মিশ্র ভাষা এক উর্দ্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর

দ্বিতীয় নেই। তারপর আমাদের কর্ম্ম জীবনের জা জুতা অর্থাৎ আইন আদালত, তার ভাষাও আগাগোড়া আরবি ফার্সি। আরজি থেকে রায় ফরসালা পর্য্যন্ত মামলার আত্মোপান্ত সকল কথাই বাঙলাভাষাকে মুসলমানের দান। ইংরাজরা আজকাল ডিক্রী দেন বটে কিন্তু তা "জারি" করতে হলেই ইংরাজি ছেড়ে ফার্সির শরণাপন্ন হতে হয়। এ কথা যে সত্য, তা যে কোনও মোক্তারী সেরেস্তার আমলা হলপ করে বলবে।

(৩)

পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে, যখন বাঙলাভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস, তখন এ যুগে যে তা অসংখ্য ইংরাজি শব্দ সুধু মুখস্থ নয় উদরস্থও করবে, সে ত ধরা কথা। এতে বাঙলা ত তার স্বধর্ম্মই পালন করে চলেছে। তবে আমাদের ভাষার, পরকে আপন করার স্বভাবের বিরুদ্ধে, আজ কেন আপত্তি উঠেছে? এর একটি কারণ, পূর্ব্বে বাঙলাভাষা বিদেশী শব্দ বেমালুম আত্মসাৎ করেছে; অপর পক্ষে আজ তার এই চুরি বিদ্যেটা এক ক্ষেত্রে সহজেই ধরা পড়ে। সেকালে বাঙলা মুসলমানদের কাছথেকে কর্ম্মের ভাষা নিয়েছিল, পোর্ত্তুগিজ ফরাসীদের কাছথেকে নিয়েছিল সুধু জিনিষের নাম, আর আজ আমরা ইংরাজি থেকে ও দুই জাতীয় কথা ত নিচ্ছিই, উপরন্তু তার জ্ঞানের ভাষাও আত্মসাৎ করছি। প্রথম দুইটির ব্যবহার হচ্ছে লৌকিক আর শেষটির সাহিত্যিক, লৌকিক কথার চুরিকে চুরি বলে ধরা যায় না, কেননা তার ভিতর অসংখ্য লোকের হাত আছে, ও হচ্ছে সমাজিক আত্মার কাজ, ওর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে না। অপর

পক্ষে সাহিত্যিকচৌর্য্য, ব্যক্তি-বিশেষের কাজ অতএব সেটা ধরাও যায় ও সে কথাচোরকে শাসন করাও যায়।

(৪)

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবেন যে উক্ত লৌকিক ও সাহিত্যিক চুরি, উভয় ব্যাপারেরই মূলে আছে একই গরজ।

মুসলমানরা আমাদের দেশে যে সব নতুন কছমের, আদালত কাছারি আইন কানুন এনেছে তাদের সঙ্গে তাদের বিদেশী নামও এসেছে। এবং সেই আইন আদালত যেমন সমাজের উপর চেপে বসেছে, তাদের নামও তেমনি ভাষার ভিতর ঢুকে বসেছে।

"ফিরিঙ্গিরা" যে সব নতুন জিনিষ এ দেশে নিয়ে এসেছে আর আমাদের ঘরে ঘরে যার স্থান হয়েছে তাদের নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। "তাস" হিন্দুরা খেলত না, তারা খেলত পাশা, মুসলমানরাও খেলত না, তারা খেলত হয় "সতরঞ্চ" নয় "গঞ্জিফা"। "ফিরিঙ্গিরা" যখন দেশে তাস আনলে তখন শুধু "বিন্তি" নয় "গ্রেমরা" খেলতেও আমরা শিখলুম, ফলে ফরাসি কথা "জুয়ো" বাঙলা হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে জুয়ো খেলিয়ে বাঙালীরা ফরাসীতে যাকে বলে "জুয়ারি" তাই হয়ে উঠল।

এ যুগে ইংরাজেরা আমাদের অনেক জিনিষ দিয়েছে, যা আমাদের ভাষায় নামে ও আমাদের ঘরে স্বরূপে আছে ও থেকেও যাবে। একটা সর্ব্বলোকবিদিত উদাহরণ দেওয়া যাক। বোতল গেলাস বাঙলা ভাষা থেকে কখনো বেরিয়ে যাবে না, কেননা ও দুই চিজও বাঙলা দেশ থেকেও কখনো বেরিয়ে যাবে না। বাঙলা যদি একদম

বেসুরো হয়ে যায়, তাহলেও বাঙালীরা ওষুধ খাবে, আর মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য তেল মাখবে। অতএব আমাদের কাঁচের পাত্র চাই।

তারপর ইংরাজ প্রবর্ত্তিত নূতন কর্ম্মজীবনও "তৎসম" অবস্থায় না হোক "তদ্ভব" অবস্থায় থেকে যাবে। আর সে কারণ বাঙলা ভাষায় সে জীবনের বিলেতি নাম সব, "তৎসম" রূপে না হোক "তদ্ভব" রূপে বজায় থাক্‌বে।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ইংরাজি জ্ঞানের ভাষাও কতক পরিমাণে বাঙলা ভাষার অন্তরঙ্গ হয়ে থাক্‌বে। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে অনেক নূতন জ্ঞান, অনেক নূতন ভাব আমাদের মনের ভিতর ঢুকে গিয়েছে তাই তাদের বিলেতি নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। যেহেতু দেশের জনগণ ইংরাজি শিক্ষিত নয়, সে কারণ ঐ সব ইংরাজি কথা স্বল্পসংখ্যক লোকের মুখেই শোনা যায়; আর তাদের বিদেশীধ্বনি আমাদের কানে সহজেই ধরা পড়ে। আর সেই কারণেই বাঙলা ভাষা থেকে অনেকে চান "আইডিয়াকে" গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে।

বাঙালীর মুখ থেকে বিলেতি কথা কেউ খসাতে পারবেন না, অতএব সে চেষ্টা কেউ করেনও না। আমরা চাই শুধু লিখিত ভাষায় বিদেশী শব্দ বয়কট কর্‌তে। কিন্তু আমাদের এই সাত শ বছরের বর্ণসঙ্কর ভাষাকে যদি আবার আর্য্য করতে হয়, তাহলে ভাষার আর্য্য-সমাজীদের আগে সে ভাষাকে শুদ্ধ কর্‌তে হবে, তার পরে তার পৈতে দিতে হবে।

এ চেষ্টা বাঙলায় ইতিপূর্ব্বে একবার মহা বাক্যাড়ম্বরের সঙ্গে হয়ে গেছে। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে গদ্য রচনা করে গিয়েছেন তাতে ফার্সি আরবীর স্পর্শ মাত্র নেই। তাঁদের ঐ

তিরস্করণী বুদ্ধির প্রতাপে বাঙলাভাষা থেকে শুধু যে আরবী ফার্সি বেরিয়ে গেল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য "তদ্ভব" কথাও সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত হল। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যে কারও "বিয়ে" করবার সাধ্য ছিল না, সকলেই বিবাহ করতে বাধ্য হত। আর বিবাহ করেও কারও নিস্তার ছিল না, কেননা ও সাহিত্যে স্ত্রীকে কেউ "ভালবাসতে" পারত না সকলকে তার সঙ্গে "প্রণয় করতে" হত। শুধু অসংখ্য কথা যে বেরিয়ে গেল তাই নয়, ভাষার কলকব্জাও সব বদলে গেল। "দ্বারা", "সহিত, কর্ত্তৃক", "পরন্তু", "অপিচ", "যদ্যপিস্যাৎ" প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত উক্ত সাধু ভাষায় পদ আর বাক্য হতে পারত না। ফলে বাঙালীর মুখে যা ছিল active বাঙালীর লেখায় তা passive হয়ে পড়ল। বাঙলা ভাষার উপর এই আর্য্য অত্যাচার বাঙালী যে বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ স্বরূপ ষাট বৎসর আগে বাঙালীর ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা আজও আমাদের সাহিত্য গগনে জ্বলজ্বল করছে। "আলালের ঘরের দুলাল" আর "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" যে বাঙলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

পণ্ডিত মহাশয়েরা যখন বাঙলা ভাষার যবন দোষ ঘোচাতে পারেন নি তখন আমারাও তা পারব না,—কেননা আমাদের আধুনিক সাহিত্যের, সংস্কৃত বেশধারী বহু শব্দকে আঁচড়াইলেই তার ভিতর থেকে সাহেল বিলেতি ভাব বেরিয়ে পড়ে। "আইডিয়া" বাদ দিয়ে বাঙলা আজ আমরা কেউ লিখতে পারিনে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, কোনও নতুন বিদেশী কথাকে বয়কট করা কিম্বা পুরোণো বিদেশী শব্দকে বাঙলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করবার চেষ্টা

করা, শুধু বৃথা সময় নষ্ট করা। আমাদের ভাষায় অনেক নতুন কথা আপনা হতেই ঢুকবে আর অনেক পুরোণো কথা আপনা হতেই বেরিয়ে যাবে, আর তা হবে তাদের জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে।

এ পত্রের যবনিকা পতনের পূর্ব্বে আর একটি কথা বলব। এ সত্যটা এখন ধরা পড়েছে যে, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর ভাষা নয়। বংশে বাঙালী হচ্ছে মঙ্গল-দ্রাবিড়, আর তার ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতের প্রপৌত্রী, "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি" বাঙলার আদিম অধিবাসীরা "ভথা" স্বভাষা ত্যাগ করে মাগধী প্রাকৃত গ্রহণ করেছিল। সেই দিন থেকে এ দেশের লোকের মনেরও পুনর্জন্ম হযেছে কেননা মন আর ভাষা একই জিনিষ। আমরা যদি এখন বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষায় ফিরে যেতে চাই তাহলে আমাদের ফিরতে হবে আদি-দ্রাবিড়+আদি মঙ্গল ভাষায়; কিন্তু সে ভাষাও হবে সঙ্কর।

বাঙালী যে দেহে সঙ্কর, মনে সঙ্কর, ভাষায় সঙ্কর—এর জন্য দোষী আমরা নই, কেননা বাঙালী জাতি আমাদের সৃষ্টি করেছে, আমরা বাঙালী জাতিকে সৃষ্টি করিনি।

এই জাতিভেদের দেশে বাস করে, শুধু দেহে নয় মনেও ছুঁতমার্গী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক—তবে এই মিশ্রণের জন্য দুঃখ করা বৃথা; কেননা ওপাপ নিজের দেহ মন থেকে দূর করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায়, বাইরের জিনিষকে আত্মসাৎ করা যে প্রাণের লক্ষণ, নব-আয়ুর্ব্বেদের এই মতকে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই ভাল।

২৪শে জুন, ১৯২২। বীরবল।

৺সত্যেন্দ্রনাথ *

—:*:—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" এ উপদেশের আধখানা অধিকাংশ লোক কিছুতেই গ্রহণ করবে না। আর বাকী আধখানা দেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বিদ্যাচর্চ্চা মানুষে স্বেচ্ছায় করে না, অতএব সে চর্চ্চা যত শিগ্‌গীর পারে তত শিগ্‌গীর মানুষে ত্যাগ করতে উৎসুক। অপর পক্ষে অর্থচিন্তা মানুষে শ্মশান পর্য্যন্ত করে—আর তা নিজেকে অমর জ্ঞানই করে।

(২)

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের জীবনের একদিন শেষ হবে, কিন্তু সে দিনটে আমরা মনে মনে সকলেই নিত্যই পিছিয়ে দেই। এ ব্যাপারে আমাদের মনগড়া মুলতবির আর অন্ত নেই। আসল কথা মৃত্যু জিনিসটিকে আমরা ভুলে থাকতে চাই। মানুষ যাকে কাজ বলে তা হচ্চে মৃত্যুকে ভোলাবার উপায় না হলেও, ভোলবার একটা উপায়। মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায় বলেই, অর্থোপার্জ্জন হচ্ছে অধিকাংশ লোকের মতে পৃথিবীতে একমাত্র কর্ম্ম—অপর সকল কর্ম্ম যথা বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি; ঐ মূল কর্ম্মের যোগাড়ি কর্ম্ম মাত্র।

---

* বিজলী হইতে উদ্ধৃত।

(৩)

নিজের মৃত্যুর তারিখ পিছিয়ে দেবার প্রবৃত্তিবশতঃ আর কতকটা মানব-জীবনের অভিজ্ঞতাবশতঃ মানুষে, মানুষের পরমায়ু বলে একটা কাল্পনিক জিনিসের সৃষ্টি করেছে, আর মৃত্যুরও একটা স্বাভাবিক নিয়মের অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। তাই অকাল মৃত্যু ও অপমৃত্যু মানুষের মনকে বিশেষ করে বিচলিত করে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অবধি তাঁর কথা আমার দিবারাত্র মনে পড়ছে। আমাদের মত স্বল্পায়ু জাতির হিসেবেও তাঁর মৃত্যু যে অকাল-মৃত্যু সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

(৪)

আয়ুর অঙ্কের হিসেব ছেড়ে দিলেও, প্রাণের অর্থের হিসেব থেকেও এ মৃত্যু সত্য সত্যই অকালমৃত্যু। বাঙলার নব কবিদের মধ্যে তাঁর আসন যে সর্ব্বোপরি ছিল, এত সর্ব্বজনবিদিত সত্য। এ আশা আমাদের সকলের মনে ছিল যে, তাঁর প্রতিভা ক্রমে পরিপক্বতা লাভ করবে এবং তিনি বঙ্গসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবেন। কালক্রমে তাঁর কবিত্ব-শক্তির কোনরূপ হ্রাস হয়নি এবং তিনি আমরণ যে অজরামরবৎ বিদ্যাচর্চ্চা করবেন এ বিষয়েও তাঁর বন্ধুবর্গ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে বঙ্গ-সরস্বতীর বীণার এমন একটি পাকা তার হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছে, যা আমার বিশ্বাস অপর কেউ সহসা চড়াতে পারবেন না। বাঙলা ভাষা যাঁর স্পর্শে স্বতঃই এমন বিচিত্র ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠত যে, তাঁর অভাব অপর কেউ

সহজে পূরণ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় সত্যেন্দ্রনাথ যে কালই জন্মগ্রহণ করবেন এরূপ আশা করা বৃথা।

(৫)

আজকের দিন, তাঁর কবিতার আলোচনা করবার ঠিক দিন নয়। যাঁরা তাঁকে জানতেন, তাঁদের চোখের সুমুখে আজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ ততটা নেই, যতটা রয়েছেন মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর মত মিতভাষী লোক আমাদের এই বাচাল জাতের মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়। আমি নিজে তাঁকে কখনো তর্কে যোগ দিতে দেখিনি, যদিচ তাঁর সুমুখে কখনো কখনো আমরা মহা উত্তেজিত ভাবে ঘোর তর্ক করেছি। কিন্তু তাঁর মুখাকৃতি ও তাঁর সংযত ব্যবহারের ভিতর থেকে, তাঁর চরিত্রের সরলতা ও উদারতা স্বতঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ত। তিনি বাঙলা সাহিত্যের একজন অদ্বিতীয় গুণী ছিলেন অথচ তাঁর কথায় তাঁর ব্যবহারে আমি অহঙ্কারের লেশমাত্রও কখনো লক্ষ্য করি নি। তাঁর এই নিরহঙ্কার চরিত্র আমাকে চিরদিনই মুগ্ধ করেছে।

(৬)

তাঁর এই সহজ বিনয়ের স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যেত যে, তাঁর প্রকৃতিতে আর যে জিনিষেরই অভাব থাক্, শক্তি ও দৃঢ়তার অভাব ছিল না। আমার বিশ্বাস যে তাঁর ছন্দের মত তাঁর চরিত্রেও দুর্ব্বলতার কোনও স্থান ছিল না। যার ভিতর কাঠিন্য গুণ নেই তা কখনো পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে না, তা সে জড়পদার্থই হোক্, ভাষাই হোক্, ভাবই হোক। কাঠিন্য যে একটা

গুণ, বিশেষত মনের, একথা হয়ত অনেকের কানে অদ্ভুত ঠেক্‌বে। আমরা ভালবাসি মনের নরম ভাবকে, আর ভয় করি গরম ভাবকে। কিন্তু যা নরমও নয়, গরমও নয়,— কিন্তু কেবলমাত্র কঠিন, তার আদর আমরা করিনে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ—আমার কথার মর্ম্ম বুঝতেন, কেননা তিনি নিজেই বলেছেন যে—

"কঠিনা! কে বলে তোরে হেয়?
নির্ভর—কঠিন হওয়া শ্রেয়।"

(৭)

আমরা এ যুগে, মানসিক ও সামাজিক এত প্রকার অসত্য ও অন্যায়ের ভিতর বাস করি, এত প্রকার মিথ্যাচার ও অত্যাচারের দ্বারা আমাদের হৃদয় মন বিড়ম্বিত হয়,—যে, যে-বাণীর ভিতর বিদ্রোহের সুর নেই—সে বাণী অলোকসামান্য হলে আমাদের মনকে হয় ত চমৎকৃত করতে পারে, কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য পদ্যের ভিতর থেকে, যা অসত্য, যা অশিব, যা অসুন্দর, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি তীব্র সুর ফুটে উঠত। তিনি সুধু কবি ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন আমাদের যুগ-ধর্ম্মের একজন শক্তিমান সৈনিক। তাঁর হাতে বাঙলা ভাষা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি ভাস্বর আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে উঠত। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে, সুধু বাঙলার সরস্বতীর বীণার যে একটি প্ল্যাটিনামের তার ছিঁড়ে গিয়েছে তাই নয়, বাঙলার দশভুজার হাতেরও একটি দিব্যাস্ত্র খসে গিয়েছে।

(৮)

কবি তাঁর প্রথম যৌবনে সমীরণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

হে সমীর! তোল তবে উৎসাহের তান,
বিশ্ব যেন রহে সচেতন।
আমিও তোমার সনে গাব সমস্বরে,
যতদিন না আসে মরণ।
আমি গেলে—দেখ' দেখ'
এ গান জাগায়ে রেখ'—
মিলনের সঙ্গীত মহান!
নবোৎসাহ সঞ্চারিয়া—দিয়ো নব প্রাণ।

কবি তাঁর কথা রেখেছেন। "যতদিন না আসে মরণ" তিনি সমীরণের সঙ্গে সমস্বরে অবিরাম গান গেয়ে গিয়েছেন,—আশা করি, বায়ুদেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। তাঁর কবিতায় বায়ুর অর্থ অবশ্য প্রাণ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বুল-ভ্য-সুইফ বা চর্ব্বির গোলা *

(Manpassant-র ফরাসী হইতে)

আজ কয়েকদিন ধরে পরাজিত সৈন্তেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সহরের ভিতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। লড়াকে-সেপাহীর মত চেহারা তাদের আর কিছুমাত্র ছিল না—ছিন্ন ভিন্ন হয়ে এক একটা দল বেঁধে তারা চলছিল। লম্বা বেজায় নোঙ্‌রা দাড়ি আর ছেঁড়া-পোষাক, এই নিয়ে গা-ছেড়ে দিয়ে তারা এগোচ্ছিল, সঙ্গে না ছিল নিশান, না ছিল তাদের পল্টনী কায়দা। সকলেরি অতি ক্লান্ত, বিমর্ষ ভাব দেখে মনে হয় তারা চিন্তা বা কাজ করবার শক্তি একদম হারিয়েছে; হাঁটছে শুধু অভ্যাসের বশে, কোথাও থামলেই ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ছে। আরও চোখে পড়ছে হরেক রকমের লোক যারা সবে নূতন যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল অনেক শান্ত শিষ্ট, নিরীহ, আধাবয়সী লোক, যারা বন্দুকের ভারে নুইয়ে পড়ছে; আর চট্‌পটে ছোকরা সৈনিক যারা সহজেই যেমন রোখে তেমনি ভয় খায়,

---

* এটি মোপার্সার প্রথম গল্প এবং এই গল্প লিখেই তিনি জগৎবিখ্যাত লেখক হয়ে ওঠেন। যখন এ গল্প লেখা হয়, তখন ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধের জের মেটে নি। অর্থাৎ তখন ফরাসীরা যুদ্ধে হেরেছে আর জর্মাণরা অর্দ্ধেক ফ্রান্স দখল করে বসেছে। এই গল্পের বইটি দেশের ঐ দুরবস্থার দিনেও এক মাসে নাকি তিন লক্ষ কপি ফ্রান্সে বিক্রী হয়।

আক্রমণ করতে ও পালাতে যারা সমান পটু; লাল কোর্ত্তা পরা দু' একজন সেপাহী, বড় বড় লড়াইয়ে ঘা খেয়ে যাদের দলের মধ্যে সামান্য সংখ্যাই বেঁচে আছে; গম্ভীর মুখ গোলন্দাজ সেপাহী পদাতিকদের সাথে দণ্ডায়মান, আর ক্বচিৎ এক আধটি জমকালো পোষাক পরা অশ্বারোহী সেপাহী, যারা সাজ সজ্জার ভার বয়ে অতি কষ্টে পদাতিক সৈন্যের সাথে চলছে।

এদের পর ফিরে এল কয়েক দল ভলাণ্টিয়ার সৈন্য, চোরের মত চেহারা করে। কিন্তু তাদের নামগুলো ছিল খুবই গাল-ভরা— "পরাজয়ের প্রতিহিংসক", "মৃত্যুদেশের মানুষ", "মরণের সহযাত্রী" ইত্যাদি।

এই সব দলের কাপ্তেন হচ্ছেন রাজ্যের যত বুড়ো হাবড়া কাপড়ের ও গোলদারী ব্যবসায়ী, চর্ব্বি ও সাবানের ভূতপূর্ব্ব দোকানী। সেপাহী হয়েছেন তাঁরা দায়ে পড়ে, আর কাপ্তেন হয়েছেন পয়সার জোরে বা গোঁফের বহরের জোরে। হাতিয়ার-পাতি, ফ্লানেল ও লেসে সজ্জিত হয়ে, জোর গলায় তারা কথা কইছিলেন, যুদ্ধের যুক্তি পরামর্শ করছিলেন,—এই ভাবে যেন যুদ্ধক্লিষ্ট ফ্রান্সকে তাঁদের কাঁধে চাপিয়ে, শুধু গলাবাজির জোরেই তাঁরা বাঁচিয়ে রাখছেন। কিন্তু মনে মনে তাঁরা আপনাদের অধীন সৈন্যদের বিশেষ ভয় করে চলতেন, কারণ তারা সব ছিল কারামুক্ত কয়েদী, দুঃসাহসিক-চোর ও বদমাইস।

তারা সবাই বলাবলি করছিল, প্রুসীয়ানরা রুয়াঁ প্রবেশ করল বলে।

বাকী ছিল ন্যাশনাল গার্ডের সৈন্যরা। তারা মাস দুই ধরে আপ

পাশের বন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে খবরদারী করছিল,—কখন বা নিজ প্রহরীদের উপর গুলি চালিয়ে, কখন বা ঝোপের আড়ালে একটা খরগোসের বাচ্চা নড়লেই বন্দুক উঁচিয়ে যুদ্ধং দেহি বলে বুকটান করে খাড়া হয়ে। কিন্তু তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। তাদের যন্ত্রপাতি, পোষাক-আষাক, মানুষ ত ভাল, রাস্তার থামগুলোর পর্য্যন্ত ত্রাস জন্মিয়ে দিত। তারাও হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে।

অবশিষ্ট ফরাসী সৈন্যেরা সেন নদী পার হয়ে চলে এল, "সাঁৎ-সেভে" ও "বুর্গ আসাদ" দিয়ে "পঁৎ ওদেমে" যাবার জন্য। সকলের শেষে এলেন ভগ্ন হৃদয় সেনাপতি, দু'জন গোলন্দাজ অফিসারের সাথে, পায়ে হেঁটে। আপনার ছত্রভঙ্গ, দড়িছেঁড়া সৈন্যের উপরে তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না; তিনি নিজেও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন,—চিরকাল যুদ্ধজয়ী একটা জাতের অতুল সাহস সত্ত্বেও এই সাংঘাতিক পরাজয় ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে।

তারপর বিরাট নিস্তব্ধতা; ভয়ঙ্কর কি একটার প্রতীক্ষায় সব চুপ, সহরটা ছমছম করছে। হাঁদাপেটা যত দোকানীরা, ব্যবসাতে শুধু টাকা করতে গিয়ে যাঁরা সাহসটুকুও হারিয়েছেন—তাঁরা যে কোন মুহূর্তে বিজেতারা এসে পড়ে তাই ভাবছেন, আর তাঁদের মনে বিশাল ভয় যে রান্নাবান্নার ছুরি বঁটিগুলোকে শেষটা জর্ম্মাণরা অস্ত্রের মধ্যে না ধরে।

প্রতিদিনকার চলাফেরা বন্ধ, দোকান পাট বন্ধ, রাস্তা ঘাট কোলাহল শূন্য;—কদাচিৎ এক আধটি লোক চারদিকের এই নিস্তব্ধতায় ভয় খেয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে সরে পড়েছে।

অবশেষে এই অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠল, এর চেয়ে শত্রুর উপস্থিতি ও ভাল বলে মনে হল।

ফরাসী সৈন্য চলে যাবার পরদিন বিকেলে কোথা থেকে একদল uhlan দ্রুতগতিতে সহরের উপর দিয়ে চলে গেল। এর কিছু পরেই "সঁ্যাৎ কাথেরিনের" দিক থেকে এক দল সৈন্য শ্রাবণের আকাশ ভাঙ্গা কালো মেঘের মত নেমে এল এবং "দারনেটন" ও "বোয়াস যুই লোঁ"-এর পথ ধরে আরও দুই বিজয়ী বাহিনী এসে উপস্থিত হল। এই তিন দলের অগ্রবর্ত্তী প্রহরী সৈন্য একই সময়ে "হোটেল-দ্য-ভিলের" সুমুখে এসে জড় হল। তারপর চারদিককার সবগুলো পথ দিয়ে তালে তালে পণ্টনী পা ফেলার শব্দে রাস্তার পাথর মুখরিত করে, বিজয়ী জার্ম্মান সৈন্য অবিরাম চলে যেতে লাগল।

অজ্ঞাত, দাঁতভাঙ্গা এক ভাষায় উচ্চারিত, অফিসারদের সব আদেশ পথের ধারের সব বাড়ীগুলোর উপর থেকে শোনা গেল। বাইরে থেকে বাড়ীগুলো দেখতে পরিত্যক্ত, মৃত,—কিন্তু বন্ধ করা জানলার আড়াল থেকে জোড়া জোড়া চোখ দেখছিল, কেমন ওরা দেখতে এই বিজয়ী মানুষ গুলো, যারা যুদ্ধে জয়লাভ করবার অধিকারে এই—সহরের মালিক, জীবন মরণের হর্ত্তা কর্ত্তা, সকল স্বত্বে সত্ত্বান। দরজা জানলা বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে বসে সহরের তাবৎলোক আতঙ্কে কাঁপছিল, যেমন করে মানুষ কাঁপে যখন পৃথিবী ধ্বংসকারী প্রলয়ের রুদ্রমূর্ত্তি তার চোখের সুমুখে প্রকাশিত হয়, যার বিরুদ্ধে তার সব বাহুবল, সব যুক্তি তর্ক একেবারে ব্যর্থ। যখনই পৃথিবীতে অনেকদিনের চলে-আসা একটা গোছ-গাছ, অভ্যস্ত একটা শৃঙ্খলা ও চারদিকের শান্তি, যখনই মানুষ বা প্রকৃতির হাতে গড়া সাধারণ

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আয়োজন অনুষ্ঠান, বিবেক শূন্য নির্মম বর্ব্বরতার পায়ের তলায় দলিত হয় তখনই এমনতর বুক কাঁপা আতঙ্ক সবাইকে চেপে ধরে। মানুষে-ভরা আস্ত আস্ত বাড়ীগুলো যখন পৃথিবীর দুলুনীতে আছাড় খেয়ে সবশুদ্ধ ভেঙে ভেঙে পড়ে; নদীর বাণ যখন দুই কুল প্লাবিত করে জলে ডোবা কৃষকদের মৃতদেহ, মরাগরু ও ঘরের কড়ি বরগা একসাথে ভাসিয়ে নিয়ে যায়;—অথবা বিজয়ী সৈন্য যখন জীবন রক্ষার জন্য যারা যুদ্ধ করে; তাদের কতক মেরেকেটে, কতক বন্দী করে, তরবারির জোরে লুট করে ও কামান গর্জ্জনের সাথে তাদের দেবতার জয়ধ্বনি করে চলে যায়,—তখন আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাকে ভক্তি বলা চলে না। এ সব দৃশ্যে, ঈশ্বরের সুবিচারের উপর আমাদের বিশ্বাস, তাঁর উপর আমাদের ভক্তি ও নির্ভর এবং মানুষের উপর আমাদের আস্থা —সবগুলো শিকড় শুদ্ধ আমাদের মন থেকে উপড়ে ফেলে দেয়।

যাক্। সৈন্যদের এক একটা দল প্রত্যেক বাড়ীর কাছে গিয়ে তার দরজায় একটা করে ঘা দিলে, তারপর ভিতরে ঢুকে গেল। প্রথমে আক্রমণ, তারপর দখল। এর পরের কর্ত্তব্য হচ্ছে বিজিত-দের ;—তারা জেতাদেব সাথে কুটুম্বের মত ব্যবহার করবে।

কয়েকদিন যেতেই লোকের ভয়টা ভেঙ্গে গেলে একটু শান্তির মত দেখা গেল। অনেক বাড়ীতে প্রুসীর অফিসার পরিবারবর্গের সাথে এক টেবিলে খেত। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ভদ্রবংশীয়; তারা ভদ্রতা করে, ফ্রান্সের উপর সহানুভূতি দেখিয়ে বলত যে, আন্তরিক অনিচ্ছা সত্বেও তারা যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হত, কারণ সময়ে তাদের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক

হতে পারে। অনেকের খোরাক জুটে যেত এই ভবিষ্যৎ চিন্তার দরুণ। আর যার উপর তাদের ভাল মন্দ নির্ভর করছে, তাকে চটিয়েই বা লাভ কি? ও রকম কাজে সাহস নয়, অসমসাহসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এককালে "রুয়াঁ"বাসীরা প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিয়ে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল বটে, এখন আর সে দিন নেই। বিশেষতঃ এটাও একটা কথা যে, ফরাসী ভদ্রতার সদ্বুদ্ধি বশতই সকলে মেনে নিত যে, লোকে বাইরে ঐ বিদেশী সৈন্যগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা না দেখালেও, ভিতরে তাদের সাথে অবাধেই মিশতে পারে। রাস্তায় তারা কেউ কারো দিকে ফিরে চাইত না, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে বেশ কথাবার্তা কইত। এর ফলে অফিসাররা রোজ সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে ফরাসীদের সঙ্গে আগুণের ধারে বসে গল্পস্বল্প করত।

আস্তে আস্তে সহরের চেহারা আগেকার মত হতে লাগল। ফরাসীরা কদাচিৎ রাস্তায় বেরুত, জার্ম্মাণ-সৈন্যেরাই সর্ব্বত্র হৈ হৈ করে বেড়াত। বাকীর মধ্যে ছিল ব্লু-হুসার দলের অফিসাররা; তারা লম্বা লম্বা তরবারি ঝুলিয়ে সদম্ভে রাস্তায় চলত, কিন্তু আগের বছরের পা দল সৈন্যের অফিসারদের চেয়ে ওরা বেশী ঘৃণা, সহরের সাধারণ লোকদের দেখাত না।

কিন্তু চারদিকের বাতাসের ভিতর নূতন তীব্র কি যেন একটা ঢুকে ছিল,—অনভ্যস্ত, বিশ্রী একটা চাপা চাপা ভাব লোকের দম আটকে দিচ্ছিল, হাওয়ার মুখে চারিয়ে-যাওয়া একটা গন্ধের মত,—যার কারণ হচ্ছে জর্ম্মাণদের সহর অধিকার। পথ ঘাট, ঘরদোর সর্ব্বত্র ঐ ভাবে আক্রান্ত; খাবার জিনিস পর্য্যন্ত ঐ কারণে স্বাদহীন। মনে হয় যেন কোন্ একটা সুদূর দেশে, যেখানে অসভ্য, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর

প্রকৃতির লোকের বাস, সেইখানে সবাই মিলে জাহাজের খোলে বন্ধ হয়ে যাত্রা করছে।

বিজেতারা প্রচুর টাকার দাবী করত এবং প্রচুর টাকাই পেত। সহরের বাসিন্দারা যখন যে টাকা চাওয়া হত তাই দিত, কারণ টাকার অভাব তাদের ছিল না।

এদিকে সহরের পাঁচশত মাইল ভাটিতে "ক্রোয়াসে," "ডাপে ডাল" বা "বাঁসার্টের নীচে নদীতে, জেলে ও মাঝিরা প্রায়ই মরা জার্ম্মান দেহ দু একটা করে পেত। পরণে তাদের য়ুনিফর্ম, আর সাধারণত দা বা লাঠির আঘাতে, পাথর দিয়ে মাথাটা ছেঁচে বা পুলের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, তাদের খুন করা হয়েছে। মানুষে এমনি করে' লুকিয়ে থেকে প্রতিহিংসা বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করত, যা বর্ব্বরোচিত হলেও নিতান্ত স্বাভাবিক। এই বীরত্বের জন্য তারা পুরস্কার পেত না; নিঃশব্দে, গোপনে এই যুদ্ধ জয় হত,—কিন্তু যশের অংশ এতে না থাকলেও বিপদের সম্ভাবনা কিছুমাত্র কম ছিল না। এই ধরণের যুদ্ধে, পরাজিত পক্ষের সমাধি হত নদীর বিস্তৃত গর্ভে।

একটি মাত্র আদর্শ বা আইডিয়ার জন্য মরতে প্রস্তুত, এমন ওর বাছা বাছা সাহসী পুরুষ, চিরকালই বিদেশী-বিদ্বেষে এমনি করে জ্বলে ওঠে।

এরপর ক্রমে যতই দেখা যেতে লাগল যে, বিজেতারা জয়পথে, আগাগোড়া যে সব ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতে করতে আসছিল, সহর শাসন করতে গিয়ে তার কোনটাই আর সেখানে করছে না, ততই লোকের মন নিঃশঙ্ক হতে লাগল। ব্যবসা বাণিজ্যের

আশা ফের সব ব্যবসায়ীদের মনে জেগে উঠল। "হাভ্রে" "অনেকের প্রচুর টাকার মালামাল ছিল। তাই মহাজনেরা মনস্থ করলে স্থলপথে ডীয়েপ গিয়ে, তারপর জাহাজে চড়ে "হাভরে" যাবে।

যে সব জার্ম্মাণ অফিসারের সাথে তাদের পরিচয় ছিল, তাদের হাত করে জেনারেলের কাছ থেকে ছাড় পত্র নেওয়া হল।

চার ঘোড়ার একখানা বড় গাড়ী ভাড়া করা হল এবং ঠিক হল তাতে দশজন যাবে। শেষটা লোকজন না জমে যায় এজন্য যাত্রার সময় নির্দ্দিষ্ট হল মঙ্গলবার সকালে, ফর্সা হবার আগেই।

কদিন ধরে একটু একটু করে বরফ পড়ে মাটি ঢাকা পড়তে সুরু হয়েছিল। সোমবার প্রায় তিনটে থেকে কালো মেঘ বরফ বৃষ্টি আরম্ভ করে দিল। সারা সন্ধ্যা, সারা রাত্রি অবিরাম বরফ পড়্ল

ভোর সাড়ে চারটায় যাত্রীরা গাড়ী চড়বার জন্য হোটেল-দ্য-নরমাণ্ডির উঠানে এসে জুটল।

তখনও কারো ঘুমন্ত ভাব কাটেনি, জামা কাপড় গায়ে, সকলে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না,—ছালার মত একরাশ মোটা কাপড়ে ঢাকা, তাদের দেখাচ্ছিল ঠিক ক্যাসক পরা পেট-মোটা পাদরীদের মত। খানিক পরে দু'জন পরস্পরকে চিনতে পারল, তৃতীয় আরেকজন তাদের কাছে এগিয়ে এল। তখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ হল।—"আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন", একজন বললে—"আমারও তাই"। "আমার সঙ্গেও আমার পরিবার", প্রথম লোকটি বললে, "আমরা আর রুঁয়াতে

ফিরছি না। প্রুসীয়ানারা যদি "হাভ্‌রের" দিকে এগোয় তবে সোজা ইংলণ্ড মুখে রওনা হব"। সকলেই জাত ভাই, সকলেই সেইমত।

ঘোড়া তখন পর্য্যন্ত গাড়ীতে যোতা হয়নি। আস্তাবলের একজন সইস একটা ছোট লণ্ঠন হাতে করে—এক একবার এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে আরেক দরজা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো খড় বিছানো রাস্তায় কেবলই পা ঠুকছিল। ঘরের মাঝে অনেক দূর থেকে কার গলা শোণা যাচ্ছিল, সে ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে কথা বলছে ও বকাবকি করছে। টুং টাং শব্দে বোঝা গেল সাজ কসা হচ্ছে। শব্দ ক্রমেই পরিষ্কার হতে লাগল; সে শব্দ ঘোড়ার শরীরের দুলুনীর সাথে তালে তালে বাড়তে থাকে, হঠাৎ থেমে যায়, তারপরেই মাটীতে ঘোড়ার নাল-ঠোকা-পা ছোড়ায়, তা আবার জোরে সুরু হয়।

দরজাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সব চুপ। যাত্রীরা ঠাণ্ডায় জমে যাবার মত, ক্রমে সবার বিরক্তি ধরে গেল, সবাই খুঁটির মত খাড়া দাঁড়িয়ে, হিমে আড়ষ্ট।

অবিরাম সাদা তুষার কণা পড়েছে, যেন একটা পরদা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন জিনিষের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, আগাগোড়া বরফে ঢাকা, যেন মাটির গায়ে সাদা শ্যাওলা পড়েছে। শীতের রাত্রের শান্ত ও নিদ্রামগ্ন সহরের, এই বিরাট নিস্তব্ধতায় আর কিছুই কানে আসছিল না—শুধু অবিরাম বরফ পড়ার ঐ অস্ফুট অবর্ণনীয়, দূরাগত মৃদু শব্দও নয়, শুধু শব্দের একটা নিবিড় অনুভূতি, জগৎ-জোড়া যে প্রাণের স্পন্দন চলেছে তারই আভাস।

সইসটা খানিক লণ্ঠন হাতে করে লাগাম ধরে এগোতে এগোতে নিতান্ত এক পক্ষীরাজ ঘোড়াকে টানতে টানতে ফিরে এল। তাকে যোয়ালের ভিতর পুরে যোত কসে দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে চারদিক দেখতে লাগল ঠিক হচ্ছে কিনা, কারণ লণ্ঠনে এক হাত আটকা থাকাতে শুধু একহাতে তাকে কাজ করতে হচ্ছিল। দ্বিতীয় ঘোড়া আনবার জন্য ফিরতেই তার চোখ পড়ল থামের মত দাঁড়িয়ে বরফে-সাদা সব যাত্রীদের উপর। তাদের অবস্থা দেখে সে বললে, "আপনারা,, গাড়ীতে চড়ে বসুন না কেন, মাথাটা বাঁচবেত" ?

এই সোজা কথাটা তারা ভাবেনি। এখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। প্রথম তিনজন—তাদের স্ত্রীদের আগে উঠিয়ে নিজেরা উঠে বসল। বাকী যারা আপাদ মস্তকে কাপড় মুড়ি দিয়ে "ভূতের" মত দাঁড়িয়ে ছিল তারাও বিনাবাক্যব্যয়ে, এক একটা জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

নীচে পা রাখবার জায়গায় খড় বিছিয়ে দেওযা হয়েছিল। মহিলারা পা গরম করবার জন্য তামার "সোকারেট" এনেছিলেন, এখন সে গুলো জ্বালিয়ে দিলেন। মোটা গলায় কে যেন এতক্ষণ ধরে ঐ গুলোর বিজ্ঞাপন জাহির করেছিলেন, যা হয়ত হাজার বার লোকে শুনেছে।

পথ অনেক ও ভার বেশী বলে, দুই ঘোড়ার জায়গায় চার ঘোড়া যোতা হল। তারপর বাইর থেকে একজন ডেকে বললে,,— "সবাই গাড়ীতে উঠেছেন আপনারা" ? ভিতর থেকে একজন উত্তর দিলে "হাঁ", গাড়ী তখন ছেড়ে দিল।

অতি ধীরে ঠুক ঠুক করে গাড়ী চলতে লাগল। রাস্তা বরফে ঢেকে গিয়েছিল; গাড়ীখানা শ্রুতিকটু কোঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে চল্‌ল। ঘোড়াগুলো হাঁপিয়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগোতে লাগল। কোচোয়ানের লম্বা চাবুক অবিরাম চট্‌পট্‌ শব্দ করে চারদিক ঘুরতে লাগ্‌ল, সপাং সপাং করে সরু সাপের মত উঠ্‌তে পড়তে লাগল, কখন পটাং করে নীচে নেমে, ঘোড়ার পিছনটা যেই উঁচু হয়ে ওঠে, অমনি তার উপর পড়তে থাকল।

আস্তে আস্তে চারদিক পরিষ্কার হতে লাগল। খাঁটি রুঁয়া-বাসী যাত্রীরা যাকে তুলোর বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছিল, সেই সাদা তুষারপাত অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল। চাপবাঁধা কালো মেঘ চুইয়ে একরকম ঘোলাটে আলো বেরিয়ে চারিদিকের সাদা চেহারাকে আরও সাদা করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে আগাগোড়া তুষরাচ্ছন্ন বড় বড় গাছ ও বরফের ঘোমটা পরা দু'একটা কাঁচা বাড়ী দেখা যেতে লাগল।

গাড়ীর ভিতরে এই অস্পষ্ট আলোতে যাত্রীরা সকৌতূহল পরস্পরের দিকে চাইল।

গাড়ীর সব চেয়ে ভাল জায়গায় পরস্পরের মুখোমুখি চেয়ে ম্যঁসে ও মাডাম লোয়াসেও ঘুমচ্ছিলেন। তাঁরা "গ্রাঁদ-পঁৎ" রাস্তার পাইকারী মদের ব্যবসায়ী।

লোয়াসেও প্রথমে ছিল এক মদের ব্যবসায়ীর মহুরী; ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে সে লোকটা দেউলে হলে, লোয়াসেও সেটা কিনে নিয়ে তার যথেষ্ট উন্নতি করে। মফস্বলের খুচরা দোকানীদের কাছে খুব বেশী দরে, খুব খারাপ মাল বিক্রী করে তার বিস্তর পয়সা

হয়েছিল। আলাপী ও বন্ধু বান্ধবের কাছে, খুব ধড়িবাজ লোক, ফ্রিকির ও স্ফূর্ত্তিবাজ খাঁটি নর্ম্মাণ, বলে তার খ্যাতি ছিল।

তার এই জুয়াচুরির নাম কত বিস্তৃত ছিল নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে। প্রিফেক্টের বাড়ী এক সান্ধ্যসম্মিলনীতে বহু গান ও গল্পের রচয়িতা, উচ্চদরের হাস্যরসিক, স্থানীয় নামজাদা লেখক ম্যঁসে টুরনেল উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি মহিলার ঝিমুনির লক্ষণ দেখে তাঁদের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, এক বাজি "গোলামচোর" নয়, "লোয়াসেও চোর" খেলা যাক। এই রসিকতা তখনই প্রিফেক্টের সালোনে ও তারপর সহরের মধ্যে প্রচার হয়ে সকলকে একমাস ধরে হাসিয়েছিল।

সব রকম হাসি মসকরা ও বদ্ ও সৎ দু'রকমের ঠাট্টাতেই লোয়াসেও সমান দক্ষ ছিল। তার কথা উঠলে প্রত্যেক "ও লোকটির জুড়ী নেই" এ কথাটি না বলে থাকতে পারত না।

খাটো শরীর ও বিশাল পেটধারী, তাকে দেখতে মনে হত যে একটা বেলুনের উপর কাঁচা পাকা দুই গোচ্ছা গোঁফের মধ্যে যেন ছোট একটা লালচে মুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার গৃহিণী ঠিক উল্টো—লম্বা চওড়া, শক্ত সামর্থ, রাশভারি মেয়ে মানুষ। তার গলা মর্দ্দানী আর কার্য্য-তৎপরতা জাঁদরেলি। দোকানের খাজাঞ্চি ও মেনেজার সবই তিনি। লোয়াসেও-এর কাজ ছিল শুধু চারদিক সর-গরম করে রাখা।

এদের পাশে বসেছিলেন কিছু উচ্চদরের ও উচ্চতর শ্রেণীর লোক। ম্যঁসে কারে-লামাডোঁ পদস্থ লোক, তিনটি সুতার মিলের স্বত্বাধিকারী, লেজিয়ঁ দ্য-অনেরের এব অফিসার ও সাধারণ কাউন্সিল

সভার সদস্ত। নেপোলিয়নের শাসনকালে তিনি বরাবর শাসন প্রণালীর সমালোচক দলের নেতা ছিলেন এবং এজন্য ভাল রকমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন;—এর কারণ, তিনি নিজ মুখেই বলতেন, তিনি নাকি ভদ্র-অস্ত্র, অর্থাৎ শুধু মুখের কথা দ্বারা যুদ্ধ করতেন। মাডাম কারে-লামাডোঁ স্বামীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। রুঁয়াতে সৈন্যদলের মধ্যে যে সব ভদ্রবংশীয় অফিসার আসত, তারা কেবল তাঁর সঙ্গেই মিশত।

মাডাম কারে-লামাডোঁ দেখতে ছোটখাট,-খুব সুশ্রী ও সুন্দরী। তিনি স্বামীর মুখোমুখি বসে, আপাদ-মস্তক গরম পোষাকে জড়িত হয়ে গাড়ীর ভিতরের অবস্থাটা দেখছিলেন; চোখে অত্যন্ত করুণ ভাব।

তাঁদের পাশে বসেছিলেন ব্রেভিলের কাউণ্ট ও কাউণ্টেস হুবার্ট। তাঁরা নর্ম্মানডির অতি পুরাতন ও উচ্চ অভিজাত বংশের প্রতিনিধি। কাউণ্টের লম্বা চওড়া চেহারার সঙ্গে রাজা চতুর্থ হেনরীর চেহারার কিছু সাদৃশ্য ছিল। তিনি ঘষে মেজে, নানা উপায়ে এই সাদৃশ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর পরিবারে এ একটা গৌরবের কাহিনী বলে জানা ছিল যে, ঐ রাজার সঙ্গে আলাপের ফলে ব্রেভিল বংশের এক মহিলার গর্ভে এক ছেলে হয় এবং ঐ মহিলার স্বামী এই কারণে কাউণ্ট উপাধি ও প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ পান।

কাউণ্ট হুর্বাট সাধারণ কাউন্সিল সভার সদস্ত ও তাঁর প্রদেশের অরলিয়ানিষ্ট দলের নেতা ছিলেন। "মানটের" অতি সামান্ত এক জাহাজওয়ালার মেয়ের সাথে কি করে যে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, কেউ তার কোন কারণ খুঁজে পেত না। কিন্তু কাউণ্টেসের রূপ ছিল এবং

অতিথি অভ্যাগত সৎকার তিনি সবার চেয়ে ভাল করতেন। এই কারণে সকলেই কথাটা বিশ্বাস করে নিত যে, রাজা লুই ফিলিপের এক ছেলে তাঁর প্রেমে পড়েছিল। সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে বিস্তর খাতির করতেন এবং তাঁর সালোন, সকলের উপরে স্থান পেত। কেবল তাঁর সালোনেই মেয়ে পুরুষের মেশবার প্রাচীন প্রথা ও আদব-কায়দার চলন ছিল,—আর ঠিক আগেকার মতই যে সে সেখানে ঢুকতে পারত না।

ব্রেভিল-পরিবার বড়লোক ছিলেন ভূ-সম্পত্তিতে; তাঁদের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ লিভ্‌র।

এই ছয়জন গাড়ীর সব চেয়ে ভাল জায়গাটি দখল করে বসেছিলেন। সমাজের সেই শ্রেণীতে এঁরা বাস করতেন যে শ্রেণীর হাতে থাকে পয়সা ও ক্ষমতা এবং মনে নিরুদ্বেগ ভাব। সমাজের ভূষণ-স্বরূপ সব গুণই এঁদের ছিল; যথা—ধর্ম্মজ্ঞান ও সব বিষয়েই একটা করে, বড় মত।

ঘটনাক্রমে মহিলারা সকলেই বেঞ্চে বসেছিলেন। কাউণ্টেসের পাশে ছিলেন—দুটি nun তাঁদের গলায় ঝোলানো ছিল লম্বা জপমালা আর ঠোঁট নেড়ে নেড়ে তাঁরা ভগবানের নাম করেছিলেন। একজন বয়সে বৃদ্ধা ও তাঁর সমস্ত মুখটা বসন্তের দাগে এমনি ভরা যে মনে হয় কেউ যেন তাঁর নাকের গোড়ায় ছররা-ভরা বন্দুক ছেড়ে দিয়েছে। অপরটি নেহাৎ রোগা। মুখের চেহারা সুন্দর বটে কিন্তু মেজাজ শুক্‌নো। চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ধার্ম্মিকতার ফলে মানুষের যেমন হয়ে থাকে তেমনি সাংঘাতিক ক্ষয় রোগে তাঁকেও ধরেছে।

এই দুইজন ধর্ম্মশীলা মহিলার পাশে একটি পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক বসেছিল,—যাদের উপর সকলেরই চোখ পড়ছিল।

পুরুষটিকে সকলেই জানত, তার নাম "করনুদেৎ"। পলিটিক্সে সে ছিল ডেমোক্রাট; সহরের তাবৎ ভালমানুষ ভদ্রলোক তার কাছ দিয়ে ঘেঁষতেন না। কুড়ি বছর বয়েস থেকে রাজ্যের ছোট বড় সব ডেমোক্রাটিস কাফের মদের গেলাসে, সে তার লম্বা রাশিয়ান দাড়িশুদ্ধ মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার বাপ ছিল মেঠাইওয়ালা এবং মরবার সময় ছেলেদের জন্য যথেষ্ট টাকা পয়সা রেখে যায়। কিন্তু ভাইদের ও ইয়ারদের সহযোগে করনুদেৎ অবিলম্বে পৈতৃক সম্পত্তি সাবাড় করে। এখন বসে বসে কবে যে রিপাব্লিক হবে তারই দিন সে গুণছিল,—কারণ, তার আশা ছিল যে এতদিন ধরে এত ডিমোক্রাটিক মদ সে উদরস্থ করেছে, দেশে রিপাবলিক হলে, তা বিফলে যাবে না—ভাল রকম একটা চাকরী বাকরী তার নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। সেপ্টেম্বরে তার ধারণা হয়েছিল যে তাকে প্রিফেক্ট করা হয়েছে। কিন্তু কাজের ভার নেবার জন্য আফিসে ঢুকলে সেখানকার ছোকরারা তাকে মোটেই আমল দিতে চাইল না, বাধ্য হয়ে তাকে পশ্চাদপদ হতে হল। কিন্তু আর আর বিষয়ে সে খুব ভাল মানুষ, কাজের লোক, ও মোটেই ঝগড়াটে নয়। যুদ্ধ বাধলে সে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে সহর রক্ষার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। সমান জায়গায় খাল কেটে কেটে, আশ পাশের জঙ্গলের ছোট গাছপালা কেটে কুটে, সব রাস্তাগুলোতে মানুষ-মারা কল বসিয়ে বসিয়ে সে কাজ চালাতে লাগল। শত্রুরা কাছে আসতেই এই সব চমৎকার ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে নিশ্চিন্ত ও খুশী মনে সে একদম সহরের ভিতর

ডিপিটার দিলে। হাড্রে যাবার তার মতলব ছিল এই যে, সেখানে নূতন কিছু কিছু দেশরক্ষার ব্যবস্থার দরকার, সেখানে সে নিজের সামরিক অভিজ্ঞতা ও শক্তি আরও ভাল করে কাজে লাগাতে পারবে।

স্ত্রীলোকটি হচ্ছে সেই শ্রেণীর যাকে সাধুভাষায় আমরা রূপের ব্যবসায়ী বলি। অল্প বয়সেই তার রূপের এমন খোলতাই হয়েছিল, যে লোকে তাকে "বুল-দু সুইফ" বা চর্ব্বির গোলা বলে ডাকত। দেখতে ছোট খাটো, গোল গাল, নাদুস নুদুস,—হাতের আঙ্গুল মোটা মোটা, গায়ে গায়ে লাগা। গায়ের উপর চামড়া নরম ও চক্‌চকে। গলাটি লম্বা, ভাঁজ খাওয়া। চেহারা খানিতে এমন একটা তাজা যৌবনের প্রকাশ ছিল, যা দেখে আনন্দ হয়। লোকের চোখ বাধ্য হয়ে তার দিকে ফিরত। আগাগোড়া তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন একটা লাল টুক্‌ টুকে আপেল, একটি স্ফুটোনোন্মুখ পিওনি ফুলের কুঁড়ি। ভাসা ভাসা দু'টি কালো চোখ; তার উপরে বিশাল, নিবিড় চোখের পাতা চোখের ভিতরে যার ছায়া পড়েছে। তার নীচেই সুন্দর, ছোট মিষ্ট মুখখানি, রাঙা ঠোঁট দুটির ভিতর দিয়ে অতি ক্ষুদ্র, চক্‌চকে দাঁতের সার দেখা যাচ্ছিল।

লোকে বলত শুধু রূপ নয়, অনেক অনন্যসাধারণ গুণও তার ছিল।

যে-মুহূর্ত্তে তাকে সবাই চিনতে পারলেন সেই মুহূর্ত্তে গাড়ীর বাঁকী সব ভদ্রমহিলা মণ্ডলীর মধ্যে ফুস্‌ ফাস্‌, কানাকানির ধুম পড়ে গেল। "বেশ্যা", "বাজারের স্ত্রীলোক" ইত্যাদি কথা এত উঁচু গলায় কানাকানি হতে লাগল যে, সে মাথা তুললে তারপর এমনতর কটমট নির্ভয়

চাহনীতে তাঁদের দিকে চাইল যে সবাই একদম চুপ হয়ে গেলেন। সকলেই চোখ নামিয়ে ফেললেন, শুধু লোয়াসেও অত্যন্ত ফুর্ত্তির সঙ্গে তাকে দেখতে লাগল।

গাড়ীতে এই মেয়েটি উপস্থিত থাকার দরুণ বিবাহিতা তিনজনা মহিলা নিজেদের ভিতর ফের কথাবার্ত্তা সুরু করলেন। আপনাদের বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও ভব্যতার অনুরোধে এই নির্লজ্জা বাজারের বেশ্যাটার বিরুদ্ধে সকলের একজোট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বলে তাঁদের মনে হল। কারণ, আইন মোতাবেক কাজ যাঁরা ভালবাসেন, যারা বে-আইনী কাজ ভালবাসে তাদের কখন দুচক্ষে দেখতে পারেন না।

ভদ্রলোক তিনটির মনেও পরস্পরের মধ্যে হঠাৎ একটা আত্মীয়তার ভাব বোধ করলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যের সাথে স্বীয় দারিদ্র্যের কথা বলতে লাগলেন। কাউণ্ট হুবার্ট প্রুসীয়ানদের আক্রমণের দরুণ, গরুমহিষ চুরি ও শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় তাঁর কি রকম ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে, এবং তাঁর মত কোটিপতির পক্ষে সেটা বিশেষ কিছু না হলেও ব্যাপারটা বিরূপ ভয়ানক তাই সবিস্তারে বললেন। তুলার ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ ম্যাঁসে কারে,—পাছে নষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি দুইকোটী ফ্রাঙ্ক ইংলণ্ডে পাঠিয়েছেন। আর লোয়াসেও বললেন যে তার দোকানের সমস্ত চলতি মদ সে কমিশারিয়েট বিভাগের কাছে বেচে দিয়েছে—তাতে তার কাছে গভর্ণমেণ্টের অনেক দেনা হয়েছে। হাভরে টাকাটা পাবার আশা আছে।

তাঁরা সকলেই পরস্পরের দিকে মহা খাতির ও প্রীতির ভাব দেখিয়ে চাওয়া চাওয়ি—করতে লাগলেন। একদরের বা একশ্রেণীর

লোক না হলেও সকলেই রেস্তওয়ালা বটেন। ট্যাঁক তাঁদের কারও খালি নয়,—নাড়াচাড়া দিলে সকলের পকেট থেকেই ঝুন ঝুন শব্দ বেরবে— এই হিসেবে তাঁদের এক সম্প্রদায়ের লোক বলা চলে,—এবং সে সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হচ্ছে রূপচাঁদ।

গাড়ী এত আস্তে আস্তে চলছিল যে বেলা দশটার সময় বার মাইল পথমাত্র এগোল। গাড়ীর পুরুষ যাত্রীরা বার বার ওঠা নামা করতে লাগলেন। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কারণ, টোটে-তে ব্রেকফাষ্ট। সন্ধ্যার আগে সেখানে যাওয়াই যাবে না। এক একবার গাড়ীর চাকা বরফের স্তুপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল, আর তাকে টেনে বার করতে লাগছিল দু'ঘণ্টা। সেই অবসরে সকলেই এদিক ওদিক দেখছিলেন যদি এক আধটা সরাই চোখে পড়ে।

এদিকে ক্ষিদের চোটে সকলের মাথা ঘুরে উঠল। এতটা পথের কোথাও একটা দোকান পাট হোটেল কিছুই নেই, প্রুসীয়ানদের আবির্ভাবে ও বুভুক্ষু ফরাসী সৈন্যের যাতায়াতে সবরকম বেচা কেনা উঠে গেছে।

বেচারা ভদ্রলোক কটি যা হোক কিছু খাবারের জন্য পথের পাশের চাষাদের বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে সুরু করলেন,—একটা রুটি পর্য্যন্ত মিল্‌ল না। চাষারা দিন কাল বিবেচনা করে আগাগোড়া সব খাদ্যবস্তু লুকিয়ে রাখত, কারণ, সৈন্যগুলো ক্ষিদেয় পাগল হয়ে যা দেখতে পেত তাই ছিনিয়ে নিত।

এমনি চলতে চলতে বেলা যখন একটা বাজে লোয়াসেও আর থাকতে না পেরে বলে উঠল যে ক্ষিদেয় তার পেটে টাঁপ ধরেছে। প্রত্যেকেরই সেই অবস্থা। কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ আগেই থেমে

গিয়েছিল। থেকে থেকে এক একজন হাই তুলতে লাগল আর অমনি গাড়ীর সব মূর্ত্তিই একছের হাই তুলে চলল। যার যেমন স্বভাব, আদব কায়দা ও সামাজিক পদ, প্রত্যেকে সেই অনুযায়ী হাই তুলতে লাগল—কেউ সশব্দে দুই চোয়াল আলগা করে, কেউ বা মোলায়েম ভাবে, নীরবে মুখ ফাঁক করে, ও হাতের আড়াল দিয়ে।—সকলেরই হাঁ-করা মুখ হতে ধোঁয়া বেরচ্ছিল।

বুল-দ্য-সুইক মাঝে মাঝে কাৎ হয়ে নীচের দিকে চাইছিল, যেন কোন জিনিষ খুঁজছে। খানিক ইতস্ততঃ করে, চারদিক দেখে, আবার সোজা হয়ে বসল। যাত্রীরা সবাই ক্যাকাসে হয়ে, শুকিয়ে উঠেছিল। লোয়াসেও বলে উঠল যে এক টুকরো মাংসের জন্য তিনি হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে প্রস্তুত আছেন, মাদাম লোয়াসেও এই প্রস্তাব প্রতিবাদ করবার ভঙ্গী করে, থেমে গেলেন। টাকা নষ্ট করবার কথা শুনলেই তিনি কষ্ট পেতেন।—ও সম্বন্ধে ঠাট্টা তামাসাও তাঁর মাথায় ঢুকত না। কাউণ্ট বললেন—"আমারও খুব সোয়াস্তি বোধ হচ্ছে না। কিছু খাবার আনবার কথাটা যে কি করে ভুল হল বুঝতে পারছিনে।" প্রত্যেকেরই ঐ অনুশোচনা।

করনুদেৎ-এর কাছে এক ভাঁড় রম ছিল। সে সবাইকে দিতে চাইলে সকলেই গম্ভীর ভাবে প্রত্যাখান করলেন। কেবল লোয়াসেও তাতে বার দুই চুমুক দিয়ে, ধন্যবাদের সাথে পাত্রটা ফিরে দিয়ে বললেন, "এও মন্দের ভাল। হাত পা'টা গরম হবে, ক্ষিদেও বসে যাবে।" ঐ মদ টুকু খেয়ে তাঁর দিল খোলাসা হয়ে উঠল। প্রচলিত ছড়ায় সমুদ্রের মধ্যে সেই জাহাজের যে গল্পটা আছে, তারই ভাবটা নিয়ে সে প্রস্তাব করে বসলে,—যাত্রীদের ভিতর যাদের গায়ে মাংস বেশী

আছে তাদের ভক্ষণ করা হোক্। বুল-ছ্য-সুইফ সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতে গাড়ীর সভ্য ভব্য যাত্রীরা চটে উঠলেন। কেউ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু করনুদেৎ একটু মুচকে হাসলে। nun দুটির ঠোঁট নেড়ে জপ করা অনেকক্ষণ হল থেমে গিয়েছিল। ঢিলে হাতার মধ্যে হাত গুটিয়ে ফেলে, নড়ন-চড়ন বিহীন আড়ষ্ট ভাবে, জোর করে চোখ নীচু করে তাঁরা বসেছিলেন,—বোধ করি মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন যে এই কষ্ট ভোগ করবার মহাসুযোগ তাঁদের কপালে লাভ হয়েছে।

বেলা যখন তিনটে, তখন গাড়ী সীমা সহরদ্দহীন, বিস্তীর্ণ এক মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়ল,—তার কোনদিকে একখানা গাঁয়ের চিহ্ন মাত্র নেই। বুল-ছ্য-সুইফ চট্ করে উঁচু হয়ে, বেঞ্চের নীচে থেকে সাদা তোয়ালে ঢাকা একটা ঝুড়ি বের করে ফেললে।

ঐ বাসকেটের ভিতর থেকে প্রথমে বেরল একটা প্লেট, তারপর একটা গিল্টি করা পেয়ালা ও শেষে একটা বড় ডিস। ডিসের উপর ছিল, দুটো ফাউল, কাটা ও মসলা-মাখা। এ ছাড়া ঝুড়ির ভিতর আরও প্রচুর খাবার জিনিষ ছিল—যথা কেক্, ফল, মেঠাই, ইত্যাদি। পথে হোটেলে না খেতে হয় এই উদ্দেশ্যে সে তিনদিনের খাবার সংগ্রহ করে এনেছিল। ঐ সঙ্গে চারটে বোতলের গলাও দেখা যাচ্ছিল। বুল-ছ্য-সুইফ ছোট একখানা রুটি নিয়ে ফাউলের খানিকটে কেটে খেতে সুরু করে দিল।

সবগুলো চোখ তখন তার উপর গিয়ে পড়ল। একটু একটু করে মাংসের গন্ধ নাকে ঢুকতেই সকলের জিবের ডগায় জল এসে গেল। মহিলাদের মনে ঐ মেয়েটার উপর দুর্জ্জয় ঘৃণা জন্মে

গেল।—ঐ আপদটাকে যদি মেরে ফেলা যায়,এই রকম ইচ্ছেটা তাঁদের হল,—গাড়ী থেকে তুলে একেবারে ঘোড়াগুলোর পায়ের নীচে, বরফের মধ্যে, ওঁর পেয়ালার ঝুড়ি, খাবার দাবার সব শুদ্ধ ওকে ফেলে দিলে গায়ের জ্বালা যদি মেটে।

লোয়াসেওর চোখ দু'টো যেন ডিসের উপরকার ফাউল গিলছিল। সে বুল-দ্য-সুইফকে উদ্দেশ করে বললে, "সুখের বিষয় আপনি খাবারের কথাটা ভেবেছিলেন, আমরা ত একটুও ভাবিনি। অল্প লোকেরই আপনার মত জ্ঞান থাকে কখন কোনটা দরকার হবে," বুল-দ্য-সুইফ মাথাটা তুলে তাকে বললে, "আপনি খাবেন? সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকা বড় কষ্টকর।" সে ধন্যবাদ দিয়ে বললে, "সত্যি বলতে কি আমার আপত্তি করবার কিছু নেই। এক পেট ক্ষিদে নিয়ে বসে থাকা আমার আর পোষাচ্ছে না। যখন যেমন, তখন তেমন,—আপনি কি বলেন? তারপর চকিতে একবার চারদিকটা চেয়ে নিয়ে বললে, "এই রকম সময়ে কেউ অনুগ্রহ করলে খুসী হওয়া উচিৎ।" তার কাছে একখান খবরের কাগজ ছিল, পোষাকে যাতে না লাগে, তাই সেই কাগজখানা হাঁটুর উপর বিছিয়ে নিয়ে, পকেট থেকে একখানা ছুরি বের করে, ফাউলের একটা ঠ্যাং তুলে, খানিকটে কেটে নিয়ে মুখে পুরে চিবোনো সুরু করলেন—তার স্ফূর্ত্তি দেখে গাড়ীর বাকী সকলে সখেদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কিন্তু বুল-দ্য-সুইফ অতি বিনীত ও মধুর স্বরে Nun-যুগলকে খেতে অনুরোধ করলে। তাঁরা দু'জনেই তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে চোখ নীচের দিকে রেখেই, অস্পষ্টস্বরে কি ধন্যবাদ দিয়ে, অত্যন্ত দ্রুত বেগে হাত

ও মুখ চালাতে লাগলেন। করমুড়েৎও ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে না। সে ও Nnn দুটির হাঁটুর উপর খবরের কাগজ পেতে টেবিলের মত করে নিলে।

তারপর কেবল মুখ খোলা ও বন্ধ হওয়া, গেলা, চিবানো ও গেলা—ভীষণ বেগে এই ব্যাপার চলতে লাগল। লোয়াসেও তার কোণে বসে ক্ষিপ্রগতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তার স্ত্রীকেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বললে। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পেটের ভিতরটায় একবার টান ধরতেই রাজি হয়ে গেলেন। তখন লোয়াসেও ভাষা চোস্ত করে, বুল-ছ-সুইককে Charming Companion বলে আপ্যায়িত করে জিজ্ঞাসা করলে তার স্ত্রীকে এক আধটু সে দিতে পারে কিনা। বুল-ছ-সুইফ বললে, "নিশ্চয়"। তারপর একটু মধুর হেসে ডিসটা তুলে ধরলে।

মদের প্রথম বোতলটা খোলা হলে একটু মুস্কিল বেধে গেল, পাত্র ছিল কেবল একটা। সেইটেই মুছে নিয়ে সকলে হাত বদল করলেন; কেবল করমুড়েৎ সৌজন্য দেখাবার মতলবেই যে জায়গাটাতে বুল-ছ-সুইফ চুমুক দিয়েছিল ঠিক সেইখানেই ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দিল।

যখন চারদিকের মানুষগুলো সবাই খাচ্ছে আর নাকে খাবারের এই গন্ধ ভুর ভুর করে ঢুকছে—তখন কাউণ্ট ও কাউণ্টেস ব্রেভিল ও ম'ঁাসে ও মাদাম কারে-লামাডোঁর যে অবস্থাটা হল তাকে টাণ্টালাসের শাস্তির সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। হঠাৎ মাদাম কারে-লামাডো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—সবাই সেইদিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর চেহারা ঠিক বরফের মত শাদা হয়ে

গিয়েছে, চোখ দু'টো বন্ধ, কপালটা কাঁপছে; তিনি মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী পাগলের মত হয়ে হাঁক ডাক করতে লাগলেন। সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সেই Nun দুটির মধ্যে বড়টি মুর্চ্ছিতার মাথাটা ধরে বুল-ড্য-সুইফের মদের গেলাস তাঁর মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকটে বরদ্যো সুরা তাঁকে খাইয়ে দিলেন। তখন মাদামের মূর্চ্ছা ভেঙে গেল। তিনি চোখ খুলে মৃদু হেসে করুণ কণ্ঠে বললেন যে তিনি বেশ ভাল বোধ করছেন। কিন্তু ফিরে আবার তিনি মুর্চ্ছিত না হন এজন্য সেই বৃদ্ধা আরও খানিকটে বরদ্যো তাঁকে খাইয়ে বললেন, "এর কারণ আর কিছু নয়, কেবল অনাহার"।

এই শুনে বুল-ড্য-সুইফ মুখ লাল করে, একটু ইতস্ততঃ করে, বাঁকী যে চারজন যাত্রী অনাহারী ছিলেন তাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলে, "আপনাদের অনুরোধ করতে আমার সাহস হচ্ছে না, যদি অপরাধ না নেন তবে"—লোয়াসেও তার বক্তব্যের বাঁকীটুকু শেষ করলে, "বর্ত্তমান অবস্থায় সকলে ভাই ভাই—এবং পরস্পরের সাহায্য করবে। সভ্যতা ভব্যতা ছেড়ে ছুড়ে লেগে যান, কে জানে রাত কাটাবার মত একখানা কুঁড়েও আমাদের ভাগ্যে জুটবে কিনা। যে গতিতে গাড়ী চলেছে কাল দুপুরের আগে যে টোটে-তে যেতে পারব সে ভরসা নেই," তাঁরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, "হাঁ" বলবার দায়িত্ব কেউ ঘাড়ে নিতে চান না। শেষে কাউণ্ট এ সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন। মোটা, ভীরু, সেই মেয়েটার দিকে চেয়ে সৌজন্য সহকারে তিনি বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করছি।" আরম্ভ করতেই কি মহা গোলযোগ! একমাত্র আত

গেলে ছত্রিশ জাতই সমান হয়ে যায়। অবিলম্বে খাবারের ঝুড়ি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

ও মেয়েটার খাবার খাব কিন্তু ওর সাথে কথা বলব না, এ করা চলে না। কাজেই কথাবার্ত্তা সুরু হল প্রথমে বাধ বাধ ভাবে, কিন্তু সেও কথা কইতে যে বেশ পটু এই প্রমাণ হতে, সে সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেল। কাউণ্টেস ব্রেভিল ও মাদাম কারে লোমাড়োঁ ভদ্রতার রীতিনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ—তাঁরা তার সাথে অতি মোলায়েম ব্যবহার করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে কাউণ্টেস ব্রেভিল অতি নরম কথা বার্ত্তায় তাকে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। উচ্চবংশীয় ও উচ্চপদস্থ মহিলাদের, লোকের অবস্থা নির্ব্বিশেষে তাদের সঙ্গে যে মার্জ্জিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবার ক্ষমতা দেখা যায়, তা তাঁর পুরা মাত্রাতেই ছিল। দলের মধ্যে কেবল কাটখোট্টা স্বভাব বলে মাদাম লোয়াসেও গোঁ ধরে বসে থাকলেন। অথবা বাক্যব্যয় না করে যথা সম্ভব দ্রুতগতিতে তিনি মুখ হাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কথাবার্ত্তা প্রথমেই যুদ্ধের বিষয় নিয়ে আরম্ভ হল—প্রুসীয়ানদের বর্ব্বরের মত ব্যবহার সম্বন্ধে গল্প, ফরাসীদের বীরত্ব সম্বন্ধে গল্প সকলেই অবশ্য এমনি করে রাতারাতি সহর ছেড়ে পালাচ্ছিলেন, কিন্তু তাই বলে যাঁরা সহরে রয়ে গেলেন তাঁদের সাহসের যথোচিত প্রশংসা করতে তাঁরা কোন ত্রুটি করলেন না। তারপর সকলের নিজের কথা সুরু হল। বুল-ছ্য-সুইফ বললে সে কেন রোঁয়া ছাড়ছে। অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায় যে, মনের কথা বলতে হলে, তারা উত্তেজিত না হয়ে পারে না।—বুল-ছ্য-সুইফও কথা

বলতে বলতে গরম হয়ে উঠল। সে বললে, "আমি প্রথমে ঠিক করেছিলেম যে রোঁয়াতেই থেকে যাব। আমার ঘরে খাবার জিনিষ পত্র সব সঞ্চয় করা ছিল। বাড়ী ঘর ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে অজানা স্থানে বেরিয়ে পড়বার চাইতে দু'চারটে সৈন্যকে খেতে দেওয়া অনেক ভাল। কিন্তু প্রুসীয়ানগুলো যখন এসে পড়ল তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেম না। আমার শরীরের সব রক্ত রাগে গরম হয়ে উঠল—সমস্ত পথটা কেবল ধিক্কারে ও লজ্জায় চোখের জল ফেলেছি। যদি পুরুষ মানুষ হতেম,—তাহলে দেখে নিতেম! জানলা দিয়ে আমি দেখতে লাগলেম, চুড়োওয়ালা-টুপী মাথায় ঐ পেট মোটা শুয়োর গুলোকে—আমাকে জোর করে হাত ধরে না আটকালে, নিশ্চয় আমি সব চেয়ার বেঞ্চিগুলো ওদের ঘাড়ের উপর ফেলে দিতেম, তারপর কটা এল আমার বাড়ীতে থাকবার জন্য,—ঘরে ঢুকতেই প্রথমটার ঘাড়ের উপর আমি লাফিয়ে পড়লেম। ওদের গলা নিশ্চয় অন্য লোকের চাইতে শক্ত নয়। যেটাকে ধরেছিলেম সেটাকে চুকিয়ে দিতেম যদি আমায় চুল ধরে হতভাগাটা না টানত। এই ব্যাপারের পর আমার পালিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় ছিল না। —রোঁয়া ছাড়বার এই সুবিধেটা জুটে যেতেই চলে এসেছি।"

সকলে তাকে প্রশংসা করলেন। তার সঙ্গীদের ভিতর অতটা সাহস কেউ প্রকাশ করেনি,—সেই অনুপাতে প্রত্যেকের চোখেই সে বড় হয়ে উঠল। করনুডেৎ ধীর ভাবে গল্প শুনছিল, মুখে সমর্থনসূচক ও উদার, উচ্চভাবব্যঞ্জক মুরুব্বীয়ানার মৃদুহাসি—কোন ভক্তের মুখে ঈশ্বরের প্রশংসা শুনলে পাদরী মাথা নেড়ে যেমন মৃদু হাসি হাসে।—কারণ লম্বা চোগা-পরা পাদরী যেমন একচেটে

করেছে ধর্ম্মকে, লম্বা দাড়িওয়ালা ডেমোক্রাট তেমনি একচেটে করেছে স্বদেশ-প্রেমকে। অতি গম্ভীর চালে সে আপনার মত ব্যক্ত করলে; দেয়ালের গায়ে হয় রোজ যে সব বিজ্ঞাপন ও ঘোষণা আটা-মেরে দেওয়া হয় তাদের ভাষা যেমন জমকালো, তেমনি গুরু গম্ভীর তার ভাষা। বক্তৃতার শেষে সে "কঠোরেন সমাপয়েৎ" করলে; হাকিমি ষ্টাইলে গালাগালি দিয়ে, তৃতীয় নেপোলিয়ান নামক সেই নচ্ছার ফ্রান্সের পরাজিত সম্রাটির উদ্দেশে।

ঐ শোনা মাত্রই বুল-অ-স্থইফ ক্ষেপে উঠল, কারণ সে ছিল বোনা-পার্টিষ্ট। মুখখানা চেরির চেয়ে বেশি লাল করে রাগে তোতলাতে তোতলাতে সে বলে চললে—"তাঁর জায়গাটিতে আপনাক দেখতে পেলে আমি খুসী হতেম—আর কেউ নয় কেবল আপনাকে, তাহলে ঠিক হত নয় কি? আপনার মত চরিত্রের যারা তারাই বিশ্বাস-ঘাতকের ব্যবহার করেছে তাঁর সাথে, আপনার মত যত ফকোড় লোক তাদের হাতে ফ্রান্সের শাসন ভার গেলে দেশে আর লোক রইত না!"

করনুদেৎ অবিচলিতভাবে তাচ্ছিল্য ব্যঞ্জক উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে। দু'জনে ঝগড়া বেধে যায় দেখে বহুকষ্টে লোয়াসে তাদের মাঝে পড়ে ঝগড়া থামিয়ে দিলেন—এই মন্তব্য করে' যে, আন্তরিক ভাবে যে যা বিশ্বাস করে তাই মূল্যবান। কাউণ্টেস ও মাদাম কারে লামাডোঁর মনে মনে রিপাব্লিকান মতের লোকের উপর অকারণ রাগ ছিল—এবং সাধারণতঃ মেয়েদের যেমন থাকে, তেমনি ডেস্পটিক গভর্ণমেণ্ট ও জাঁক জমকের উপর তাঁদের একটু আন্তরিক টান ছিল—তাঁরা মনে মনে তেজী স্বভাবের স্ত্রীলোকটির-

উপর খুসি হলেন—কারণ তাঁদের ও তার মত প্রায় এক রকমেরই।

খাবার ঝুড়ি শেষ হয়েছিল। দশজনে মিলে ওটাকে সাবাড় করা কিছুই নয়—সকলে মনে করলেন ঝুড়িটা আরও বড় হলে ভাল হত। কথাবার্ত্তা চলতে থাকল,—কিন্তু ভোজন ব্যাপারটি শেষ হবার পর থেকে, স্বভাবতই তার উৎসাহের কমতি দেখা গেল।

দিন শেষ হয়ে রাত্রি এসে পড়ল, আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘন হয়ে এল, আর সেই সঙ্গে ভয়ানক ঠাণ্ডা,—বুল দ্য-সুইফ অত মোটা হয়েও হি-হি করে কাঁপতে লাগল। তখন কাউন্টেস ব্রেভিল তাঁর "সোফারেট" তাকে ব্যবহার করতে দিলেন, সকাল থেকে অনেকক্ষণ তাতে নূতন করে কয়লা দেওয়া হয়েছিল, বুল-দ্য-সুইফ খুসী হয়ে গেল, কারণ তার পাদু'টো জমে যাবার মত হয়েছিল। মাদাম কারে-লামাডোঁ ও মাদাম লোয়াসেও তাঁদের সোফারেট Nun দুটিকে দিলেন।

গাড়ীর লণ্ঠনগুলো জ্বেলে দেওয়া হল। দ্রুত গতিতে চলার দরুণ ঘোঁড়ার গায়ের ঘাম থেকে ধোঁয়া উঠছিল। রাস্তা ঘন কুয়াশায় ভরে গিয়েছিল। ঐ আলোতে সব স্পষ্ট, চকচকে হয়ে উঠল। গাড়ী ছোটবার সাথে সাথে পথের দু'ধারে লণ্ঠনের আলো পড়ে মনে হতে লাগল যেন জমাট মাটিঢাকা বরফ নিজ হতেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে গাড়ীর ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ বুল-দ্য-সুইফ ও করনুদেৎ-এর মধ্যে একটু গা ঘেসাঘেসি হচ্ছে বোধ হল। লোয়াসেও অন্ধকারেই দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে পেলে, যেন ঐ

লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটি নিঃশব্দে ছুঁড়ে দেওয়া একটা কিল থেকে গা বাঁচাবার জন্য সরে বসল।

রাস্তার উপরে জায়গায় জায়গায় দু'একটা আলো দেখা যেতে লাগল। এতক্ষণে টোটে পাওয়া গেল। এগার ঘণ্টা ধরে গাড়ী চলেছে; আর পথে ঘোঁড়ার দানা খাবার ও দম নেবার জন্য বার চা'রেক থামতে হয়, তাতে গেল দু'ঘণ্টা একুনে এই তের ঘণ্টা সময় লেগেছে এই পথটুকু আসতে। সহরে ঢুকে গাড়ী হোটেল-দ্য-কমার্সের সুমুখে থামল।

অমনি চট করে দরজা খুলে গেল। পরিচিত একটা শব্দ কানে আসতেই যাত্রীরা আঁৎকে উঠল, শব্দটা হচ্ছে মাটিতে তলওয়ারের খাপ ছেঁচড়ানোর; সাথে সাথেই জার্ম্মান ভাষায় একটা লোক কি যেন বললে।

গাড়ী থেমে গেলেও কারও নামবার রকম দেখা গেল না— ভাবটা এই যে নামলেই বুঝি তাদের প্রাণ যাবে। কণ্ডাকটার এসে তার লণ্ঠনটা তুলে ধরতে গাড়ীর ভিতরটা আলো হয়ে উঠল,—আর নজরে পড়ল যাত্রীদের আতঙ্কের চেহারা—হাঁ-করা মুখ ও ভয়ে ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ।

আর দেখা গেল গাড়ীর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অল্প বয়সের এক জার্ম্মান অফিসার,—লম্বা শুক্‌নো, ফরসা তার চেহারা। মেয়েদের গায়ের করসেট যেমন করে এঁটে থাকে, তেমনি আঁটা তার য়ুনিফরম। টুপীটা মাথায় দিয়েছে, ইংরেজি হোটেলের খানসামার মত করে। সব চেয়ে অদ্ভুত দর্শন তার খোঁচা খোঁচা গোঁফের তাড়া।

সে আলসেসীয় ফরাসীতে যাত্রীদের নামতে বললে—অতি ভারী গলায়—"আপনাদের নামতে আজ্ঞা হোক্" ইত্যাদি।

সকলের আগে নামলেন Nun দুটি, কারণ সব রকমের আদেশ অনুজ্ঞা মাথা পেতে পালন করতে তাঁরা অভ্যস্ত। তারপর কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, ম'্যাসে ও মাদাম কারে-লামাডোঁ নামলেন। লোয়াসেও তার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ঠেলে দিয়ে নামল। ম্যাটিতে পা দিয়েই সে অফিসারকে বললে—"নমস্কার মশাই", অবশ্য এই নমস্কারের মধ্যে ভদ্রতার চাইতে খোসামোদই বেশী ছিল। অফিসার পাল্টা ভদ্রতা না করে নীরবে তার দিকে চেয়ে দেখল—যার হাতে সব ক্ষমতা, ভদ্রতা করা তার পক্ষে অনাবশ্যক।

করনুদেৎ ও বুল-দ্য-সুইফ দরজার একদম নিকটে ছিল, কিন্তু নামবার বেলায় সবার শেষে তারা নামল অত্যন্ত গম্ভীর ও উদ্ধত ভাবে, শত্রুর সুমুখে যেমন ভাব দেখাতে হয়। স্থূলকায় মেয়েটা শান্ত স্থির থাকবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, আর আমাদের ডেমোক্রাট তার লালচে দাড়ি কাঁপিয়ে ট্র্যাজিক চেহারা করে রইল। তাদের মনের ইচ্ছা যে শত্রুর সম্মুখে এমনি ভঙ্গী করে তারা দাঁড়ায় যাতে করে দেশের মানের কিছু খর্ব্বতা না হয়—কারণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তারা সকলেই স্বদেশের যে এক একটি প্রতিনিধি এটা মনে করা যেতে পারে। সঙ্গের অন্যান্য যাত্রীদের আদেশ পালনে অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে, বুল-দ্য-সুইফ গাড়ীর বাকী রমনী-দের চাইতে বেশী উদ্ধতভাবে চেয়ে দেখতে লাগল, সকলের দৃষ্টান্ত স্থানীয় হওয়া উচিৎ বিবেচনা করে। আর করনুদেৎ রাস্তার খালকাটা থেকে সুরু করে, শত্রুর যে সব বিরুদ্ধ আচরণ এ যাবৎ করে এসেছে, ভাব ভঙ্গিতে সেইটে বজায় রাখতে চেষ্টা করলে।

যাত্রীরা হোটেলের প্রকাণ্ড ঘরটায় গিয়ে বসে, অফিসারকে

প্রধান সেনাপতির সই-করা ছাড়পত্র দেখতে দিলে। তাতে প্রত্যেকের নাম, ধাম, পেশা ও চেহারার বর্ণনা ছিল। অফিসার সেখানি পড়ে, অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকের সাথে লিখিত বিষয়গুলি মিল করে করে হঠাৎ বলে উঠল—"ঠিক হয়েছে." তারপর সে চলে গেল।

এতক্ষণে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সকলের ক্ষিদে আবার চেগে উঠেছিল। খাবার হুকুম দেওয়া হল। খাবার তৈয়েরী হতে তখনও আধঘণ্টা দেরী, সকলে সেই অবসরে শোবার ঘর গুলো দেখে নিতে গেলেন।

তারপর টেবিলে খাবার দেওয়া হল। এমন সময়ে হোটেলের কর্ত্তা স্বয়ং এসে হাজির। সাবেক কালে সে ছিল ঘোঁড়ার ব্যবসায়ী,—দেখতে মোটা, হাঁপানি রোগগ্রস্থ, সর্ব্বদাই হাঁস ফাঁস করছে, কাশছে, গলা থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। তার নাম কোলেনভি।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "মাদমোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট ?"

—বুল দ্য-সুইফ কেঁপে উঠল। বললে, 'আমি"।

—মাদমোয়াজেল প্রুসীয় অফিসার এখনই আপনাকে ডাকছেন।

—আমাকে ?

—আপনাকে, যদি আপনিই মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট হন।

সে চিন্তিত হল, কিছুক্ষণ ভেবে বললে, "খুব সম্ভব আমাকেই ডাকছেন, কিন্তু আমি যাব না"।

চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল, সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন এই ডাকবার কারণ কি হতে পারে। কাউণ্ট তার কাছে

গিয়ে বললেন, "মাদাম একাজটা আপনার অন্যায় হল। কারণ, এই অবাধ্যতার জন্য হয়তঃ শুধু আপনার উপর নয়, দলের সকলের উপরেই কোন গুরুতর অত্যাচার হতে পারে। যারা বলবান তাদের বাধা দেওয়া সব সময়েই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই ব্যবহারের ভিতর কোন আশঙ্কার কারণ না থাকাই সম্ভব। হয়তঃ খুঁটিনাটি কোন নিয়ম কানুনের ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে"।

তখন সকলেই সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি, উপদেশ ইত্যাদিতে তাকে বুঝিয়ে তুললেন, কারণ সকলেরই জানা ছিল যে বর্ত্তমান অবস্থায় ইঙ্গিত মাত্রে যে কোন বিপদাশঙ্কা করা যেতে পারে। শেষে সে বললে, "জানবেন যে কেবল আপনাদের অনুরোধেই আমি যাচ্ছি"।

কাউণ্টেস তার হাত ধরে বললেন, "এজন্য আমাদের ধন্যবাদ"।

সে উঠে গেল। সকলে তার জন্য সবুর করতে লাগলেন, প্রত্যেকেই দুঃখ করতে লাগলেন যে ঐ বদ্‌মেজাজী রুক্ষ স্বভাব মেয়েটাকে না ডেকে, কেন তাকে ডাকা হল না। যদি তাকে ডাকা হত তবে কেমন করে কি-কি তিনি বলতেন মনে মনে সেই সব ঠিক করতে লাগলেন।

মিনিট দশেক পরেই সে যখন ফিরল তখন রাগে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, আর কেবল সে বলছে—"নচ্ছার, হতভাগা"—।

কি বৃত্তান্ত জানবার জন্য সকলে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু সে মুখ বুঁজে গোঁজ হয়ে থাকল। কাউণ্ট যখন নিতান্ত চেপে ধরলেন তখন গম্ভীরভাবে বললে,—"আর অনুরোধ করবেন না, আমি কিছুই বলতে পারব না"।

তখন সকলে খেতে বসে গেলেন, বড় রকমের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, তার সঙ্গে বেরল, বাঁধা-কপির গন্ধ। যাহোক এ গোলযোগ সত্বেও বেশ ফূর্ত্তির সাথে খাওয়া দাওয়া চলল : লোয়াসেও দম্পতী ও দুই Nun কেসিভার সুরা পান করতে লাগলেন বাকী সকলে অন্য মদ নিলেন, করনুদেৎ নিল বিয়র।

তার অভ্যাস ছিল কায়দা করে বোতলের মুখ খোলা,—খোলা মুখ দিয়ে ফেনা বের করা, তারপর গেলাসটা, বাতি আর তার চোখের মধ্যে উঁচু করে তুলে ধরে, মদের রঙ মালুম করবার জন্য সেটা বিচক্ষণ ভাবে দেখা। যখন সে গেলাসে চুমুক দিত তখন তার বিয়র-রঙিন লম্বা লম্বা দাড়ি আনন্দে একটু একটু কাঁপতে আরম্ভ হত। আর একদৃষ্টে সে চেয়ে দেখত তার বোতলটা ঠিক আছে কিনা। তখন তার ভাব দেখে মনে হত যে যে-মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে সংসারে জন্মেছে সেই কাজটি যেন সে সত্যই করছে। সকলেই বলত যে, তার জীবনের সেরা বাতিক, বিয়র ও রেভেল্যুশন। এই দুইয়ের মধ্যে সে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে ছিল, কাজেই মদের গেলাসে চুমুক দেবার সময় অপর বাতিকটির কথা স্বতই তার মনে উদয় হত।

ম্যাঁসে ও মাদাম ফোলোঁভি টেবিলের এককোণে খেতে বসলে ভাঙা এঞ্জিনের মত হাঁস ফাঁস শব্দ করতে করতে, ম্যাঁসে কোন গতিকে হাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কথা বলা একেবারেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু মাদাম তাঁর রসনাকে একটুও বিরাম দিচ্ছিলেন না। তিনি অনবরত বকে যাচ্ছিলেন কেমন করে প্রুসীয়ানেরা এল, কি তারা করলে, কি তারা বললে ইত্যাদি। এসেই ওরা টাকার দাবী করে, এজন্য একচোট গাল দিয়ে নিলেন, তারপর তাঁর দুই ছেলে

সৈন্য দলে আছে এজন্য আরেক চোট গাল দিয়ে নিলেন। কাউণ্টেসকে উদ্দেশ করেই মাদাম কথা বলছিলেন—অতখানি উচ্চ পদবীর মহিলার সাথে কথা বলাও যে একটা গৌরবের বিষয়।

তারপর গলা একটু নীচু করে গোপনতর কথাগুলো বলতে লাগলেন। তাঁর স্বামী মাঝে মাঝে—"আপনার মুখটা বন্ধ করলেই ভাল হত মাদাম ফোলাঁভি"—এই বলে বাধা দিতে চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু মাদাম সে কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে কথা কয়েই চললেন—

—"হ্যাঁ মাদাম, ঐ হতভাগা গুলো ওরা খেতেই বা জানে কি ছাই? কেবল আলু আর শূয়োর, শূয়োর আর আলু! আর বেটারা যে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তা শুনলে ঘেন্নায় নাক সিটকবেন! ওদের কুচ কাওয়াজ যদি দেখতেন—একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে সব গুলো জড় হবে—তারপর চলবে একবার আগে, একবার পিছে, একবার এদিকে একবার ওদিকে—এইত ব্যাপার! এর চেয়ে বাড়ী বসে হাল লাঙ্গল চষলে বা পথঘাট তৈয়েরীর কাজ করলেও ভাল হ'ত। এইসব অকেজো সৈন্য সামন্ত দিয়ে কার কি লাভটা হয় শুনি? তারা যেখানে সেখানে মানুষ খুন করে' বেড়াবে আর যত গরীব বেচারারা তাদের পেট ভরাবে। আমি ত মুখ্যু সুখ্যু বুড়ো মেয়ে মানুষ মাত্র—কিন্তু সকাল সন্ধ্যা ওদের ঐ লাফ ঝাঁপ দেখে আমারও মনে হয়—সংসারে কতলোক আছে যারা কি করে ভাল করবে, ভাল হবে, তাই চেষ্টা করছে, আর ঐ যে হতভাগাগুলো কিসে মন্দ করবে তারই তল্লাসে ফিরছে। আচ্ছা, প্রুশীয় হোক, ইংরেজ হোক, আর ফরাসি হোক, মানুষ মারা কি পাপ নয়? কেউ যদি

অন্যায় করে, পাল্টা যদি তার প্রতিশোধ নেও সকলে তোমাকে দুষবে—আর চোর ডাকাতের মত, যে যত মানুষ খুন করবে, তাকে তত ভাল ভাল খেলাত, ইনাম দেওয়া হবে? এ ব্যবস্থার মহিমা আমার মাথায় ঢোকে না বাপু!

করমুদেৎ বললে, "যুদ্ধ হচ্ছে বর্ব্বরতা যখন শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রতিবেশী জাতকে খামকা আক্রমণ করা হয়; কিন্তু স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য!"

বুড়ো স্ত্রীলোকটি মাথা নামিয়ে বললে,—

"হ্যাঁ আত্মরক্ষার কথা আলাদা কথা? কিন্তু যে সব রাজা রাজড়া মজা দেখবার জন্যই লড়াই বাধায়, তাদের মেরে ফেলা উচিৎ নয় কি"?

করমুদেৎ সোৎসাহে বলে উঠলে,—"বাহবা! বেশ বলেছেন"।

ম্যাঁসে কারে-লামাডো গম্ভীর চিন্তামগ্ন হলেন। বড় বড় নাম-জাদা সেনাপতিদের তিনি রীতিমত ভক্তি করতেন—ঐ মুর্খ স্ত্রীলোকটি সহজ বুদ্ধিতে যা বললে সেই কথাটা তিনি ভাবতে লাগলেন। বাস্তবিক অতগুলো লোককে নিষ্কর্ম্ম রেখে দেশের ধনাগমের কতখানি ক্ষতি করা হচ্ছে ও কতখানি শক্তির অপচয় হচ্ছে,—তার জায়গায় ওদের বড় বড় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকর নানাকাজে,—যা হয়ত বহুশত বৎসরেও শেষ হবে না,—লাগিয়ে দিলে কত মঙ্গল হয়।

এদিকে লোয়াসেও নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে হোটেল ওয়ালার সাথে নীচু গলায় আলাপ করতে বসলে। লোয়াসেওর রসিকতায় ঐ মোটা মানুষটি হেসে, কেশে, থুথু ফেলে একটা

বিতিগিচ্ছি কাণ্ড করে তুললে—তার এই মোটা ভুঁড়ি ফূর্তিতে নড়ে, নড়ে উঠতে লাগল। শেষটা হল এই যে, সে স্বীকার করে ফেললে যে বসন্তকালে প্রুসীয়ানেরা চলে গেলে সে লোয়াসেওর কাছ থেকে ছয় পিপে বরড্যো মদ কিনবে।

সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন, আহার শেষ হতেই শয্যা আশ্রয় করতে ছুটলেন।

লোয়াসেওর নজরে দু'একটা জিনিস পড়েছিল। সে আগে তার স্ত্রীকে শুইয়ে দিলে,—তারপর দরজার ফুটোয় একবার চোখ, একবার কান লাগিয়ে, কোন মজা দেখা কি শোনা যায় কিনা তাই আবিষ্কার করবার মতলব করলে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে খস্ খস্ শব্দ শুনে ভাল করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে যে বুল-ড্য-সুইফ একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে করিডোরের শেষদিক পানে যাচ্ছে। শাদা লেশ লাগানো নীল কাশ্মিরী নাইট-গাউন তার গায়ে, আর তাতে করে তাকে আরও মোটা সোটা দেখাচ্ছে। করিডোরের পাশের একটা দরজা হঠাৎ খুলে গেল। বুল-ড্য সুইফ ফেরবার সময় দেখলেন করনুদেৎ সার্ট গায়ে তার পিছু পিছু আসচে। খুব আস্তে দু'জন কথা কইছিল, তারপর থেমে গেল। মনে হল বুল-ড্য-সুইফ তার ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে করনুদেৎ-এর পথ আটকাচ্ছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদের কথাবার্তা লোয়াসেওর কানে আসছিল না। কিন্তু খানিক বাদে দু'জনের গলা চড়ে উঠতে লোয়াসেও কিছু কিছু শুনতে পেল।

করনুদেৎ জিদ করতে লাগল, "তুমি বড় বেকুব, খামকা এমন করছ কেন"?

বুল-দ্য-সুইফ রেগে উঠে বললে,—"আজ্ঞে না; যখন তখন এমন চলে না বিশেষতঃ এখানে—অত্যন্ত লজ্জার বিষয়"।

করনুদেৎ কথার অর্থ না বুঝতে পেরে বললে, "কেন" ?

আরও চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বুল-দ্য-সুইফ বললে,—"কেন ? কেন তা কি বোঝ না ? এ বাড়ীতে প্রুসীয়ানেরা থাকতে,—হয়ত পাশের ঘরেই তাদের কেউ না কেউ রয়েছে"।

করনুদেৎ চুপ করে গেল। সাধারণ একটা বেশ্যার এই ব্যবহার, যে শত্রুর কাছে থাকতে কোন আমোদ আহ্লাদ অকর্ত্তব্য! এতে তার স্তিমিত প্রায় পাট্রিয়টিক আত্মা চেগে উঠল,—ফলে সে এক লাফে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

লোয়াসেওর মনে ভারি ফূর্ত্তি বোধ হল। সে একা একাই ঘরের মধ্যে—এক চোট নেচে নিয়ে, স্ত্রীকে জাগিয়ে তুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই বাড়ীর উপর কি নীচ একটা দিক থেকে উননের উপর ঢাকা দেওয়া কেৎলীর শব্দের মত ভারি গোছের ও একঘেয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল। বোঝা গেল ম্যাঁসে ফোলেঁাভি—ঘুমুচ্ছেন।

ঠিক হয়েছিল যে পরদিন সকালে আটটায় এখান থেকে রওনা হওয়া হবে, তাইতে খুব ভোরেই সকলে বাইরে এসে জুটলেন। কিন্তু দেখা গেল আঙ্গিনার এক কোণে আগাগোড়া বরফ-ঢাকা হয়ে গাড়ীখানা খাড়া করা রয়েছে—তার ঘোড়াও নেই, কোচওয়ানও নেই। আস্তাবলে, এখানে-সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘোড়া বা চালকের দেখা মিলল না। তখন বাইরে এদিক-ওদিক খুঁজে

দেখবার মতলবে সকলে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই, সুমুখে নজর পড়ল, গির্জ্জা ও তার দুইদিকে কতকগুলি নীচু বাড়ী ও তাতে দু'চারজন প্রুশীয়ান সৈন্য। প্রথমে যাকে তাঁরা দেখলেন, সে বসে আলু ছাড়াচ্ছে। দ্বিতীয় জন একটু দূরে নাপিতের দোকান ধুয়ে সাফ করছে। আরেকজন যার দাড়ী একেবারে চোখ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে, সে দুই হাঁটুর উপর একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে, চুমো খেয়ে খেলা দিয়ে তার কান্না থামাতে চেষ্টা করছে। দেখতে মোটা-সোটা সব চাষার গিন্নীরা, হাত মুখ নেড়ে ইসারায়, তাদের অনুগত ও বাধ্য বিজিতাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, কি কি কাজ তাদের করতে হবে, —যথা কাঠ চেলা করা, সুপ তৈয়ারী, কাফি গুঁড়ো করা ইত্যাদি। একজন আবার তার অতি বৃদ্ধা, অক্ষম বাড়ীওয়ালীর কাপড় চোপড় কেচে সাফ করে দিচ্ছে।

কাউণ্ট আশ্চর্য্য বোধ করলেন। পাদরীর বাড়ী থেকে চার্চ্চের একটি কর্ম্মচারী বেরিয়ে আসছিল,—তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সেই বুড়োটি বললে, "ওঃ! এদের কথা বলছেন? এরা আদপেই হারামজাদা নয়, যদি খাঁটি প্রুশীয়ানরা তাই বটে। এরা সকলেই বাড়ীতে স্ত্রী ও কাচ্চা বাচ্চা ফেলে এসেছে,—লড়াইতে ওরা কোন আহ্লাদ বোধ করে না। ওদের বাড়ীর মেয়েরাও ওদের জন্য কান্নাকাটি করছে, যেমন আমাদের সকলে করছে। লড়াইয়ের ফলে জেতা বিজেতা দুই জাতির দেশেই এমনি চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে এখনও তেমন কিছু খারাপ ব্যবহার করা হয়নি আর লোক গুলো ভাল, ঘরের মানুষের মতই কাজ কর্ম্ম করে,— সকলেই একরকম বনি বনাও করে আছে। দরিদ্র বলেই এরা

পরস্পরের সাহায্য আশা করে, আর বড় লোক, ধনী যারা, তারা কেবল লড়াই বাধিয়ে মজা দেখেন।

জেতা বিজেতা দুই দলের মধ্যে এমনতর সদ্ভাবের পরিচয় পেয়ে করন্দুদেৎ চটে গিয়ে আর না এগিয়ে হোটেলের দিকে ফিরলে। লোয়াসেও একটু হেসে রসিকতা করলে, ম্যাঁসে কারে-লামাডোঁ গম্ভীর ভাবে একটা মন্তব্য করলেন। কিন্তু কোথাও কোচওয়ানের দেখা মিলল না। শেষটায় গাঁয়ের কাছে তাকে পাওয়া গেল, সে অফিসারের আর্দ্দালীর সাথে দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক টেবিলে বসে পান ভোজন করছে। কাউণ্ট তাকে বললেন,

—তোমাকে আটটায় গাড়ীতে ঘোড়া জুৎতে বলা হয়েছিল না?

—হাঁ; তারপর আমাকে আরেকটা আদেশও দেওয়া হয়।

—কি আদেশ?

—গাড়ীতে ঘোড়া যেন না জোতা হয়।

—কে তোমাকে এ আদেশ দিয়েছে?

—প্রুসীয়ান কমণ্ডাট মহাশয়।

—কেন?

—আমি কিছু জানিনে—বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন-গে। আমাকে গাড়ী জুৎতে নিষেধ করা হল আমি গাড়ী জুৎলেম না। ব্যস্।

—তিনি নিজ মুখে তোমাকে এ হুকুম দিয়েছেন?

—না মশাই হোটেলওয়ালা তাঁর হয়ে বলেছে।

—কখন?

—কাল সন্ধ্যায় যখন শু'তে যাই।

ভদ্রলোক তিনজন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে ফিরলেন।

ম্যাঁসে ফোলেঁভিকে খুঁজতে গিয়ে তাঁরা জানলেন হাঁপানির জন্য সে দশটার আগে বিছানা থেকে ওঠে না। তার বিশেষ নিষেধ ছিল যে ঘরে আগুন লাগা কিম্বা আর যে কারণেই হোক্ তাকে ঐ সময়ের আগে যেন জাগানো না হয়।

তাঁরা অফিসারের সাথে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু অফিসার যদিও ঐ হোটেলেই থাকত, তার সাথে দেখা হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। ম্যাঁসে ফোলেঁভি ছাড়া আর কারও সাধারণ ব্যাপার বিষয়ে কথা বলবার অনুমতি ছিল না। বাধ্য হয়ে সকলকে অপেক্ষা করতে হল। স্ত্রীলোকেরা আপন আপন ঘরে চলে গেলেন, যা করে হোক সময়টা ত কাটাতে হবে।

করনুদেৎ বসবার ঘরে প্রকাণ্ড চীমনীর কাছে গিয়ে বসল; তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। সেখানে কাফের ছোট একটা টেবিল ও বিয়ারের ভাঁড় নিয়ে এসে, নিজের পাইপটা বের করে, সময় কাটাবার উপায় করে নিল। ডেমোক্রাট দলের মধ্যে করনুদেৎ এর পাইপ প্রায় করনুদেৎ-এর সমান খ্যাতি লাভ করেছিল, করনুদেৎ এর মত লোকের কাজে লেগে সে দেশের কাজই করেছে, এই রকমটা সকলের মনের ভাব। সে পাইপটির চেহারা ভারি চমৎকার, এনামেল করা তার প্রভুর দাঁতের মতই কাল, ঝকঝকে চকচকে, একটু বাঁকা, তাম্রকুট সুরভিত। তার পাইপের সাথে করনুদেৎ এর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে মনে হত সেটা যেন করনুদেৎ-এর দেহেরই একটা অঙ্গ, তার মুখের সম্পূর্ণতা সম্পাদক ও শোভাবর্দ্ধক আবশ্যকীয় অবয়ব। নড়ন চড়ন বিহীন হয়ে গম্ভীর

ভাবে বসে কখনো সে চীমনীর জ্বলন্ত আগুনের উপর দৃষ্টিপাত করছিল, কখনো বা ভাঁড়ের সফেন বিয়রের উপর নজর দিচ্ছিল। থেকে থেকে এক চুমুক করে মদ খেয়ে, লম্বা সরু সরু আঙুল-গুলো মাথার অপরিষ্কার লম্বা চুলের মধ্যে বুলিয়ে যাচ্ছিল, গোঁফের সাথে যে মদের ফেনা লেগে যাচ্ছিল, সে তা চুষে নিচ্ছিল।

লোয়াসেও একবার হেঁটে ছুঁটে শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোলবার অছিলায় ঐ জায়গায় খুচরা মদের দোকানে নিজের মাল বিক্রয়ের চেষ্টাতে বেরিয়ে গেল। কাউণ্ট ও ম্যাঁসে কারে-লামাডো পোলি-টিকস আলোচনা করতে লাগলেন। ফ্রান্সের ভবিষ্যত তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একজনের মত যে ভবিষ্যৎ অর্লিয়ানিষ্ঠ দলের হাতে, অপরের বিশ্বাস যে দৈব প্রেরিত কোন মহাপুরুষ ও বীর, যিনি দেশের চরম দুর্দ্দশার সময় হঠাৎ দেখা দেবেন, যা কিছু করবার তাঁরই হাতে। সে হয়তঃ একজন দ্বিতীয় "দু-গেসাক্লিন" বা "জাঁন ডার্ক" বা প্রথম "নাপোলিয়ঁ।" আহা! সম্রাটের ছেলেটি যদি অত অল্প বয়সের না হত! করনুদেৎ গম্ভীর ভাবে এইসব কথাবার্ত্তা শুনছিল—যেমন ভাবিষ্যদ্বক্তার সাথে দৈবজ্ঞ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্যক্তি এই ধরণের কথাবার্ত্তা কানে তুলে থাকে। তার পাইপের গন্ধে ও ধোঁয়ার ঘর ভরে উঠেছিল।

এদিকে দশটা বাজতে ম্যাঁসে ফোলেঁভি দেখা দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি একটুও অদল বদল না করে বার তিনেক এই একই কথাগুলো শুনিয়ে দিলেন।—"অফিসার মহাশয় আমাকে বললেন, 'ম্যসেঁ ফোলেঁভি, আপনি উপস্থিত যাত্রীদের

গাড়ীতে কালকে ঘোড়া জুৎতে নিষেধ করে দেবেন। আমার বিনা হুকুমে যেন তারা না যায়।' শুনলেন ত? ব্যস্।"

তখন তাঁরা অফিসারের সাথে দেখা করতে চাইলেন। কাউণ্ট তাঁর কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাঁসে কারে-লামাডোঁ সেই কার্ডের উপর নিজের নাম ও সবগুলো খেতাব লিখে দিলেন। অফিসার বলে পাঠালে যে তার প্রাতভোজন শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ একটার সময় সে তাঁদের বক্তব্য শোনবার অবসর পাবে।

মহিলারা নেমে এলেন। সকলেই চিন্তিত ও ব্যাকুল। যেমন তেমন করে' খাওয়া দাওয়া হল। বুল-ডু-সুইফকে দেখে মনে হল তার বোধহয় অসুখ করেছে, সে ভয়ানক অসোয়াস্তি বোধ করছে।

তাঁদের কাফি পান শেষ হয়েছে, এমন সময় আর্দ্দালী এসে ভদ্রলোক দু'জনকে ডাকল।

লোয়াসেও তাঁদের দু'জনের সাথে যোগ দিল। তাঁরা দলভারী করবার জন্য—কর্নুদেৎকেও ডাকলেন কিন্তু সে গর্ব্বিত ভাবে জানিয়ে দিল যে সে জীবনে কখন জার্ম্মাণদের সাথে সন্ধি করে নি। টান হয়ে চীমনীর কাছে বসে সে আরেক জাগ্ বিয়র আনবার হুকুম দিলে।

তিনজন উপরে উঠে গেলেন। হোটেলে সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে অফিসার থাকত, সেই ঘরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল। অফিসার একখানা আরাম-চেয়ারের উপর শুয়ে চীমনীর উপর দুই পা রেখে তাঁদের সাথে দেখা করলে। তার গায়ে জলজলে রংয়ের ঢিলা ইজার, যেটা সম্ভবতঃ কোন সৌখিন ভদ্রলোকের

পরিত্যক্ত ঘর থেকে চুরি করা হয়েছে, আর মুখে একটা লম্বা পোরসিলেনের পাইপ। সে উঠে তাঁদের অভ্যর্থনা করলে না, নমস্কার করলে না, এমন কি তাঁদের দিকে একবার তাকালে না পর্য্যন্ত। যুদ্ধে জয়ী সৈন্যের ছোটলোকী নবাবীর এমন চূড়ান্ত উদাহরণ দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে সে বল্‌লে,

— কি চাই আপনাদের ?

কাউণ্ট বললেন,—আমরা এখান হতে বিদায় হতে চাই।

—না।

— কি কারণ জানতে পারি কি ?

—কারণ, যাওয়া হবে না।

—দেখুন আপনাদের প্রধান সেনাপতি মহাশয়, দীয়েপ পর্য্যন্ত যাবার জন্য নিজ হাতে আমাদের ছাড়পত্র দিয়েছেন। আশাকরি আপনার বিরক্তিকর কোন কাজ আমাদের দ্বারা করা হয়নি।

— যাওয়া হবেনা, ব্যস। আপনারা এখান থেকে যেতে পারেন। তাকে নমস্কার করে তিনজনে নেমে এলেন।

বিকেল বেলায় সকলের অসোয়াস্তি বেড়ে উঠল। জার্ম্মাণটার এই খেয়ালের হদ্দ মুদ্দ কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। এক একজন এক এক রকম ভাবতে লাগলেন। সেই ঘরে বৈঠক বসল—প্রত্যেকের মাথায় এক একটা উদ্ভট কল্পনা। কেউ বলে জামিন স্বরূপ তাদের আটকে রাখা হবে—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ? কেউ বললে যে তারা যুদ্ধ-বন্দী। কেউ বল্‌লে যে তাদের কাছ থেকে মোটারকম খালাসী টাকা আদায় করা হবে। এই কথায় সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। যারা যত বেশী ধনী, তারা তত ভয়

খেল। তাঁরা স্পষ্ট চক্ষে দেখতে লাগলেন যে উদ্ধত সৈন্য বেটারা তাঁদের মুক্তির বিনিময়ে থলে থলে টাকা কেড়ে নিচ্ছে। সকলে মাথা খুঁড়ে ভাবতে লাগলেন, কি রকম মিষ্টি করে মিথ্যা বললে, কি রকমে দারিদ্র্যের—একেবারে হত দারিদ্র্যের, ভাণ করলে ঐ দুষমণদের মন একেবারে ভেজানো যাবে। লোয়াসেও তার ঘড়ীর চেইন খুলে নিয়ে পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। রাত্রে সকলের ভয় ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেল। আলো জ্বালা হল। ডিনারের তখনও দু ঘণ্টা বিলম্ব দেখে মাদাম লোয়াসেও বললেন তাস খেলাতে মনটা ত ব্যস্ত থাকবে। সকলে রাজি হলেন। করনুদেৎও ভদ্রতা করে পাইপ নিবিয়ে খেলায় যোগ দিল।

কাউণ্ট তাস বেঁটে দিলেন। খেলার ঝোঁকে সকলের মনে যে ভয় ছিল সেটা চাপা পড়ে গেল। করনুদেৎ দেখছিল যে লোয়াসেও গৃহিনী তাসে কেবল চুরির চেষ্টায় আছেন।

তারপর খাবার টেবিলে যেতে যখন সকলে উঠে দাঁড়ালেন তখন ম্যাঁসে কোলেঁভি ফের দেখা দিলেন। মুখ থেকে পোড়া মাংসের মত গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে তিনি বললেন,—

—"প্রুসীয় অফিসার মশাই জানতে চাইছেন যে মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট তাঁর মত বদল করেছেন কি না।"

বুল-দ্য-সুইফ দাঁড়িয়েছিল, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একেবারে লাল হয়ে উঠে রাগের চোটে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলে না। শেষে একেবারে চেঁচিয়ে উঠলে,—

—"যান, সেই বদমাইস, সেই ছুঁচো, সেই নচ্ছার প্রুসীয়ানটাকে

বলুন্‌গে যে আমি কখন রাজি হব না—কখন না, কখন না, কখন না, শুনছেন?"

মোটা লোকটা বেরিয়ে গেল। তারপর সকলে তাকে ঘিরে ধরে অনুরোধ, উপরোধ করতে লাগলেন, হোটেল-ওয়ালার এই আগমনের রহস্য জানবার জন্য। প্রথমে সে বলবে না বলে জিদ করলে; কিন্তু রাগের মাথায় সামলাতে না পেরে বলে ফেললে,—

—কেন? ওটা কি চায়? ও চায় যে রাত্রে আমি ও বেটার কাছে থাকি।

সকলের এত রাগ হয়েছিল যে কথাটা শুনে কেউ মুখ ফেরালেন না। কর্‌নুদেৎ ঠাস করে "জাগটা" টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে সেটা ভেঙে ফেললে। এর অর্থ হচ্ছে সেই দুশ্চরিত্র লোকটার উপর সকলের অসন্তোষ জ্ঞাপন, ক্রোধের অভিব্যক্তি, বাধাপ্রদানে সকলের মধ্যে একতা স্থাপন—যেন বুল-দ্য-সুইফের উপর এই নির্য্যাতন সকলের গায়েই বিঁধেছে। কাউণ্ট বিরক্তির সাথে মন্তব্য করলেন যে এই লোকগুলো প্রাচীন কালের বর্ব্বরদের মত ব্যবহার করছে। সবার চেয়ে মহিলারাই বুল-দ্য-সুইফের উপর সদয় ও প্রণয়ের ভাব দেখাতে লাগলেন, Nun দুটি লাঞ্চের টেবিলে দেখা দেন নি—তাঁরা এখন তার মাথায় একটা করে চুমা খেলেন, কোন কথা মুখ দিয়ে বের করলেন না।

প্রথমে উত্তেজনা থেমে গেলে সকলে খেতে বসলেন। কথাবার্ত্তা তেমন হল না; সকলেই চিন্তামগ্ন।

মহিলারা যথাসময়ে নিজ নিজ কক্ষে চলে গেলেন। পুরুষেরা তাস নিয়ে বসলেন। ম্যাসে কোলোভিঁকে আহ্বান করা হল এই

মতলবে যে হয়ত জেরা করে তার কাছ থেকে জানা যাবে কোন কল কৌশলে প্রুসীয়ান অফিসারকে তাদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিতে রাজি করা যায় কিনা? কিন্তু ম্যাঁসে কোলেভিঁ তার হাতের তাস নিয়েই ব্যস্ত,—কারও কোন কথা কাণে না তুলে ও কোন জবাব না দিয়ে সে কেবলই বলতে লাগল—"হাতের তাস দেখুন, আপনারা খেলুন"। খেলাতে সে এতই মগ্ন হয়ে গেল যে অভ্যাস মত থু-থু ফেলবার কথা পর্য্যন্ত তার ভুল হয়ে গেল। বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বের হয়ে হাঁপানির সবগুলো রাগ রাগিনী বাজাতে থাকল, ভস্ ভস্ থেকে চিঁ চিঁ পর্য্যন্ত।

তার স্ত্রী একদফা ঘুমিয়ে নিয়ে তাকে ডাকতে এল, সে গেল না। সে একাই চলে গেল কারণ তার অভ্যাস ছিল সূর্য্য ওঠবার সাথে সাথে শয্যা ত্যাগ করা, কিন্তু তার স্বামী নিশাচর, রাত্রিটা বন্ধু বান্ধবের সাথে কাটিয়ে দিতে পারলে বেশী খুসী।—"আমার ডিম সিদ্ধ আগুণের কাছে রেখে দিও,"—স্ত্রীকে এই কথা বলে সে খেলায় মন দিল। সকলে যখন দেখলেন যে লোকটার কাছ থেকে কিছুই আদায় হবে না, তখন "শোবার সময় হয়েছে", এই বলে খেলা ভেঙ্গে দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

খুব সকালেই সকলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। প্রত্যেকের মনে অনিশ্চিত আশা, ঐ ক্ষুদ্র আরামহীন হোটেল থেকে পালাবার জন্ত ব্যাগ্রতা। কিন্তু হায়! ঘোড়া গুলো তখনো আস্তাবলে বাঁধা, কোচয়ান আগের মত অদৃশ্য। নিরাশ হয়ে সকলে সেই খানে গাড়ীর চার পাশেই বার কতক ঘুরলেন।

নীরবে প্রাতরাশ শেষ হল। ইতিমধ্যেই বুল-দ্য-স্থইফের উপর

সকলের ভালবাসার ভাটা ধরেছিল; রাত্রে নাকি বুদ্ধি পাকে, তাই সকাল বেলায় সকলেরি মতামত কিছু বদলে গিয়েছিল। ধর ও যদি রাত্রে টুক্ করে অফিসারের কাছ থেকে ঘুরে আসে, তা হলে সকালে উঠে বাঁকী সঙ্গীদের কেমন অবাক্ করে দিতে পারে! আর গোলযোগই বা এর মধ্যে কি আছে? কেইবা জানবে? অফিসারকে বলে দিলেই হল যে তার সঙ্গীদের কষ্টে সহানুভূতি পরবশ হয়ে সে এতে বাধ্য হয়েছে; তা হলেই মান রক্ষা হয়? আর ওর নিজের কথা ধরলে, সেটাত কিছুই নয়।

কিন্তু এই কথাগুলো কেউ সাহস করে মুখ দিয়ে বের করলেন না।

বিকেলে বসে থেকে থেকে সকলের তি-তি বিরক্তি ধরে গেল। কাউণ্ট তখন প্রস্তাব করলেন যে গাঁ-য়ের ভিতর একবার ঘুরে আসা যাক্।

বেশ ভাল করে গায়ে কাপড় চোপড় দিয়ে ছোট দলটি বেরিয়ে পড়ল। বাঁকী থাকল করনুদেৎ ও Nun দুটি। করনুদেৎ আগুনের কাছে বসে রইল; Nun যুগলের সময়, চার্চ্চে বা পাদরীর গৃহেই কেটে যেত।

ঠাণ্ডা, দিন দিন বেড়েই চলছিল, সকলের নাক কান বরফ হয়ে গেল। পা হিমে ঝিম হয়ে গেল—এক পা এগোতেই ভয়ানক কষ্ট। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই একঘেয়ে, সীমাহীন সাদা মাঠ, যা দেখেই গায়ে শীত ধরে। বিরক্ত হয়ে সকলে ফিরে এলেন, মন ও প্রাণে যেন বরফে চাপ পড়েছে, এই ভাব নিয়ে।

স্ত্রীলোক চারজন আগে ও পুরুষ তিনজন পাছে, এই ভাবে সকলে চলছিলেন।

১

লোয়াসেও সমস্ত অবস্থা এক আঁচে বুঝে নিয়েছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল যে "ঐ মাগীটা" আর কতদিন তাদের এমনি করে আটকে রাখবে। কাউণ্ট সব সময়ে ভদ্র, তিনি বললেন যে, কোনো লোক স্ত্রীলোকের কাছ থেকে এমন মর্ম্মঘাতী ত্যাগ স্বীকার, দাবী করতে পারেন না। সেটা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ম্যাসে কারে-লামাডো বললেন যে যে রকম শোনা যাচ্ছে, ফরাসীরা যদি দীয়েপ থেকে প্রতি-আক্রমণ করে', তবে সে সংঘর্ষ টোটের কাছে ভিতে হওয়াই সম্ভব, বাকী দু'জন এই কথা শুনে চিন্তিত হলেন।— "যদি পায়ে হেঁটে আমরা পালাই," লোয়াসেও এই কথা বললে। কাউণ্ট ঘাড় নাড়লেন। "এই বরফের ভিতর দিয়ে, স্ত্রীলোক সাথে নিয়ে,—কি যে বলছেন? তারপর তখনই পিছু পিছু লোক ছুটে দশ মিনিটের মধ্যে গ্রেপ্তার করে আনবে—তখন সম্পূর্ণরূপেই ঐ বেটাদের হাতে পড়তে হবে"। কথাটা ঠিক, সকলে চুপ করে রইলেন।

মহিলারা সাজসজ্জা সম্বন্ধে আলাপ করছিলেন—কিন্তু একটা বাধ বাধ ভাবের দরুণ সে আলাপ তেমন জমে উঠছিল না।

হঠাৎ দেখা গেল যে রাস্তার মাথায়—অফিসার আসছে। জমাট বরফের উপর দিয়ে. বোলতার মত সরু কোমর ও দীর্ঘ দেহ য়ুনিফরমে ঢেকে সটান হয়ে, মিলিটারী কায়দা মাফিক সযত্নে পালিশ করা চকচকে বুট যাতে নষ্ট না হয় এজন্য দু'পা ফাঁক করে, সে পা টেনে টেনে হেঁটে আসছিল।

মহিলাদের পাশ দিয়ে যেতে মাথা নুইয়ে, এবং অতিশয় তাচ্ছিল্যের সাথে পুরুষদের দিকে তাকিয়ে সে চলে গেল। তাঁদের

এই সম্ভ্রম বোধটুকু ছিল যে তাঁরা খাতির দেখাবার চেষ্টা কেউ করলেন না। যদিচ লোয়াসেও টুপী ওঠাবার জন্য হাতটা তুলেছিল।

বুল-ড্য-সুইফ কান অবধি রাঙা হয়ে উঠল; বাকী তিনজন বিবাহিতা মহিলা, বুল-ড্য-সুইফের সাথে এক সঙ্গে বেড়াতে অফিসার তাঁদের দেখলে—এতে মনে মনে অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন,—কারণ, সে ও হতভাগীকে কি চোখে দেখে তাত আর কারও অজানা নেই।

তারপর সকলে তার সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন,—তার গড়ন, তার মুখের চেহারা এইসব। মাদাম কারে-লামাডোঁ অনেক অফিসার দেখেছিলেন,—তিনি বিশেষজ্ঞের মত সমালোচনা করে বললেন, যে মন্দ নয়। তিনি আপশোষ করলেন যে সে ফরাসী নয়, কারণ তাহলে "হুসারের" পোষাকে তাকে চমৎকার দেখাত ও যত স্ত্রীলোক তার জন্য ক্ষেপে উঠত।

ফিরে এসে তার পর কি করা যাবে তা কারো মাথায় খেলল না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসে কেউ কেউ গরম হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ও নীরবে ডিনার শেষ হয়ে গেল। সকলে উপরে উঠে গেলেন ঘুমিয়েই সময় কাটানো যায় কিনা দেখা যাক বলে।

পরদিন সকালে সকলে নেমে এলেন, ক্লান্ত মুখের চেহারা ও মনে নির্ব্বাক-ক্রোধ নিয়ে। মহিলারা বুল-ড্য-সুইফের সাথে কথাবার্ত্তা একরকম বন্ধ করে দিলেন।

কোন নবজাত শিশুর অভিষেক উপলক্ষে হঠাৎ গির্জ্জায় একটা ঘড়ী বেজে উঠল। আমাদের স্থূলকায় স্ত্রীলোকটির একটি ছেলে

"দ'ইভটোৎ" নামে কৃষকের গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিল। সে বছরে একবার করেও তাকে দেখত না, কখনো তার কথা ভাবতও না। কিন্তু যে শিশুটির অভিষেক হচ্চে তার কথা ভেবে হঠাৎ তার মনে নিজের শিশুটির উপর প্রবল স্নেহ জেগে উঠল। এই অভিষেক দর্শনের ইচ্ছা চাপতে না পেরে সে বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র উপস্থিত সকলে পরস্পরের প্রতি চেয়ে চেয়ার টেনে এনে ঘেঁষে বসলেন, কারণ বর্ত্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে কোন উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য। লোয়াসেওর মাথায় এক বুদ্ধি খেলল। সে বললে যে অফিসারকে গিয়ে বলা যাক যে সে শুধু বুল-দ্য-সুইফকে আটক রেখে বাকী সকলকে ছেড়ে দিক।

ম্যাসে কোলেঁভি এই ভার নিয়ে গেলেন। কিন্তু উপরে যাওয়া মাত্রই তাকে নেমে আসতে হল। অফিসার মানুষের স্বভাব জানত, সে বলে দিলে যে তার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে সকলকেই আটক রাখবে—কাজেই কোলেঁভিকে দরজা থেকেই ফিরতে হল।

ব্যাপার দেখে মাদাম লোয়াসেওর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে অতি নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্বভাব সিদ্ধ ইতরতার সহিত বললে—

"এখানে বসে বসে বুড়ো হয়ে মরতে আমরা কেউ রাজি নয়। ও ছুঁড়ীটার পেশাই যখন, সব রকমের মানুষকে ঘরে নেওয়া তখন এমনতর বাছাবাছির দরকার কিরে বাপু? আপনারা জানেন না ও মাগী রোঁয়ায় যাকে তাকে ঘরে ঢুকিয়েছে, এমন কি গাড়ীর কোচওয়ান পর্য্যন্ত! আজ্ঞা হ্যাঁ,—প্রিকেক্টের কোচওয়ানও বাদ যায় নি। সে আমাদের দোকানে থেকেই মদ কেনো, এ কথা বেশ

ভাল করেই আমি জানি। আজ আমরা বিপদে পড়েছি, আর উনি সতীসেজে বসেছেন—লক্ষ্মীছাড়ী কোথাকার! অফিসারের দোষ কোন্ জায়গাটায় দেখিয়ে দেও ত শুনি?:বেটা ছেলে ত সে?"

শ্রোত্রী মহিলা দু'জন একটুখানি কেঁপে উঠলেন। সুন্দরী মাদাম কারে-লামাডোঁর মুখখানি একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল—যেন অফিসার তখনই তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে এই ভেবে।

পুরুষেরা একটু দূরে তাঁদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, এখন এগিয়ে এলেন। লোয়াসেও ক্রোধে অধীর হয়ে, হাত পা বেঁধে ঐ সর্ব্বনাশী ছুঁড়িটাকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে। কিন্তু কাউণ্ট চালাকি করে কাজ উদ্ধারের পক্ষপাতী—তাঁর তিন পুরুষ "আম-বাসেডর-গিরি" করে গেছেন—ডিপ্লোমাটের চাল চলন তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

—তিনি বললেন একটা কিছু স্থির করা প্রয়োজন। সকলে ষড়যন্ত্র করতে বসলেন।

মহিলারা সকলে ঘেঁষে বসলেন, অতি নীচু গলায় আলোচনা চলল। সে আলোচনায় সকলেই যোগ দিলেন, সকলেই নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন। এতে আসর জমকালো হয়ে উঠল। বিশেষতঃ মহিলারা সেরা সেরা বদ্ কথা গুলো বলবার সময় যে সুন্দর মুখভঙ্গী করেছিলেন, যে মধুর ও পরিষ্কার ভাবব্যঞ্জক বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করছিলেন তাতে আলোচনা অতি চিত্তা-কর্ষক হয়ে উঠছিল। তাবার উপর এত অত্যাচার করা কেন যে হচ্ছে, সেটা কোন আগন্তুকের বোঝবার সাধ্য ছিল না।

সংসারের তাবৎ স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা ঠিক ঠিক চিক্কণ

প্রলেপের মত আলগা ভাবে তাদের গায়ে লেগে থাকে—এমন একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপারের রসালোচনায় সেটা আপনা হতে উবে গেল মনে মনে সকলে বেজায় খুসী হয়ে উঠলেন, সকলের মনের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ল। লোভী পাচক অপরের ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করতে যেমন আহ্লাদ বোধ করে, পরের কেলেঙ্কারী নিয়ে তাঁরাও তেমনি মেতে উঠলেন।

সকলের আহ্লাদ উপচে পড়তে লাগল—সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া এমনি মজার। কাউন্ট সাহস করে দু'চারটে রসিকতা ছাড়লেন, কিন্তু সেগুলো এমনি চমৎকার করে বলা হল, যে সকলেই হাসলেন। লোয়াসেও তার পছন্দসই দু'চারটে রসিকতা ছুড়ে দিল, কিন্তু কেউ তাতে নাক সিঁটকালেন না। তার স্ত্রী যে সোজা কথাটা অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছিল, সেইটে ঘুরে ফিরে সকলের মাথায় খেলতে লাগল—"এ কাজ যখন তার পেশা, তখন সে এমন অন্যায় আবদার কেন করবে?"

বহুক্ষণ ধরে সকলে উপায় চিন্তা করতে লাগলেন,—অবরুদ্ধ দুর্গ হস্তগত করতে হলে লোকে যেমন করে চিন্তা করে। প্রত্যেকে ঠিক করলেন কে কি ভার নেবেন, কি কি যুক্তি ব্যবহার করবেন, কি রকম ফিকির দেখাবেন। আক্রমণের প্ল্যান, কল কৌশল, হঠাৎ অসতর্ক আক্রমণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হতে লাগল, কি করে এই জীবন্ত দুর্গকে বাধ্য করা যায় যাতে সে শত্রুকে তার ভিতরে ঢুকতে দেয়।

করনুদেৎ এতক্ষণ একা একা চুপ করে বসেছিল,—এই সব আলোচনায় সে কিছুমাত্র যোগ দিল না।

কথাবার্ত্তায় সকলে এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে বুল-ড-সুইফের

স্রেরবার শব্দ কারো কানে গেল না। কাউণ্ট হঠাৎ বললেন—"চুপ", সকলে মাথা তুললেন। বুল-দ্য-সুইফ কাছে দাঁড়িয়ে। তাঁরা অমনি থেমে গেলেন কিন্তু প্রথমটা থতমত খাওয়াতে কেউ তার সাথে কথা বলতে পারলেন না। কাউণ্টেস সালোনের লুকোচুরি খেলাতে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি ফস্ করে বলে ফেললেন,—"অভিষেক কেমন দেখলেন ?"

মোটা মেয়েটা তখন পর্য্যন্ত সেই ভাবে বিভোর। সে আগাগোড়া সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে বললে, "সময় সময় উপাসনা করা ভারি ভাল লাগে"।

মহিলারা স্থির করলেন যে প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত তার সাথে সদ্ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত—কারণ তাতে ওর বিশ্বাসটা ঠিক থাকবে এবং যুক্তি পরামর্শ কানে তুলবে।

খাবার টেবিলে বসে তাঁরা আক্রমণের সূচনা করলেন। প্রথমে আরম্ভ হল আত্মহত্যার গৌরব সম্বন্ধে হেঁয়ালিতে কথাবার্ত্তা। প্রাচীন ইতিহাস থেকে উদাহরণ বের হল জুডিথ ও হলোফারনেস। তারপরেই খামকা এল লুক্রিস ও সেকসটাস্, ক্লিওপ্যাট্রা কেমন করে সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সেনাপতিদের নিজের বিছানায় জায়গা দিয়ে তাদের চাকরের তুল্য বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল ; তারপর ঐ সব মূর্খ লাখপতিদের স্ব স্ব কল্পনায় তৈয়েরী অদ্ভূত এক গল্প বেরল,—কেমন করে রোমের বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলারা ক্যাপুয়ায় হ্যানিবল, তার সেনানী ও তাবৎ সৈন্যদের সাথে রাত্রিবাস করতেন। এর পর সকলে খুঁজে বের করতে লাগলেন পৃথিবীতে কখন কোন্ রমণী, বিজয়ী সেনাপতিদের গতিরোধ করেছেন, নিজের দেহকে যুদ্ধ

ক্ষেত্র করে, আদর আলিঙ্গনের প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের উপর আধিপত্য করতে পেরেছেন, প্রতিহিংসা সাধন ও দেশ-ভক্তির জন্য সতীত্ব বিসর্জ্জন করেছেন।

এইসব ব্যাপার ভারি চমৎকার করে, ধীর ভাবে বর্ণিত হচ্ছিল, যাতে করে ঐ মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অনুসরণ করবার ইচ্ছা বুল-দ-সুইফের মনে এক আধটু জেগে ওঠে।

তাঁদের কথাগুলো শুনলে সকলেরি মনে হবে যে পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য হচ্ছে শুধু নিজের দেহকে বিলিয়ে দেওয়া, সৈন্যদের খেয়াল মাফিক আত্মত্যাগ করা।

Nun যুগল গভীর চিন্তায় মগ্ন, এসব কথা তাদের কানে উঠছিল না, এমনি ভাব দেখাচ্ছিলেন।

সমস্ত বিকেলটা সকলে তাকে ভাববার অবসর দিলেন। কিন্তু কথাবার্ত্তার সময়ে পূর্ব্বে যেমন তাঁরা তার নামের আগে "মাদাম" শব্দ ব্যবহার করতেন, এখন তা না করে হঠাৎ "মাদামোয়াজেল" বলতে সুরু করলেন।—সকলের চোখে সে যে সম্মানের পদবীতে উঠেছিল সেখান থেকে তাকে নাবিয়ে তার প্রকৃত অবস্থা কি সেইটে বুঝিয়ে দেওয়াই হয়তঃ এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

টেবিলে সুপ পরিবেশনের সময় ম্যাসে কোর্নোভি পুনরায় আবির্ভূত হয়ে তাঁর পুরাণ বুলি আওড়ালেন,

"প্রুসীয় অফিসার মশাই জানতে চাইছেন, যে মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট, তাঁর মত বদলেছেন কিনা।"

বুল-দ-সুইফ সংক্ষেপে জবাব দিল, "না ম্যাসে।"

কিন্তু ডিনারের টেবিলে প্রতিপক্ষের একজোট ভাঙবার উপক্রম হল। লোয়াসেও গোটা তিনেক বেফাঁস কথা বলে ফেললে। সকলেই নূতন নূতন উদাহরণ বের করবার জন্য মাথা খুঁড়তে লাগলেন—কিন্তু একটা কথাও মনে এল না। হঠাৎ কাউণ্টেস, বোধকরি ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বশতঃই, Nun-দ্বয়ের জ্যেষ্ঠাকে অনুরোধ করলেন যে "সেণ্টদের" জীবনী থেকে বড় বড় দু'চারটে বৃত্তান্ত তাঁদের শুনিয়ে দিন। সেণ্টদের অনেকে এমন কাজ করেছিলেন, যা আমাদের চোখে মন্দ বলেই লাগবে। কিন্তু ঐ রকমের কাজগুলো যদি ভগবানের গৌরব ও পরকালের মঙ্গলের জন্য করা হয়, তবে ধর্ম্মযাজকেরা বিনা বিচারে, সেগুলোর সব দোষ অপরাধ স্খালন করে দেন। যুক্তি খুব প্রবল; কাউণ্টেস, এর অবতারণা করে খুব ফল পেলেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা-বুঝে-ব্যবস্থা করার স্বভাব বশতঃ রীতিমত মতলব করে হোক, কিংবা নিরেট স্থূলবুদ্ধি, যা অনেক সময় আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তার ফলেই হোক, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ষড়যন্ত্রে রীতিমত—সাহায্য করলেন। সকলের ধারণা ছিল তিনি খুব ধীর, স্থির—কিন্তু দেখলেন যে তিনি বেশ রোখালো বক্তিতাবাগীশ ও উগ্রপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। তিনি গ্রাহ্যও করলেন না যে, তার যুক্তিতর্ক জেসুইটদের মতের দিকে যাচ্ছে কি না? মত তাঁর, লোহের মত কঠিন, তাঁর বিশ্বাসে কোন দুর্ব্বলতা নেই, তাঁর বিবেক সব রকম দ্বিধাশূন্য। আব্রাহামের ত্যাগ-স্বীকার তাঁর চোখে সহজ ও স্বাভাবিক,—কারণ, তিনি বললেন, ঈশ্বরের আদেশ পেলে তিনি নিজে নিজের পিতামাতাকে বিনা বিলম্বে হত্যা করতে প্রস্তুত আছেন। উদ্দেশ্য যেখানে ভাল, সেখানে কোন

কাজই ঈশ্বরের অপ্রীতিকর নয়। কাউন্টেস, স্ব-অনুকূলে Nun-টির "অথরিটি" আরও ভাল করে কাজে লাগাবার জন্য, তাকে জেরা করে, "উদ্দেশ্য দেখে উপায়ের বিচার"—এই নীতি উপদেশ সম্বন্ধে চমৎকার, শিক্ষাপ্রদ এক বক্তৃতা বের করে নিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আপনার মতে আমরা হাজার খারাপ কাজই করি, তার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে ভগবান সে কাজের দিকে না তাকিয়ে শুধু উদ্দেশ্য দেখে আমাদের ক্ষমা করবেন?"

—"এ সত্য কে অস্বীকার করতে সাহস করে? আমাদের চোখে যে কাজ অতি জঘন্য, যদি তার মূলে সদুদ্দেশ্য থাকে, তারই জোরে শেষে অতি মহৎ বলে তা গণ্য হতে পারে।"

এমনি ভাবে তাঁদের কথাবার্ত্তা চলল—ভগবানের অভিপ্রায়, তাঁর আদেশ, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চলল—এবং যে সব ব্যাপারে কস্মিনকালে তাঁর মনোযোগ করবার সম্ভাবনা নেই, সেগুলো স্বচ্ছিন্ন ভাবে ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকল।

এ আলোচনা আগাগোড়া চাপা, চালাকীপূর্ণ ও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকটির প্রত্যেকটি কথা, বুল-ড-জুইকের বিরুদ্ধ-ভাবকে অনুকূল পথে আনতে লাগল। তারপর আলাপ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হল। মাজা-গলায় ঐ রমণী আপন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো, তার সম্প্রদায়ের, তার নিজের কথা, ও তার পরম প্রিয় প্রতিবাসী "সেঁইত-নিসেফোরের" কথা বললে। হাভ্রের হাসপাতালে রক্তশত বসন্ত রোগাক্রান্ত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য তাদের আহ্বান করা হয়েছে। ঐ সব হতভাগ্যদের

চিত্র সকলের সুমুখে সে এঁকে ধরলে, তাদের ব্যারামের খুঁটিয়ে বর্ণনা করলে। পথের মাঝে প্রুসীয়ানটার খামখেয়ালীতে তারা আটকা পড়েছে, এদিকে হয়ত কত ফরাসী দুর্ভাগা মারা যাবে, যাদের খুব সম্ভব শুশ্রূষায় বাঁচিয়ে তুলতে পারা যেত। তিনি বললেন সৈন্যদের শুশ্রূষা করা তাঁর বিশেষ কাজ,—স্পেশিয়ালটি। তিনি ক্রিমীয়াতে, ইটালীতে, অষ্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন, ঐ সব স্থানের অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা এমন চমৎকার করে বলতে লাগলেন যে, হঠাৎ সকলের চোখের সুমুখে ফুটে উঠল তার স্বরূপ-চিত্র,—সাবেক কালের ধর্ম্মোন্মত্তা সন্ন্যাসিনীদের মত, যারা রণ-বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে, সৈন্য-বাহিনীদের পিছু পিছু চলত, যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আহত যোদ্ধাদের কুড়িয়ে নিয়ে সেবা করত, সামান্য দুই একটা উত্তেজনা বাক্যে, সেনাপতিদের চাইতে বেশী কৃতকার্য্যতার সাথে নিরুৎসাহ সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করত; তাঁর রুক্ষ চেহারা ও অসংখ্য বসন্ত চিহ্ন লাঞ্ছিত মুখ দেখে মনে হল, বাস্তবিক তিনি লড়াইয়ের ধ্বংস-লীলার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি!

তার পরে আর কেউ কোন কথা বললে না, তাঁর বর্ণনা এমনি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

নৈশ ভোজন শেষ হতেই সকলে চটপট্ উপরে গিয়ে শয্যার আশ্রয় নিলেন। পরদিন বেশী সকালে উঠতে কারও আগ্রহ দেখা গেল না।

প্রাতরাশ নীরবে শেষ হল। বৃদ্ধা যে বীজ বুনেছিল, সেটা অঙ্কুরিত ও পুষ্পে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে সময়ের আবশ্যক বিবেচনা করে, সকলে চুপ করে রইলেন।

বিকেল বেলা কাউণ্ট একটু বেড়িয়ে আসবার প্রস্তাব করলেন। ব্যবস্থামত কাউণ্ট বুল-দ্য-সুইফের হাত ধরে সকলের পিছনে চললেন।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা পথের মেয়েদের সাথে কথা বলতে,—"শুনছ বাছা," ইত্যাদি বলে, খানিকটে তাচ্ছিল্য ও খানিকটে মুরুব্বীয়ানা করে আলাপ করেন,—কাউণ্ট ও তেমনি করে অন্তরঙ্গতার ভাব দেখিয়ে বুল-দ্য-সুইফের সাথে আলাপ আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমেই—আসল কাজের কথা পাড়লেন,—"সামান্য একটু উদারতা যা জীবনে আপনি কতবারই ত দেখিয়েছেন, তার বদলে এই অবাধ্যতার দরুণ প্রুসীয়ানরা যে অত্যাচার করবে, তার মুখে সবাইকে ফেলে রাখাই আপনি ভাল মনে করলেন?"

বুল-দ্য-সুইফ কোন উত্তর করলে না।

কাউণ্ট মিষ্টি কথা দিয়ে, যুক্তি তর্ক দিয়ে, প্রাণের কথা বলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। দরকার হলে তিনি নিজের উচ্চ পদের উপযোগী রসিকতা করতে পারতেন—খোসামুদি ও কোমল ব্যবহারের চূড়ান্ত করতে পারতেন। তাঁদের যে উপকারটা সে ইচ্ছা করলেই করতে পারে, সেটাকে তিনি আকাশে তুলে দিলেন, তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর একদম ঘনিষ্ঠতার চরমে, "তুমি আমিতে" এসে বললেন,—"আর দেখ, এক্ষে-লোকটা বড়াই করতে পারবে বটে, যে সে এমন সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখেছে, যা তার নিজের দেশে একরকম নেই বললেই হয়।"

বুল-দ্য-সুইফ কোন উত্তর না করে, অগ্রগামী দলের সঙ্গে গিয়ে মিললে।

হোটেলে ফিরেই সে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল—তাকে আর ফিরতে দেখা গেল না। সকলে ভয়ানক চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন,—সে কি স্থির করেছে? এখনও যদি সে রাজি না হয়, তবে কি করতে হবে।

ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল,—সকলে তার জন্য বৃথা দেরী করলেন। তখন ম্যাঁসে কোর্লেঁভি ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, যে মাদ্‌মোয়াজেল রুসেট অসুস্থ হয়েছেন, সকলে টেবিলে বসতে পারেন। সকলের কান খাড়া হয়ে উঠল। কাউণ্ট হোটেলওয়ালার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"কাজ হাঁসিল?"

—"হাঁ।"

তার সঙ্গীদের কাছে কিছু খুলে না বলে তিনি শুধু মাথা নেড়ে ইসারা করলেন। অমনি সকলে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন, সকলের মুখই প্রফুল্ল হয়ে উঠল; "বাঁচা গেল বাপ! হোটেলে শ্যাম্পেন থাকে তবে আনা হোক আমি দাম দেব।"—হোটেলওয়ালা যখন চারটে বোতল হাতে করে ঘরে ফিরে এল, তখন মাদাম লোয়াসেও সেগুলোর দিকে চেয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলেন। দেখতে দেখতে সকলের মুখ খুলে গেল, কথাবার্ত্তায় আসর জাঁকিয়ে উঠল। খুসীতে সকলের দিল মসগুল হয়ে উঠল। কাউণ্ট হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে মাদাম কারে-লামাডোঁ প্রকৃতই সুন্দরী। তুলার ব্যবসায়ী ম্যাঁসে কারে-লামাডোঁ কাউণ্টেসকে খুসী করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঠাট্টা মসকরা ও ফূর্ত্তিতে সকলে প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

হঠাৎ লোয়াসেও মুখ গম্ভীর করে, হাত তুলে বলে উঠলে, "আস্তে"! সকলে আশ্চর্য্য হয়ে ও ভয় পাবার মত চেহারা করে চুপ করে গেলেন। সে কাণ খাড়া করে, গোল থামাবার জন্য দু'হাত উঠিয়ে, ঘরের ছাদের দিকে দুই চোখ তুলে খানিকক্ষণ কি যেন শুনলে,—তারপর তার সাধারণ গলায় বললে, "কোন ভয় নেই, ঠিক চলছে।"

প্রথমটা কেউ যেন বোঝেন নি এই ভান করলেন, তারপর সকলের মুখেই মৃদুহাসির উদয় হল।

মিনিট পনের পরে ফের সে ঐ অভিনয় করলে;—সমস্ত সন্ধ্যা ধরে বার বার এই কারবার চলল। সে যেন উপর তলার কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে কথা বলছে, ও তাকে দ্ব্যর্থবোধক দু'চারটে পরামর্শ দিচ্ছে, সেগুলো তার ব্যবসা ও চরিত্রের উপযুক্ত বটে। কখনো দুঃখার্ত্ত মুখ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলছে, "বেচারা মেয়েটা!" আবার হয়তঃ রাগের ভাণ করে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলছে, "হতভাগা, পাজি প্রুসীয়ান!"—থেকে থেকে সকলে যখন হয়তঃ অন্য কথা বলছে, মাথা নেড়ে জোরগলায় বলে উঠছে, "বেশ, বেশ," এবং যেন নিজের মনেই বলছে,—"মেয়েটাকে আর দেখতে পাই কিনা,—বজ্জাত লোকটা তাকে না মেরে ফেললে হয়।"

এইসব রসিকতা নিতান্ত বদরুচির পরিচায়ক হলেও, সকলেই এতে আমোদ বোধ করছিলেন, কেউ আপত্তি প্রকাশ করলেন না। কারণ, অপর সব মনোভাবের মত ক্রোধের প্রকাশও নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে,—কিন্তু যে ভাব তখন

সকলের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেটার মূলে ছিল যত অশ্লীল ও বদচিন্তা।

ডিনারের শেষের দিকে মহিলারা পর্য্যন্ত দু' চারটে মার্জ্জিত ও মনোজ্ঞ রসিকতা করলেন। সকলের চোখ চক্‌চকে হয়ে উঠল,—পান কার্য্যটি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় হয়েছিল। কাউণ্ট সবরকম অবস্থাতেই নিজের পদোপযোগী গাম্ভীর্য্য ঠিক রাখতে পারতেন—তিনি একটা উপমা না দিয়ে থাকতে পারলেন না,—সে উপমাটা হচ্ছে এই যে মেরু প্রদেশে শীতের শেষ হলে, যারা জাহাজ আটকে বন্দি অবস্থায় ছিল, তাদের কি আহ্লাদ হয় যখন তারা দেখে যে দক্ষিণের পথ খোলসা হয়ে গেছে।

লোয়াসেও টক করে উঠে দাঁড়িয়ে—হাতে এক গেলাস শ্যাম্পেন নিয়ে বললে, "আমাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে।" সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন—তার প্রশংসা করলেন Nun-দুটি পর্য্যন্ত, মহিলাদের অনুরোধে, গেলাসের ঐ সফেন মদে চুমুক দিতে রাজি হলেন,—যদিও শ্যাম্পেন তাঁরা জীবনে কখন স্পর্শ করেন নি। তাঁরা বলেন যে ওর স্বাদ লেমনেডের মত কতকটা, কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভাল।

লোয়াসেও সকলের মনের কথা একাই প্রকাশ করে, বললে,—"দুঃখের বিষয় হাতের কাছে একটা পিয়ানো নেই, থাকলে একপাক নাচলে মন্দ হত না এ সময়ে।

করনুদেৎ এ পর্য্যন্ত একবারটিও মুখখোলেনি, খোলবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নি। তাকে দেখলে মনে হয় সে অত্যন্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। থেকে থেকে সে শুধু তার লম্বা দাড়ি সজোরে টানছিল,

যেন তার ইচ্ছা ওটা টেনে সে আরও লম্বা করে। দুপুর রাত্রে সকাল যখন নিজ নিজ ঘরে যাবে, তখন নেশায় টলটলায়মান লোয়াসেও তার পেটের উপর এক থাবড়া মেরে মাতালের অস্পষ্ট উচ্চারণে বললে, "আপনাকে কিছু খুশী বলে মনে হচ্ছে না ত এখন, কোন কথা বললেন না।" করনুদেৎ চট্‌করে মাথা উঠিয়ে, তীক্ষ্ম মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে, বললে, "আপনারা সকলে কেলেঙ্কারী করলেন,—আমি বলছি কেলেঙ্কারী—করলেন।" সে উঠে দোরের কাছে গিয়ে আবার বললে "কেলেঙ্কারী" তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

প্রথমটা এই ব্যাপারে সকলে ভেবড়ে গেলেন। লোয়াসেও বেকুব হয়ে হাঁ করে রইল। একটু পরেই তার মাথায় বুদ্ধি এল, সে চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভঙ্গী করে বললে, "ও দুটোই একেবারে কাঁচা, বুঝলে বন্ধু, একেবারে কাঁচা"। সকলে কিছুই বুঝতে পারলেন না দেখে সে সেই "করিডোর রহস্য" বিবৃত করলে। ব্যাপার শুনে সকলের আমোদে জোয়ার লেগে গেল। মহিলারা স্ফূর্ত্তির আধিক্যে পাগলের মত হয়ে গেলেন। হাসতে হাসতে কাউণ্ট ও ম্যাসে কারে-লামাডোঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

—তাই কি? আপনি ঠিক বলেছেন? সে গিয়েছিল—

—আরে আমি চোখে দেখেছি।

—ও বেটি রাজি হল না—

—কারণ, প্রুসীয়ানটা পাশের কামরায় ছিল।

—এও কি সম্ভব?

—আমি হলফ করে বলতে পারি।

কাউণ্টের দম বন্ধ হবার যোগাড় হল। তুলার ব্যবসায়ী দু'হাতে পেট চেপে ধরলেন। লোয়াসেও বললে, "কাজেই বুঝতে পারছেন, যে আজকের—ব্যাপারটায় ও লোকটা কিছু মজা পাচ্ছে না—একেবারেই কিছু না"।

তারপর তিনজনে হাঁস ফাঁস করতে করতে, টলতে টলতে, কোন মতে নিজ নিজ ঘরের দিকে চললেন।

উপরতলায় গিয়ে সকলের ছাড়াছাড়ি হল। মাদাম লোয়াসেও বিছানায় শুয়ে তাঁর স্বামীকে বললেন যে কারে লামাডোঁর ঐ ঠ্যাকারী কচকে বৌটা সারা সন্ধ্যা হাসতে হাসতে পাঁশুটে মেরে গেছে।—"আর জানইত স্ত্রীলোকগুলো যখন সৈনিকের য়ুনিফরমের গোঁ ধরে তখন সে সৈনিক ফরাসী হোক বা প্রুসীয়ান হোক তাদের কাছে একই কথা—একি কম ঘেন্নার কথা মাগো!"

সমস্ত রাত্রি ধরে করিডোরের অন্ধকারে নানারকম ঘুস্‌ঘাস্‌, খস্‌খস্‌, মানুষের নিশ্বাসের ও খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করবার মত অস্পষ্ট শব্দ ইত্যাদি কানে আসতে লাগল। সকলে অনেক রাত্রি অবধি জেগে ছিলেন, কারণ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দোরের ফাঁক দিয়ে আলো জ্বলছে দেখা গেল। শ্যাম্পেন ষোল আনা সুদ আদায় করে নেয়, ঘুমের উপর, তার নাকি বড় রাগ।

পরদিন সকাল বেলায় শীতের সুন্দর ঝরঝরে সূর্য্যের আলো চারদিকের বরফ-ঢাকা ক্ষেত মাঠ সব ঝলমলে করে তুলেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের গাড়ী, এত গোলমালের পর তবে তাতে ঘোড়া যোতা হয়েছে। একপাল সাদা রংয়ের পায়রা, ক্যাকম

ধরে, মাঝে কাল-তারা-চিহ্নিত লালচে চোখ মেলে, অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে ছুটা ঘোড়ার পেটের নীচে, পায়ের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কোচওয়ান তার ভেড়ার লোমের পোষাক গায়ে দিয়ে, কোচবাক্সে বসে পাইপ টানছিল,—যাত্রীরা খুসীমনে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে, পথের জন্য কিছু খাবার বেঁধে নিচ্ছিলেন।

কেবল বুল-ছ্য-সুইফের জন্য গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। একটু পরেই সে এল।

তাকে দেখে দুঃখিত ও লজ্জিত বলে মনে হল। অতি ধীরভাবে সে সঙ্গীদের দিকে অগ্রসর হল। তাঁরা তাকে যেন দেখেন নি, এই ভাবে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কাউণ্ট গম্ভীর ভাবে তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে, তার অশুচি স্পর্শ থেকে দূরে সরে গেলেন।

মোটা মেয়েটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সমস্ত সাহস সংগ্রহ করে, অতি বিনীত ভাবে "প্রাতঃ-নমস্কার" বলে তুলার ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে সম্বোধন করলে। তিনি অতি উদ্ধত ভাবে কটমট করে তার দিকে চাইলেন। সকলেই অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখাতে লাগলেন—ও তার কাছ থেকে দূরে সরে সরে থাকলেন, যেন তার পোষাকের মধ্যে সে কোন ছোঁয়াচে রোগের বীজ পুরে রেখেছে। তারপর সকলে হুড়মুড় করে গাড়ীতে উঠে পড়লেন, সে একা শেষে পড়ে রইল। সকলের বসা হলে ধীরে, নির্ব্বাক ভাবে গিয়ে প্রথমে আসবার সময় যেখানে বসেছিল, সেই জায়গায় চুপ করে বসলে।

কেউ তার দিকে ফিরে চাইলে না, তাকে যেন কেউ মোটে চেনেনই না। কেবল মাদাম লোয়াসেও তার ও আপনার মধ্যে

দূরত্ব বিবেচনা করে তার স্বামীকে নিম্নস্বরে বললে,—কি সৌভাগ্য যে ওটার কাছ থেকে আমি দূরেই বসেছি।

গাড়ী ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে উঠে, আবার যাত্রা সুরু করল।

প্রথমে কেউ কোন কথা বললে না। বুল-দু-সুইফ সাহস করে চোখ দু'টো তুলতে পারলে না। তার মনে তখন সঙ্গীদের বিরুদ্ধে রাগ জমে উঠেছে—তারাই ত তাকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত করে তুলেছে—ভণ্ডামি করে প্রুসীয়ানটার কোলের উপর তাকে দু'হাতে ঠেলে দিয়েছে।

এতক্ষণের এই অসহ্য নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্য কাউণ্টেস মাদাম কারে-লামার্ডোঁকে সম্বোধন করে বললেন,—

—আপনি বোধ হয় মাদমোয়াজেল দ' এট্রেলেশ-কে জানেন?

—হ্যাঁ, তিনি ত আমার একজন বন্ধু।

—ভারি বিদুষী মহিলা?

—তা আর বলতে? তিনি বিদুষীদের মধ্যেও একজন রীতিমত শিক্ষিত, পাকা আর্টিষ্ট। তার গানে মোহিত না হয় এমন লোক নেই, আর ছবি যা আঁকেন তা একেবারে নিখুঁত করে।

তুলার ব্যবসায়ী ও কাউণ্ট আলাপ করতে লাগলেন—কাঁচের শার্শি দেওয়া জানলার ঝকর ঝকর শব্দ ছাপিয়ে তাঁদের দু'একটা কথা মাঝে মাঝে কানে আসছিল্—"মেয়াদ," "প্রিমিয়াম"—ইত্যাদি।

লোয়াসেও তাঁর স্ত্রীর সাথে তাস খেলতে সুরু করলে।

Nun-দ্বয় হাতে জপের মালা নিয়ে, একসঙ্গে ক্রসের প্রতিরূপ বাতাসে এঁকে, অতিক্রুত গতিকে অস্পষ্ট শব্দ করে ঠোঁট নাড়তে সুরু করলেন। মাঝে মাঝে একটা মেডেল চুম্বন করে, আবার

বাতাসে ক্রস চিহ্ন এঁকে, গুণ্ গুণ্ শব্দ করে, জপ করতে লাগলেন।

করনুদ্বেৎ ঠায় বসে চিন্তা করতে লাগল। তিনঘণ্টা পরে লোয়াসেও তাস কুড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলে,—"ক্ষিদে পেয়েছে"।

লোয়াসেও-পত্নী একটা প্যাকেট থেকে একখণ্ড বীফ বের করে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কাটলেন। তারপর দু'জনে খেতে সুরু করলেন।

"আমরাই বা বাদ যাই কেন"?—কাউণ্টেস বললেন। তিনি একটা খাবারের বাকস থেকে নানারকম সুখাদ্য বের করলেন। তাঁর বাক্সে দু'বারের খাবার মত জিনিস জমানো ছিল।

Nnn-দ্বয় পিঁয়াজের গন্ধওয়ালা খানিকটে মাংসের কাবাব কাগজের মোড়ক খুলে বের করলেন। করনুদ্বেৎ তার কোটের বিশাল দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটার মধ্যে থেকে বের করলে সিদ্ধকরা খোসা সমেত গোটাকয়েক ডিম, আর একটা থেকে একখানা রুটি। ডিমের খোসা ছাড়িয়ে, খোসাগুলো পায়ের নীচে খড়ের উপর ফেলে দিয়ে ডিম কামড়ে খেতে লাগল—ডিমের মধ্যের হলদে রঙের বস্তুর দু'চারটে কণা তার বিশাল দাড়ির মধ্যে ঢুকে, সন্ধ্যাবেলার নক্ষত্রের মত চিক্‌চিক্ করতে লাগল।

ভোরবেলার তাড়াতাড়ি ও মাথার গোলমেলে অবস্থায় বুল-স্তু-সুইক খাবারের কথা ভাবতেই সময় পায়নি। তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করে সকলে নিশ্চিন্ত মনে যার যার মত খাচ্ছিল—এই দেখে তার মন কেবল অভিমানে ভরে উঠছিল। ক্রোধের উত্তেজনায় যন্ত্র

রকমের গালিগালাজ বুকের ভিতর থেকে ঠেলে তার জিবের আগায় এসে জমা হচ্ছিল, তাদের অন্যায় ব্যবহারের জন্য সবাইকে একেবারে লজ্জিত, অভিভূত করে দেবার জন্য—কিন্তু রাগের চোটে তার গলা আটকে গিয়েছিল, গালগুলো বেরোবার পথ পাচ্ছিল না।

একটি লোকও তার দিকে দৃষ্টিপাত করছিল না, তার কথা ভাবছিল না।

তার মনে হচ্ছিল, সে যেন ঐ সব সাধু ও সাধ্বী কপটাচারীদের দারুণ ঘৃণার অতল সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে —ওরাই না প্রয়োজন কালে তাকে আকাশে তুলে দিয়ে বলি দিয়েছিল, আর এখন প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাই অনাবশ্যক ও অকেজো বলে তাচ্ছিল্যভরে তার দিক থেকে মুখ ফেরাচ্ছে ? তারপর তার খাবার প্রকাণ্ড ঝুড়িটার কথা তার মনে হল,—তখন ত রাক্ষসের মত ওরাই তার ফাউল রোষ্ট, প্যাষ্ট্রি, ফল, চার বোতল বরদো, সব খুঁটিয়ে গিলেছিল ? এই সব ভাবতে ভাবতে, বেশী টানাটানিতে শক্ত রশি যেমন পট্ করে ছিঁড়ে যায়, তেমনি তার রাগ পড়ে গিয়ে কান্নার বেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কান্না চাপবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল,—ছোট ছেলে মেয়েরা যেমন করে ঢোক গিলে উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চায়, তেমনি করে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল,—কিন্তু দেখতে দেখতে চোখের পাতা জলে ভিজে ভারী হয়ে এল,—তারই দুইটা বড় বড় ফোঁটা টসটস করে গাল বয়ে ঝরে পড়ল।

পাথর কেটে ঝরণার জল যেমন ঝরঝরিয়ে নেমে যায়, বাধাহীন তার চোখের জল, তেমনি নিজের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে গাল ছাপিয়ে বুকের উপর পড়তে থাকল। কেউ সে জল লক্ষ্য না করে, এই মনে

করে সে স্থির দৃষ্টিতে চুপ করে বসে রইল,—তার মুখের চেহারা তখন কঠিন ও রক্তলেশশূন্য।

কিন্তু সে জল কাউণ্টেসের চোখে পড়ল, তিনি ইসারায় তাঁর স্বামীকে দেখালেন। তিনি শুধু দুই কাঁধ একবার নাড়লেন—অর্থাৎ, "সবাই জানে এতে আমার কোন দায় দোষ নেই।" মাদাম লোয়াসেও নিঃশব্দে খানিক বিজয়ের হাসি হেসে নিলেন ও নিম্নস্বরে বললেন,—"ছুঁড়িটা লজ্জায় কাঁদছে।"

Nun-দ্বয় আহারশেষে বাকী কাবাবখানি কাগজে জড়িয়ে রেখে, আবার জপ তপ আরম্ভ করলেন।

করনুদেৎ তার ডিমগুলো ধীরে সুস্থে হজম করছিল। এখন লম্বা সরু দুই ঠ্যাং সামনের বেঞ্চির নীচে টান করে মেলে, পিঠ হেলিয়ে, দুই হাত আড়াআড়ি করে কোলের উপর রেখে,—কোন রং-তামাসা দেখে উৎফুল্ল সমজদার দর্শকের মত একটুখানি মৃদু হাসি হেসে—শিষ দিয়ে "লা মার্সেলেজ" নামক পেট্রিয়টিক গানটি গাইতে সুরু করলেন।

গাড়ীর ভিতরকার চেহারাগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। সেই বিখ্যাত গীতটি কাউকে খুসী করতে পারছিল না। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা বিরক্তি ও অসোয়াস্তি বোধ করছিলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই যেন খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে চীৎকার করে উঠবেন, রাস্তার ব্যারেল-অরগানের আওয়াজ শুনলে কুকুরগুলো যেমন করে ওঠে, করনুদেৎ এই ভাব লক্ষ্য করলে, কিন্তু তার সঙ্গীতের বিরাম হল না। নীচের পদ ক'টি সে ফিরে ফিরে গাইতে থাকল,

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens, nos bras Vengeurs,
Liberté, liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs !

(পবিত্র স্বদেশ-প্রেম প্রতিশোধ নিতে উদ্যত আমাদের বাহুতে বল দেউক, হে প্রিয় স্বাধীনতা, তোমার রক্ষার জন্য যারা লড়ছে, তাদের সহায় হও)।

রাস্তার বরফ জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, গাড়ী দ্রুত ছুটে চল্‌ল তার উপর দিয়ে। দীয়েপ অবধি সমস্ত রাস্তাটা গাড়ীর বিষম ঝাঁকুনি, সন্ধ্যার ম্লান আলো, রাত্রে গাড়ীর ভিতরের ঘন অন্ধকার—সব অগ্রাহ্য করে, একরোখা হয়ে, তার একঘেয়ে নিষ্ঠুর শিষ দেওয়া চলতেই থাকল। গাড়ীর ক্লান্ত, রুষ্ট আরোহীদলকে নিরুপায় হয়ে তার গীতের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করতে হচ্ছিল—তার শিষ অনুযায়ী প্রত্যেকটি কথা তাঁদের মনে ফুটে উঠছিল।

বাধাহীন, বিরামহীন হয়ে বুল-দ্য-সুইফের চোখের জল ঝরে পড়ছিল,—মাঝে মাঝে একটা অবাধ্য দীর্ঘশ্বাস সেই গীতের দুই পদের ফাঁকে বাইরের ঘনান্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

১৩ই মে, ১৯২২।